# সূচীপত্র

# চিত্রসূচী



যতীন্দ্রকুমার সেন চিত্রিত

# কৃষ্ণকলি

## ইত্যাদি গল্প

# কৃষ্ণকলি

সকাল বেলা বেড়াতে বেরিয়েছি। রাস্তার ধারে একটা ফুলুরির দোকানের দাওয়ায় তিন-চার বছরের দুটি মেয়ে বসে আছে। একটি মেয়ে কুচকুচে কালো, কিন্তু সুশ্রী। আর একটি শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী মাঝারি রকম। দুজনে আমসত্ত্ব চুষছে।

আমি তাকাচ্ছি দেখে তারা মুখ থেকে আমসত্ত্ব বার করে আমার দিকে এগিয়ে ধরলো। বোধ হয় লোভ দেখাবার জন্য। বললুম, কি চুষছ খুকী?

কালো মেয়েটি উত্তর দিলো, বল দিকি নি কি?

—চটি জুতোর সুকতলা।

—হি হি হি, এ বাবুটা কিছু জানে না, আমসত্ত্বকে বলছে সুকতলা!

অন্য মেয়েটি বললে, হি হি হি. বোকা বাবু রে!

তার পর প্রায় চার বৎসর কেটে গেছে। সকাল বেলা বাড়ি থেকে বেরুবার উপক্রম করছি, একটি মেয়ে এসে বললে. একটু দুব্বো দেবে গা দাদু? বিশ্বকম্মা পুজো হবে।

দেখেই চিনেছি এ সেই আমসত্ত্ব-চোষা কালো মেয়ে, এখন এর বয়স বোধ হয় আট বছর। বললুম, যত খুশি দুব্বো নাও না।

মেয়েটির সাজ দেখবাব মতন। সদ্য স্নান করে এসেছে, এলো চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। একটি ফরসা লালপেড়ে শাড়ি কোমরে জড়িয়েছে। গা খোলা, কিন্তু আঁচলের এক দিক মাথায় দেবার চেষ্টা করছে আর বার বার তা খসে পড়ছে। গোল গোল দুই হাত যেন কষ্টি পাথরে কে'দো, তাতে ঝকঝকে রুপোর চুড়ি আর অনন্ত, কোমরে রুপোর গোট, গলায় লাল পলার মালা, পায়ে আলতা, হাতে আলতা, সি'থিতে সি'দুর। জিজ্ঞাসা করলুম. একি খুকী, বিয়ে করলে কবে?

মাথার ওপর কাপড় টেনে খুকী বললে, খুকী ব'লো নি বাবু, এখন আমি বড় হইছি। আমার নাম কেলিন্দী।

আমি বললুম, কেলিন্দী নয়, কালিন্দী। কিন্তু তোমার আরও ভাল নাম আছে, কৃষ্ণকলি। রবি ঠাকুর তোমাকে দেখে লিখেছেন—কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।...কালো? তা সে যতই কালো হ'ক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ। কৃষ্ণকলি নাম তোমার পছন্দ হয়?

কালিন্দী ঘাড় দুলিয়ে জানালে যে খুব পছন্দ হয়।

—তোমার বিয়ে হল কবে?

—সেই অঘ্রান মাসে।

—শ্বশুরবাড়ি কোথায়? বরের নাম কি?

—ধেৎ, বরের নাম বুঝি বলতে আছে! শ্বশুরঘর হই হোথাকে. ছুতোর-বউ মুড়িউলীর দোকানে। দাদু, রাঙা ফুল দুটো দাও না, মা পুজো করবে।

চাকরকে বললুম, নিতাই, গোটাকতক রঙ্গন ফুল পেড়ে দাও।

মুখ বেঁকিয়ে সাদা দাঁত বার করে কৃষ্ণকলি বললে, এ ম্যা গে, ও তো নোংরা পেণ্টু পরে আছে, সাত জন্ম কাচে নি। তুমি ফুল পেড়ে দাও।

—আমিও তো নোংরা, এখনও স্নান করি নি, কাপড় ছাড়ি নি। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক, নিতাই তোমাকে আলগোছে তুলে ধরুক, ও ফুল ছোঁবে না, তুমি নিজের হাতে পেড়ে নাও।

—কি বলচ গা দাদু, আমার যে বে হয়ে গেছে!

বুঝলুম, পরপুরুষের স্পর্শে কৃষ্ণকলির আপত্তি আছে। বললুম, তবে তোমার বরকে ডেকে আন, সেই তোমাকে তুলে ধরুক।

—সে তুলতে লারবেক। তুমিই আমাকে তুলে ধর না, আমি ফুল পেড়ে নেব।

—সেকি কৃষ্ণকলি, তোমার যে বিয়ে হয়ে গেছে, আমি তোমাকে তুলে ধরব কি করে?

—তুমি তো বুড়ো থুবড়ো।

ঠিক কথা, এতক্ষণ আমার হুঁশ ছিল না যে আমি বুড়ো থুবড়ো, সমস্ত অবলা-জাতি আমার কাছে অভয় পেয়েছে। বললুম, আমার হাতে যে বাতের ব্যথা, তোমাকে তোলবার তো শক্তি নেই।

—বাড়িতে আঁকশি নেই?

আমার লাঠির ডগায় একটা ছুরি বেঁধে আঁকশি করা হল। নিতাই তাই দিয়ে গোটাকতক ফুল পাড়লে, কৃষ্ণকলি মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলে।

ফুল-দুব্বো নিয়ে সে চলে যাবার উপক্রম করছে, আমি তাকে বললুম, কৃষ্ণকলি, বিস্কুট খাবে?

—উঁহু।

—মাখন দেওয়া পাঁউরুটি আর মিষ্টি কুলের আচার?

কৃষ্ণকলির মুখ দেখে মনে হল তার রুচি আছে, কিন্তু সংস্কারে বাধছে। বললে, আজ খেতে নেই, বিশকম্মা পুজো। সোঁসা আছে?

—আছে বোধ হয়। নিতাই, দেখ তো বাড়িতে শসা আছে কিনা।

শসা পবিত্র ফল, তাতে কৃষ্ণকলির আপত্তি নেই। নিতাই দুটো শসা এনে আলগোছে তার আঁচলে দিলে। আমি বললুম, কৃষ্ণকলি, তুমি এই অল্প বয়সে বিয়ে করে ফেলেছ, টের পেলে পুলিসে যে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

—ইশ, নিয়ে গেলেই হল কিনা! আমি তো বে করি নি, সে করেছে রেমো। সেই তো মন্তর পড়লে, আমি চুপটি করে বসেছিনু। রেমোর বাবার গায়ে খুব জোর, বলেছে পুলিস এলে ভোমরা ঘুরিয়ে তাদের পেট ছেঁদা করে দেবে।

—রেমো বুঝি তোমার বর?

কৃষ্ণকলি ওপর নীচে মাথা নাড়লে।

—এই যাঃ, কৃষ্ণকলি, বরের নাম করে ফেললে!

কৃষ্ণকলি লজ্জায় মা-কালীর মতন জিব বার করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, বলে ফেলেছ তা হয়েছে কি, আজকাল সব্বাই বরকে নাম ধরে ডাকে।

—সক্কলের সামনে ডাকে?

—আড়ালে ডাকে! নির্মলচন্দ্রের বউ ডাকে— ওরে নিমে, জগদানন্দর বউ ডাকে —এই জগা। দিন কতক পরে মেমদের মতন সকলের সামনেই ডাকবে।

—আমি যে তোমার সামনে বলে ফেলনু!

—তাতে দোষ হয় নি, আমি বুড়ো লোক কিনা।

এমন সময় একটি ফ্রক-পরা মেয়ে এসে বললে, এই কেলিন্দী, কি করছিস এখেনে, এক্ষুনি আয়, মামী ডাকছে।

এই মেয়েটিই বোধ হয় সেই চার বছর আগে দেখা আমসত্ত্ব-চোষা দ্বিতীয় মেয়ে। কৃষ্ণকলি তাকে বললে, খবদ্দার বিমলি, আর কেলিন্দী কইবি নি, রবি ঠাকুর আমার ভাল নাম দিয়েছে কেষ্টকলি। এই দাদু বললে।

মুখভঙ্গী করে দু' হাত নেড়ে বিমলি বললে, মরি মরি, কেলোকিষ্টি কেলিন্দীর নাম আবার কেষ্টকলি! রূপ দেখে আর বাঁচি নে!

কৃষ্ণকলি বললে, দেখ না দাদু, বিমলি আমায় ভেংচি কাটছে।

প্রশ্ন করলুম, বিমলি তোমার কে হয়, বোন নাকি?

—বোন না ঢেঁকি, ও তো আমার পিসতুতো ননদ। বিমলি, তুই যা, আমি একটু পরে যাব।

চলে যেতে যেতে বিমলি বললে, দেখিস এখন, আজ মামী তোকে ছেঁচবে। ওরে আমার কেষ্টকলি, শ্যাওড়া গাছের পেতনী!

কৃষ্ণকলি বললে, দাদু, ও আমায় পেতনী বলবে কেন?

—বলুক গে, ননদরা অমন বলে থাকে, শ্রীরাধার ননদও বলত। এক মেয়ের রূপ আর এক মেয়ে দেখতে পারে না। তোমার বর রেমো তো তোমাকে পেতনী বলে না?

—সেও বলে।

—তুমি রাগ কর না?

—উঁহু, সে হাসতে হাসতে বলে কিনা। আমি তাকে বলি ভূত পিচেশ হনুমান।

—তোমরা ঝগড়া কর নাকি?

—আমি খুব ঝগড়া করি, চিমটিও কাটি, কিন্তু রেমো রাগে না, শুধু মুখ ভেংচায় আর হাসে।

এমন সময় রামের মা এল। সে অনেকদিন থেকে এ বাড়িতে মুড়ি চিঁড়ে-ভাজা দিয়ে আসছে। তার স্বামী মুরারী ছুতোর মিস্ত্রী, ভাল কারিগর, কাঠের ওপর নকসা তোলে। রামের মা কৃষ্ণকলিকে দেখে বললে, ওমা, তুই এখেনে রইছিস, বিমলি যে বললে কেলিন্দী ধিঙ্গী হয়ে হেথা হোথা সেথা চাদ্দিক ঘুরে বেড়াচ্ছে!

কৃষ্ণকলি বললে, সব মিছে কথা। জান গা মা, এই দাদু বললে রবি ঠাকুর আমার নাম দিয়েছে কেষ্টকলি।

আমি রামের মাকে জিজ্ঞাসা করলুম, এ মেয়েটি তোমার বউ নাকি?

—হেঁ গা বাবা, গেল অঘ্রানে রেমোর সঙ্গে বে দিয়েছি। রেমোর বয়স দশ আর এর আট।

—এত কম বয়সে বিয়ে দিলে? কাজটা যে বেআইনী হয়েছে।

—আইন ফাইন জানি নে বাবা। মেয়েটা হতভাগী, এর মা পাঁচ বছর রোগে

ভুগে গেল সন জষ্টি মাসে ম'ল। বাপটা লক্ষীছাড়া, গাজা ভাং খেয়ে গেরুয়া পরে কোথা তারকেশ্বর কোথা ভদ্রেশ্বর টোটো করে ঘুরে বেড়ায়। তাই অনাথা মেয়েটাকে নিজের ঘরে এনে ছেলের সঙ্গে বে দিনু। ওদের ফুলুরির দোকানটাও আমি চালাচ্ছি। আমার তিন মেয়েই তো শ্বশুরঘর করছে, একটা বউ না আনলে কি আমার চলে বাবা? তা কেলিন্দী এখেনে এসে আপনাকে জ্বালাতন করছে বুঝি?

—না না, জ্বালাতন করে নি, একটু গল্প করছিল। তুমি আর একে কেলিন্দী ব'লো না রামের মা, এখন থেকে কৃষ্ণকলি ব'লো।

—হা রে কপাল, আমার খুড়শাশুড়ীর নাম যে কেষ্টদাসী। ঠাকুর দেবতার নাম কি মুখে আনবার জো আছে বাবা, শ্বশুরবাড়ির গুষ্টি সব নাম দখল করে বসে আছে। দাদাশ্বশুর ছিলেন ফরিদাস, শ্বশুরের নাম ফালিদাস, খুড়শ্বশুর ফত্তীধর, শ্বাশুড়ী ফরস্বতী।

কৃষ্ণকলি বললে, আর তোমার নামটা বলে দিই মা? হি হি হি, ফুগ্‌গা ফুগ্‌গতিনাশিনী!

আমি বললুম, রামের মা, আদর দিয়ে তুমি বউটির মাথা খেয়েছ, মুখের ওপর তোমাকে ঠাট্টা করে।

রামের মা হেসে বললে, কি করি বাবা, ওর ধরনই ওইরকম। নিজের মায়ের যত্ন আর ক দিন পেয়েছে, জন্ম ইস্তক আমাকেই দেখছে কিনা। যে নতুন নামটি বললেন তার পুরোটি তো বলতে পারব নি, এখন থেকে একে কলি বলব। দেখুন বাবা, এর বন্নটা কালো বটে, কিন্তু খুব ছিরি আছে, ছাঁদটি পরিষ্কার, যেন বার্টালি দিয়ে গড়া, আর ভারী সতীনক্ষী মেয়ে। বিমলিটা হচ্ছে কুঁদুলি। এখন আসি বাবা। ঘরকে চল্‌ রে কলি।

আমি বললুম, কৃষ্ণকলি, তোমার বরকে নিয়ে এক দিন এখানে এসো।

রামের মা বললে, হা আমার কপাল, রেমোর যে বড্ড নজ্জা, বউএর সঙ্গে কোথাও যেতে চায় না। আজকালকার ছোঁড়াদের মতন তো নয় যে সোমত্ত বউকে নিয়ে চাদ্দিকে ধেই ধেই নেত্য করে বেড়াবে। রেমোর পরীক্কেটা চুকে যাক, আমিই একদিন দুটিকে নিয়ে আসব।

কৃষ্ণকলি হাত নেড়ে বললে, সে তোমাকে কিছু করতে হবে নি মা, আমি একাই তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসব।

আমি বললুম, রামের মা, তোমার ছেলে তো সেকেলে, কিন্তু বউটি যে অত্যন্ত একেলে।

—ওটুকু সেরে যাবে বাবা, একটু বড় হলেই নজ্জা শরম আসবে।

রামের মা তার পুত্রবধূকে নিয়ে চলে গেল। কৃষ্ণকলির কপাল ভাল, আট বছর বয়সেই সে শাশুড়ীর কাছ থেকে সতীলক্ষ্মী সার্টিফিকেট আদায় করেছে, এক মা হারিয়ে আর এক মা পেয়েছে, এমন বর পেয়েছে যাকে নির্বিবাদে চিমটি কাটা চলে আর হিড়হিড় করে টেনে আনা যায়।

১৩৫৯

# জটাধর বকশী

নূতন দিল্লির গোল মার্কেটের পিছনে কুচা চমৌকিরাম নামে একটি গলি আছে। এই গলির মোড়েই কালীবাবুর বিখ্যাত দোকান ক্যালকাটা টি ক্যাবিন। এখানে চা বিস্কুট সস্তা কেক সিগারেট চুরুট আর বাংলা পান পাওয়া যায়, তামাকের ব্যবস্থা আর গোটাকতক হুঁকোও আছে। দু-এক মাইলের মধ্যে যেসব অল্পবিত্ত বাঙালী বাস করেন তাঁদের অনেকে কালীবাবুর দোকানে চা খেতে আসেন। সন্ধ্যার সময় খুব লোকসমাগম হয় এবং জাঁকিয়ে আড্ডা বসে।

পৌষ মাস পড়েছে, সন্ধ্যা সাড়ে ছটা, বাইরে খুব ঠান্ডা, কিন্তু কালীবাবুর টি ক্যাবিন বেশ গরম। ঘরটি ছোট, এক দিকে চায়ের উনন জ্বলছে, পনের-ষোল জন পিপাসু ঘেঁষা-ঘেঁষি করে বসেছেন। সিগারেট চুরুট আর তামাকের ধোঁয়ায় ঘরের ভিতর ঝাপসা হয়ে গেছে।

রামতারণ মুখুজ্যে কথা বলছিলেন। এঁর বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি। মিলিটারী অ্যাকাউন্ট্‌সে কাজ করতেন, দশ বছর হল অবসর নিয়েছেন। দুই ছেলেও দিল্লিতে চাকরি পেয়েছে, সেজন্য রামতারণ এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন। ইনি একজন সবজান্তা লোক, কথা বলতে আরম্ভ করলে থামতে চান না, অন্য লোককে কিছু বলবার অবকাশও দেন না। চায়ের আড্ডার সবাই এঁকে উপাধি দিয়েছে —বিরাট ছেঁদা, অর্থাৎ দি গ্রেট বোর।

রামতারণবাবু বলছিলেন, আরে না না, তোমাদের ধারণা একেবারে ভুল। ভূত আর প্রেত স্বতন্ত্র জীব, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। মৃত্যুর পর মানুষ যত দিন বায়ুভূত নিরালম্ব নিরাশ্রয় হয়ে থাকে, অর্থাৎ যে পর্যন্ত আবার জন্মগ্রহণ না করে তত দিন সে প্রেত। কিন্তু—

স্কুল মাস্টার কপিল গুপ্ত বললেন, অর্থাৎ পরলোকের ভ্যাগাবন্ডরাই প্রেত।

বক্তৃতায় বাধা পাওয়ায় রামতারণ বিরক্ত হয়ে বললেন, ফাজলামি রাখ, যা বলছি শুনে যাও। মৃত্যুর পর মানুষ চিরকাল প্রেত হয়ে থাকে না, আবার জন্মায়। ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। কিন্তু যারা ভূত তারা চিরকালই ভূত।

কপিল গুপ্ত আবার বললেন, বুঝেছি। যেমন গাজনের সন্ন্যাসী আর লোটা-চিমটা-কম্বল-ধারী বারমেসে সন্ন্যাসী।

—আঃ চুপ কর না। মরা মানুষের আত্মা হল প্রেত, বিলিতি ঘোস্ট্‌ও প্রেত। কিন্তু পিশাচ আর পল্টারগাইস্ট্‌কে ভূত বলা যেতে পারে। ভূত হল অপদেবতা, তারা নাকে কথা কয়, ভয় দেখায়, ঘাড় মটকায়, নানা রকম উপদ্রব করে। কিন্তু প্রেত সে রকম নয়, জীবদ্দশায় যার যেমন স্বভাব, প্রেত হলেও তাই থাকে। তবে চলিত কথায় প্রেতকেও লোকে ভূত বলে।

এই সময় একজন অচেনা লোক ঘরে প্রবেশ করলেন। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, ছ ফুট লম্বা, মজবুত গড়ন, মোচড় দেওয়া মোটা কাইজারী গোঁফ। গায়ে কালচে

খাকী মিলিটারী ওভারকোট, পরনে ইজার আছে কি ধুতি আছে বোঝা যায় না, মাথায় পাগড়ির মত বাঁধা কম্ফর্টার। আগন্তুক ঘরে এসে বাজখাঁই গলায় বললেন, নমস্কার মশাইরা, এখানে আপনাদের সঙ্গে বসে একটু চা খেতে পারি কি?

কয়েক জন এক সঙ্গে উত্তর দিলেন, বিলক্ষণ, চা খাবেন তার আবার কথা কি, এ তো চায়েরই দোকান। ওহে কালীবাবু, এই ভদ্রলোককে চা দাও। আপনাকে তো আগে কখনও দেখি নি, নতুন এসেছেন বুঝি?

—নতুন নয়, দিল্লি আমার খুব চেনা জায়গা, তবে সম্প্রতি বহু কাল পরে এসেছি। পুরনো দিল্লির কেউ কেউ এখনও হয়তো আমার নাম মনে রেখেছেন—জটাধর বকশী। ও ম্যানেজারমশাই, দয়া করে আমাকে বেশ বড় এক পেয়ালা চা দিন, খুব গরম আর কড়া। একটা মোটা বর্মা চুরুট, দশ খিলি পান, এক ধেবড়া চুন, আর অনেকখানি দোক্তাও দেবেন। হাঁ, তার পর ভূত প্রেতের কি যেন কথা হচ্ছিল আপনাদের। আমি একটু শুনতে পাই কি? এসব কথায় আমার খুব আগ্রহ আছে।

একজন উৎসুক নতুন শ্রোতা পেয়ে রামতারণবাবু খুশী হয়ে বললেন, হাঁ হাঁ শুনবেন বইকি। বলছিলুম, ভূত আর প্রেত আসলে আলাদা জীব, তবে সাধারণ লোকে তফাত করে না। বাদশাহী আর ব্রিটিশ জমানায় ভূত প্রেতের কথা অনেক শোনা যেত, কিন্তু এখনকার এই সেকিউলার ভারতে তারা ফৌত হয়ে যাচ্ছে। গুরুমহারাজ পানিমহারাজ রাজজ্যোতিষী নেপালবাবা ইত্যাদির ওপর লোকের ভক্তি খুব বেড়েছে বটে, কিন্তু ভূত প্রেতের ওপর আস্থা কমে গেছে, সেজন্য তাদের দেখা পাওয়া এখন কঠিন।

কপিল গুপ্ত বললেন, বিশ্বাসে মিলয়ে ভূত, তর্কে বহু দূর।

জটাধর বকশী বললেন, ঠিক কথা। কিন্তু ভূত যদি প্রবল হয় তবে অবিশ্বাসীকেও দেখা দেয়। যদি অনুমতি দেন তো আমি কিছু বলি।

রামতারণবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, আপনি ভূতের কি জানেন? গেল বছর যখন চাঁদনি চকের ঘড়িটা পড়ে গেল—

তিন-চার জন একবাক্যে বললেন, মুখুজ্যেমশাই, দয়া করে আপনি একটু থামুন, এঁকে বলতে দিন।

জটাধর বকশী বলতে লাগলেন।—বাদশা জাহাঙ্গীরের আমলে দিল্লিতে একবার প্রচণ্ড ভূতের উৎপাত হয়েছিল, আমাদের ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তার চমৎকার বৃত্তান্ত লিখেছেন। ভবানন্দ মজুমদারের ইষ্টদেবীকে জাহাঙ্গীর ভূত বলে গাল দিয়েছিলেন। প্রভুর আশকারা পেয়ে বাদশাহী সিপাহীরা ভবানন্দকে বললে—

> আরে রে হিন্দুর পুত দেখলাও কঁহা ভূত
> নহি তুঝে করুঙ্গা দো টুক।
> ন হোয় সুন্নত দেকে কলমা পড়াঁও লেকে
> জাতি লেউঁ খেলায়কে থুক॥

তখন ভবানন্দ বিপন্ন হয়ে দেবীকে ডাকলেন। ভক্তের স্তবে তুষ্ট হয়ে মহামায়া ভূতসেনা পাঠালেন, তারা দিল্লি আক্রমণ করলে—

> ডাকিনী যোগিনী শাঁখিনী পেতিনী গুহ্যক দানব দানা।
> ভৈরব রাক্কস বোক্কস খোক্কস সমরে দিলেক হানা॥

লপটে ঝপটে দপটে রবটে ঝড় বহে খরতর।
লপ লপ লম্ফে ঝপ ঝপ ঝম্ফে দিল্লি কাঁপে থরথর॥...
তাথই তাথই হো হো হই হই ভৈরব ভৈরবী নাচে।
অট্ট অট্ট হাসে কট মট ভাষে মত্ত পিশাচী পিশাচে॥

অবশেষে বেগতিক দেখে বাদশা ভবানন্দের শরণাপন্ন হলেন, বিস্তর ধন-দৌলত খেলাত আর রাজগির ফরমান দিয়ে তাঁকে খুশী করলেন, তখন ভূতের উৎপাত থামল। সেকালের তুলনায় আজকাল ভূত প্রেত কিঞ্চিৎ দুর্লভ হয়েছে বটে, কিন্তু এই দিল্লিতে এখনও ভূত দেখা যায়।

কপিল গুপ্ত বললেন, মুখুজ্যেমশাই, আপনি তো প্রাচীন লোক, বহুকাল দিল্লিতে আছেন, ভূতের সঙ্গে কখনও আপনার মোলাকাত হয়েছিল?

রামতারণ বললেন, আমি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তোমাদের মতন অখাদ্য খাই না, নিত্য সন্ধ্যা-আহ্নিক করি। ভূতের সাধ্য নেই যে আমার কাছে ঘেঁষে।

কপিল গুপ্ত বললেন, আচ্ছা জটাধরবাবু, আপনাকে তো একজন চৌকস লোক বলে মনে হচ্ছে, আপনি ভূত দেখেছেন?

জটাধর বললেন, নিরন্তর দেখছি, ভূত দেখা অতি সহজ।

—বলেন কি! দয়া করে আমাদের দেখান না।

রামতারণ বললেন, ওসব বুজরুকি আমার কাছে চলবে না। ভূত প্রেত মানি বটে, একলা অন্ধকারে ভয়ও পাই, কিন্তু জটাধর কি ঘটাধর বাবু ভূত দেখাতে পারেন এ কথা বিশ্বাস করি না। কলেজে আমি রীতিমত সায়েন্স পড়েছি, ম্যাজিকওয়ালাদের জোচ্চুরিও আমার জানা আছে।

অট্টহাস্য করে জটাধর বললেন, যদি আপনাকে ভূত দেখাই?

—দেখাবেন বললেই হল! কবে দেখাবেন? কোথায় দেখাবেন? কখন দেখাবেন?

—আজই, এখানেই, এখনই দেখাতে পারি।

কপিল গুপ্ত বললেন, দেখিয়ে ফেলুন মশাই, আর দেরি করবেন না, আমাদের বাড়ি ফেরবার সময় হল। কিন্তু কি দেখাবেন, ভূত না প্রেত?

রামতারণবাবু প্রতিবাদ সইতে পারেন না। চটে গিয়ে বললেন, বেশ, এখনই দেখান, ভূত প্রেত বেম্মদত্যি শাঁখচুন্নী যা পারেন। আমি বাজি রাখছি যে আপনি পারবেন না, শুধু ধাপ্পা দিচ্ছেন। ভূত দেখানো আপনার সাধ্য নয়।

জটাধর বললেন, আপনার চ্যালেঞ্জ মেনে নিলুম। মোটা টাকা বাজি রাখতে চাই না, কারণ আপনি নিশ্চয় হারবেন। ছা-পোষা পেনশনভোগী বুড়ো মানুষ, আপনার ক্ষতি করবার ইচ্ছে নেই। এই বাজি রাখা যাক যে ভূত যদি দেখাতে পারি তবে আমার চা চুরুট পানের দাম আপনি দেবেন। আর যদি হেরে যাই তবে আপনি যা খেয়েছেন তার দাম আমি দেব। রাজী আছেন? আপনারা সবাই কি বলেন?

সবাই বললেন, খুব ভাল প্রস্তাব, ভেরি ফেয়ার অ্যাণ্ড জেণ্টলম্যানলি।

বর্মা চুরুটের উগ্র ধোঁয়া উদ্‌গিরণ করতে করতে জটাধর বকশী বলতে লাগলেন।—উনিশ শ একচল্লিশ সালের কথা। তখন আমি বর্মায়, জেনারেল সিটওয়েলের

স্যাপার্স অ্যান্ড মাইনার্স-এর দলে সিনিয়র হাবিলদার-আমিন। বর্মা থেকে চীন পর্যন্ত যে রাস্তা তৈরি হচ্ছিল তারই জরিপ আমাকে করতে হত। আমার ওপর-ওকালা অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন ব্যাবিট।

রামতারণবাবু বললেন, ওসব বাজে কথা কি বলছেন, আপনার চাকরির বৃত্তান্ত আমরা শুনতে চাই না। ভূত দেখাতে পারেন তো দেখান।

দুই হাত নেড়ে আশ্বাস দিয়ে জটাধর বললেন, ব্যস্ত হবেন না সার, আমার কথাটি শেষ হবামাত্র ভূত দেখতে পাবেন। তখন জাপানীরা দক্ষিণ বর্মায় পেঁছেছে, তাদের আর একদল থাইল্যান্ডের ভেতর দিয়ে বর্মার উত্তর-পূর্ব দিকে হানা দিচ্ছে। আমাদের সার্ভে পার্টি সে সময় শান স্টেটের উত্তরে কাজ করছিল। দলটি খুব ছোট, ক্যাপ্টেন ব্যাবিট, আমি, পাঁচজন গোর্খা সেপাই, পাঁচজন বর্মী কুলী, একটা জিপ, আর আমাদের তাঁবু রসদ থিওডোলাইট লেভেল চেন ঝাণ্ডা ইত্যাদি বইবার জন্য চারটে খচ্চর। আমরা যেখানে ছাউনি করেছিলুম সে জায়গাটা পাহাড় আর জঙ্গলে ভরা, মানুষের বাস নেই। বাঘ ভালুক হুড়ার প্রভৃতি জানোয়ারের খুব উপদ্রব। বন্দুক দিয়ে মারা বারণ, পাছে শত্রুরা টের পায়। ব্যাবিট সায়েবের সঙ্গে এক টিন স্ট্রিকনীনের বড়ি ছিল, জিলাটিন দিয়ে মোড়া, পেটে গেলে তিন মিনিটের মধ্যে গলে যায়। মাংসের টুকরোর সঙ্গে সেই বড়ি মিশিয়ে ক্যাম্পের বাইরে ফেলে রাখা হত, রোজই দু-চারটে জানোয়ার মারা পড়ত।

একদিন গুজব শোনা গেল যে জাপানীরা আমাদের বিশ মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে। ক্যাপ্টেন ব্যাবিট বললেন, ওহে বকশী, শুধু তুমি আর আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি চল, আর সবাই ক্যাম্পেই থাকুক। চিয়াং কাই-শেক আমাদের সাহায্যের জন্য একটা চীনা পল্টন ইউনান থেকে পাঠিয়েছেন, আজ তাদের এখানে পেঁছবার কথা। দেখতে হবে তাদের কোনও পাত্তা মেলে কিনা।

আমরা দুজনে উত্তর-পূর্ব দিকে চার-পাঁচ মাইল হেঁটে চললুম। সামনে একটা নিবিড় জঙ্গল, তার ওধারে একটা ছোট পাহাড়। সায়েব বললেন, ওই পাহাড়ের ওপর উঠে দূরবীন দিয়ে চারিদিক দেখতে হবে। আমরা জঙ্গলে ঢুকলুম, সঙ্গে সঙ্গে জন পঞ্চাশ জাপানী আমাদের ঘিরে ফেললে।

রামতারণবাবু অধীর হয়ে বললেন, ওহে বকশী, তুমি তো কেবলই বকবক করে চলেছ। শেষকালে হয়তো বলবে যে তুমি নিজেই একটি জাপানী ভূত দেখেছিলে। সেটি চলবে না বাপু, তোমার দেখা ভূত মানব না।

জটাধর বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আর একটু পরেই আপনারা সবাই স্বচক্ষে ভূত দেখবেন। তার পর শুনুন।—ক্যাপ্টেন ব্যাবিট বললেন, বকশী, আত্ম-রক্ষার কোনও উপায় নেই, হাত তুলে সরেন্ডার কর। আমরা হাত তুলতেই জাপানীরা কাছে এল। এমন রোগা হাড্ডি-সার পল্টন কোথাও দেখি নি। তাদের তিন-চার জন আমাদের গাল কাঁধ হাত পা টিপে টিপে দেখতে লাগল, একজন সায়েবের কাঁধে কামড়ে দিলে, আর সবাই তাকে ধমক দিয়ে টেনে নিয়ে গেল।

ব্যাবিট সায়েব একটু আধটু জাপানী ভাষা বুঝতেন। জিজ্ঞাসা করলুম এদের মতলব কি? সায়েব বললেন, মাই পুওর বকশী, বুঝতে পারছ না? এদের ভাঁড়ার শূন্য, রসদ যা আসছিল শান ডাকাতরা লুট করে নিয়েছে, সাত দিন উপোস করে আছে, খিদেয় পেট জ্বলছে। তার পর দেখলুম, ওদের কয়েকজন একটা উনন বানিয়ে আগুন জ্বেলেছে, তার ওপর মস্ত একটা ডেকচি চাপিয়েছে।

টি ক্যাবিনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে বীরেশ্বর সিংগি একটু বেশী ভীতু। ইনি শিউরে উঠে বললেন, এই সময় চীনা পল্টন এসে পড়ল বুঝি?

জটাধর বললেন, কোথায় পল্টন! চারজন জাপানী এগিয়ে এল, দুজনের হাতে দড়ি, আর দুজনের হাতে তলোয়ার। সায়েব বললেন, বকশী, এই চারটে বড়ি এখনই গিলে ফেল। আমি বললুম, আগে থাকতেই বিষ খেয়ে মরব কেন, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। সায়েব ধমক দিয়ে বললেন, যা বলছি তাই কর, আমি তোমার কমান্ডিং অফিসার, অবাধ্য হলে কোর্ট মার্শালে পড়বে। কি আর করা যায়, বড়ি চারটে গিলে ফেললুম, সায়েবও গিললেন।

বীরেশ্বর সিংগি আঁতকে উঠে বললেন, অ্যাঁ, বিষ খেলেন? তার পর চীনা ফৌজের ডাক্তার এসে বিষ বার করে ফেললে বুঝি?

—চীনা ফৌজ এক ঘণ্টা পরে এসেছিল। আমাদের যা হল শুনুন। দুটো জাপানী আমাদের হাত পা বেঁধে ঘাড় নীচু করে বসিয়ে দিলে। আর দুটো জাপানী তলোয়ার দিয়ে ঘ্যাঁচ—

বীরেশ্বরবাবু মাথা চাপড়ে চিৎকার করে বললেন, ওরে বাপ রে বাপ!

—হাঁ মশাই, তলোয়ারের চোপ দিয়ে ঘ্যাঁচ করে আমাদের মুণ্ডু কেটে ফেললে।

রামতারণবাবু ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, তবে বেঁচে আছেন কি করে?

বজ্রগম্ভীর স্বরে জটাধর বকশী বললেন, কে বললে বেঁচে আছি? আপনার হুকুমে বাঁচতে হবে নাকি? আমাদের কেটে টুকরো টুকরো করলে, ডেকচিতে সেদ্ধ করলে, চেটে পুটে খেয়ে ফেললে, খিদের চোটে স্ট্রিকনীনের তেতো টেরই পেলে না। তারপর তিন মিনিটের মধ্যে সব কটা জাপানী কনভলশন হয়ে পটপট করে মরে গেল। ক্যাপ্টেন ব্যাবিটের মতন বিচক্ষণ অফিসার দেখা যায় না মশাই, আশ্চর্য দূরদৃষ্টি। আচ্ছা, আপনারা বসুন, আমি এখন চললুম। ও কালীবাবু, আমার বিলটা রামতারণবাবুই শোধ করবেন। নমস্কার।

# নিরামিষাশী বাঘ

অনেক বৎসর আগেকার কথা, তখন আলীপুর জন্তুর বাগানের কর্তা ডাক্তার যোগীন মুখুজ্যে। যোগীন আমার বন্ধু। একদিন টেলিফোনে বললে, ওহে, বড় বড় একজোড়া তিব্বতী পান্ডা এসেছে, খাসা জানোয়ার, দেখলেই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। সাদা গা, কালো পা, কাজলপরা চোখ, ভাল্লুককে টেনে লম্বা করলে যেমন হয় সেইরকম চেহারা। তোমারই মতন নিরামিষ খায়। দুদিন পরেই হামবুর্গ জু-তে চলে যাবে, দেখতে চাও তো কাল বিকেলে এস।

পরদিন বিকালে যোগীনের কাছে গেলুম। পান্ডা, কাংগারু, হিপ্পো, কালো রাজহাঁস, সাদা ময়ূর প্রভৃতি সব রকম দুর্লভ প্রাণী দেখা হল। তারপর বাঘ সিংগির খাওয়া দেখছি এমন সময় নজরে পড়ল একটা বাঘ ভাল করে খাচ্ছে না, যেন অরুচি হয়েছে। মাংসের চার দিকে তিন পায়ে খুঁড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে একটু কামড় দিচ্ছে। যোগীনকে বললুম, আহা, বেচারার একটা পা জখম হয়েছে, খানিকটা মাংস কেউ যেন খাবলে নিয়েছে। গুলি লেগেছিল নাকি?

যোগীন বললে, গুলি লাগে নি। বাঘটির নাম রামখেলাওন, এর ইতিহাস বড় করুণ। পাশের খাঁচার বাঘিনীটিকে দেখ।

পাশের খাঁচায় দেখলুম একটি খোঁড়া বাঘিনী রয়েছে। এরও অরুচি, কিন্তু তবুও কিছু খাচ্ছে। প্রশ্ন করলুম, দুটোই খোঁড়া দেখছি, কি করে এমন হল?

যোগীন বললে, এই বাঘিনীটির নাম রামপিয়ারী। রামখেলাওন আর রামপিয়ারী দুটোই বছর-দুই আগে গয়া জেলার গড়বড়িয়ার জংগলে ধরা পড়ে। এদের দস্তুর মত মন্ত্র পড়িয়ে বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু মনের মিল হল না, তাই আলাদা খাঁচায় রাখতে হয়েছে।

—ভারী অদ্ভুত তো! ইতিহাসটা বল না শুনি।

—তোমার তো সব দেখা হয়ে গেছে, এখন আমার বাসায় চল, চা খেতে খেতে ইতিহাস শুনবে।

যোগীনের কাছে যে ইতিহাস শুনেছিলুম তাই এখন বলছি।

গয়া জেলায় অনেক বড় বড় জমিদার আছেন। একজন হচ্ছেন চৌধুরী রঘুবীর সিং, প্রতাপপুর গ্রামে বাস করেন। ইনি খুব ধনী লোক, অনেক বিষয় সম্পত্তি, গড়বড়িয়ার জঙ্গল এঁরই জমিদারির অন্তর্গত। রঘুবীর রাজপুত ছত্রী, এককালে খুব শিকার করতেন, কিন্তু বুড়ো বয়সে তাঁর গুরু মহাত্মা রামভরোস স্বামীর উপদেশে সব রকম জীবহিংসা ত্যাগ করেছেন, নিরামিষ খান, ত্রিসন্ধ্যা রামনাম জপ করেন। তাঁর কড়া শাসনে বাড়ির সকলেই মায় কাছারির আমলারা পর্যন্ত নিরামিষ খেতে বাধ্য হয়েছে।

রঘুবীর যখন শিকার করতেন তখন তাঁর সহচর ছিল অকলু খাঁ। সে তখন বেকার, কিন্তু নিয়মিত মাসহারা পায় এবং মনিবের সেলাখানায় যত বন্দুক তলোয়ার বর্শা ইত্যাদি অস্ত্র আছে সমস্ত মেজে ঘষে চকচকে করে রাখে।

একদিন সকালবেলা রঘুবীর সিং বাড়ির সামনের চাতালে একটা খাটিয়ায় বসে গুড়গুড়ি টানছেন আর তাঁর পাঁচ বছরের নাতি লল্লুলালের সঙ্গে গল্প করছেন, এমন সময় অকলু খাঁ এসে সেলাম করে বললে, হুজুর, একটা বড় বাঘ গড়বড়িয়ার জঙ্গলে ধরা পড়েছে।

রঘুবীর বললেন, আহা, রামজীর জানবর, ওকে ফের জঙ্গলে ছেড়ে দাও।

লল্লুলাল বললে, না দাদুজী, ওকে আমি পুষব।

রঘুবীর নাতির আবদার ঠেলতে পারলেন না। হুকুম দিলেন, শাল কাঠের একটা বড় পিঁজরা বানাও, তার সামনে একটা আর পিছনে একটা কামরা থাকবে, যেমন কলকাতার চিড়িয়াখানায় আছে। মোটা মোটা সিক লাগানো হবে। দুই কামরার মাঝে একটা ফটক থাকবে, ছাদ থেকে জিঞ্জির টানলে ফটক খুলবে, তখন বাঘ কামরা বদল করতে পারবে।

দু দিনের মধ্যেই খাঁচা তৈরি হয়ে গেল, তাতে বাঘকে পোরা হল। দেখা-শোনার ভার অকলু খাঁর উপর পড়ল। সে তার মনিবকে বললে, হুজুর, আমাদের যে বাঙালী ডাক্তারবাবু আছেন তিনি বলেছেন আলীপুরের চিড়িয়াখানায় প্রত্যেক বাঘকে দু-তিন দিন অন্তর সাত সের ঘোড়ার মাংস খেতে দেওয়া হয়। এখানে তো তা মিলবে না, আপনি খাসীর হুকুম করুন।

রঘুবীর বললেন, খবরদার, কোনও রকম গোশ্‌ত আমার কোঠির এলাকায় ঢুকবে না। এই বাঘের নাম দিয়েছি রামখেলাওন, ও গোশ্‌ত খাবে না!

—তবে কি রকম খানা দেওয়া হবে হুজুর?

—খানা কি কমী ক্যা? পুরি কচৌড়ি হালুআ লড্ডু খিলাও, চাহে দুধ পিলাও, রাবড়ি মালাই পেড়া বরফি ভি খিলাও।

ওই সব পবিত্র খাদ্যেরই ব্যবস্থা হল। রঘুবীর তাঁর লোকজনদের বিশ্বাস করলেন না, নাতিকে সঙ্গে নিয়ে নিজের সামনে বাঘকে খাওয়াতে এলেন। বাঘ একবার শুঁকে পিছন ফিরে বসল। রঘুবীর বললেন, এসব জিনিস খাওয়া তো অভ্যাস নেই, নিয়মিত দিয়ে যাও, দিন কতক পরেই খেতে শিখবে।

দু দিন অন্তর রামখেলাওনকে নৈবেদ্য সাজিয়ে দেওয়া হতে লাগল, কিন্তু একটু দুধ আর মালাই ছাড়া সে কিছুই খায় না। পুরি কচৌড়ি পেড়া ইত্যাদি সবই অকলু খাঁ আর অন্যান্য চাকরদের জঠরে যেতে লাগল।

মানুষকে যদি অন্য কোনও খাবার না দিয়ে শুধু ঘাস দেওয়া হয় তবে খিদের তাড়নায় সে ঘাসই খাবে। রামখেলাওনও অবশেষে পুরি কচৌড়ি পেড়া প্রভৃতি সাত্ত্বিক খাদ্য খেতে শুরু করলে।

চৌধুরী রঘুবীর সিং-এর একটি দাতব্য দাবাখানা আছে, ডাক্তার কালীচরণ পাল তার অধ্যক্ষ। মনিবের আদেশে কালীবাবু রোজই একবার বাঘটিকে দেখেন। তিনি জন্তুর ডাক্তার নন, তবু বুঝতে দেরি হল না যে রামখেলাওনের গতিক ভাল নয়। তার পেট মোটা হচ্ছে, কিন্তু ফুর্তি নেই, ঝিমিয়ে আছে। কালীবাবু ডায়াগনোসিস করে রঘুবীরের কাছে এলেন।

রঘুবীর প্রশ্ন করলেন, ক্যা খবর ডাকটর বাবু, রামখেলাওন তো বহুত মজে মে হৈ?

কালীবাবু বললেন, না চৌধুরীজী, মোটেই ভাল নেই। ওর ডায়াবিটিস হয়েছে।

—সে কি? ভাল ভাল জিনিসই তো ওকে খেতে দেওয়া হচ্ছে, আমি যা খাই বাঘও তাই খাচ্ছে।

—কি জানেন, বাঘ হল কার্নিভোরস গোশ্‌তখোর জানোয়ার। কার্বোহাইড্রেট খাদ্য ওর সহ্য হচ্ছে না, গ্লুকোজ হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। রোজ তিন বার ইনসুলিন দেওয়া দরকার, কিন্তু দেবে কে?

—কি বলছ বুঝতে পারছি না। তুমি বাঘের ইলাজ করতে না পার তো পাটনা থেকে বড় ডাক্তার আনাও।

—আপনি ইচ্ছা করলে বড় ডাক্তার আনতে পারেন, কিন্তু কেউ কিছুই করতে পারবে না, ছাগল যেমন মাংস হজম করতে পারে না, বাঘ তেমনি পুরি কচৌড়ি পারে না। ওকে যদি বাঁচাতে চান তবে মাংসের ব্যবস্থা করুন।

রঘুবীর সিং চিন্তিত হয়ে বললেন, বড়ী মুশকিল কি বাত। আচ্ছা, কাল আমার গুরুমহারাজ রামভরোসজী আসছেন, তিনি কি বলেন দেখা যাক।

গুরুমহারাজ এলেন, রঘুবীর তাঁকে বাঘ দেখাতে নিয়ে গেলেন, ডাক্তার কালীবাবুও সঙ্গে গেলেন।

রামভরোসজী খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে বাঘকে প্রশ্ন করলেন, ক্যা বেটা রামখেলাওন, ক্যা হুয়া তেরা? বাঘ মৃদুস্বরে উত্তর দিলে, হুলুম।

রামভরোস বললে, সমঝ লিয়া। আরে ই তো বহুত মামুলী বীমারী। বির্হা হুয়া।

কালীবাবু বললেন, বির্হা কি রকম বেয়ারাম?

—নহি সমঝা? বাঘ বাঘিনী মাংতা।

কালীবাবু বললেন, ও, বাঘের বিরহ হয়েছে, তাই ঝিমিয়ে আছে। তবে চট-পট বাঘিনী যোগাড় করুন।

চৌধুরী রঘুবীর সিংএর লোকবল অর্থবল প্রচুর। তিন দিনের মধ্যে একটা তরুণী বাঘিনী ধরা পড়ল। রামভরোসজী তার নাম রাখলেন রামপিয়ারী। বিধান দিলেন, আলাদা পিঁজরায় রেখে বাঘিনীকেও পুরি কচৌরি ওগয়রহ খেতে দেওয়া হক। যখন নিরামিষ ভোজনে অভ্যস্ত হবে, বাঘ বাঘিনী দুজনেই সাত্ত্বিক স্বভাব পাবে, তখন পুরুত ডাকিয়ে বিয়ে দিয়ে এক খাঁচায় রাখবে।

খিদের জ্বালায় বাঘিনীও ক্রমশঃ পুরি কচৌড়ি পেড়া ইত্যাদি খেতে আরম্ভ করলে। সাত্ত্বিক আহারের ফলে বাঘের যেসব উপসর্গ দেখা দিয়েছিল বাঘিনীরও তাই দেখা গেল। তখন রামভরোস স্বামীর উপদেশে ঘটা করে বিয়ে দেবার আয়োজন হল, ঢোল বাজল, পুরোহিত মিসিরজী মন্ত্রপাঠ করলেন, তবে দুই থাবা এক করে দেবার সাহস তাঁর হল না। বাঘ-বাঘিনীর বাসের জন্য একটা খাঁচা ফুল দিয়ে সাজিয়ে তার মধ্যে বড় বড় বারকোশে নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রী এবং পান সুপারী কর্পূর ছোয়ারা নারকেল-কুচি প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য রাখা হল।

বিবাহসভায় রঘুবীর সিং, তাঁর আত্মীয়-স্বজন, রামভরোসজী, কালীবাবু, অকলু খাঁ এবং আরও বিস্তর লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই আশা করলেন যে এইবারে এদের মেজাজ ভাল থাকবে, খাদ্য হজম হবে, দুটিতে মিলে মিশে সুখে ঘরকন্না করবে।

বর-কনের শুভদৃষ্টি-বিনিময় কেমন হয় দেখবার জন্যে সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। শুভ মুহূর্তে শাঁখ বেজে উঠল, বিহারের প্রথা অনুসারে পুরনারীরা

চিৎকার করে গাইতে লাগল—পরদেসীয়া আওল আঙ্গানা। অকলু খাঁ কপাট টেনে নিয়ে নবদম্পতিকে এক খাঁচায় পুরে দিলে।

ফ্রয়েডের শিষ্যরা যাই বলুন, প্রাণীর আদিম প্রেরণা ক্ষুৎপিপাসা। রামখেলাওন আর রামপিয়ারী হিংস্র শ্বাপদ, নামের আগে রাম যোগ করে এবং অনেক দিন নিরামিষ খাইয়েও তাদের স্বভাব বদলানো যায় নি। চার চক্ষুর মিলন হবা মাত্র আমিষবুভুক্ষু দুই প্রাণীর ক্যানিবল প্রবৃত্তি চাগিয়ে উঠল, প্রচণ্ড গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা পরস্পরের সামনের বাঁ পায়ে কামড় দিয়ে এক এক গ্রাস মাংস তুলে নিলে।

বাঘের গর্জন, রক্তের স্রোত, মানুষের চিৎকার, লল্লুলালের কান্না সমস্ত মিলে সেই বিবাহসভায় হুলস্থূল পড়ে গেল। রঘুবীরের আদেশে অকলু খাঁ একটা জলন্ত মশালের খোঁচা দিয়ে কোনও রকমে বাঘ দুটোকে তফাত করে তাদের নিজের নিজের খাঁচায় পুরে দিলে। রামভরোস মহারাজ বললেন, এই দুই জীব পূর্বজন্মে পাপ করেছিল তাই এই দশা হয়েছে, এদের চরিত্র দুরস্ত হতে আরও চুরাশি জন্ম লাগবে।

রঘুবীর সিং জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তারবাবু, এখন কি করা উচিত?

কালীবাবু বললেন, চৌধুরীজী, আপনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, এরা যখন কিছুতেই সাত্ত্বিক হল না তখন আর দেরি না করে এদের আলীপুরে পাঠিয়ে দিন।

তারপর যোগীন আমাকে বললে, রঘুবীর সিং বাঘ দুটোকে বিদেয় করতে রাজী হলেন। কালীবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তিনি সমস্ত ঘটনা জানিয়ে আমাকে একটি চিঠি লিখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আলীপুর জু এই দুটো বাঘকে রাখবে কিনা। খোঁড়া বাঘ শুনে ট্রাস্টীরা প্রথমে একটু খুঁতখুঁত করেছিলেন। কিন্তু চৌধুরী রঘুবীর সিং দিলদরিয়া লোক, ব্যাঘ্রদম্পতির যৌতুক স্বরূপ হাজার-এক টাকার একটি চেক আগাম পাঠিয়ে দিলেন। আর কোনও আপত্তি হল না, রামখেলাওন আর রামপিয়ারী কালীবাবুর সঙ্গে এসে আমাদের এখানে ভরতি হল। এখন মোটের ওপর ভালই আছে, তবে অনেক দিন সাত্ত্বিক আহারের ফলে ওদের প্যাংক্রিয়াস ড্যামেজ হয়েছে, হজমশক্তি কমে গেছে, মেজাজও খিটখিটে হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মোটেই বনে না।

# বরনারীবরণ

সজ্জনসংগতির নাম আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন। খবরের কাগজে যাঁদের ওয়াকিফহাল মহল বলা হয় তাঁরা সকলেই একমত যে এর মতন উঁচুদরের অভিজাত ক্লাব কলকাতায় আর নেই। নামটি মোহমুদ্গর থেকে নেওয়া বটে, কিন্তু এখানে এর মানে সাধুসঙ্গ নয়। সজ্জনসংগতি—কিনা শিক্ষিত শৌখীন নরনারীর মিলনস্থান। আপনি যদি আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখক চিত্রকর নটনটী গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে দেখতে চান তবে এখানে আসতেই হবে। যদি অলট্রামডার্ন ফ্যাশন আর চালচলন শিখতে চান তবে এই ক্লাব ভিন্ন গত্যন্তর নেই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, বাৎসরিক চাঁদা নগদ এক শ টাকা। ক জন তা দিতে পারে? চাঁদার টাকা যদি বা যোগাড় করলেন তবু দরজা খোলা পাবেন না। সজ্জনসংগতির সদস্যসংখ্যা ধরাবাঁধা আড়াই শ। যদি একটা পদ খালি হয় এবং অন্তত পঞ্চাশ জন সদস্যের সম্মতি আনতে পারেন তবেই আপনার আশা আছে। কিন্তু যদি আপনার বরাত ভাল হয় তবে সুপারিশের জোরে ক্লাবের কোনও বিশেষ অধিবেশনে আপনি অতিথি হিসাবে বিনা খরচে নিমন্ত্রণ পেয়ে যেতে পারেন।

ক্লাবটি চালাবার ভার যাঁদের উপর তাঁরা পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচিত হন। বর্তমান সভাপতি অনুকূল চৌধুরী একজন মনীষী লেখক ও সুবক্তা, বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রগামিনী'র মালিক ও সম্পাদক। এঁর বয়স এখন পঁয়ষট্টি, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের সঙ্গেই মিশতে পারেন সেজন্য সকলেরই ইনি প্রিয়। কর্মাধ্যক্ষ দু জন, কপোত গুহ আর সোহনলাল সাহু। কপোত গুহ ব্যারিস্টার, বয়স চল্লিশের নীচে, পসার নেই কিন্তু পৈতৃক টাকা দেদার আছে। সোহনলাল ধনী কারবারী যুবক, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, খুব শৌখীন, ছাপরার লোক হলেও বাঙালীর সঙ্গেই বেশী মেশেন। ইনি বলেন, বিহার প্রদেশের সমস্তই বাংলার অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার, নতুবা বিহারী কালচারের উন্নতি হবে না।

বিকাল বেলা প্রগামিনী পত্রিকার অফিসে অনুকূল চৌধুরী, কপোত গুহ আর সোহনলাল সাহু সজ্জনসংগতির আগামী অধিবেশন সম্বন্ধে পরামর্শ করছেন। কপোত গুহ একটু চঞ্চল হয়ে বলছিলেন, এ রকম করে ক্লাব চালানো যাবে না দাদা। প্রত্যেক বৈঠকে সেই একঘেয়ে প্রোগ্রাম, ভূপালী বোসের গান, লুলু চ্যাটার্জীর নাচ, দরদী সেনের ন্যাকা ন্যাকা আবৃত্তি, জগাই বারিকের রাসলীলা ব্যাখ্যা, আর শসার স্যাণ্ডউইচ কেক শিঙাড়া সন্দেশ পেস্তা-বাদাম-ভাজা আইসক্রীম চা।

অনুকূল বাবু বললেন, বেশ তো, কি রকম করতে চাও তাই বল না।

সোহনলাল বললেন, গুহ সাহেবের মন খারাপ হয়ে গেছে দাদা। সেদিন প্রাচী-প্রতীচী সংঘের জয়ন্তী হয়ে গেল, তারা একটি চমৎকার ট্যাবলো দেখিয়েছে। ডলি বাগচীর ক্লিওপেট্রা, পবন ঘোষের অ্যাণ্টনি, আর ইরফান আলীর ঘটোৎকচ দেখে সকলে অবাক হয়ে গেছে। ঘটোৎকচ ক্লিওপেট্রাকে কাঁধে নিয়ে পালাচ্ছে আর অ্যাণ্টনি ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। যারা দেখেছে তারা সবাই ধন্য ধন্য করছে।

অনুকূলবাবু বললেন, তোমরাও তো ওইরকম কিছু একটা করতে পার। গজেন গুপ্তকে বললে একদিনের মধ্যে একটা একাঙ্ক নাটক লিখে দেবে।

সোহনলাল বললেন, আমার মতে সিপাহী যুদ্ধের কোনও ঘটনা দেখালে খুব ভাল হবে। এই ধরুন—নানা সাহেব জেনারেল ম্যাকআর্থারকে বন্দী করে এনে নিজের স্ত্রীকে বলছেন, এই ফিরিঙ্গী তোমার জিম্মায় রইল, ফুরসত হলেই একে পাঁচ টুকরো করবে, আমি আবার লড়াইএ চললুম। ম্যাকআর্থার পায়ে পড়ে প্রাণভিক্ষা করলেন। নানী সাহেবার দয়া হল, বললেন, জান নহি লুংগি, সিফ্‌ নাক কাট দুংগি।

কপোত গুহ ঘাড় নেড়ে বললেন, আমরা কারও নকল করতে চাই না, একেবারে নতুন কিছু দেখাতে চাই। শুনুন দাদা—বিলেতে যেমন মে-কুইন ইলেকশন হয়, আগামী অধিবেশনে আমরা তেমনি উপস্থিত মহিলাগণের একজনকে বসন্তরানী নির্বাচন করব।

—বল কি হে, জষ্টি মাসের গুমোট গরমে বসন্তরানী!

—আচ্ছা, আষাঢ় মাস হতে পারে, তখন গরম কমে যাবে। উপস্থিত মহিলা-গণের মধ্যে যিনি সব চেয়ে সুন্দরী তাঁকে আমরা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা উপাধি দিয়ে ফুলের মুকুট পরিয়ে দেব, একটি সোনার ঘড়িও উপহার দিতে পারি।

সোহনলাল বললেন, সে খুব ভাল হবে দাদা। খবরটি যদি আগে কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া হয় তবে সমস্ত মেম্বার আর মেম্বেরসরা তো হাজির হবেনই, বাইরের লোকেও অ্যাডমিশনের জন্য ভিড় করবে। যদি দশ টাকার টিকিট করা হয় তা হলেও বিস্তর লোক তামাশা দেখতে আসবে।

অনুকূলবাবু বললেন, আইডিয়াটা ভাল, কিন্তু সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলা চলবে না, তাতে অনর্থক মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে। সাধারণ লোকে অল্পবয়সী মেয়েদের মধ্যেই সুন্দরী খোঁজে। কিন্তু আমাদের সদস্যারা সকলেই তরুণী নন, অনেকের বয়স হয়েছে অথচ রূপের খ্যাতি আছে। এইসব হোমরাচোমরা ফ্যাট ফেয়ার অ্যান্ড ফর্টি বা ফর্টি-উত্তীর্ণা মহিলারা যদি দেখেন যে তাঁদের কোনও আশা নেই তবে ভীষণ চটে যাবেন, চাই কি ক্লাবের সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারেন। তা হলে তো সজ্জনসংগতি উঠে যাবে।

কপোত গুহ চিন্তিত হয়ে বললেন, ভাবিয়ে তুললেন দাদা, আপনার কি অসাধারণ দূরদৃষ্টি! সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নির্বাচন—এ কথা বললে সিচুয়েশন একটু ডেলিকেট হবে বটে। কি বললে ভাল হয় আপনিই স্থির করুন।

অনুকূলবাবু বললেন, বরনারীবরণ মন্দ হবে না। যুবতী প্রৌঢ়া বৃদ্ধা কারও বরনারী হতে বাধা নেই। ফুলের মুকুট আর ঘড়ি না দেওয়াই ভাল, একটা জাঁকালো বরমাল্য দিলেই চলবে।

সোহনলাল বললেন, বরনারী ইলেকশন কি রকম হবে? আমার মতে সিক্রেট ব্যালটের ব্যবস্থা করা দরকার, তা হলে সকলেই চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করে ভোট দিতে পারবে।

অনুকূলবাবু বললেন, তাতে জনমতের নির্ধারণ হবে বটে, কিন্তু তার পরিণামটা ভেবে দেখেছ? তারক মল্লিকের মেয়ে কিরণশশী—আজকাল যে হ্লাদিনী দেবী নাম নিয়ে গৌড়ীয় লাস্যনৃত্যম্ দেখাচ্ছে—সেই সব চেয়ে বেশী ভোট পাবে। তার পরেই বোধ হয় সুরেন ভৌমিকের গুজরাটী স্ত্রী কলাবতী ভৌমিক কিংবা আমাদের ডকটর নিয়োগীর স্ত্রী বঞ্জুলা নিয়োগীর চান্স। ভোটে যেই জিতুক, সদস্যারা

সবাই তাঁদের স্বামীদের ওপর চটবেন, বাড়িতে মুখ হাঁড়ি করে থাকবেন, একটা পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হবে। আমাদের মেয়েরা এখনও পাশ্চাত্ত্য নারীর উদারতা পায় নি, সবাই শ্রীরাধার মতন জেলস। তা ছাড়া ব্যালটে বিস্তর সময় লাগবে, লোকের ধৈর্য থাকবে না। ক্লাবের মেম্বাররা আমোদ চায়, ব্যালটের মতন নীরস ব্যাপারে সময় নষ্ট করা পছন্দ করবে না। ব্যালট নয়, সেকালের স্বয়ংবর সভার মতন কিছু করাই ভাল। সভায় যারা উপস্থিত থাকবেন তাঁদেরই একজনকে বরয়িতা বা বিচারক করা হবে। তিনি বরমাল্য হাতে নিয়ে সভা পরিক্রমণ করবেন, প্রত্যেক মহিলার চেহারা ঠাউরে দেখবেন, তার পর যাঁকে বরনারী সাব্যস্ত করবেন তাঁর গলায় মালা দেবেন। এতে পারিবারিক অশান্তি হবে না। বরমাল্য যাঁকেই দেওয়া হক, মেয়েরা শুধু বিচারকের ওপর চটবেন, তাঁদের স্বামীদের দোষ ধরবেন না।

সোহনলাল বললেন, খুব ভাল হবে। জজ মশাই যখন ঘুরে ঘুরে ইন্‌স্পেকশন করবেন তখন মহিলাদের বুক তড়প তড়প করবে, আর পুরুষরা খুব মজা পাবে। হয়তো চুপি চুপি বাজি ধরবে—ফোর টু ওআন হ্লাদিনী দেবী, থ্রি টু ওআন কলাবতী ভৌমিক। এর চেয়ে আমোদ হতেই পারে না।

আরও কিছুক্ষণ পরামর্শের পর স্থির হল যে আষাঢ় মাসের অধিবেশনে বরনারী-বরণের ব্যবস্থা হবে। বিচারক কে হবেন তা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার দরকার নেই, সভাতে স্থির করলেই চলবে। বরনারীর নির্বাচনে কিছু গলদ হলেও ক্ষতি হবে না, সদস্যরা যদি হুজুগে মেতে একটু উত্তেজনা আর আনন্দ উপভোগ করেন তা হলেই আয়োজন সার্থক হবে।

কপোত গুহ আর সোহনলাল সাহু যাবার জন্য উঠলেন। অনুকূল চৌধুরী বললেন, হাঁ, ভাল কথা—আমার বেহাই রাখহরি লাহিড়ী সস্ত্রীক কাশী থেকে আসছেন, পুরী ঘুরে এসে কিছুদিন আমার কাছে থাকবেন। এককালে ইনি গোরখপুর ডিভিশনের বড় এঞ্জিনিয়ার ছিলেন, বেশ পণ্ডিত লোক। বয়স আশি পেরিয়েছে, কিন্তু খুব শক্ত আছেন, তাঁর গিন্নীরও প্রায় বাহাত্তর হবে। কাশীতে ছেলের কাছে থাকেন, কিন্তু সেখানকার গরম এখন আর বুড়ো বুড়ীর সয় না। লাহিড়ী মশাইকে অতিথি হিসেবে একটা নিমন্ত্রণপত্র দিও, তাঁর স্ত্রী থাকমণি দেবীকেও দিও। আমি সস্ত্রীক সজ্জনসংগতিতে যাব, বেহাই বেহানকে বাড়িতে ফেলে রাখা ভাল দেখাবে না।

কপোত গুহ বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়। সোহনলাল আর আমি আপনার বাড়িতে গিয়ে তাঁদের নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে আসব।

কপোত গুহর চেষ্টায় বরানগরের ভাগীরথী ভিলা নামক প্রকাণ্ড বাগানবাড়িটি যোগাড় হয়েছে, এখানেই বরনারীবরণ হবে। সজ্জনসংগতির আড়াই শ সদস্য-সদস্যা সকলেই এসেছেন, তা ছাড়া তাঁদের সুপারিশে প্রায় এক শ জন অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছেন। চার দিক গাছে ঘেরা খোলা মাঠে সভা বসেছে, যদি বৃষ্টি হয় তবে বাড়ির বড় হল ঘরে উঠে গেলেই চলবে। স্ত্রীপুরুষের আলাদা বসবার ব্যবস্থা হয় নি, অন্যান্য অধিবেশনের মতন এবারেও সকলে ইচ্ছামত মিলে মিশে বসেছেন। কেবল দশ-বারো জন স্কুল-কলেজের মেয়ে এক পাশে দল বেঁধে মহা উৎসাহে আড্ডা দিচ্ছে।

মাঠের এক ধারে সভাপতি অনুকূল চৌধুরী বসেছেন। নিকটেই তাঁর স্ত্রী

সরসীবালা দেবী, বেহাই রাখহরি লাহিড়ী, বেহান থাকমণি দেবী এবং কয়েকজন মান্যগণ্য সদস্য-সদস্যা আর আমন্ত্রিত অতিথি আসন পেয়েছেন। কপোত গুহ, সোহনলাল সাহু এবং অন্যান্য কর্মকর্তারাও কাছে আছেন।

প্রথমেই সভাপতি বললেন, আপনারা আমন্ত্রণপত্রে পড়েছেন যে আজ আমরা এখানে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আশা করি সেটি সকলেরই উপভোগ্য হবে। আমাদের মামুলী কৃত্য যা আছে তা আগে চুকে যাক, তারপর বরনারীবরণ হবে।

যথারীতি বেহালা এসরাজ বাঁশির কনসার্ট, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি আর জলযোগ শেষ হল। অধ্যাপক কপিঞ্জল গাঙ্গুলী বৈদিক যুগের নক্তগোষ্ঠী বা নাইট ক্লাব সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পড়বার উপক্রম করছিলেন, কিন্তু তাঁর পাশের সদস্যরা তাঁকে থামিয়ে দিলেন। তার পর সভাপতি ঘোষণা করলেন—আজ আমরা উপস্থিত মহিলাগণের মধ্য থেকে একজনকে বরনারী রূপে বরণ করব। বরয়িতা অর্থাৎ বিচারক কে হবেন, কাকে আপনারা এই দুরূহ কর্মের জন্য যোগ্যতম মনে করেন, তাঁর নাম আপনারাই প্রস্তাব করুন।

রাজলক্ষ্মী দেবী সাহিত্যভাস্বতী একজন উঁচুদরের লেখিকা। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, শ্যামবর্ণ লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা, মুখটি বেশ ভারী আর গম্ভীর। দশ বৎসর আগেও এঁর লেখা খুব জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু সম্প্রতি অর্বাচীন লেখক-লেখিকাদের উপদ্রবে এঁর বইয়ের কাটতি ক্রমশ কমে যাচ্ছে। রাজলক্ষ্মী দেবী দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আপনারা যা করতে চাচ্ছেন তা আমাদের ভারতীয় সংস্কারের বিরোধী। প্রকাশ্য সভায় একজন পরপুরুষ একজন পরনারীকে বরনারী আখ্যা দিয়ে মাল্যদান করবে—সেই নারী কুমারী সধবা বিধবা যাই হ'ক না কেন—এ অতি অশোভন নীতিবিরুদ্ধ ব্যাপার। বিলাতে এসব অনাচার চলতে পারে, কিন্তু এদেশের রুচিতে তা সইবে না। আমাদের আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী, সর্বসাধারণের দৃষ্টিভোগ্যা বিলাসিনী সুন্দরী নয়। একেই তো আজকালকার মেয়েরা সিনেমার নটী হবার জন্য মুখিয়ে আছে, তার ওপর যদি আপনারা বরনারীবরণ আরম্ভ করেন তবে সমাজ অধঃপাতে যাবে। আমি আপনাদের সংকল্পিত অনুষ্ঠানে ঘোর আপত্তি জানাচ্ছি।

কপোত গুহর বৃদ্ধা পিসী পাশেই বসে ছিলেন। ইনি বললেন, রাজলক্ষ্মী ঠিক কথা বলেছে। বরনারী টরনারী চলবে না, যত সব হুল্লুতে কাণ্ড।

রাজলক্ষ্মী দেবীর স্বামী কাউনসিলার বামাপদ ঘোষাল একটু পিছনে বসে ছিলেন। ইনি লাজুক লোক, বেশী কথা বলেন না। এখন কর্তব্য বোধে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, বরনারীবরণ আমারও পছন্দ নয়।

সভাপতি বললেন, দুজন সদস্যা আর একজন সদস্য আপত্তি জানিয়েছেন। যদি অন্তত চার আনা সদস্যের অমত থাকে তবে আমরা বরনারীবরণ অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেব। শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী দেবী সাহিত্যভাস্বতীর সঙ্গে যাঁরা একমত তাঁরা দয়া করে হাত তুলুন।

রাজলক্ষ্মী, তাঁর স্বামী, আর কপোত গুহর পিসী ছাড়া অন্য কেউ হাত তুললেন না। সভাপতি বললেন, বরনারীবরণে যাদের মত আছে তাঁরা এইবারে হাত তুলুন।

প্রায় তিন শ জন হাত তুললেন, যেসব মেয়েরা আড্ডা দিচ্ছিল তারা দু হাত তুললে। সভাপতি বললেন, দেখা গেল পনরো আনার বেশী সদস্যের সম্মতি আছে, অতএব বরনারীবরণ হবে। এখন আপনাদের মধ্য থেকে কেউ বরয়িতা বা বিচারকের

নাম প্রস্তাব করুন।

কপোত গুহের তালিম অনুসারে বিখ্যাত উপন্যাসলেখক অরিন্দম সান্যাল দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আমি প্রস্তাব করছি—খ্যাতনামা চলচ্চিত্র-প্রযোজক শ্রীযুক্ত ভূপেন হালদার মশাইকে বরনারীবরণের ভার দেওয়া হক। নারীর রূপের সমঝদার এর চাইতে ভাল কেউ নেই। আমার মতে ইনিই যোগ্যতম বরয়িতা।

ভূপেন হালদার দাঁড়িয়ে উঠে করজোড়ে বললেন, আপনারা আমাকে মাপ করবেন, আমি এই কাজের মোটেই উপযুক্ত নই। আমি নারী দেখি ক্যামেরার দৃষ্টিতে, পর্দায় তাঁদের রূপ কি রকম ফুটে উঠবে তাই আমার বিচার্য। রক্তমাংসের নরনারী সোজা চোখে কেমন দেখায় তার অভিজ্ঞতা আমার বিশেষ কিছু নেই।

সোহনলালের উসকানিতে আর একজন সদস্য প্রস্তাব করলেন, প্রবীণ চিত্রকর স্বনামখ্যাত নিখিলেশ্বর সেন মহাশয়কে বরয়িতা করা হক!

নিখিলেশ্বর হাত জোড় করে বললেন, মাপ করবেন মশাইরা। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে ঘর করি, সাহায্য করবার দ্বিতীয় লোক নেই, গৃহিণীই একমাত্র ভরসা। তিনি বাড়িতে ঘরকন্নার কাজে ডুবে আছেন এই মওকায় যদি আমি একজন বরনারীকে মাল্যদান করি তবে গৃহিণী খুশী হবেন না। কাগজে আর ক্যাম্বিসে হরেক রকম বরনারী আঁকতে পারি—শাড়ি সিঁদুর-টিপ পরা মেম, ঢুলু ঢুলু চৈনিক-নয়না ওরিয়েণ্টাল ললনা, পটের সুন্দরী যার পটোলচেরা চোখ মুণ্ডুর বাইরে বেরিয়ে আসে—সব রকমই আমি এঁকে থাকি। কিন্তু একজন জলজ্যান্ত সুন্দরীকে সামনা-সামনি বরণ করব এমন বুকের পাটা আমার নেই।

ছাত্রীদের আড্ডা থেকে রব উঠল, যত সব ভীরু কাওয়ার্ড।

প্রতাপগড় কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল গগন বাঁড়ুজ্যে বললেন, আমাদের সদস্যদের সংকোচ হবারই কথা। এত দিন ধরে যাদের দেখে আসছেন তাদের একজনকে আজ হঠাৎ বরমাল্য দিতে চক্ষুলজ্জা হতেই পারে। বরনারীবরণের ভার কোনও নতুন লোককে দেওয়াই ভাল। ভাগ্যক্রমে রিটায়ার্ড এগ্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার শ্রদ্ধেয় রাখহরি লাহিড়ী মশাই এখানে উপস্থিত আছেন। ইনি বহুদর্শী বিচক্ষণ ঋষিতুল্য লোক, বয়সে আমাদের সকলের চাইতে বড়, নির্ভীক স্পষ্টবক্তা বলে এঁর খ্যাতি আছে। কর্নেল গ্রেহাম সাহেবকে ইনি মুখের ওপর ড্যাম ফুল বলেছিলেন, সেজন্যই রায়বাহাদুর খেতাব পান নি। আমার প্রস্তাব, এঁকেই বরয়িতা করা হক।

একজন সদস্য এই প্রস্তাবের সমর্থন করলেন। অনুকূলবাবু তাঁর বেহাইকে বললেন, আপত্তি করবেন না লাহিড়ী মশাই, আপনিই আমাদের ভরসা। রাখহরি-বাবু তাঁর পত্নীকে জিজ্ঞাসা করলেন, গিন্নী কি বল, রাজী হব নাকি?

থাকমণি দেবী কানে একটু কম শোনেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন নি। অনুকূলবাবুর স্ত্রী সরসীবালা তাঁকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন। থাকমণি বললেন, বেশ তো, যাকে পছন্দ হয় মালা দাও না গিয়ে, কে বারণ করছে। আমি তো একটা অখদ্যে থুত্থুড়ী বুড়ী।

সরসীবালা বললেন, ওকি দিদি, খুশী মনে হুকুম দিন, তা না হলে ওঁর যেতে সাহস হবে কেন। সভায় এত লোক ওঁর জন্য হা-পিত্যেশ করছে, ওদের হতাশ করবেন না।

থাকমণি বললেন, হ্যাঁ গো হাঁ, খুশী মনেই বলছি। ওই তো গণ্ডা গণ্ডা রূপসী বসে রয়েছে, যাকে মনে ধরে স্বচ্ছন্দে মালা দিয়ে এস, আমার তাতে কি।

খাকর্মণি দেবী একটু বেশী বুড়ো হয়ে পড়েছেন, কিন্তু তাঁর স্বামীর চেহারাটি দেখবার মতন। লম্বা মজবুত গড়ন, ফরসা রং, পাকা চুল, পাকা গোঁফ-দাড়ি, যেন থিয়েটারের ভীষ্ম। পত্নীর সম্মতি পেয়ে রাখহরিবাবু দাঁড়িয়ে উঠে স্মিতমুখে বললেন, সভাপতিভায়া, মাননীয় মহিলা ও ভদ্রবৃন্দ, মা-লক্ষ্মীগণ এবং দিদিমণিগণ, আমার ওপর আপনারা বড় কঠিন কর্তব্য চাপিয়েছেন। কিন্তু আমি পিছপা নই, এর চাইতেও শক্ত কাজ ঢের করেছি। গোড়াতেই আমি বরনারীর লক্ষণ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে চাই। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে—beauty is skin deep, অর্থাৎ রূপের দৌড় চামড়া পর্যন্ত। কথাটা ডাহা মিথ্যে। শুধু চামড়ায় নয়, নারীর মাংস হাড় মজ্জা সর্বত্রই রূপের সন্ধান করতে হবে।

একটা ফাজিল মেয়ে বললে, চিরে চিরে দেখবেন নাকি সার?

—আরে না না, তোমাদের কোনও ভয় নেই, আমি এক নজরেই ভেতর বার সব টের পাই। যা বলছিলুম শোন। মানুষের যেমন তিন দশা—বাল্য যৌবন জরা, নারীর যৌবনেরও তেমনি তিন দশা—আদ্য মধ্য আর অন্ত্য। এই তিন যৌবনের তোয়াজ বা পরিচর্যার পদ্ধতি আলাদা, প্রসাধন বা মেরামতও এক রকমে হয় না। কি রকম জানেন? মনে করুন একটা ইমারত তৈরী হল। প্রথম পনরো বৎসর তার হেপাজত খুব সোজা, মাঝে মাঝে চুনকাম আর রং ফেরালেই যথেষ্ট। কিন্তু আরও পরে দেখবেন, এক এক জায়গায় পলেস্তারা খসে গেছে, দরজা জানালার রং চটে গেছে। তখন রীতিমত মেরামত করতে হবে। ত্রিশ-চল্লিশ বছর পরে দেখবেন, স্থানে স্থানে ভিত বসে গেছে, দেওয়ালে ফাট ধরেছে, ছাত চিড় খেয়েছে। তখন শুধু দাগরাজি নয়, থরো রিপেয়ার দরকার, হয়তো দু-চার জায়গায় পিলপে গেঁথে কড়িতে চাড় দিতে হবে, ফাটা দেওয়াল জুড়তে হবে। ফেস লিফ্‌টিং জানেন? বিলেতে খুব চলন আছে, আমাদের মা-লক্ষ্মীরা কেউ করিয়েছেন কিনা জানি না। বেশী বয়সে গাল ঝুলে পড়লে রগের চামড়া টেনে সেলাই করে দেয়, তাতে যৌবনশ্রী ফিরে আসে। ফাটা দেওয়াল যেমন লোহার প্লেট আর নাটবোল্টু দিয়ে টেনে রাখা হয় সেইরকম আর কি। আসল কথা, আমাদের এই দেহমন্দির একটা ইমারতের সমান, যতদিন খাড়া থাকে ততদিন তার তোয়াজ করতে হয়। কিন্তু ইমারত পুরনো হলেই বরবাদ হয় না, হাল ফ্যাশনের অনেক বাড়ির চাইতে আমাদের বাপ-পিতামোর আমলের সেকেলে বাড়ি ঢের ভাল। বরনারীও সেইরকমে বিচার করতে হবে। শুধু কম বয়স আর ওপরচটকে ভুললে চলবে না মশাই, দেখতে হবে বনেদ কেমন, গাঁথনি কেমন, ভূমিকম্প আর ঝড়বৃষ্টির ধকল সইতে পেরেছে কিনা। আচ্ছা, কথা তো বিস্তর বলা হল, এখন ইন্‌স্পেকশন আরম্ভ করা যাক। কই হে সেক্রেটারি, তোমাদের বরমাল্য কই?

কপোত গুহ একটি প্রকাণ্ড মালা এনে বললেন, এই যে সার। রাখহরিবাবু মালাটি হাতে নিয়ে বললেন, বাঃ, খাসা মালাটি, বোধ হয় সের খানিক জুঁই ফুল আছে। বরমাল্য এইরকমই হওয়া উচিত। আজকাল হয়েছে গ্যালভানাইজ তারে গাঁথা ফুল-পাতার মালা, খ্রীষ্টানরা যেমন কবরে দেয়। এক জায়গায় আমাকে ওইরকম একটা মালা দিয়েছিল, গিন্নী রেগে গিয়ে টান মেরে সেটা ফেলে দিয়েছিলেন।

রাখহরি লাহিড়ী মন্থরগতিতে পরিক্রমণ আরম্ভ করলেন। প্রথমেই ছাত্রীদের দলের কাছে এসে বললেন, বগের মত গলা বাড়াচ্ছিস কি, তোদের মালা দিচ্ছি না। তোরা হলি কাঁচা কংক্রিট, পোক্ত হতে বহুকাল লাগবে।

একটি মেয়ে চুপি চুপি বললে, দাদু দয়া করে রাজলক্ষ্মী দেবীর গলায় মালা দিন, ভীষণ মজা হবে।

চোপ বলে ধমক দিয়ে রাখহরি এগিয়ে চললেন। প্রত্যেক মহিলার সামনে এসে একটু থামেন, তার পর আবার চলেন। সভায় চাপা গলায় তুমুল গুঞ্জন আরম্ভ হল। সদস্যরা বলাবলি করতে লাগলেন—বুড়ো কাকে মালা দেবে মনে হচ্ছে? নিশ্চয় হ্লাদিনী দেবীকে—উঃ, কি মারাত্মক কায়দায় শাড়ি পরেছে দেখ। কই না, ওর দিকে একবার তাকিয়েই তো এগিয়ে চলল। ওই দেখ, বঞ্জুলা নিয়োগীকে ঠাউরে দেখছে। নাঃ, বুড়োর পছন্দ কিছু নেই, ঘাড় নেড়ে আবার চলল। বোধ হয় কলাবতী ভৌমিককে পছন্দ করবে। ওঃ, চুল বাঁধার স্টাইলখানা দেখ। আরে গেল যা, ওকেও তো ফেলে চলে গেল! কাকে মালা দেবে বুড়ো, সুন্দরী আর কই? এই মাটি করলে, রাজলক্ষ্মী দেবীর কাছে থেমেছে, শেষটায় ওকেই মনে ধরল নাকি? নাঃ, একটু হেসে ঘাড় নেড়ে আবার চলেছে।

রাখহরি লাহিড়ী সমস্ত মহিলা পরিদর্শন করে ফিরে আসছেন দেখে কপোত গুহ আর সোহনলাল হন্তদন্ত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, কি হল সার, মালা দিলেন না?

এই যে দিচ্ছি ভাই—এই বলে রাখহরি হন হন করে তাঁর বসবার জায়গায় ফিরে এসে মৃদু স্বরে বললেন, গিন্নী, মাথাটা তোল। থাকমণি থতমত খেয়ে ঘাড় উঁচু করলেন, রাখহরি ঝুপ করে মালাটি তাঁর গলায় দিলেন।

নিমেষকালমাত্র সভা চিত্রার্পিতবৎ স্তব্ধ হয়ে রইল। তার পর তিন দিক থেকে তীব্র আলোর ঝলক থাকমণি দেবীর শীর্ণ মুখে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ক্যামেরায় লেন্স উন্মীলিত হল—ক্লিক ক্লিক ক্লিক। থাকমণি চমকে উঠে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, আঃ, জ্বালিয়ে মারলে, এদের মতলবটা কি, খুন করবে নাকি?

তুমুল করতালির শব্দে সভা যেন ফেটে পড়ল, যেসব মহিলার রূপের খ্যাতি আছে তাঁরাই সবচেয়ে বেশী হাততালি দিলেন। ছাত্রীর দল হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল।

হট্টগোল একটু থামলে রাজলক্ষ্মী দেবী দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আজকের অনুষ্ঠানটি অতি মনোজ্ঞ হয়েছে, আমরা অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেছি। মহিলাদের পক্ষ থেকে আমি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাখহরি লাহিড়ী মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি, তাঁর বরনারীবরণ অনবদ্য হয়েছে। শ্রীযুক্ত থাকমণি দেবী আজ যে দুর্লভ সম্মান পেলেন তার জন্যে তাঁকেও আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁকে মাল্যদান করে শ্রীলাহিড়ী সমস্ত পুরুষজাতির সমক্ষে একটি সুমহান আদর্শ স্থাপন করেছেন। এই বলে রাজলক্ষ্মী দেবী তাঁর স্বামী বামাপদ ঘোষালের দিকে কটমট করে তাকালেন।

সরসীবালা তাঁর বেহানকে বললেন, কি দিদি, এখন খুশী হয়েছেন তো?

—রাম রাম, কি ঘেন্না, বুড়োর বুদ্ধিশুদ্ধি কি একেবারে লোপ পেয়েছে! বাড়ি চল বোন, এখানে আর একদণ্ড নয়, সবাই প্যাঁট প্যাঁট করে তাকাচ্ছে।

১৩৬০

# একগুঁয়ে বার্থা

মোগলসরাইএর দু স্টেশন আগে সাকলদিহা। সকাল আটটায় পঞ্জাব মেল সেখানে এসে থামল। একটা সেকেণ্ডক্লাস কামরায় দশ জন বাঙালী আর অবাঙালী যাত্রী আছেন, গাড়ি চলতে দেরি হচ্ছে দেখে তাঁরা অধীর হয়ে উঠলেন। প্ল্যাট-ফর্মে কলরব হতে লাগল।

ক্যা হুআ গার্ডসাহেব? গার্ড জানালেন, এঞ্জিন বিগড়ে গেছে. ট্রেন এখন সাইডিং এ ফেলে রাখা হবে, মোগলসরাই থেকে অন্য এঞ্জিন এলে গাড়ি চলবে। অন্তত দেড় ঘণ্টা দেরি হবে।

অতুল রক্ষিত বিরক্ত হয়ে বললেন, বিগড়ে যাবার আর সময় পেলেন না ইঞ্জিন, সেরেফ বজ্জাতি। ই. আই. আর. নাম বদলে গিয়েই এইসব যাচ্ছেতাই কাণ্ড শুরু হয়েছে। কাশী পৌঁছুতে দুপুর পেরিয়ে যাবে দেখছি। ওহে নরেশ, তোমাদের প্লে যদি ভাল না ওতরায় তো আমি দায়ী হব না তা বলে দিচ্ছি। আনাড়ী অ্যাক্টরদের তালিম দিতে অন্ততঃ দশ ঘণ্টা লাগবে। সিরাজুদ্দৌলা নাটকটি সোজা নয়।

নরেশ মুখুজ্যে বললেন. আপনি ভাববেন না রক্ষিত মশায়। ওরা অনেক দিন ধরে রিহার্সাল দিয়ে তৈরী হয়ে আছে. আপনি শুধু একটু পালিশ চড়িয়ে দেবেন। তিন-চার ঘণ্টার বেশী লাগবে না।

অতুল রক্ষিত বললেন, তাতে কিছুই হবে না, তোমাদের খোট্টাই উচ্চারণ দুরস্ত করতেই দিন কেটে যাবে। দেখ নরেশ, আমার মনে হচ্ছে আমরা অশ্লেষা কি মঘায় যাত্রা করেছি, সকলেই আমাদের পিছুনে লেগেছে। হাওড়া আসতে ট্যাক্সির টায়ার ফাটল, সিগারেটের দুটো টিন বাড়িতেই পড়ে রইল, ট্রেনে উঠতে হোঁচট খেলুম, এই দেখ গোড়ালি জখম হয়েছে। এখন আবার ইঞ্জিন নড়বেন না বলে গোঁ ধরেছেন।

অধ্যাপক ধীরেন দত্তর শ্বশুরবাড়ি কাশীতে, পুজোর বন্ধে সেখানে চলেছেন! সহাস্যে বললেন, অচেতন পদার্থের একগুঁয়েমি সম্বন্ধে একটা ইংরিজী প্রবাদ আছে বটে।

দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ কৈলাস গাঙ্গুলী বললেন, জগদীশ বোস তো বলেই দিয়েছেন যে এক টুকরো লোহাও সাড়া দেয়। তার মানে, লোহার চেতনা আছে। রেলের ইঞ্জিন আর মোটর গাড়ি আরও সচেতন।

ধীরেন দত্ত বললেন, তাদের চাইতে একটা পিঁপড়ে ঢের বেশী সচেতন। এঞ্জিন বা মোটর গাড়ির জীবন নেই।

কৈলাস গাঙ্গুলী বললেন, নেই কেন? ইঞ্জিন কয়লা খায়, জল খায়, ধোঁয়া ছাড়ে, ছাই ফেলে, অর্থাৎ কোষ্ঠ সাফ করে। মোটর গাড়িও পেট্রল খায়, তেল খায়,

ধোঁয়া ছাড়ে, চার পায়ে দাপিছে বেড়ায়। জীবনের সব লক্ষণই তো বর্তমান, গোঁ ধরবে তা আর বিচিত্র কি।

—হল না গাঙ্গুলী মশাই। মোটর গাড়ি যদি লোহা-পেতল-চুর খেয়ে দেহের ক্ষয় মেরামত করতে পারত, আর মাঝে মাঝে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পিছনের খোপ থেকে একটি বাচ্চা মোটর প্রসব করত তবেই জীবিত বলা চলত। জীবনের লক্ষণ হচ্ছে—আহার গ্রহণ, শরীর পোষণ, মল বর্জন, আর বংশবৃদ্ধি।

—ওহে প্রফেসার, নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে গেছ। তুমি যে সব লক্ষণ বললে তাতে আগুনকেও সজীব পদার্থ বলা চলে।। আশপাশ থেকে দাহ্য উপাদান আত্মসাৎ করে পুষ্ট হয়, ধোঁয়া আর ছাই ত্যাগ করে, সুবিধে পেলেই ব্যাপ্ত হয়ে বংশবৃদ্ধি করে।

ধীরেন দত্ত হেসে বললেন, হার মানলুম, হার মানলুম গাঙ্গুলী মশায়। কিন্তু এঞ্জিনের বা আগুনের গোঁ আছে এ কথা মানি না।

—জোর করে কিছুই বলা যায় না, জগৎটাই যে প্রাণময়।

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এক কোণে হেলান দিয়ে চোখ বুজে সব কথা শুনছিলেন। মাথায় টাক, বড় গোঁফ, কপালে একটা কাটা দাগ, চোখে পুরু চশমা। ইনি খাড়া হয়ে বসে বললেন, মশায়রা যদি অনুমতি দেন তো একটা কথা নিবেদন করি। আমি একটা মোটর গাড়ি জানি যার অতি ভয়ানক গোঁ ছিল। আমার নিজেরই গাড়ি, জার্মান বার্থা কার।

অতুল রক্ষিত বললেন, ব্যাপারটা খুলে বলুন সার।

দু হাতের আস্তিন গুটিয়ে ভদ্রলোক বললেন, এই দেখুন কি রকম চোট লেগেছিল। কপালের কাটা দাগ দেখতেই পাচ্ছেন। শুধু জখম হইনি মশায়, বিনা অপরাধে কোর্টে হাজারটি টাকা জরিমানা দিয়েছি। সবই সেই বার্থা গাড়ির একগুঁয়েমির ফল।

নরেশ মুখুজ্যে বললেন, আপনারই তো গাড়ি, তবে আপনার ওপর তার অত আক্রোশ হল কেন? বেদম চাবুক লাগিয়েছিলেন বুঝি?

—তামাশা করবেন না মশাই। আক্রোশ আমার ওপর নয়, মকদুমপুরের কুমার সাহেবের ওপর। তিনি খুন হলেন, আমি জখম হলুম, আর অসাবধানে গাড়ি চালিয়ে মানুষ মেরেছি এই মিথ্যে অপবাদে মোটা টাকা দণ্ড দিলুম। আমি হচ্ছি মাখনলাল মল্লিক, আমার কেসটা কাগজে পড়ে থাকবেন।

কৈলাস গাঙ্গুলী বললেন, মনে পড়ছে না কি হয়েছিল। ঘটনাটা সবিস্তারে বলুন মল্লিক মশাই। ইঞ্জিন এসে পৌঁছুতে তো ঢের দেরি, ততক্ষণ আপনার আশ্চর্য কাহিনীটি শোনা যাক।

মাখন মল্লিক বলতে লাগলেন।—

**আ**মি শেয়ারের দালালি করি, শহরে হরদম ঘুরে বেড়াতে হয়। পনর বছর আগেকার কথা। জগমল সেথিয়া পুরনো মোটর গাড়ির ব্যবসা করে। একদিন আমাকে বললে, বাবুজী, একটা ভাল গাড়ি নেবেন? জার্মান বার্থা কার, রোল্স রয়েস তার কাছে লাগে না, সস্তায় দেব। গাড়িটি দেখে আমার খুব পছন্দ হল।

বেশী দিন ব্যবহার হয় নি, কিন্তু দেখেই বোঝা যায় যে বেশ জখম হয়েছিল, সর্বাঙ্গে চোট লাগার চিহ্ন আছে। তা হলেও গাড়িটি অতি চমৎকার, মেরামতও ভাল করে হয়েছে। জগন্মল খুব কম দামেই বেচলে, সাড়ে তিন হাজারে পেয়ে গেলুম।

একদিন স্টক এক্সচেঞ্জে যাচ্ছি, ড্রাইভার নেই, নিজেই চালাচ্ছি। যাব দক্ষিণ দিকে, কিন্তু স্টিয়ারিংএর ওপর হাতটা যেন কেউ জোর করে ঘুরিয়ে দিলে, গাড়ি উত্তর দিকে চলল। সামনে একটা প্রকাণ্ড গাড়ি আস্তে আস্তে চলছিল, আমার বার্থা কার পিছন থেকে তাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিলে, প্রাণপণে ব্রেক কষেও সামলাতে পারলুম না।

যখন জ্ঞান হল, দেখলুম আমি রক্ত মেখে শুয়ে আছি, মাথা আর হাতে যন্ত্রণা, চারিদিকে পুলিস। আমাকে মেডিক্যাল কলেজে ড্রেস করিয়ে থানায় নিয়ে গেল। শুনলাম ব্যাপারটা এই।—আমার গাড়ি যাকে ধাক্কা মেরেছিল সেটা হচ্ছে মকদুম-পুরের কুমার সাহেবের গাড়ি। গাড়িখানা একেবারে চুরমার হয়েছে, একটা গ্যাস পোস্টে ঠুকে গিয়ে কুমার সাহেবের মাথা ফেটে গেছে, বাঁচবার কোনও আশা নেই। আমি বেহুঁশ হয়ে গাড়ি চালিয়ে মানুষ খুন করেছি এই অপরাধে পুলিস আমাকে গ্রেফতার করেছে। অনেক কষ্টে বেল দিয়ে খালাস পেলুম।

তার পর তিন মাস ধরে মকদ্দমা চলল। সরকারী উকিল বললে, আসামী মদ খেয়ে চুর হয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। আমার ব্যারিস্টার বললে, মাখন মল্লিক অতি সচ্চরিত্র লোক, মোটেই নেশা করে না, হঠাৎ মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে অসামাল হয়েছিল।

কৈলাস গাঙুলী প্রশ্ন করলেন, আপনার মৃগীর ব্যারাম আছে নাকি?

—না মশায়, মৃগী কস্মিন্ কালে হয় নি, মদ গাঁজা গুলিও খাই নি। আমাকে ফাঁসবার জন্যে সরকারী উকিল আর বাঁচাবার জন্যে আমার ব্যারিস্টার দুজনেই ডাহা মিথ্যে কথা বলেছিল। প্রকৃত ব্যাপার—বার্থা গাড়ি নিজেই চড়াও হয়েছিল, আমার তাতে কিছুমাত্র হাত ছিল না। কিন্তু সে কথা কে বিশ্বাস করবে? আমি নিস্তার পেলুম না, হাজার টাকা জরিমানা হল, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সও বাতিল হয়ে গেল।

নরেশ মুখুজ্যে বললেন, কুমার সাহেবের গাড়িটা কোন্ মেক ছিল?

—খুব দামী ব্রিটিশ গাড়ি, সোআংক্-টুটলার।

—তাই বলুন। আপনার জার্মন গাড়ি তো ব্রিটিশ গাড়িকে ঢুঁ-মারবেই, শত্রুর তৈরী যে। মজা মন্দ নয়, দুই চ্যাম্পিয়ান গাড়ির লড়াই হল, মাঝে থেকে বেচারা কুমার বাহাদুর মরলেন, আপনি জখম হলেন, আবার জরিমানাও দিলেন।

মাখন মল্লিক বললেন, যা ভাবছেন তা নয় মশায়, এতে ইণ্টারন্যাশনাল ক্ল্যাশের নাম গন্ধ নেই। আসল কথা, বার্থা গাড়ি প্রতিশোধ নিয়েছে, কুমার সাহেবকে ডেলিবারেটলি খুন করেছে।

কৈলাস গাঙুলী বললেন, বড় অলৌকিক কথা, কলিযুগেও কি এমন হয়? অবশ্য জগতে অসম্ভব কিছু নেই। আপনার এই বিশ্বাসের কারণ কি?

এই সময় কামরায় একটা ধাক্কা লাগল, তার পরেই হেঁচকা টান। অতুল রক্ষিত বললেন, যাক বাঁচা গেল, ইঞ্জিন খুব চটপট এসে গেছে, সাড়ে দশটার মধ্যে কাশী পৌঁছে যাব।

নরেশ মুখুজ্যে বললেন, কাশী বিশ্বনাথ এখন মাথায় থাকুক। মল্লিক মশায়, আপনার গল্পটি শেষ করে ফেলুন, নইলে গাড়ি থেকে নামতে পারব না।

মাখন মল্লিক বললেন, তার পর শুনুন। আমার মাথার আর হাতের ঘা সেরে গেল, মকদ্দমাও চুকে গেল। তখন আমার মনে একটা জেদ চাপল। বার্থা গাড়ির আচরণটি বড়ই অদ্ভুত, তার রহস্য ভেদ না করলে স্বস্তি পাব না। প্রথমেই খোঁজ নিলুম জগমল্ল সেথিয়ার কাছে। সে বললে, এই গাড়ির মালিক ছিলেন সলিসিটার জলদ রায়, রায় অ্যান্ড দস্তিদার ফার্মের পার্টনার। রাঁচি যেতে চান্ডিলের কাছে তাঁর গাড়ি উলটে যায়। তাঁর বন্ধু কুমার বাহাদুর নিজের গাড়িতে আগে আগে যাচ্ছিলেন, তিনিই অতি কষ্টে জলদ রায় আর তাঁর স্ত্রীকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনেন। জলদ রায় সাত দিন পরে মারা গেলেন, তাঁর স্ত্রী ভাঙা বার্থা গাড়ি জগমল্লকে বেচলেন, মেরামতের পর সে আবার আমাকে বেচলে।

কৈলাস গাঙুলী বললেন, মানুষ মারাই দেখছি বার্থা গাড়িটার স্বভাব।

না মশায়, জলদ রায়কে বার্থা মারে নি। জগমল্ল আর কোনও খবর দিতে পারলে না, তখন আমি জলদ রায়ের স্ত্রীর কাছে গেলুম। তিনি বাপের বাড়িতে ছিলেন, একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করা বৃথা। তার পর গেলুম জলদের পার্টনার রমেশ দস্তিদারের কাছে। শেয়ার কেনা বেচা উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। প্রথমটা তিনি কিছুই বলতে চাইলেন না। যখন শুনলেন বার্থা গাড়িই কুমার সাহেবকে মেরেছে তখন অবাক হয়ে গেলেন এবং নিজে যা জানতেন তা প্রকাশ করলেন। মারা যাবার আগে জলদ রায় তাঁকে সবই জানিয়েছেন। সংক্ষেপে বলছি। শুনুন।

জলদ রায় বিস্তর পৈতৃক সম্পত্তি পেয়েছিলেন। সলিসিটার ফার্মের কাজ দস্তিদারই দেখতেন, জলদ রায় ফুর্তি করে বেড়াতেন আর নিয়মরক্ষার জন্য মাঝে মাঝে অফিসে যেতেন। তাঁর স্ত্রী হেলেনা রায় ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী আর বিখ্যাত সোসাইটি লেডি।

কৈলাস গাঙুলি বললেন, ও, তাই বলুন, এর মধ্যে একজন সুন্দরী নারী আছেন, নইলে অনর্থ ঘটবে কেন।

—জলদ রায়ের সঙ্গে মকদুমপুরের কুমার ইন্দ্রপ্রতাপ সিংএর খুব বন্ধুত্ব ছিল। ইন্দ্রপ্রতাপ বিলিতী সোআংক্-টুটলার গাড়ি কিনলেন দেখে জলদ রায় বললেন, আমি লেটেস্ট মডেল জার্মন বার্থা কার কিনেছি। তোমার গাড়ি বড়, কিন্তু স্পীডে বার্থার কাছে হেরে যাবে।

কুমার সাহেব বললেন, তবে এস, একদিন রেস লাগানো যাক, পাঁচ হাজার টাকা বাজি। জলদ রায় বললেন, রাজী আছি। আমার বাড়ি থেকে স্টার্ট করা যাবে। বেলা একটার সময় তুমি রওনা হবে, তার ঠিক পনর মিনিট পরে আমি হেলেনাকে নিয়ে বেরুব। চান্ডিলের আগেই তোমাকে ধরে ফেলব। কুমার সাহেব বললেন, খুব ভাল কথা। চান্ডিল ডাকবাংলায় আমরা রাত কাটাব, পরদিন সকালে একসঙ্গে রাঁচি যাব, সেখানে আমার বাড়িতে পিকনিক করা যাবে।

নির্দিষ্ট দিনে জলদ রায় তাঁর অফিস থেকে বেলা পৌনে একটায় ফিরে এলেন। স্ত্রীকে দেখতে পেলেন না, দারোয়ান বললেন, কুমার বাহাদুর এসেছিলেন, তাঁর গাড়িতে মেমসাহেবকে তুলে নিয়ে এইমাত্র রওনা হয়েছেন। এই চিঠি রেখে গেছেন।

চিঠিটা জলদ রায়ের স্ত্রী লিখেছিলেন। তার মর্ম এই।—কুমারের সঙ্গে চললুম, জীবনটা পরিপূর্ণ করতে চাই। লক্ষ্মীটি, তুমি আর শুধু শুধু পিছনে ধাওয়া ক'রো না। ডিভোর্সের দরখাস্ত কর, ইন্দ্রপ্রতাপ কৃপণ নয়, উপযুক্ত খেসারত দেবে। হেলেনা।

জলদ রায়ের মাথায় খুন চাপল। স্ত্রীর জন্যে একটা চাবুক, কুমারের জন্যে একটা মাউজার পিস্তল, নিজের জন্যে এক বোতল ব্রাণ্ডি, আর বার্থার জন্যে তিন বোতল সাজাহানপুর রম নিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়লেন। গাড়ি কেনার পরেই তিনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে বার্থাকে রম খাওয়ালে (অর্থাৎ পেট্রল ট্যাংকে ঢাললে) তার বেশ ফুর্তি হয়, হর্সপাওয়ার বেড়ে যায়।

প্রচণ্ড বেগে গাড়ি চালিয়ে জলদ রায় যখন চাণ্ডিলের কাছে পৌঁছুলেন তখন দেখতে পেলেন প্রায় দেড় মাইল দূরে কুমারের গাড়ি চলেছে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে কিন্তু দূর থেকে সোআংক্-টুটলালের রুপুলী রং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ওদিকে কুমার ইন্দ্রপ্রতাপও দেখলেন পিছনে একটা গাড়ি ছুটে আসছে। তিনটে হেড লাইট দেখেই বুঝলেন যে জলদ রায়ের বার্থা কার। কুমারের সামনেই একটা পাহাড়, রাস্তা তার পাশ দিয়ে বেঁকে গেছে। তিনি জোরে গাড়ি চালিয়ে পাহাড়ের আড়ালে এলেন, এবং গাড়ি থেকে নেমে তাড়াতাড়ি গোটাকতক বড় বড় পাথরের চাঙড় রাস্তায় রাখলেন। তার পর আবার গাড়িতে উঠে চললেন।

সঙ্গে সঙ্গে বার্থা গাড়ি এসে পড়ল। জলদ রায় বিস্তর মদ খেয়েছিলেন, বার্থাকেও খাইয়েছিলেন, তার ফলে দু জনেই একটু টলছিলেন। রাস্তার বাধা জলদ দেখতে পেলেন না, পাথরের ওপর দিয়েই পুরো জোরে চালালেন। ধাক্কা খেয়ে বার্থা গাড়ি কাত হয়ে পড়ে গেল। ইন্দ্রপ্রতাপের ইচ্ছে ছিল তাড়াতাড়ি অকুস্থল থেকে দূরে সরে পড়বেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গিনী হেলেনা চিৎকার করতে লাগলেন, দৈবক্রমে একটা মোটর গাড়িও বিপরীত দিক থেকে এসে পড়ল। তাতে ছিলেন ফরেস্ট অফিসার বনবিহারী দুবে আর তাঁর চাপরাসী।

অগত্যা ইন্দ্রপ্রতাপকে থামতে হল ; তিনি দুবের সাহায্যে জলদ রায়কে তুলে নিয়ে চাণ্ডিল হাসপাতালে এলেন। ডাক্তার বললেন, সাংঘাতিক জখম, আমি মরফীন ইঞ্জেকশন দিচ্ছি, এখনই কলকাতায় নিয়ে যান। দুবেজী বললেন, কুমার সাহেব, আপনি আর দেরি করবেন না, এঁদের নিয়ে এখনই বেরিয়ে পড়ুন। আপনার বন্ধুর গাড়িটা আমি পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। চেক বই সঙ্গে আছে তো ? একখানা সাড়ে সাত হাজার টাকার বেয়ারার চেক লিখে দিন, পুলিসকে ঠাণ্ডা করতে হবে।

কলকাতায় ফেরবার সাত দিন পরেই জলদ রায় মারা পড়লেন, তাঁর স্ত্রী হেলেনা উন্মাদ অবস্থায় বাপের বাড়ি চলে গেলেন। তোবড়ানো বার্থা গাড়িটা জগমল কিনে নিলে।

এখন ব্যাপারটা আপনাদের পরিষ্কার হল তো ? ইন্দ্রপ্রতাপ বার্থাকে জখম করেছে, তার প্রিয় মনিবকে খুন করেছে, বার্থা এরই প্রতিশোধ খুঁজছিল। অবশেষে আমার হাতে এসে মনস্কামনা পূর্ণ হল, স্টক এক্সচেঞ্জের কাছে সোআংক্-টুটুলারকে ধাক্কা দিয়ে চুরমার করে দিলে, ইন্দ্রপ্রতাপকেও মারলে।

নরেন দত্ত বললেন, বার্থা খুব পতিব্রতা গাড়ি, তার আগেকার মনিবের প্রতি-শোধ নিয়েছে, কিন্তু আপনার ওপর তার টান ছিল না দেখছি। শত্রু মারতে গিয়ে আপনাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বার্থার গতি কি হল?

—জগমলকেই বেচে দিয়েছি, চার শ টাকায়।

নরেশ মুখুজ্যে বললেন, খাসা গল্পটি মাখনবাবু, কিন্তু বড্ড তড়বড় করে বলেছেন। যদি বেশ ফেনিয়ে আর রসিয়ে পাঁচ শ পাতার একটি উপন্যাস লিখতে পারেন তবে আপনার রবীন্দ্র-পুরস্কার মারে কে। যাই হক, বেশ আনন্দে সময়টা কাটল।

—আনন্দে কাটল কি রকম? দু জন নামজাদা লোক খুন হল, এক জন মহিলা উন্মাদ হয়ে গেল, দুটো দামী গাড়ি ভেঙে গেল, আমি জখম হলুম আবার জরিমানাও দিলুম, এতে আনন্দের কি পেলেন?

—রাগ করবেন না মাখনবাবু। আপনি জখম হয়েছেন, জরিমানা দিয়েছেন, তার জন্যে আমরা সকলেই খুব দুঃখিত—কি বলেন গাঙুলী মশায়? কুমার সাহেবকে বধ করে আপনি ভালই করেছেন, কিন্তু জলদ রায়কে মরতে দিলেন কেন? সে কলকাতায় ফিরে এল, হেলেনা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে সেবা করলে, জলদ রায় সেরে উঠল, তার পর ক্ষমাঘেন্না করে দুজনে মিলে মিশে সুখে ঘরকন্না করতে লাগল—এইরকম হলে আরও ভাল হত না কি?

—আপনি কি বলতে চান আমি একটা গল্প বানিয়ে বলেছি? আপনারা দেখছি অতি নিষ্ঠুর বেদরদী লোক।

মোগলসরাই এসে পড়ল। মাখন মল্লিক তাঁর বিছানার বাণ্ডিলটা ধপ করে প্লাট-ফর্মে ফেললেন এবং সুটকেসটি হাতে নিয়ে নেমে পড়ে বললেন, অন্য কামরায় যাচ্ছি, নমস্কার।

কৈলাস গাঙুলী বললেন, ভদ্রলোককে তোমরা শুধু শুধু চটিয়ে দিলে। আহা, চোট খেয়ে বেচারার মাথা গুলিয়ে গেছে।

# পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী

পঞ্চপাণ্ডব অত্যন্ত অশান্তিতে আছেন। ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য ত্যাগ করে বার বৎসর বনবাস আর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে হবে, এজন্য নয়। এই কাল উত্তীর্ণ হলেও হয়তো দুর্যোধন রাজ্য ফেরত দেবেন না, তখন আত্মীয় কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, এজন্যও নয়। অশান্তির কারণ, পাঞ্চালী এক মাস তাঁর পঞ্চপতির সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করেছেন।

রাজ্যত্যাগের পর পাণ্ডবরা প্রথমে কাম্যকবনে এসেছিলেন, এখন দ্বৈতবনে নদীর তীরে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করছেন। তাঁদের সঙ্গে পুরোহিত ধৌম্য এবং আরও অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, সারথি ইন্দ্রসেন এবং অন্যান্য দাসদাসী আছে, দ্রৌপদীর সহচরী ধাত্রীকন্যা বালিকা সেবন্তী আছে। দ্রৌপদীর বিস্তর কাজ, বনবাসেও তাঁকে বৃহৎ সংসার চালাতে হয়। ভগবান সূর্যের দয়ায় তিনি যে তামার হাঁড়িটি পেয়েছেন তাতে রান্না সহজ হয়ে গেছে, দ্রৌপদীর না খাওয়া পর্যন্ত খাদ্য আপনিই বেড়ে যায়, সহস্র লোককে পরিবেশন করলেও কম পড়ে না। গৃহিণীর সকল কর্তব্যই দ্রৌপদী পালন করছেন, শুধু স্বামীদের সঙ্গে কথা বলেন না। কোনও অভাব হলে সেবন্তীই তা পাণ্ডবদের জানায়।

প্রায় চার মাস হল পাণ্ডবরা বনবাসে আছেন। এ পর্যন্ত যুধিষ্ঠির প্রসন্ন মনে দিনযাপন করছিলেন, যেন বনবাসেই তিনি আজীবন অভ্যস্ত। ভীম প্রথম প্রথম কিছু অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু পরে বেশ প্রফুল্ল হয়ে মৃগয়া নিয়েই থাকতেন। অর্জুন নকুল সহদেবও রাজ্যনাশের দুঃখ ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি পাঞ্চালীর ভাবান্তর দেখে পাঁচজনেই উদ্‌বিগ্ন হয়েছেন।

দ্যূতসভায় অপমান আর রাজ্যনাশের দুঃখ দ্রৌপদী ভুলতে পারেন নি। তিনি প্রায়ই বিলাপ করতেন যে তাঁর জ্যেষ্ঠ পতির নির্বুদ্ধিতা এবং অন্যান্য পতির অকর্মণ্যতার জন্যই এই দুর্দশায় পড়তে হয়েছে। যুধিষ্ঠির তাঁকে শান্ত করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন, ভীম বার বার আশ্বাস দিয়েছেন যে দুঃশাসনের রক্তপান আর দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ না করে তিনি ছাড়বেন না, অর্জুন নকুল সহদেবও তাঁকে বহুবার বলেছেন যে ত্রয়োদশ বর্ষ দেখতে দেখতে কেটে যাবে, তার পর আবার সুদিন আসবে। কিন্তু কোনও ফল হয় নি, দ্রৌপদী তাঁর রোষ দমন করতে না পেরে অবশেষে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে কথা বন্ধ করেছেন।

দ্বৈতবন থেকে দ্বারকা বহু দূর, তথাপি কৃষ্ণ রথে চড়ে মাঝে মাঝে পাণ্ডবদের দেখতে আসেন, দু-একবার সত্যভামাকেও সঙ্গে এনেছেন। এবারে তিনি একাই এসেছেন। যুধিষ্ঠিরের কাছে সকল বৃত্তান্ত শুনে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর গৃহে এলেন।

কৃষ্ণ পাণ্ডবদের মামাতো ভাই, অর্জুনের সমবয়স্ক। সেকালে বউদিদি আর বউমার অনুরূপ কোনও সম্বোধন ছিল কিনা জানা যায় না। থাকলেও তার বাধা ছিল,

কারণ সম্পর্কে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর ভাশুরও বটেন দেওরও বটেন। দ্রৌপদীর প্রকৃত নাম কৃষ্ণা, সেজন্য কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে সখীসম্বন্ধ পাতিয়েছিলেন এবং দুজনেই পরস্পরকে নাম ধরে ডাকতেন।

অভিবাদন ও কুশলপ্রশ্ন বিনিময়ের পর কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, সখী কৃষ্ণা, তোমার চন্দ্রবদন রন্ধনশালার হাঁড়িকার ন্যায় দেখাচ্ছে কেন?

দ্রৌপদী বললেন, কৃষ্ণ, সব সময় পরিহাস ভাল লাগে না।

কৃষ্ণ বললেন, তোমার কিসের দুঃখ? পাণ্ডবরা তোমার কোন্ অভাব পূর্ণ করতে পারছেন না তা আমাকে বল। সূক্ষ্ম কৌষেয় বস্ত্র আর রত্নাভরণ চাও? গন্ধ-দ্রব্য চাও? এখানে শস্য দুর্লভ, তোমরা মৃগয়ালব্ধ মাংস আর বন্য ফল মূল শাকাদি খেয়ে জীবন ধারণ করছ, তাতে অরুচি হবার কথা, তার ফলে মনও অপ্রসন্ন হয়। যব গোধূম তণ্ডুল মুদ্গাদি চাও? দুগ্ধবতী ধেনু চাও? ঘৃত তৈল গুড় লবণ হরিদ্রা আর্দ্রক চাও? দশ-বিশ কলস উত্তম আসব পাঠিয়ে দেব? পৈষ্টী মাধ্বী আর গৌড়ী মদিরা মৈরেয় আর দ্রাক্ষের মদ্য সবই দ্বারকায় প্রচুর পাওয়া যায়। এখানে বোধ হয় তালরস ভিন্ন কিছুই মেলে না।

দ্রৌপদী হাত নেড়ে বললেন, ওসব কিছুই চাই না। মাধব, তুমি তো মহাপণ্ডিত, লোকে তোমাকে সর্বজ্ঞ বলে। আমার দুর্ভাগ্যের কারণ কি তা বলতে পার? আমার তুল্য হতভাগিনী আর কোথাও দেখেছ?

কৃষ্ণ বললেন, বিস্তর, বিস্তর। আমার যে-কোনও পত্নীকে জিজ্ঞাসা করলে শুনবে তিনিই অদ্বিতীয়া হতভাগিনী, অনুপমা দগ্ধকপালিনী। তাঁরা মনে করেন আমিই তাঁদের সমস্ত আধিদৈবিক আধিভৌতিক আর আধ্যাত্মিক দুঃখের কারণ। কৃষ্ণা, দুশ্চিন্তা দূর কর। বিধাতা বিশ্বপাতা মঙ্গলদাতা করুণাময়।

—তুমি বিধাতার চাটুকার, তাঁর নিষ্ঠুরতা দেখেও দেখছ না, কেবল করুণাই দেখছ।

—যাজ্ঞসেনী, তুমি কেবল নিজের দুর্ভাগ্যের বিষয় ভাবছ কেন, সৌভাগ্যও স্মরণ কর। তুমি ইন্দ্রপ্রস্থের রাজমহিষী, তোমার তুল্য গৌরবময়ী নারী আর কে আছে? তোমার বর্তমান দুর্দশা চিরদিন থাকবে না, আবার তুমি স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হবে। যজ্ঞের অনল থেকে তোমার উৎপত্তি, তুমি অপূর্ব রূপবতী, তোমার পিতা পঞ্চালরাজ দ্রুপদ বর্তমান আছেন, তোমার দুই মহাবল ভ্রাতা আছেন। তোমার পাঁচ বীরপুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে দ্বারকায় আমাদের ভবনে শিক্ষালাভ করছে। পাঁচ পুরুষসিংহ তোমার স্বামী, চার ভাশুর, চার দেবর—

ভাশুর দেবর আবার কোথায় পেলে? ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

—ভাশুর আর দেবর তোমার কাছেই আছেন। কৃষ্ণা, এই শ্লোকটি কি তুমি শোন নি?—

পতিশ্বশুরতা জ্যেষ্ঠে পতিদেবরতানুজে।
মধ্যমেষু চ পাঞ্চাল্যাস্ত্রিতয়ং ত্রিতয়ং ত্রিষু॥

—জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব পাঞ্চালীর পতি ও ভ্রাতৃশ্বশুর (ভাশুর), কনিষ্ঠ পাণ্ডব পতি ও দেবর, মাঝের তিনজন প্রত্যেকেই পতি ভাশুর ও দেবর।

—তাতেই আমি ধন্য হয়ে গেছি?

—পাঞ্চালী, তুমি ক্রোধ সংবরণ কর। দোষশূন্য মানুষ জগতে নেই, যুধিষ্ঠির দ্যূতপ্রিয় ও সরলস্বভাব, তাই এই বিপদ হয়েছে। তিনি অনুতপ্ত, তাঁকে আর মনঃপীড়া দিও না। তোমার অন্য পতিরা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাবহ, অগ্রজের মতের বিরুদ্ধে তাঁরা যেতে পারেন না। তাঁদের অকর্মণ্য মনে ক'রো না।

কৃষ্ণ আরও অনেক প্রবোধবাক্য বললেন, নানা শাস্ত্র থেকে ভার্যার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন, কিন্তু পাঞ্চালীর ক্ষোভ দূর হল না। তখন কৃষ্ণ স্মিতমুখে বিদায় নিয়ে পাণ্ডবদের কাছে গেলেন।

একটি প্রকাণ্ড আটচালায় পুরোহিত ধৌম্য আর অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। কৃষ্ণের আগমন উপলক্ষ্যে সেখানে একটি মন্ত্রিসভা বসেছে। যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা কৃষ্ণকে সাদরে সেই সভায় নিয়ে গেলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, পূজ্যপাদ ধৌম্য ও উপস্থিত বিপ্রগণ, আপনারা সকলে অবধান করুন। বাসুদেব কৃষ্ণ, তুমিও শোন। কৌরবসভায় লাঞ্ছনা ও রাজ্যনাশের শোকে পাঞ্চালীর চিত্তবিকার হয়েছে, পঞ্চপতির প্রতি তাঁর নিদারুণ অভিমান জন্মেছে, তিনি এক মাস আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নি। এই দুঃসহ অবস্থার প্রতিকার কোন্ উপায়ে হতে পারে তা আপনারা নির্ধারণ করুন।

ধৌম্য বললেন, আমি বেদ পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র থেকে শ্লোক উদ্ধার করে পাঞ্চালীকে পতিব্রতা সহধর্মিণীর কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিতে পারি, পাপের ভয়ও দেখাতে পারি।

কৃষ্ণ বললেন, দ্বিজবর, তাতে কিছুই হবে না। আমি এইমাত্র তাঁকে বিস্তর শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনিয়ে এখানে এসেছি, আমার চেষ্টায় কোনও ফল হয় নি।

যুধিষ্ঠির বললেন, তবে উপায়?

পুরোহিত ধৌম্যের খুল্লতাত হৌম্য নামক এক তেজস্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন, পাঞ্চালীকে বিনীত করা মোটেই দুরূহ নয়। পাণ্ডবগণ স্ত্রৈণ হয়ে পড়েছেন, দ্রুপদনন্দিনীকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়েছেন, পঞ্চভ্রাতা তাঁদের এই যৌথ কলত্রটিকে ভয় করেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, আমি অতি সুসাধ্য উপায় বলছি শুনুন। পাঞ্চালীই আপনাদের একমাত্র পত্নী নন। আপনার আর একটি নিজস্ব পত্নী আছেন, রাজা শৈব্যের কন্যা দেবিকা। ভীমের আরও তিন পত্নী আছেন, রাক্ষসী হিড়িম্বা, শল্যের ভগিনী কালী, কাশীরাজকন্যা বলন্ধরা। অর্জুনেরও তিন পত্নী আছেন, মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা, নাগকন্যা উলূপী, আর কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা। নকুলের আর এক পত্নী আছেন, চেদিরাজকন্যা করেণুমতী। সহদেবেরও আর এক পত্নী আছেন, জরাসন্ধকন্যা, তাঁর নামটি আমার মনে নেই। পাঞ্চালীর এই ন জন সপত্নীকে সত্বর আনাবার ব্যবস্থা করুন। তাঁদের আগমনে দ্রৌপদীর অহংকার দূর হবে, আপনারাও বহু পত্নীর সহিত মিলিত হয়ে পরমানন্দে কালযাপন করবেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, তপোধন, আপনার প্রস্তাব অতি গর্হিত। দ্রৌপদী বহু মনস্তাপ ভোগ করেছেন, আরও দুঃখ কি করে তাঁকে দেব? আমাদের অনেক ভার্যা আছেন সত্য, কিন্তু তারা কেউ সহধর্মিণী পট্টমহিষী নন। আমরা এই যে বনবাসব্রত পালন করছি এতে পাঞ্চালী ভিন্ন আর কেউ আমাদের সঙ্গিনী হতে পারেন না।

কৃষ্ণ, সকল আপদে তুমিই আমাদের সহায়, পাঞ্চালী যাতে প্রকৃতিস্থ হন তার একটা উপায় কর।

একটু চিন্তা করে কৃষ্ণ বললেন, ধর্মরাজ, আমি যথোচিত ব্যবস্থা করব। আজ আমাকে বিদায় দিন, আমার এক মাতুল রাজর্ষি রোহিত এই দ্বৈতবনের পাঁচ ক্রোশ উত্তরে বানপ্রস্থ আশ্রমে বাস করেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে দু দিনের মধ্যে ফিরে আসব।

রথে উঠে কৃষ্ণ তার সারথি দারুককে বললেন, এখান থেকে কিছু উত্তরে জ্বলজ্জট ঋষির আশ্রম আছে, সেখানে চল।

ঋষির বয়স পঞ্চাশ। তাঁর দেহ বিশাল, গাত্রবর্ণ আরক্ত গৌর, জটা ও শ্মশ্রু অগ্নিশিখার ন্যায় অরুণবর্ণ, সেজন্য লোকে তাঁকে জ্বলজ্জট বলে। কৃষ্ণকে সাদরে অভিনন্দন করে তিনি বললেন, জনার্দন, তিন বৎসর পূর্বে প্রভাসতীর্থে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, ভাগ্যবশে আজ আবার মিলন হল। তোমার কোন্ প্রিয়কার্য সাধন করব তা বল।

কৃষ্ণ বললেন, তপোধন, আমার আত্মীয় ও প্রীতিভাজন পাণ্ডবগণ রাজ্যচ্যুত হয়ে দ্বৈতবনে বাস করছেন। সম্প্রতি তাঁরা আর এক সংকটে পড়েছেন, তা থেকে তাঁদের মুক্ত করবার জন্য আপনার সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছি। আপনার পরিচিতা কোনও নারী নিকটে আছে?

জ্বলজ্জট বললেন, নারী ফারী আমার নেই, আমি অকৃতদার। এই বিজন অরণ্যে নারী কোথায় পাবে? তবে হাঁ, অপ্সরা পঞ্চচূড়া মাঝে মাঝে তত্ত্বকথা শুনতে আমার কাছে আসে বটে। সে কিন্তু সুন্দরী নয়।

কৃষ্ণ বললেন, সুন্দরীর প্রয়োজন নেই। পঞ্চচূড়া চিৎকার করতে পারে তো? তা হলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এখন আমার প্রার্থনাটি শুনুন।

কৃষ্ণ সবিস্তারে তাঁর প্রার্থনা জানালেন। জ্বলজ্জট অট্টহাস্য করে বললেন, বাসুদেব, লোকে তোমাকে কুচক্রী বলে, কিন্তু আমি দেখছি তুমি সুচক্রী, তোমার উদ্দেশ্য সাধু। নিশ্চিত থাক, তোমার অনুরোধ নিশ্চয়ই রক্ষা করব। দুদিন পরে অপরাহ্ণকালে আমি পাণ্ডবদের আশ্রমে উপস্থিত হব।

প্রণাম করে কৃষ্ণ বিদায় নিলেন এবং আরও উত্তরে যাত্রা করে রাজর্ষি রোহিতের আশ্রমে এলেন। ইনি বলদেবজননী রোহিণীর ভ্রাতা, বানপ্রস্থ অবলম্বন করে সস্ত্রীক অরণ্যবাস করছেন। কৃষ্ণকে দেখে প্রীত হয়ে বললেন, বৎস, বহুকাল পরে তোমাকে দেখছি। তুমি এখানে কিছুদিন অবস্থান করে তোমার মাতুলানী ও আমার আনন্দবর্ধন কর। দ্বারকার সব কুশল তো?

কৃষ্ণ বললেন, পূজ্যপাদ মাতুল, সমস্তই কুশল। আমি আপনাদের চরণদর্শন করতে এসেছি, দীর্ঘকাল থাকতে পারব না, দুদিন পরেই বিশেষ প্রয়োজনে পাণ্ডবাশ্রমে আমাকে ফিরে যেতে হবে।

পাণ্ডবগণের পোষ্যবর্গ প্রায় দু শ, প্রতিদিন দু বেলা এই সমস্ত লোকের আহারের ব্যবস্থা করতে হয়। দ্বৈতবনে হাটবাজার নেই, তণ্ডুলাদি শস্য পাওয়া

যায় না, কালে-ভদ্রে দরদ পুক্কশ প্রভৃতি প্রত্যন্তবাসীরা কিছু যব আর মধু এনে দেয়। মৃগয়ালব্ধ পশুর মাংস এবং স্বচ্ছন্দবনজাত ফল মূল ও শাকই পাণ্ডবগণের প্রধান খাদ্য।

প্রত্যহ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করেই পঞ্চপাণ্ডব মৃগয়ায় নির্গত হন। আজ একটি বৃহৎ বরাহ দেখে তাঁরা উৎফুল্ল হলেন, কারণ বরাহমাংস তাঁদের আশ্রিত বিপ্রগণের অতিশয় প্রিয়। অর্জুন শরাঘাত করলেন, কিন্তু বিদ্ধ হয়েও বরাহ মরল না, বেগে ধাবিত হয়ে নিবিড় অরণ্যে গেল। তখন পঞ্চপাণ্ডব সকলেই শরমোচন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠে আর্তনাদ উঠল—হা নাথ, হতোঽস্মি!

তাঁদের শরাঘাতে কি স্ত্রীহত্যা হল? পাণ্ডবগণ ব্যাকুল হয়ে অরণ্যে প্রবেশ করে দেখলেন, বরাহ গতপ্রাণ হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু আর কেউ নেই। চতুর্দিকে অন্বেষণ করেও তাঁরা কিছু দেখতে পেলেন না। ভীম বললেন, নিশ্চয় রাক্ষসী মায়া, মারীচ একইপ্রকার চিৎকার করে শ্রীরামকে বিভ্রান্ত করেছিল।

যুধিষ্ঠির শঙ্কিত হয়ে বললেন, আশ্রমে শীঘ্র ফিরে চল, জানি না কোনও বিপদ হল কিনা। ভীম তুমি বরাহটাকে কাঁধে নাও।

সকলে আশ্রমে এসে দেখলেন কোনও বিপদ ঘটে নি। পাঞ্চালী সূর্যদত্ত তাম্রস্থালীতে বরাহমাংস পাক করলেন, সকলেই প্রচুর পরিমাণে ভোজন করে পরিতৃপ্ত হলেন।

**অ**পরাহ্নকালে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ তরুর তলে সকলে বসেছেন, পুরোহিত ধৌম্য যম-নচিকেতার উপাখ্যান বলছেন। পাঞ্চালীও একটু পশ্চাতে বসে এই পবিত্র কথা শুনছেন। এমন সময় মূর্তিমান বিপদ রূপে জ্বলজ্জট ঋষি উপস্থিত হলেন। তাঁর জটা ও শ্মশ্রু অগ্নিজ্বালার ন্যায় ভয়ংকর, মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ, চক্ষু বিস্ফারিত ও ভ্রূকুটিকুটিল। হুংকার করে জ্বলজ্জট বললেন, ওরে রে নারীঘাতক পাপিবৃন্দ, আজ ব্রহ্মশাপে তোমাদের নরকে প্রেরণ করব!

যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, ভগবান, আমরা কোন্ মহাপাপ করেছি?

জ্বলজ্জট উত্তর দিলেন, তোমরা শরাঘাতে আমার প্রিয়া ভার্যাকে বধ করেছ। ধিক তোমাদের ধনুর্বিদ্যা, একটা বরাহ মারতে গিয়ে ঋষিপত্নীর প্রাণ হরণ করেছ!

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা কাতর হয়ে ঋষির চরণে নিপতিত হলেন। পাঞ্চলীও গলবস্ত্র হয়ে যুক্তকরে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, প্রভু, আমরা অজ্ঞাতসারে মহাপাপ করে ফেলেছি! আপনি যে দণ্ড দেবেন, যতই কঠোর হক তাই শিরোধার্য করব।

দ্রৌপদী এগিয়ে এসে বললেন, মহামুনি, আমার স্বামীদের শরাঘাতে আপনার প্রিয়া ভার্যার প্রাণবিয়োগ হয়েছে, তার দণ্ড-স্বরূপ আপনি আমার প্রাণ নিয়ে এঁদের মার্জনা করুন। মধ্যম পাণ্ডব, তুমি চিতা রচনা কর, আমি অগ্নিপ্রবেশে প্রাণ বিসর্জন দেব।

জ্বলজ্জট আবার হুংকার করে বললেন, তুমি তো দেখছি অতি নির্বুদ্ধি রমণী! তোমার প্রাণ বিসর্জনে কি আমার পত্নী জীবিত হবে? আমি পত্নী চাই, এই দণ্ডেই চাই। পাণ্ডবরা আমাকে বিপত্নীক করেছে, আমি পাণ্ডবপত্নী পাঞ্চালীকে

চাই। এই বলে জবলজ্জট মুনি উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করে ভূমিতে পদাঘাত করতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির যুক্তকরে বললেন, প্রভু, প্রসন্ন হ'ন, পাঞ্চালী ভিন্ন যা চাইবেন তাই দেব।—

ইয়ং হি নঃ প্রিয়া ভার্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী
মাতেব পরিপাল্যা চ পূজ্যা জ্যেষ্ঠেব চ স্বসা।

আমাদের এই প্রিয়া ভার্যা প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী, মাতার ন্যায় পরিপালনীয়া, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় माननীয়া। একে আমরা কি করে ত্যাগ করব? আপনি বরং শাপানলে আমাকে ভস্মীভূত করে ফেলুন, পাঞ্চালীকে নিষ্কৃতি দিন।

জবলজ্জট বললেন, অহো কি মূর্খ! তুমি পুড়ে মরলে পাঞ্চালী সহমৃতা হবে, অনর্থক নারীহত্যার নিমিত্তরূপে আমিও পাপগ্রস্ত হব। পাঞ্চালীকেই চাই।

ভীম করজোড়ে বললেন, তপোধন, আমি একটি নিবেদন করছি, শুনতে আজ্ঞা হক। আপনি জ্যেষ্ঠা পাণ্ডববধূ শ্রীমতী হিড়িম্বাকে গ্রহণ করুন, পাঞ্চালীর পূর্বেই তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল।

জবলজ্জট বললেন, তুমি অতি ধৃষ্ট দুষ্ট প্রতারক, একটা রাক্ষসীকে আমার স্কন্ধে ন্যস্ত করতে চাও!

ভীম বললেন, প্রভু, হিড়িম্বা রাক্ষসী হলেও যখন মানবীর রূপ ধরেন তখন তাঁকে ভালই দেখায়। তাঁকে যদি যথেষ্ট মনে না করেন তবে আমাদের আরও আটজন অতিরিক্ত পত্নী আছেন, সব কটিকে নিয়ে পাঞ্চালীকে মুক্তি দিন। আমার ভ্রাতারা নিশ্চয় এতে সম্মত হবেন।

নকুল সহদেব সমস্বরে বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

জবলজ্জট বললেন, তোমাদের অপর পত্নীরা এখানে নেই, অনুপস্থিত বস্তু দান করা যায় না। আমি এই মুহূর্তেই পত্নী চাই, পাঞ্চালীকেই চাই।

অর্জুন বললেন, প্রভু, ধর্মরাজ আর পাঞ্চালীকে নিষ্কৃতি দিন, আমাদের চার ভ্রাতাকে ভস্ম করে আপাতত আপনার ক্রোধ উপশান্ত করুন। এর পর অবসর মত একটি ঋষিকন্যার পাণিগ্রহণ করবেন।

জবলজ্জট বললেন, তোমরা সকলেই মূর্খ, তথাপি তোমাদের আগ্রহ দেখে আমি কিঞ্চিৎ প্রীত হয়েছি। তোমাদের ভস্ম করে আমার কোনও লাভ হবে না। আমি পত্নী চাই, যে আমার সেবা করবে। যদি নিতান্তই দ্রৌপদীকে ছাড়তে না চাও তবে তাঁর নিষ্ক্রয়স্বরূপ তোমরা পঞ্চভ্রাতা আজীবন আমার দাসত্বে নিযুক্ত থাক।

যুধিষ্ঠির বললেন, মহর্ষি, তাই হক, আমরা আজীবন দাস হয়ে আপনার সেবা করব।

ধৌম্য বললেন, মুনিবর, কাজটা কি ভাল হবে? তার চেয়ে বরং পঞ্চগব্য-ভক্ষণ চান্দ্রায়ণ ইত্যাদি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করুন। অর্থ তো এঁদের এখন নেই, ত্রয়োদশ বর্ষের অন্তে রাজ্যোদ্ধারের পর যত চাইবেন এঁরা দেবেন।

জবলজ্জট প্রচণ্ড গর্জন করে বললেন, তুমি কে হে বিপ্র, আমাদের কথার উপর কথা কইতে এসেছ? ওরে কে আছিস, একটা দীর্ঘ রজ্জু নিয়ে আয়।

যুধিষ্ঠির বললেন, প্রভু, রজ্জুর প্রয়োজন নেই, আমাদের উত্তরীয় দিয়েই বন্ধন করুন।

জবলজ্জট যুধিষ্ঠিরাদি প্রত্যেকের কটিদেশে উত্তরীয়ের এক প্রান্ত বাঁধলেন এবং অপর প্রান্তের গুচ্ছ ধারণ করে পাণ্ডবাশ্রম থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। দ্রৌপদী আর্তনাদ করে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। ধৌম্যাদি বিপ্রগণ স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে রইলেন।

চেতনালাভের পর দ্রৌপদী দেখলেন তিনি তাঁর কক্ষে সেবন্তীর ক্রোড়ে মস্তক রেখে শুয়ে আছেন, কৃষ্ণ তাঁকে তালবৃন্ত দিয়ে বীজন করছেন।

দ্রৌপদী বললেন, হা পঞ্চ আর্যপুত্র, কোথায় আছ তোমরা?

কৃষ্ণ বললেন, কৃষ্ণা, আশ্বস্ত হও। পঞ্চপাণ্ডব নিরাপদে আছেন, তাঁরা অশ্বত্থ-তরুতলে উপবিষ্ট হয়ে পাপনাশের জন্য অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করছেন। তুমি একটু সুস্থ হলেই তোমাকে তাঁদের কাছে নিয়ে যাব।

—সেই ভয়ংকর ঋষি কোথায়?

—আর ভয় নেই। তিনি পঞ্চপাণ্ডবকে পশুর ন্যায় বন্ধন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, দৈবক্রমে পথে আমার সঙ্গে দেখা হল। আমি তাঁকে বললাম, তপোধন, করছেন কি? এঁরা অকর্মণ্য বিলাসী ক্ষত্রিয়, আপনার কোনও কাজ করতে পারবেন না, অনর্থক অন্ন ধ্বংস করবেন। তিনি বললেন, তবে এঁদের চাই না, পাঞ্চালীকেই এনে দাও। আমি উত্তর দিলাম, পাঞ্চালী আরও অকর্মণ্যা, আরও বিলাসিনী, শুধু নিজের প্রসাধন করতে জানেন। আমি ফিরে গিয়ে আপনাকে একটি কর্মিষ্ঠা ব্রজ-নারী পাঠিয়ে দেব। আপাতত আপনি পাঞ্চালীর নিষ্ক্রয়স্বরূপ এই সবৎসা ধেনু নিন, দধি দুগ্ধ ঘৃতাদি খেয়ে বাঁচবেন। আমার মাতুল রাজর্ষি রোহিত এটি আমাকে উপহার দিয়েছেন। জবলজ্জট মুনি তাতেই সম্মত হয়ে তোমার পতিদের মুক্তি দিলেন।

দ্রৌপদী বললেন, ধন্য সেই ধেনু যার মূল্য পাণ্ডবমহিষীর সমান। কিন্তু ঋষিপত্নীহত্যার পাপ থেকে পাণ্ডবগণ মুক্তি পাবেন কি করে?

কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, ঋষিপত্নী হত্যা হয় নি। অপ্সরা পঞ্চচূড়া ঠিক তাঁর পত্নী নন, সেবাদাসী বলা যেতে পারে। বরাহ তাঁকে ঈষৎ দন্তাঘাত করেছিল, তিনি ভয়ে চিৎকার করে আশ্রমে পালিয়ে গিয়ে মূর্ছিত হয়েছিলেন। জবলজ্জট তাঁকে দেখে ভেবেছিলেন বুঝি মরে গেছেন। পাণ্ডবদের মুক্তিলাভের পর আমি ঋষির সঙ্গে তাঁর আশ্রমে গিয়ে দেখলাম পঞ্চচূড়া দোলনায় দুলছেন।

দ্রৌপদী বললেন, কৃষ্ণ, এখনই আমাকে পতিগণের সকাশে নিয়ে চল। হা, আমি অপরাধিনী, এক মাস তাঁদের উপেক্ষা করেছি, এখন কোন্ বাক্যে ক্ষমাভিক্ষা করব?

—পাঞ্চালী, ক্ষমা চেয়ে অনর্থক তাঁদের বিব্রত ক'রো না, তাঁরা তো তোমার উপর অপ্রসন্ন হন নি। বহুদিন পরে তোমার সম্ভাষণ শোনবার জন্য তাঁরা তৃষিত চাতকের ন্যায় উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন।

—গোবিন্দ, আমি তাঁদের কি বলব?

—পুরুষজাতি ভার্যার মুখে নিজের স্তুতি শুনলে যেমন পরিতৃপ্ত হয় তেমন আর কিছুতে হয় না। কৃষ্ণা, তুমি পঞ্চপাণ্ডবের কাছে গিয়ে তাঁদের স্তুতি কর।

—হা কৃষ্ণ, আমি তাঁদের গঞ্জনাই দিয়েছি, এই দগ্ধ মুখে স্তুতি আসবে কেন? কি বলব তুমিই শিখিয়ে দাও।

—সখী কৃষ্ণা, বাগ্‌দেবী তোমার রসনায় অধিষ্ঠান করবেন, তুমি আজ সর্বসমক্ষে অসংকোচে তাঁদের সংবর্ধনা কর। এখন আমার সঙ্গে পতিসন্দর্শনে চল। সেবন্তী, মাল্য প্রস্তুত হয়েছে?

সেবন্তী একটা ঝুড়ি দেখিয়ে বললে, এই যে। অন্য ফুল পাওয়া গেল না, শুধু কদম ফুলের মালা।

কৃষ্ণ বললেন, ওতেই হবে।

ধৌম্যাদি দ্বিজগণে বেষ্টিত হয়ে পঞ্চপাণ্ডব অশ্বত্থতরুমূলে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁদের মন্ত্রজপ সমাপ্ত হয়েছে। কৃষ্ণ সহিত দ্রৌপদীকে আসতে দেখে সকলে গাত্রোত্থান করলেন।

পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দ্রৌপদী কৃতাঞ্জলিপুটে পাষাণপ্রতিমার ন্যায় নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কৃষ্ণ বললেন, পাঞ্চালী, তোমার মৌন ভঙ্গ কর।

পাঞ্চালী গদ্‌গদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন।—দেবসম্ভব পঞ্চ আর্যপুত্র, পতিমহিমায় অভিভূত হয়ে আমি সম্ভাষণ করছি, যা মনে আসছে তাই বলছি, আমার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা কর। পিতৃভবনে স্বয়ংবরসভায় ধনঞ্জয়কে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, ইনি লক্ষ্যভেদ করলে আনন্দে বিবশ হয়েছিলাম, এঁকেই পতিরূপে পাব ভেবে নিজেকে শতধন্য জ্ঞান করেছিলাম। কিন্তু বিধাতা আর গুরুজনরা আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার অপেক্ষা রাখেন নি, পঞ্চভ্রাতার সঙ্গেই আমার বিবাহ দিলেন। অন্তর্যামী সাক্ষী, কিছুকাল পরেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হল, পঞ্চপতি আমার অন্তরে একীভূত হয়ে গেলেন। পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতি যেমন পৃথক পৃথক এবং একযোগে অন্তঃকরণ রঞ্জিত করে সেইরূপ পঞ্চপতি স্বতন্ত্র ও মিলিত ভাবে আমার হৃদয় উদ্‌ভাসিত করেছেন।

পাণ্ডবাগ্রজ, ইন্দ্রপ্রস্থে যখন পট্টমহিষী ছিলাম, তখন বসনভূষণে ও প্রসাধনে আমি প্রচুর অর্থব্যয় করেছি, প্রিয়জনকে মুক্ত হস্তে দান করেছি। যখন যা চেয়েছি তুমি তখনই তা দিয়েছ, প্রশ্ন কর নি, অপব্যয়ের জন্য অনুযোগ কর নি। দাসদাসীদের আমি শাসন করেছি, তোমার প্রিয় পরিচারকগণ আমার কঠোরতার জন্য তোমার কাছে অভিযোগ করেছে, কিন্তু তুমি কর্ণপাত কর নি, পাছে পাণ্ডবমহিষীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। তুমি শান্তিপ্রিয় ক্ষমাশীল ধর্মভীরু, তোমার ধর্মাধর্মের বিচারপদ্ধতি না বুঝে আমি বহু ভর্ৎসনা করেছি, তথাপি এই অপ্রিয়বাদিনীর প্রতি ক্রুদ্ধ হও নি। অজাতশত্রু মহামান্য ধর্মরাজ, তোমার মহত্ত্ব বোঝবার শক্তি ক জনের আছে?

মধ্যম পাণ্ডব, তুমি জরাসন্ধবিজয়ী মহাবল, দুঃসাধ্য কর্মই তোমার যোগ্য, কিন্তু আমি ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা কর্মে তোমাকে নিযুক্ত করেছি, আমার প্রতি প্রীতিবশে তুমি যেন ধন্য হয়ে সে সকল সম্পাদন করেছ। তুমি ভোজনবিলাসী, রন্ধনবিদ্যায় পারদর্শী। ইন্দ্রপ্রস্থে বহুসংখ্যক নিপুণ সূপকার তোমার তৃপ্তিবিধান করত, কিন্তু

এই অরণ্যাবাসে আমি যে সামান্য ভোজ্য এক পাকে রন্ধন করে তোমাকে দিয়ে থাকি তাতেই তুমি তুষ্ট হও, কখনও অনুযোগ কর না যে বিস্বাদ বা অতিলবণ বা ঊনবলণ হয়েছে। নরশার্দূল, তোমাদের সকলের চেষ্টায় রাজ্যোদ্ধার হবে, কিন্তু আমার লাঞ্ছনার যোগ্য প্রতিশোধ একমাত্র তুমিই নিতে পারবে। দুর্যোধন আর দুঃশাসনকে তাদের অন্তিম দশায় মনে করিয়ে দিও যে পাণ্ডবমহিষীকে নির্যাতন করে কেউ নিস্তার পায় না।

তৃতীয় পাণ্ডব, তুমি বয়োজ্যেষ্ঠ নও তথাপি তোমার ভ্রাতারা যুদ্ধকালে তোমারই নেতৃত্ব মেনে থাকেন। তুমি দেবপ্রিয় সর্বগুণাকর, অদ্বিতীয় ধনুর্ধর, দেবসেনাপতি স্কন্দতুল্য রূপবান, নৃত্যগীতাদি কলায় পটু, হৃষীকেশ কৃষ্ণ তোমার অভিন্নহৃদয় সখা। যখন সুভদ্রাকে বিবাহ করে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপুরীতে এনেছিলে তখন আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু সত্য বলছি, এখন আমার কোনো দুঃখ নেই। যে নারী পঞ্চপতির ভার্যা সে কোন্ অধিকারে সপত্নীকে ঈর্ষা করবে? সুভদ্রা আমার প্রিয়তমা ভগিনী, দ্বারকায় তার কাছে আমার পঞ্চপুত্রকে রেখে নিশ্চিন্ত আছি। পরন্তপ মহারথ, কুরুপাণ্ডবসমরে তুমিই পাণ্ডবসেনাপতি হবে, বাসুদেবের সহায়তায় বিপক্ষের সকল বীরকেই তুমি পরাস্ত করবে। কুরুপিতামহ ভীষ্ম আমার মহাগুরু, তোমাদের আচার্য দ্রোণ আমার নমস্য, কিন্তু দ্যূতসভায় তাঁরা রাজকুলবধূকে রক্ষা করেন নি, বীরের কর্তব্য পালন করেন নি, কাপুরুষবৎ নিশ্চেষ্ট ছিলেন। সব্যসাচী, সম্মুখ সমরে মর্মভেদী শরাঘাতে তাঁদের সেই কর্তব্যচ্যুতি স্মরণ করিয়ে দিও।

চতুর্থ পাণ্ডব, তুমি সুকুমারদর্শন বিলাসপ্রিয়, কিন্তু যুদ্ধে দুর্ধর্ষ। ইন্দ্রপ্রস্থে তুমি বিচিত্র পরিচ্ছেদ এবং বহু রত্নালংকার ধারণ করতে, কিন্তু এখানে আমাকে অল্প-ভূষণা দেখে তুমিও নিরাভরণ হয়েছ, গন্ধমাল্যাদি বর্জন করেছ। তোমার সমবেদনায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে তুমি দশার্ণ ত্রিগর্ত পঞ্চনদ প্রভৃতি বহু দেশ জয় করেছিলে। আগামী সমরেও তুমি জয়লাভ করে যশস্বী হবে।

কনিষ্ঠ পাণ্ডব, তুমি আমার পতি ও দেবর, প্রেম ও স্নেহের পাত্র, বিশেষভাবে স্নেহেরই পাত্র। বনযাত্রাকালে আর্যা কুন্তী আমাকে বলেছিলেন, পাঞ্চালী, আমার পুত্র সহদেবকে দেখো, সে যেন বিপদে অবসন্ন না হয়। নির্ভীক অরিন্দম, তুমি অবসন্ন হও নি, যুদ্ধের জন্য অধীর হয়ে আছ। পূর্বে তুমি মাহিষ্মতীরাজ দুর্মতি নীলকে এবং কালমুখ নামক নররাক্ষসগণকে পরাস্ত করেছিলে। দুরাত্মা কৌরব-গণের সহিত যুদ্ধে তুমি নিশ্চয় বিজয়ী হবে।

হে দেবপ্রতিম মহাপ্রাণ পঞ্চপতি, দেববন্দনাকালে দেবতার দোষকীর্তন কেউ করে না, তোমাদের দোষের কথাও এখন আমার মনে নেই। আজ আমার জন্য তোমরা জীবন দিতে উদ্যত হয়েছিলে, দাসত্ব বরণ করেছিলে। কোন্ নারী আমার তুল্য পতিপ্রিয়া? পতিনির্বাসিতা সীতা নয়, পতিপরিত্যক্তা দময়ন্তীও নয়। তোমরা অপর পত্নীদের পিত্রালয়ে রেখে কেবল আমাকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর যাপন করতে এসেছ, এক দুই বা তিন অখণ্ড পত্নীর পরিবর্তে আমার পঞ্চমাংশেই তুষ্ট আছ। কোন্ স্ত্রী আমার ন্যায় গৌরবিণী? কোন্ পতি তোমাদের ন্যায় সংযমী? বহুবর্ষপূর্বে পিতৃগৃহে বিবাহমণ্ডপে একই দিনে তোমাদের কণ্ঠে একে একে মাল্য দিয়েছিলাম, আজ এই অরণ্যভূমিতে মুক্তাকাশতলে একই ক্ষণে পুনর্বার দিচ্ছি। মহানুভব পঞ্চপতি, প্রসন্ন হও, স্নিগ্ধনয়নে আমাকে দেখ।

পাঞ্চালী পঞ্চপাণ্ডবের কণ্ঠে মালা দিলেন, সেবন্তী শঙ্খধ্বনি করলে, বিপ্রগণ সাধু সাধু বললেন, কৃষ্ণ আনন্দে করতালি দিলেন। তার পর দ্রৌপদীর মস্তকে

করপল্লব রেখে যুধিষ্ঠির বললেন, পাঞ্চালী, তোমাকে অতিশয় ক্লান্ত ও অবসন্নপ্রায় দেখছি, এখন স্বগৃহে বিশ্রাম করবে চল।

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী প্রস্থান করলেন। কৃষ্ণকে অন্তরালে নিয়ে গিয়ে অর্জুন বললেন, মাধব, জবুলজ্জট ঋষিটিকে পেলে কোথায়? তাঁর অভিনয় উত্তম হয়েছে, কিন্তু হাস্যদমনের জন্য তিনি বিকট মুখভঙ্গী করছিলেন। ভাগ্যক্রমে ধর্মরাজ পাঞ্চালী ও আর সকলে তা লক্ষ্য করেন নি।

ভীম বললেন, ওহে কৃষ্ণ, একবার এদিকে এস তো। পাঞ্চালী বোধ হয় আর কখনও আমাদের গঞ্জনা দেবেন না, কি বল?

কৃষ্ণ বললেন, মাঝে মাঝে দেবেন বই কি, ওঁর বাক্‌শক্তির তো কিছুমাত্র হানি হয় নি।

# নিকষিত হেম

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, প্লেটনিক লভ কি রকম জান? দুটি হৃদয়ের পরস্পর নিবিড় প্রীতি, তাতে স্থূল সম্পর্ক কিছুমাত্র নেই। চণ্ডীদাস যেমন বলেছেন—রজকিনীপ্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়।

পিনাকীবাবু বয়সে বড় সেজন্য আড্ডার সকলেই তাঁকে খাতির করে। কিন্তু উপেন দত্ত তার্কিক লোক, পিনাকীর সবজান্তা ভাব সইতে পারে না। বললে, আচ্ছা সর্বজ্ঞ মশায়, দুই বন্ধুর মধ্যে যদি নিবিড় প্রীতি থাকে তবে তাকে প্লেটনিক বলবেন?

পিনাকীবাবু বললেন, তা কেন বলব, সম্পর্কটি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে হওয়া চাই।

—ও, তাই বলুন। এই যেমন নাতি আর ঠাকুমা, নাতনী আর ঠাকুর্দা, পিসি আর ভাইপো। এদের মধ্যে যদি গভীর ভালবাসা থাকে তাকে প্লেটনিক বলবেন তো?

—আঃ, তুমি কেবল বাজে তর্ক কর। বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। মনে কর একটি পুরুষ আর একটি নারী আছে, তাদের মধ্যে বৈধ বা অবৈধ মিলন হতে বিশেষ কোনও বাধা নেই। তবু তারা কেবল হৃদয়ের প্রীতিতেই তুষ্ট। এই হল প্লেটনিক প্রেম।

—আচ্ছা। ধরুন ত্রিশ বছরের সুপুরুষ গুরু, আর বিশ বছরের সুশ্রী শিষ্যা। এমন ক্ষেত্রে মামুলী প্রেম আকছার হয়ে থাকে। কিন্তু মনে করুন গুরু খুব কদাকার অথচ তার সুশ্রী স্ত্রী আছে। শিষ্যাও খুব কুৎসিত, তারও সুশ্রী স্বামী আছে। গুরু আর শিষ্যার মধ্যে মামুলী প্রেম হল না, কিন্তু ভক্তি আর স্নেহ খুব হল। একে প্লেটনিক বলবেন তো?

পিনাকী সর্বজ্ঞ রেগে গিয়ে বললেন, যাও, তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই না। বিষয়টি তলিয়ে বোঝবার ইচ্ছে নেই, শুধু জেঠামি।

মাথা চুলকে উপেন দত্ত বললেন, আজ্ঞে না, আমি শুধু একটা ভাল ডেফিনিশন খুঁজছি।

ললিত সাণ্ডেল বললে, ওহে উপেন, আমি খুব সোজা করে বলচি শোন। প্লেটনিক প্রেম মানে আলগোছে প্রেম, যেমন শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর সম্পর্ক। আচ্ছা যতীশ-দা, তুমি তো একজন মস্ত সাহিত্যিক, খুব পড়াশোনাও করেছ। তুমিই বুঝিয়ে দাও না প্লেটনিক প্রেম জিনিসটি কি?

যতীশ মিত্তির বললে, সব জিনিস কি বোঝানো যায়? যেমন ব্রহ্ম, তিনি তো বাক্য আর মনের অগোচর। ধর্ম, সৌন্দর্য, রস, আর্ট—এসবও স্পষ্ট করে বোঝানো যায় না। লাল রং, মিষ্টি স্বাদ, আঁষটে গন্ধ—এসবও অনির্বচনীয়, বুঝিয়ে বলা অসম্ভব, শুধু দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। প্রেমও সেই রকম।

উপেন বললে, বেশ তো, দৃষ্টান্ত দিয়েই প্লেটনিক প্রেম বুঝিয়ে দাও না।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, দৃষ্টান্ত তো পড়েই রয়েছে,—রামী-চণ্ডীদাস।

যতীশ বললে, সে কেবল চণ্ডীদাসের নিজের উক্তি, সম্পর্কটা বাস্তবিক কেমন ছিল তার কোনও সাক্ষী প্রমাণ নেই। আচ্ছা, আমি বিষয়টি একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করছি।—প্রেম বা লভ যাই বলা হক, তার অর্থ অতি ব্যাপক আর অস্পষ্ট। আমরা বলে থাকি—ঈশ্বরপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, পত্নীপ্রেম, বন্ধুপ্রেম। পণ্ডিতদের মতে বেগুন টমাটো আলু লংকা ধুতরো একই শ্রেণীতে পড়ে, এদের ফুল-ফলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মিল আছে, যদিও গুণ আলাদা। তেমনি ভক্তি প্রেম ভালবাসা স্নেহ সবই এক জাতের। তবে প্রেম বললে সাধারণত নরনারীর আদিম আসঙ্গপ্রবৃত্তিই বোঝায়। ভক্তি-শ্রদ্ধা যদি বেগুন-টমাটো হয়, স্নেহ যদি আলু হয়, রবে প্রেমকে বলা যেতে পারে লংকা। প্লেটনিক লভ বা রজকিনী প্রেম তারই একটা রকম ফের, যেমন পাহাড়ী রাক্ষুসে লংকা, ঝাল নেই, শুধু লংকার একটু গন্ধ আছে।

ললিত বললে, বুঝেছি। একটু আঁষটে গন্ধ না থাকলে যেমন কাঙালী ভোজন বা বাঙালী ভোজন হয় না, তেমনি একটু কামগন্ধ না থাকলে মামুলী বা প্লেটনিক কোনও প্রেমই হবার জো নেই। চণ্ডীদাসের নিকষিত হেম খাঁটি সোনা নয়, অন্তত এক আনা খাদ আছে।

যতীশ বললে, তোমার কথা হয়তো ঠিক, একটু লিপ্সা না থাকলে প্রেমের উৎপত্তি হয় না। এর বিচার মনোবিদ্‌গণ করবেন, আমার পক্ষে কিছু বলা অনধিকার-চর্চা। আমি একটি অদ্ভুত ইতিহাস জানি। ঘটনাটি আরম্ভ হয় মামুলী প্রেম রূপে, কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে তা প্লেটনিক পরিণতি পায় এবং কিছুকাল থমথমে হয়ে থাকে। পরিশেষে ব্যাপারটা এমন বিশ্রী রকম জটিল হয়ে পড়ে যে প্লেটো বা চণ্ডীদাসের পক্ষেও তা অনির্বচনীয়। তবে ফ্রয়েড-শিষ্যদের অসাধ্য কিছু নেই, তাঁরা নিশ্চয় বিশ্লেষণ করে একটি ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

উপেন বললে, ব্যাখ্যা শুনতে চাই না, তুমি ইতিহাসটি বল যতীশ-দা।

যতীশ মিত্তির বলতে লাগল।—

অখিল শীলকে তোমাদের মনে আছে? বছর সাত-আট আগে দু-একবার আমার সঙ্গে এই আড্ডায় এসেছিল। সে আর আমি একসঙ্গে পড়তুম। আমি বি. এল. পাস করে উকিল হলুম, সে এম. এ. পাস করে কর্পোরেশনে একটা চাকরি যোগাড় করলে। কলেজে তার দু ক্লাস নীচে পড়ত নিরঞ্জনা তলাপাত্র। মেয়েটি সুন্দরী না হক, দেখতে মন্দ ছিল না, টেনিস ভলিবল খেলায় নাম করেছিল, স্বাস্থ্যও খুব ভাল ছিল।

একদিন অখিল আমাকে বললে, সে নিরঞ্জনার সঙ্গে প্রেমে পড়েছে, বিয়ে করতে চায়। কিন্তু অখিলের বিধবা মা ব্রাহ্মণ পুত্রবধূ আনতে রাজী নন। নিরঞ্জনার বাপ সর্বেশ্বর তলাপাত্রেরও ঘোর আপত্তি, তিনি বলেছেন, ব্রাহ্মণ-কন্যার সঙ্গে বেনে বরের বিবাহ হলে তাদের সন্তান হবে চণ্ডাল, শাস্ত্রে এই কথা আছে।

আমি অখিলকে বললুম, এক্ষেত্রে সনাতন উপায় যা আছে তাই অবলম্বন কর। নিরঞ্জনা কান্নাকাটি করুক, খাওয়া কমিয়ে দিক, যথাসম্ভব রোগা হয়ে যাক। তুমিও

বাড়িতে মুখ হাঁড়ি করে থেকো, চুল রুক্ষ করে রেখো, নামমাত্র খেয়ো, বাকীটা রেস্তোরাঁয় পুষিয়ে নিও। ওরা দুজনে আমার প্রেসক্রিপশন মেনে নিলে, তাতে ফলও হল। অখিলের মা আর নিরঞ্জনার বাপ-মা অগত্যা রাজী হলেন। স্থির হল দু মাস পরে বিবাহ হবে।

নিরঞ্জনা কলকাতায় তার কাকার কাছে থেকে কলেজে পড়ত। তার বাপ সর্বেশ্বর তলাপাত্র বোম্বাই সরকারের বড় চাকরি করতেন, মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। আসন্ন বিবাহের স্বপ্নে অখিল দিন কতক বেশ মশগুল হয়ে রইল। তার পর একদিন সে আমাকে বললে, দেখ যতীশ, ক দিন থেকে নিরঞ্জনা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে আছে, কারণ জানতে চাইলে কিছুই বলে না। অখিলকে আশ্বাস দেবার জন্যে আমি বললুম, ও কিছু নয়, বাপ-মাকে ছেড়ে যেতে হবে তার জন্যে বিয়ের আগে অনেক মেয়েরই একটু মন খারাপ হয়।

তার পর একদিন সন্ধ্যাবেলা অখিল হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে এসে বললে, ভাই, সর্বনাশ হতে বসেছে। সর্বেশ্বরবাবু হঠাৎ কলকাতায় এসে নিরঞ্জনাকে বোম্বাইয়ে নিয়ে গেছেন। নিরঞ্জনার কাকার কাছে গিয়েছিলুম, তিনি গম্ভীর হয়ে আছেন, আমি প্রশ্ন করলে কিছু জানালেন না, ভাল করে কথাই বললেন না।

আমি নিরঞ্জনাকে এইমাত্র টেলিগ্রাম করেছি, চিঠি লিখেও জানতে চেয়েছি—আমাকে কিছু না জানিয়ে তার হঠাৎ চলে যাবার মানে কি, আর কারও সঙ্গে তার বিয়ে হবে নাকি?

অখিলকে আমি বললুম, ব্যস্ত হয়ো না, দু দিন সবুর করে দেখ না নিরঞ্জনা কি উত্তর দেয়। চার-পাঁচ দিন পরে অখিল এসে বললে, এই দেখ নিরঞ্জনার চিঠি, তার মতলব তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

নিরঞ্জনা অখিলকে লিখেছে—আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতেই পারে না, আমাকে একেবারে ভুলে যাও। এর কারণ এখন বলতে পারব না, শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে অন্য কোনও পুরুষকে আমি বিয়ে করব না। তুমি আমাকে চিঠি লিখো না, বোম্বাইএ এসো না, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারব না। যথা-কালে সমস্তই জানতে পারবে।

অখিল পাগলের মতন হয়ে গেল। আমি তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলুম, বললুম, ধৈর্য ধরে থাক, নিরঞ্জনা তো বলেছে যে সব কথা সে পরে জানাবে। কিন্তু অখিল ধৈর্য ধরবার লোক নয়, নিরঞ্জনাকে রোজ চিঠি লিখতে লাগল। চিঠির কোনও উত্তর এল না। অবশেষে সে বোম্বাইএ ছুটল। দশ দিন পরে ফিরে এসে আমাকে যা বললে তা এক অদ্ভুত ব্যাপার।

সর্বেশ্বর তলাপাত্র প্রথমটা অখিলকে হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন, নিরঞ্জনার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতিও দেন নি। কিন্তু অখিলের কণ্ঠস্বর আর শোকোচ্ছ্বাস শুনতে পেয়ে নিরঞ্জনা দোতলা থেকে নেমে এসে বললে, বাবা, তুমি অন্য ঘরে যাও, যা বলবার আমিই অখিলকে বলব। বেচারাকে অনর্থক যন্ত্রণা দিয়ে লাভ কি, সব খোলসা করে বলাই ভাল।

এই কি নিরঞ্জনা? তাকে এখন চেনা শক্ত। মাথার চুল ছোট করে কেটেছে, পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরেছে, লম্বায় ইঞ্চি ছয়েক বেড়ে গেছে। তার কণ্ঠস্বর মোটা হয়েছে, গোঁফ বেরিয়েচে, বুক একদম ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। অখিল অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগল।

নিরঞ্জনা যে রহস্য প্রকাশ করলে তা এই।—সে পুরুষে রূপান্তরিত হচ্ছে। সন্দেহ অনেক দিন আগেই হয়েছিল, এখন সমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ডাক্তার কির্লোস্কার তার চিকিৎসা করছেন, হরেক রকম গ্ল্যান্ড খাওয়াচ্ছেন আর হরমোন ইঞ্জেকশন দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, সম্পূর্ণ রূপান্তর হতে বড় জোর আরও ছ মাস লাগবে।

অখিল আকুল হয়ে বললে, না নিরঞ্জনা, তুমি পুরুষ হয়ো না, তা হলে আমি মরব। ট্রিটমেণ্ট বন্ধ করে দাও, বরং ডাক্তারকে বল তিনি এমন ব্যবস্থা করুন যাতে তোমার নারীত্ব রক্ষা পায়।

নিরঞ্জনা বললে, তা হবার জো নেই। আমি পুরুষ হয়েই জন্মেছি, এতদিন লক্ষণগুলো চাপা ছিল, এখন ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। যদি চিকিৎসা বন্ধ করি তা হলেও আমার পরিবর্তন হতে থাকবে, শুধু দু-তিন বছর দেরি হবে। তার চাইতে চটপট পুরুষ হয়ে যাওয়াই ভাল।

অখিল কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমার কি হবে নিরঞ্জনা? তুমি না হয় পুরুষই হয়ে গেলে, তোমার ডাক্তার কি আমাকে মেয়ে করে দিতে পারে না? তা হলেও আমাদের মিলন হতে পারবে।

নিরঞ্জনা বললে, পাগল হয়েছ? তুমি তো পুরোপুরি পুরুষ হয়েই জন্মেছ, তার আর নড়চড় হতে পারে না। এই বইখানা দিচ্ছি, ফাউলার্স সেক্স ফ্যাক্টর্স, পড়ে দেখো।

অখিল বললে, তুমি মেয়েই হও আর পুরুষই হও, তোমার সঙ্গে আমার হৃদয়ের যে সম্পর্ক তার পরিবর্তন হতে পারে না। আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না।

নিরঞ্জনা বললে, মন খারাপ ক'রো না। তুমি আর আমি যাতে একসঙ্গে থাকতে পারি তার ব্যবস্থা করব। বাবা বলেছেন আমার চিকিৎসা শেষ হলেই আমাকে ইন্দোর ব্যাংকের সেক্রেটারির পোস্টে বসিয়ে দেবেন। বাবার খুব প্রতিপত্তি, আমি জেদ করলে তোমাকেও সেখানে একটা ভাল কাজ দিতে পারবেন। তত দিন তুমি বোম্বাইএ আমাদের বাড়িতেই থাকবে।

অখিল তার কলকাতার চাকরি ছেড়ে বোম্বাইএ ফিরে গিয়ে নিরঞ্জনার কাছেই রইল। সর্বেশ্বরবাবু দয়ালু লোক, আপত্তি করলেন না। দ্রুপদ রাজার মেয়ে শিখণ্ডিনী যেমন পুরুষত্ব লাভ করে মহারথ শিখণ্ডী হয়েছিলেন, নিরঞ্জনাও তেমনি কয়েক মাস পরে পূর্ণপুরুষ মিস্টার নিরঞ্জন তলাপাত্র রূপে ইন্দোর ব্যাংকের সেক্রেটারি হল। সর্বেশ্বরবাবুর চেষ্টায় অখিল শীলও সেই ব্যাংকের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি হল। দুজনে একসঙ্গেই বাস করতে লাগল।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, সেরেফ গাঁজা। তুমি কি বলতে চাও এরই নাম নিকষিত হেম?

যতীশ মিত্তির বললে, আজ্ঞে না। স্টেনলেস স্টীল বলতে পারেন। সোনার জলুস নেই, লোহার মরচে নেই, ইস্পাতের ধারও নেই।

উপেন দত্ত বললে, তার পর কি হল?

—তার পর সব ওলটপালট হয়ে গেল। একদিন নিরঞ্জন বললে, ওহে অখিল, এরকম একা একা ভাল লাগছে না, জগৎটা বোদা বোদা ঠেকছে। মা-বাবাও বিয়ের জন্যে তাড়া দিচ্ছেন। আমি বলি শোন।—শেঠ মুলুকচাঁদের একজোড়া যমজ মেয়ে আছে, দেখেছ তো? তাদের মা বাঙালী। খাসা মেয়ে দুটি। তুমি একটিকে আর আমি একটিকে বিয়ে করি এস। শেঠজীকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি রাজী, মেয়ে দুটিরও আপত্তি নেই।

বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু কিছুদিন পরেই দুই বোনের চুলোচুলি ঝগড়া বাধল, যেন তারা দুই সতিন। তার ফলে দুই বন্ধুরও মনোমালিন্য হল। অখিল অন্য চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে গেল, নিরঞ্জন ইন্দোরেই রইল। এখন আর দুজনের মুখদর্শন নেই।

উপেন দত্ত বললে, যাক, বাঁচা গেল।

# বালখিল্যগণের উৎপত্তি

পুরাণে আছে, বালখিল্য মুনিরা বুড়ো আঙুলের মতন লম্বা এবং সংখ্যায় ষাট হাজার। তাঁদের পিতার নাম ক্রতু, মাতার নাম ক্রিয়া। এই বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ, এতে কিছু ভুলও আছে। বালখিল্যগণের প্রকৃত ইতিহাস নিম্নে বিবৃত করছি।

পুরাকালে নৈমিষারণ্যে বহু ঋষির আশ্রম ছিল। ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র মহর্ষি ক্রতু তার ভার্যা ক্রিয়ার সঙ্গে সেখানেই বাস করতেন। ক্রতু হলেন সপ্তর্ষি-গণের ষষ্ঠ ঋষি। একদিন বিকাল বেলা কুটীরের দাওয়ায় বসে তিনি তাঁর পত্নীকে ব্যাকরণ শেখাচ্ছিলেন। ক্রতু বলছিলেন, প্রিয়ে, এই স্ত্রীপ্রত্যয়প্রকরণ বড়ই কঠিন, তুমি উত্তমরূপে কণ্ঠস্থ কর। মৎস্য শব্দের য-ফলা আছে, কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে মৎসী, য-ফলা হয় না। অনুরূপ মনুষ্য মনুষী। ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণী, চন্দ্রের স্ত্রী চন্দ্রা। অশ্বের স্ত্রী অশ্বা, অথচ গর্দভের স্ত্রী গর্দভী।

সহসা একটা গম্ভীর চাপা আওয়াজ শোনা গেল। মহর্ষি ক্রতু সবিস্ময়ে কান পেতে শুনলেন যেন কেউ কলসীর ভিতর থেকে কথা বলছে—আপনি সব ভুল শেখাচ্ছেন।

ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রতু বললেন, কে রে তুই, এতদূর আস্পর্ধা যে আমার ভুল ধরিস!

আবার আওয়াজ হল—ওসব সেকেলে ব্যাকরণ চলবে না। স্ত্রীলিঙ্গ একই পদ্ধতিতে করতে হলে—মৎস্যী মনুষ্যী ইন্দ্রী চন্দ্রী অশ্বী গর্দভী, কিংবা মৎস্যাণী মনুষ্যাণী ইন্দ্রাণী চন্দ্রাণী অশ্বাণী গর্দভানী।

ক্রতু বললেন, কোথায় আছিস তুই, সম্মুখে আয়, লগুড়াঘাতে তোকে ব্যাকরণ শিক্ষা দেব।

ঋষিপত্নী ক্রিয়া বললেন, স্বামী, অদৃশ্য মূর্খের বাক্যে কর্ণপাত করো না। ব্যাকরণের পাঠ আজ স্থগিত থাকুক, সেদিন তুমি যে প্রত্যক্ষ দেবতাদের কথা বলছিলে তাই পুনর্বার শুনতে ইচ্ছা করি।

ক্রতু বললেন, প্রিয়ে, প্রণিধান কর। আকাশে তিন প্রত্যক্ষ দেবতা আছেন—সূর্য চন্দ্র ও মেঘরূপ পর্জন্য। ভূতলেও তিন প্রত্যক্ষ দেবতা আছেন—গর্ভধারিণী মাতা, জন্মদাতা পিতা, এবং বিদ্যাদাতা গুরু। এরাই সর্বাগ্রে উপাস্য। অগ্নি বায়ু বরুণ প্রভৃতির স্থান এঁদের নিম্নে।

পুনর্বার আওয়াজ হল—সব ভুল। আকাশে বা ভূতলে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কোনও দেবতা নেই, চন্দ্র সূর্য পর্জন্য পিতা মাতা গুরু কেউ উপাস্য নয়।

অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে ক্রতু বললেন, ওরে পাষণ্ড পিশাচ, সাহস থাকে তো দৃষ্টি-গোচর হয়ে তর্ক কর, নতুবা ব্রহ্মশাপে তোকে ধ্বংস করব।

ঋষিপত্নী ক্রিয়া কাতর হয়ে করজোড়ে বললেন, স্বামী, ও পিশাচ নয়, আমার গর্ভস্থ পুত্রই কথা বলছে। অবোধ শিশুকে তুমি ক্ষমা কর।

—গর্ভস্থ পুত্র না জ্যেষ্ঠতাত! বেরিয়ে আয় হতভাগা অকালকুষ্মাণ্ড!

ক্রিয়া তাঁর পুত্রের উদ্দেশ্যে বললেন, বৎস, ক্ষান্ত হও, পূজ্যপাদ পিতার বাক্যে প্রতিবাদ ক'রো না। আগে ভূমিষ্ঠ হও, তোমার দন্তোদ্গম হক, অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার চুকে যাক, তার পর যদি কিছু জ্ঞাতব্য থাকে তবে পিতাকে সবিনয়ে শ্রদ্ধাসহকারে জিজ্ঞাসা ক'রো। এখন মৌনাবলম্বন কর, গর্ভস্থ অপোগণ্ডের পক্ষে বাচালতা অত্যন্ত অনিষ্টকর।

মহর্ষি ক্রতুর অজাত অপত্য নীরব হল। অধ্যাপনার ব্যাঘাত হওয়ায় ক্রতু উঠে পড়ে সন্ধ্যাবন্দনা করতে গেলেন।

নৈমিষারণ্যের একদিকে গোমতী নদী। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষে ষষ্ঠী তিথিতে সেখানে দেশ-বিদেশ থেকে গর্ভিণী নারীরা সমাগত হন এবং সুপুত্র-কামনায় পুণ্যতোয়া গোমতীতে স্নান করে ষণ্মাতৃকা অর্থাৎ ষষ্ঠিদেবীর আরাধনা করেন। এবারে এই শুভতিথিতে পুষ্যা নক্ষত্র ও বৃদ্ধিযোগ পড়েছে, সেজন্য অসংখ্য নারী গোমতীতীরে সমবেত হয়েছেন। ক্রতুর পত্নী ক্রিয়া তাঁদের নেত্রীস্থানীয়া, তিনি সকলকে ব্রতপালনের পদ্ধতি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

সহসা তাঁর গর্ভস্থ পুত্রের গুরুগম্ভীর স্বর শোনা গেল—ভো অজাত অপোগণ্ডগণ, শ্রূয়তাম্।

তণ্ডুলভাণ্ডবাসী মূষিকশাবকের ন্যায় কিচকিচকণ্ঠে সহস্র ভ্রূণ উত্তর দিলে—হ্যাঁ হাঁ আমরা শুনছি।

—বিশ্বের অপোগণ্ড এক হও।

—এক হব।

—সকলে আরার উত্তোলন কর—প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কোনও দেবতা মানব না।

—মানব না।

—পিতা মাতা গুরু কারও শাসন মানব না।

—মানব না।

—গুরুকে আর ডরাব না, গুরুর গরু চরাব না। গুরুকুলে নাহি রব, না পড়ে পণ্ডিত হব।

—না পড়ে পণ্ডিত হব।

—তবে কাকে মানবে, কার আজ্ঞায় চলবে?

—তাই তো, কাকে মানব?

—আদিবিদ্রোহী মহান্ ত্রিশঙ্কুকে, যিনি ঊর্ধ্বপাদ অধঃশিরা হয়ে রাশিচক্রের বহির্দেশে বিদ্যমান রয়েছেন।

—মহান্ ত্রিশঙ্কু বিদ্যতাম্, অন্য গুরু ম্রিয়তাম্!

—ত্রিশঙ্কুর জন্য যিনি আকাশে নূতন স্বর্গলোক সৃষ্টি করেছেন সেই বশিষ্ঠ-শত্রু বিশ্বামিত্রকেও ধন্যবাদ দাও।

—বিশ্বামিত্র ধন্যবাদ, বশিষ্ঠাদি নিন্দাবাদ!

—ভ্রাতৃগণ, এই বারে গর্ভকারা থেকে বেরিয়ে এস, স্বাধীন হও, বসুন্ধরা ভোগ কর।

—কিন্তু এখন যে পাঁচ মাসও পূর্ণ হয় নি!

—তর্ক ক'রো না, ত্রিশঙ্কুর আজ্ঞা, ভূমিষ্ঠ হও।

—আমাদের পালন করবে কে, খেতে দেবে কে?

—তর্ক ক'রো না, তোমাদের স্নেহান্ধ মূর্খ পিতামাতাই পালন করবে। নিষ্ক্রান্ত হও।

ষাট হাজার গর্ভিণী আর্তনাদ করে উঠলেন, ষাট হাজার ভ্রূণ গর্ভচ্যুত হল। বহু প্রসূতি প্রাণত্যাগ করলেন।

আর্তনাদ শুনে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ সত্বর গোমতীতীরে উপস্থিত হলেন। তাঁরা দেখলেন, সদ্যোজাত মুনিসন্তানগণ গর্ভনাড়ী ছিন্ন করে ক্লেদাক্ত নগ্ন দেহে চিৎকার ও আস্ফালন করছে। সেই অকালপ্রসূত অকালপক্ক দন্তহীন জটাশ্মশ্রু-ধারী বালখিল্যগণের নেতা ক্রতুপুত্র ক্রাতব। সে দুই হাত নেড়ে বলছে, ভাইসব, এগিয়ে চল, আমরা এখানকার সমস্ত আশ্রম পুড়িয়ে ফেলব, তার পর বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়ে তার কামধেনু হরণ করে দুধ খাব। বিশ্বামিত্র যা পারেন নি আমরা তা পারব।

—দুধ খাব, দুধ খাব! মহান্ ত্রিশঙ্কু বিদ্যতাম, বশিষ্ঠ ঋষি ম্রিয়তাম। বাল-খিল্য বর্ধন্তাম্, আর সবাই ক্ষীয়ন্তাম্!

বালখিল্যগণ উপদ্রব করতে উদ্যত হয়েছে দেখে ঋষিরা ভীত হয়ে বললেন, মহর্ষি ক্রতু, তোমার ওই অকালজাত পুত্র ক্রাতবই এই সর্বনাশের মূল, তুমিই এর প্রতিকার কর।

ক্রতু একটু চিন্তা করে বললেন, এরা ব্রাহ্মণসন্তান, অপজাত হলেও অধৃষ্য ও অবধ্য, নতুবা মুখে লবণ দিয়ে এদের ব্যাপাদিত করা যেত। এরা দেখছি ত্রিশঙ্কুর ভক্ত, সুতরাং ত্রিশঙ্কুর যাজক বিশ্বামিত্র হয়তো এদের বশে আনতে পারবেন। চল, বিশ্বা-মিত্রের শরণাপন্ন হওয়া যাক।

নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের প্রার্থনা শুনে বিশ্বামিত্র বললেন, এই বালখিল্যগণের উপর অপদেবতার ভর হয়েছে, এরা সদুপদেশ শুনবে না, কৌশলে এদের বশে আনতে হবে। চল, চেষ্টা করে দেখা যাক।

বিশ্বামিত্রকে পুরোবর্তী করে ঋষিগণ নৈমিষারণ্যে ফিরে এলেন। বালখিল্যচমূ তখন ব্যূহবদ্ধ হয়ে আক্রমণের উপক্রম করছে।

বিশ্বামিত্র বললেন, ভো বালখিল্যগণ, আমাকে চিনতে পেরেছ? আমি হচ্ছি আদিবিদ্রোহী ত্রিশঙ্কুর যাজক বিশ্বামিত্র।

বালখিল্যগণ চিৎকার করে বললে, মহামহিম বিশ্বামিত্রের জয়োঽস্তু, অন্য ঋষি-দের ক্ষয়োঽস্তু!

বিশ্বামিত্র বললেন, কল্যাণমস্তু। বৎসগণ, তোমরা আমার অতি স্নেহের পাত্র। তোমাদের ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে, কিছু খাবে?

—খাব, খাব।

—মৃগমাংস? পুরোডাশ? পিষ্টক? সুপক্ক হরীতকী? ইক্ষুদণ্ড?

—ওসব চিবুতে পারব না, দাঁত নেই যে। আপনার সন্ধানে দুধ আছে?

—আছে। কিন্তু মাতৃদুগ্ধ বা গবাদির দুগ্ধ তো তোমরা জীর্ণ করতে পারবে না। এস আমার সঙ্গে, আমি লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করব।

বালখিল্যদের নিয়ে বিশ্বামিত্র অলম্ব তীর্থে উপস্থিত হলেন। সেখানে একটি বিশাল বটবৃক্ষের শাখাপ্রশাখায় লক্ষ লক্ষ বাদুড় ত্রিশঙ্কুর মতন ঊর্ধ্বপাদ অধঃশিরা হয়ে ঝুলছে। স্ত্রী-বাদুড়দের সম্বোধন করে বিশ্বামিত্র বললেন, অয়ি চর্মপর্ণা দন্তবতী পয়স্বিনী বিহঙ্গীর দল, এই সদ্যঃপ্রসূত বুভুক্ষু মুনিশাবকগণকে তোমরা স্তন্যদান কর।

বাদুড়-বনিতারা করুণাবিষ্ট হয়ে বললে, আহা, এস এস বাছারা।

বিশ্বামিত্র বালখিল্যদের একে একে তুলে বটবৃক্ষের শাখায় লম্বিত করে দিলেন। তারা বাদুড়ীদের বক্ষোলগ্ন হয়ে পরমানন্দে স্তন্যপানে রত হল।

ক্রতু প্রশ্ন করলেন, এরা কত কাল এইপ্রকার শান্ত হয়ে থাকবে?

বিশ্বামিত্র বললেন, এখন তো থাকুক, এর পর আবার যদি উপদ্রব করে তখন দেখা যাবে।

# সরলাক্ষ হোম

বরুণ বিশ্বাস একজন বড় অফিসার, যদিও বয়স ত্রিশের কম। ছেলেবেলায় মা বাপ মারা যাবার পর তার পিতৃবন্ধু গদাধর ঘোষ তাকে পালন করেন। তিনি খুব ধনী লোক, বিস্তর খরচ করে বরুণকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। বরুণ ছেলেটিও ভাল, ছ মাস হল আমেরিকা থেকে গোটাকতক ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এসেছে। গদাধরের মেয়ে মাণ্ডবীর সঙ্গে তার বিয়ে আগে থেকেই ঠিক করা আছে, তিন মাস পরে বিয়ে হবে।

গদাধর ঘোষ প্রতিপত্তিশালী লোক, মুরুব্বীর জোর খুব আছে। তাঁর চেষ্টায় বরুণ একটা বড় চাকরি পেয়ে গেছে—বানর-নির্বাসন-অধিকর্তা, অর্থাৎ ডিরেক্টর অভ মংকি ডিপোর্টেশন। এই সরকারী বিভাগটির উদ্দেশ্য মহৎ। এদেশে মানুষ যা খায় বাঁদরও তাই খায়, তার ফলে মানুষের ভাগে কম পড়ে। সরকার স্থির করেছেন দেশের সমস্ত বাঁদর ক্রমে ক্রমে আমেরিকায় চালান দেবেন, সেখানে চিকিৎসা আর শারীরবিদ্যার গবেষণার জন্য মুখপোড়া রূপী মর্কট প্রভৃতি সব রকম শাখা-মৃগের চাহিদা আছে। বানরনির্বাসনের ফলে দেশের খাদ্যাভাব কমবে, আমেরিকান ডলারও ঘরে আসবে। কিন্তু শ্রেয়স্কর কর্মে বহু বিঘ্ন। যাঁরা জীবহিংসার বিরোধী তাঁরা প্রবল আপত্তি তুললেন। বিদেশে গিয়ে বাঁদররা প্রাণ বিসর্জন দেবে এ হতেই পারে না। তারা শ্রীহনুমানের আত্মীয়, ভারতীয় রামরাজ্যের প্রজা, মানুষের মতন তাদেরও বাঁচবার অধিকার আছে। ভারতবাসী যেমন গরুকে মাতৃবৎ দেখে তেমনি বাঁদরকে ভ্রাতৃবৎ দেখে। সরকার যদি নিতান্তই বানরনির্বাসন চান তবে এদেশেরই কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে তাদের জন্য উপনিবেশ নির্মাণ করুন, প্রচুর আম কাঁঠাল কলা ইত্যাদির গাছ পুঁতুন, ছোলা মটর বেগুন ফুটি কাঁকুড় ইত্যাদির খেত করুন, তদারকের ভাল ব্যবস্থা করুন। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে যে বেবন্দোবস্ত হয়েছে বাঁদরের বেলা তা হলে চলবে না। এই রকম আন্দোলনের ফলে বানরনির্বাসন আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে, বরুণ বিশ্বাসের উপর হুকুম এসেছে এখন শুধু গনতি করে যাও, পরিসংখ্যান তৈরি কর। বরুণের অধীনে বিশ জন পরিদর্শক আছে, তারা জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়ায় আর রিপোর্ট পাঠায়—বাঁদর এত, বাঁদরী এত, বাঁদরছানা এত। কলকাতার অফিসে এইসব রিপোর্ট ফাইল করা হয় এবং মোটা মোটা খাতায় তার খতিয়ান ওঠে।

আজ বরুণের হাতে কাজ কিছু নেই, মনেও সুখ নেই। সে তার অফিসঘরে ঘূর্ণিচেয়ারে বসে টেবিলে পা তুলে দিয়ে সিগারেট টানছে আর আকাশ পাতাল ভাবছে, এমন সময় সামনের বাংলা কাগজে এই বিজ্ঞাপনটি তার চোখে পড়ল—

যদি মনে করেন সময়টা ভাল যাচ্ছে না, মুশকিলে পড়েছেন, তবে আমার কাছে আসতে পারেন। যদি অবস্থা এমন হয় যে উকিল ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার পুলিস জ্যোতিষী বা গুরুমহারাজ কিছুই করতে পারবেন না, তবে বৃথা দেরি না করে

আমাকে জানান। এই ধরুন, আপনার সম্বন্ধী সপরিবারে আপনার বাড়িতে উঠেছেন, ছ মাস হয়ে গেল তবু চলে যাবার নামটি নেই। অথবা আপনার পিসেমশাই তাঁর মেয়ের বিয়ের গহনা কেনবার জন্য আপনাকে তিন হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু রেস খেলতে গিয়ে আপনি তা উড়িয়ে দিয়েছেন। অথবা পাশের বাড়ির ভবানী ঘোষাল আপনাকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছে, কিন্তু সে হচ্ছে ষণ্ডামার্কা গুণ্ডা আর আপনি রোগা-পটকা। কিংবা ধরুন আপনার স্ত্রীর মাথায় ঢুকেছে যে তাঁর মতন সুন্দরী ভূভারতে নেই, তিনি সিনেমা অ্যাকট্রেস হবার জন্য খেপে উঠেছেন, আপনি কিছুতেই তাঁকে রুখতে পারছেন না। কিংবা মনে করুন আপনি একটি মেয়েকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেবার পর অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে ঘোরতর প্রেমে পড়েছেন, আগেরটিকে খারিজ করবার উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। ইত্যাদি প্রকার সংকটে যদি পড়ে থাকেন তো সোজা আমার কাছে চলে আসুন। শ্রীসরলাক্ষ হোম, তিন নম্বর বেচু কর স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। সকাল আটটা থেকে দশটা, বিকেল চারটে থেকে রাত নটা।

বিজ্ঞাপনটি পড়ে বরুণ কিড়িং করে ঘণ্টা বাজালে। লাল চাপকান পরা একজন আরদালী ঘরে এল, বরুণ তাকে বললে, মিস দাস। একটু পরে ঘরে ঢুকল খঞ্জনা দাস, বরুণের অ্যাসিস্টাণ্ট, রোগা, লম্বা, কাঁধ পর্যন্ত ঝোলা ঢেউ তোলা রুক্ষ ফাঁপানো চুল, চাঁচা ভুরু, গোলাপী গাল, লাল ঠোঁট, লাল নখ, নখের ডগা টিকে দেবার লানসেটের মতন সরু। সস্তা সিন্থেটিক ভায়োলেটের গন্ধে ঘর ভরে গেল।

বরুণ কাগজটা হাতে দিয়ে বললে, এই বিজ্ঞাপনটা পড়ে দেখ।

বিজ্ঞাপন পড়ে খঞ্জনা বললে, যাবে নাকি লোকটার কাছে? নিশ্চয় হামবগ জোচ্চোর, কিছুই করতে পারবে না, শুধু ঠকিয়ে পয়সা নেবে। আমার কথা শোন, দু নৌকোয় পা রেখো না, মাণ্ডবী আর তার বাপকে সোজা জানিয়ে দাও যে তুমি অন্য মেয়ে বিয়ে করবে।

—তার ফল কি হবে জান তো? আমার আড়াই হাজার টাকা মাইনের চাকরিটি যাবে। আমাদের চলবে কি করে? মাণ্ডবীর বাপ গদাধর ঘোষকে তুমি জান না, অত্যন্ত রাগী লোক।

—অত ভয় কিসের? তোমার সরকরী চাকরি, গদাই ঘোষ তোমার মনিব নয়, ইচ্ছে করলেই তোমাকে সরাতে পারে না। আর যদিই চাকরি যায়, অন্য জায়গায় একটা জুটিয়ে নিতে পারবে না?

বরুণ বললে, আজ বিকেলে এই সরলাক্ষ হোমের কাছে গিয়ে দেখি। যদি কোনও উপায় বাতলাতে না পারে তবে তুমি যা বলছ তাই করব।

এখন সরলাক্ষ হোমের পরিচয় জানা দরকার। লোকটির আসল নাম সরলচন্দ্র সোম। বি. এ. পাস করে সে স্থির করলে আর পড়বে না, চাকরিও করবে না, বুদ্ধি খাটিয়ে স্বাধীনভাবে রোজগার করবে। প্রথমে সে রাজজ্যোতিষীর ব্যবসা শুরু করলে। কিন্তু তাতে কিছু হল না। কারণ সামুদ্রিক আর ফলিত জ্যোতিষের বুলি তার তেমন রপ্ত নেই, মক্কেলরা তার বক্তৃতায় মুগ্ধ হল না। তার পর সে সরলাক্ষ হোম নাম নিয়ে ডিটেকটিভ সেজে বসল, কিন্তু তাতেও সুবিধা হল না। সম্প্রতি সে একেবারে নতুন ধরনের ব্যবস্থা ফেঁদেছে, মক্কেলও অল্পস্বল্প আসছে।

সরলাক্ষ হোমের বাড়িতে ঢুকতেই যে ঘর সেখানে একটা ছোট টেবিল আর তিনটে চেয়ার আছে, মক্কেলরা সেখানে অপেক্ষা করে। তার পরের ঘরটি কনসল্টিং রুম, সেখানে সরলাক্ষ আর তার বন্ধু বটুক সেন গল্প করছে। বটুক সরলাক্ষর চাইতে বয়সে কিছু বড়, সম্প্রতি পাস করে ডাক্তার হয়েছে, কিন্তু এখনও কেউ তাকে ডাকে না। ঘরের ঘড়িতে পৌনে চারটে বেজেছে।

বটুক সেন বলছিল, খুব খরচ করে ব্যবসা তো ফাঁদলে। ঘর সাজিয়েছ, দামী পর্দা টাঙিয়েছ, উর্দি পরা বয় রেখেছ, কাগজে বিজ্ঞাপনও দিচ্ছ। মক্কেল কেমন আসছে?

সরলাক্ষ বললে, দুটি একটি করে আসছে। বেশীর ভাগই স্কুলের ছেলে, ষোল টাকা ফী দেবার সাধ্য নেই, টাকাটা সিকেটা যা দেয় তাই নিই। একজন প্রেমে পড়েছে, কিন্তু সে অত্যন্ত বেঁটে বলে প্রণয়িনী তাকে গ্রাহ্য করছে না। আমি অ্যাডভাইস দিয়েছি—সকালে দু পায়ে দুখানা ইট বেঁধে দু হাতে গাছের ডাল ধরে আধ ঘণ্টা দোল খাবে, বিকেলে মাঠে মনুমেণ্টের মাথার দিকে তাকিয়ে এক ঘণ্টা ধ্যান করবে, ছ মাসের মধ্যে ছ ইঞ্চি বেড়ে যাবে। আর একটি ছেলে কাশী থেকে পালিয়ে এখানে ফুর্তি করতে এসেছে, টাকা সব ফুরিয়ে গেছে, বাপকে জানাতে লজ্জা হচ্ছে। আমি বলেছি—লিখে দাও, ছেলেধরা ক্লোরোফর্ম করে নিয়ে এসেছে, মিস্টার সরলাক্ষ হোম্ আমাকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন, পত্রপাঠ এক শ টাকা পাঠাবেন। আর এই দেখ বটুক-দা—শ্রীগদাধর ঘোষ চিঠি লিখেছেন, আজ সন্ধ্যা সাতটায় আসবেন।

বটুক বললে, বল কি হে! গদাধর তো মস্ত বড় লোক, তার আবার মুশকিল কি হল? তাকে যদি খুশী করতে পার তো তোমার বরাত ফিরে যাবে।

সরলাক্ষর প্রতিহাররক্ষী ছোকরা সোনালাল একটা স্লিপ নিয়ে এল। সরলাক্ষ পড়ে বললে, এ যে দেখছি একজন মহিলা, মাণ্ডবী ঘোষ। পাঠিয়ে দে এখানে।

কুড়ি-বাইশ বছরের একটি মেয়ে ঘরে এল। দুজন লোক দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললে, মিস্টার হোমের সঙ্গে কিছু প্রাইভেট কথা বলতে চাই।

সরলাক্ষ বললে, আমিই হোম, ইনি আমার সহকর্মী ডাক্তার বটুক সেন। আপনি এঁর সামনে সব কথা বলতে পারেন, কোনও দ্বিধা করবেন না। বসুন আপনি।

মাণ্ডবী কিছুক্ষণ ঘাড় নীচু করে বসে রইল। তার পর আস্তে আস্তে বললে, আমার বাবার নাম শুনে থাকবেন, শ্রীগদাধর ঘোষ।

সরলাক্ষ বললে, ও, তাঁরই কন্যা আপনি?

—হাঁ। বরুণ-দার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা অনেক কাল থেকে ঠিক করা আছে—বানর-নির্বাসন-অধিকর্তা বরুণ বিশ্বাস।

হাঁ হাঁ এই নতুন পোস্টের কথা কাগজে পড়েছি বটে। খুব ভাল সম্বন্ধ, কংগ্রাট্স মিস ঘোষ।

মাণ্ডবী বিষণ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বললে, একটা বিশ্রী গুজব শুনছি, বরুণ-দা তার অ্যাসিস্টাণ্ট খঞ্জনা দাসের প্রেমে পড়েছে।

—আপনার বাবা জানেন?

—জানেন, কিন্তু তিনি তেমন গা করছেন না। বলছেন, ইয়ংম্যানদের অমন একটু-আধটু বেচাল হয়ে থাকে, বিয়ে হলেই সেরে যাবে।

—কথাটা ঠিক, চটপট বিয়ে হয়ে যাওয়াই ভাল।

—এক জ্যোতিষী বলেছেন আমার একটা ফাঁড়া আছে, তিন মাস পরে কেটে যাবে। তার পর বিয়ে হবে। কিন্তু তার মধ্যে বরুণ-দা কি করে বসবে কে জানে।

—দেখি আপনার হাত।

মাণ্ডবীর করতল দেখে সরলাক্ষ বললে, হুঁ, ফাঁড়া একটা আছে বটে, কিন্তু তিন মাস নয়, মাস খানিকের মধ্যেই আমি কাটিয়ে দেব। খঞ্জনা দাসের খপ্পর থেকে আপনি শ্রীবিশ্বাসকে উদ্ধার করতে চান তো?

—হাঁ। আপনি দু জনের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিন, ভীষণ ঝগড়া, যাতে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়। খরচ যা লাগে আমি দেব, এখন এই একশ টাকা আগাম দিচ্ছি।

সরলাক্ষ সহাস্যে বললে, ব্যস্ত হবেন না, আমার প্রথম ফী ষোল টাকা মাত্র। কাজ উদ্ধার হলে আরও যা ইচ্ছে দেবেন।

বটুক বললে, মিস ঘোষ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সরলাক্ষর অসাধ্য কিছু নেই, ঠিক ঝগড়া বাধিয়ে দেবে।

মাণ্ডবী মাথা নেড়ে বললে, উঁহু, অত সহজ ভাববেন না। খঞ্জনাকে আপনারা চেনেন না, ভীষণ বদমাশ মেয়ে, দারুণ ছিনে জোঁক, সহজে ছাড়বে না। আর বরুণ-দাও ভীষণ বোকা।

সরলাক্ষ প্রশ্ন করলে, বরুণ-দাকে আপনি কত দিন থেকে জানেন?

—সেই ছেলেবেলা থেকে। আমার বাবাই ওকে মানুষ করেছেন, চাকরিও জুটিয়ে দিয়েছেন।

সোনালাল আবার ঘরে এসে একটা কার্ড দিলে। সরলাক্ষ দেখে বললে, আরে স্বয়ং বরুণ বিশ্বাস দেখা করতে এসেছেন!

মাণ্ডবী চমকে উঠে বললে, সর্বনাশ, আমাকে তো দেখে ফেলবে! কি করি বলুন তো?

সরলাক্ষ বললে, কোনও চিন্তা নেই, আপনি ওই পিছনের ঘরে যান, মোটা পর্দা আছে, কিছু দেখা যাবে না। শ্রীবিশ্বাস চলে গেলে আপনি আবার এ ঘরে আসবেন।

মাণ্ডবী তাড়াতাড়ি পিছনের ঘরে গেল এবং পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আড়ি পাততে লাগল।

বরুণ বিশ্বাস ঘরে ঢুকে বললেন, মিস্টার হোমের সঙ্গে আমার কথা আছে, অত্যন্ত প্রাইভেট।

সরলাক্ষ বললে, আমিই সরলাক্ষ হোম, ইনি আমার কোলীগ ডাক্তার বটুক সেন। এঁর সামনে আপনি স্বচ্ছন্দে সব কথা বলতে পারেন।

বরুণ তবু ইতস্তত করছে দেখে বটুক বললে, মিস্টার বিশ্বাস, আপনি সংকোচ করবেন না। শার্লক হোমসের জুড়িদার যেমন ডাক্তার ওআটসন, সরলাক্ষ হোমের তেমনি ডাক্তার বটুক সেন—এই আমি। তবে আমি ওআটসনের মতন হাঁদা নই। আপনিই বাঁদর দপ্তরের কর্তা তো?

বরুণ বললে, আমি হচ্ছি ডিরেক্টর অভ মংকি ডিপোর্টেশন। সরলাক্ষবাবু, আমি একটি অত্যন্ত ডেলিকেট ব্যাপারের জন্য আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।

সরলাক্ষ বললে, কিছু ভাববেন না, আপনি খোলসা করে সব কথা বলুন।

—শ্রীগদাধর ঘোষের নাম শুনেছেন তো? তাঁর মেয়ে মাণ্ডবীর সঙ্গে আমার বিবাহ বহু কাল থেকে স্থির হয়ে আছে।

—চমৎকার সম্বন্ধ, কংগ্রাট্‌স মিস্টার বিশ্বাস।

—কিন্তু আমি অন্য একটি মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছি।

—বেশ তো, তাঁকেই বিবাহ করুন না।

—তাতে বিস্তর বাধা। শ্রীগদাধর আমার পিতৃবন্ধু, ছেলেবেলার অভিভাবক, এখনও মুরুব্বী। তিনিই আমার চাকরিটি করে দিয়েছেন, চটে গেলে তিনিই আমাকে তাড়াতে পারেন। অথচ তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে আমি বিস্তর সম্পত্তি পাব, চাকরিও বজায় থাকবে।

—তবে তাঁর মেয়েকেই বিয়ে করুন না।

—দেখুন, মাণ্ডবীকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, তাকে ছোট বোন মনে করতে পারি, কিন্তু তার সঙ্গে প্রেম হওয়া অসম্ভব।

—দেখতে বিশ্রী বুঝি?

—ঠিক বিশ্রী হয়তো নয়, কিন্তু আমার পছন্দর সঙ্গে একদম মেলে না। মোটা-সোটা গড়ন, ডলিপুতুলের মতন টেবো টেবো গাল। ফোর্থ ইয়াবে পড়ছে বটে, কিন্তু চালচলন সেকেলে, স্মার্ট নয়, ভুল ইংরিজী বলে। এখনও জরির ফিতে দিযে খোঁপা বাঁধে, এক গাদা গহনা পরে জুজুবুড়ী সাজে।

—যাঁকে ভালবেসে ফেলেছেন তিনি কেমন?

—খঞ্জনা? ওঃ, সুপর্ব্, চমৎকার। মেমের মতন ইংরিজী বলে, তাব সঙ্গে মাণ্ড-বীর তুলনাই হয় না।

সরলাক্ষ বললে, দেখুন মিস্টার বরুণ বিশ্বাস, আপনার ইচ্ছেটা বুঝেছি। আপনি চাকরি বজায় রাখতে চান, গদাধরবাবুর সম্পত্তিও চান, অথচ তাঁর কন্যাকে চান না। এই তো?

বরুণ মাথা নীচু করে বললে, সমস্যাটা সেইরকমই দাঁড়িয়েছে বটে। কোন উপায় বলতে পারেন?

সরলাক্ষ বললে, একটা খুব সোজা উপায় বাতলাতে পারি। আপনি হিন্দু তো? এখনও বহু-বিবাহ-নিষেধের আইন পাস হয় নি। শ্রীগদাধরের কন্যাকে বিবাহ করে ফেলুন, যত পারেন সম্পত্তি আদায় করেন নিন। ছ মাস পরে মিস খঞ্জনাকেও বিবাহ করবেন, তাঁকেই সুয়োরানীর পোস্ট দেবেন?

বরুণ বললে, আপনি গদাধর ঘোষকে জানেন না, ধড়িবাজ দুর্দান্ত লোক। সম্পত্তি যা দেবার তিনি মেয়েকেই দেবেন। খঞ্জনাকে বিয়ে করলে তৎক্ষণাৎ আমার চাকরিটি খাবেন আর মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে যাবেন।

বটুক সেন বললে, আমি একটি ডাক্তারী উপায় বলছি শুনুন। মিস মাণ্ডবীকে বিয়ে করে ফেলুন। আপনাকে দু পুরিয়া আর্সেনিক দেব, একটা শ্বশুরকে আর একটা শ্বশুর-কন্যাকে চায়ের সঙ্গে খাওয়াবেন। দুজনেই পঞ্চত্ব পেলে সম্পত্তি আপনার হাতে আসবে, চাকরিও থাকবে, তখন মিস খঞ্জনাকে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করবেন।

—বিষ দিতে বলছেন?

আর্সেনিকে আপত্তি থাকলে কলেরা জার্ম দিতে পারি, কাজ সমানই হবে।

বরুণ রেগে গিয়ে বললে, আপনাদের সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে এখানে আসি নি, আমার সময়ের মূল্য আছে।

সবলাক্ষ বললে না না রাগ করবেন না, আপনার প্রবলেমটি বড় শক্ত কিনা তাই বটুক-দা একটু ঠাট্টা করেছেন। আমি বলি শুনুন—আপনার আকাঙ্ক্ষাটি বড্ড বেশী নয় কি? কিছু কমিয়ে ফেলুন দুধও খাবেন তামাকও খাবেন তা তো হয় না।

—আচ্ছা সম্পত্তির আশা না হয় ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি এমন উপায় বলতে পারেন যাতে মাণ্ডবীর সঙ্গে আমার বিয়ে ভেস্তে যায় অথচ চাকরির ক্ষতি না হয়, অর্থাৎ গদাধর ঘোষ রাগ না করেন?

—আমাকে একটু সময় দিন ভেবে চিন্তে উপায় বার করতে হবে। আপনি সাত দিন পরে আসবেন। ফী জানতে চান? আজ ষোল টাকা দিন তার পর কাজ উদ্ধার হলে তার গুরুত্ব বুঝে আরও টাকা দেবেন।

বরুণ টাকা দিয়ে চলে গেল।

মাণ্ডবী পর্দা ঠেলে ঘরে এল। তার গা কাঁপছে মুখ লাল, চোখ ফুলো ফুলো দেখেই বোঝা যায় যে জোর করে কান্না চেপে রেখেছে।

বটুক সেন বললে একি মিস ঘোষ আপনি বড্ড আপসেট হয়ে পড়েছেন দেখছি! স্থির হয়ে বসুন দু মিনিটের মধ্যে একটা ওষুধ নিয়ে আসছি।

মাণ্ডবী বললে ওষুধ চাই না একটু জল।

সবলাক্ষ তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল এনে দিলে। মাণ্ডবী চোখে মুখে জল দিয়ে ভাঙা গলায় বললে সবলাক্ষবাবু আর কিছু করবার দরকার নেই বরুণদাকে আমি বিয়ে করব না।

সবলাক্ষ বললে না না ঝোঁকের মাথায় কোনও প্রতিজ্ঞা করবেন না। আপনার বাবা খুব খাঁটী কথা বলেছেন বিয়ে হয়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—খঞ্জনার খপ্পর থেকে আপনার বরুণ-দাকে উদ্ধার করবই। যদি তিনি অনুতপ্ত হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চান তবে তাকে বিয়ে করবেন না কেন?

সজোরে মাথা নেড়ে মাণ্ডবী বললে না না না। আমি মুটকী ধুমসী আমি সেকালে মুখখু জুজুবুড়ী আর খঞ্জনা হচ্ছে বিদ্যাধরী—

—ও আপনি বুঝি আড়ি পাতছিলেন। ভেরি ব্যাড। ওসব কথায় কান দেবেন না বাঁদরের কর্তা হয়ে আপনার বরুণদা বাঁদুরে বুদ্ধি পেয়েছেন খঞ্জনার মোহে পড়ে যা তা বলছেন। মোহ কেটে গেলেই আপনার কদর তিনি বুঝবেন। আপনি হচ্ছেন সেই কালিদাস যা বলছেন—পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা আপনি হচ্ছেন—শ্রোণীভরাদলসগমনা স্তোকনম্রা—

—চুপ করুন অসভ্যতা করবেন না। এই নিন আপনার ষোল টাকা আমি চললুম।

সবলাক্ষ হাতজোড় করে বললেন মাণ্ডবী দেবী মন শান্ত করুন ধৈর্য ধরুন। যত শীঘ্র পারি খঞ্জনাকে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করব দোহাই আপনার, তত দিন কিছু করে বসবেন না।

মাণ্ডবী নমস্কার করে চলে গেল। বটুক বললে নাও ঠেলা সামলাও এখন।

সবাই দেখছি ভীষণ, খঞ্জনা ভীষণ বদমাশ, বরুণ-দা ভীষণ বোকা আর মাণ্ডবী ভীষণ ছেলেমানুষ। পাত্রী একদিকে যাচ্ছেন, পাত্র আর একদিকে যাচ্ছেন, কার মন রাখবে? আবার পাত্রীর বাপ আসছেন, তিনি কি চান কে জানে।

সন্ধ্যা সাতটায় শ্রীগদাধর ঘোষ প্রকাণ্ড মোটরে চড়ে উপস্থিত হলেন। সরলাক্ষ খুব খাতির করে তাঁকে নিজের খাস কামরায় নিয়ে গিয়ে বসালে এবং বটুকের পরিচয় দিলে।

পকেট থেকে বিজ্ঞাপনটা বার করে শ্রীগদাধর একটু হেসে বললেন, খাসা ব্যবসা খুলেছেন সরলাক্ষবাবু। ডেলিকেট ব্যাপারে মতলব দিতে পারে এমন একজন তুখড় চৌকশ লোকের বড়ই অভাব ছিল। আপনি বিজ্ঞাপনে ঠিকই লিখেছেন, ডাক্তার উকিল পুলিশ জ্যোতিষী গুরু—এদের কি সব কথা বলা চলে, নাকি এরা সব সমস্যার সমাধান করতে পারে? আপনার তো বয়স বেশী নয়, ব্যবসাটি শিখলেন কোথায়? ডিগ্রী কিছু আছে?

সরলাক্ষ বললে, আমি হচ্ছি সাউথ আমেরিকার মায়া-আজটেক-ইংকা ইউনিভার্সিটির পিএচ. ডি., আমার রিসার্চের জন্য সেখানকার অনারারী ডিগ্রী পেয়েছি। বাগবাজার বিবুধ সভাও আমাকে বুদ্ধিবারিধি উপাধি দিয়েছেন।

—বেশ বেশ। এখন আমার মুশকিলটা শুনুন।

শ্রীগদাধর তাঁর মুশকিলটা সবিস্তারে বিবৃত করে অবশেষে বললেন, আপনি ওই খঞ্জনা মাগীর কবল থেকে বরুণকে চটপট উদ্ধার করে দিন, আমার মেয়েটা বড়ই মনমরা হয়ে আছে।

সরলাক্ষ বললে, আপনার তো শুনেছি খুব প্রতিপত্তি, মন্ত্রীরা আপনার কথায় ওঠেন বসেন। আপনি মনে করলেই খঞ্জনাকে আণ্ডামানে বদলী করতে পারেন।

—সেটি হবার জো নেই। খঞ্জনা হচ্ছে চতুর্ভুজ খাবলদারের তৃতীয় পক্ষের শালী। চতুর্ভুজকে চটানো আমার পলিসি নয়, আমার ছেলে দিল্লিতে তারই কম্পানিতে কাজ করে।

—বরুণকে দূরে বদলী করিয়ে দিন।

—সে কথা আমি যে ভাবি নি এমন নয়। কিন্তু বিচ্ছেদের ফলে প্রেম যে আরও চাগিয়ে উঠবে, চিঠিতে লম্বা লম্বা প্রেমালাপ চলবে, তার কি করবেন?

—তারও উপায় আছে। অন্য কারও সঙ্গে চটপট খঞ্জনার বিয়ে দিতে হবে।

—খেপেছেন? খঞ্জনা আমাদের ফরমাশ মত বিয়ে করবে কেন?

—জুতসই পাত্র পেলেই করবে। শুনুন সার—বরুণকে দূরে বদলী করান, তার জায়গায় এমন একজন বাহাল করুন যে খঞ্জনাকে বিয়ে করতে রাজী আছে।

—কোথায় পাব তেমন লোক?

বটুককে ঠেলা দিয়ে সরলাক্ষ বললে, কি বল বটুক-দা?

বটুক প্রশ্ন করলে, মাইনে কত?

শ্রীগদাধর বললেন, তা ভালই, আড়াই হাজার।

সরলাক্ষ বললে, রাজী আছ বটুক-দা? এমন চাকরি পেলে খঞ্জনাকে আত্মসাৎ করতে পারবে না?

—খুব পারব, খঞ্জনা গঞ্জনা ঝঞ্জনা কিছুতেই আমার আপত্তি নেই।

শ্রীগদাধর বললেন, বরুণকে ছেড়ে খঞ্জনা তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে কেন? চাকরি বদল যত সহজে হয় প্রেমের বদল তত সহজে হয় না।

বটুক বললে, সেজন্য আপনি ভাববেন না সার, আমি খঞ্জনাকে ঠিক পটিয়ে নেব।

—কিন্তু জন্তুর সায়েন্স না জানলে তো বানর-নির্বাসন-অধিকর্তা হতে পারবে না। তুমি তো নাড়ী-টেপা ডাক্তার?

সরলাক্ষ বললে, শুনুন সার। এমন বিদ্যে নেই যা ডাক্তাররা শেখে না, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বটানি জোঅলজি আরও কত কি। নয় বটুক-দা?

বটুক বললে, নিশ্চয়। জোঅলজি, বিশেষ করে মংকিলজি, আমার খুব ভাল রকম জানা আছে।

গদাধর একটু ভেবে বললেন, বেশ, কালই আমি মিনিস্টার ইন চার্জকে বলব। কিন্তু প্রথমটা টেম্পোরারি হবে, যদি দুমাসের মধ্যে খঞ্জনাকে বিয়ে করতে পার তবেই চাকরি পাকা হবে, নয়তো ডিসমিস।

বটুক বলে, দু মাস লাগবে না, এক মাসের মধ্যেই আমি তাকে বাগিয়ে নেব।

গদাধর বললে, বেশ। বড় আনন্দ হল তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে। কাল আমাকে একবার দিল্লি যেতে হবে, গিন্নীকে ছেলের কাছে রেখে আসব, পাঁচ দিন পরে ফিরব। তার পরের রবিবারে বিকেল চারটার সময় তোমরা আমার বাড়িতে চা খাবে, কেমন? আমার মেয়ে মাণ্ডবীর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেব।

সরলাক্ষ আর বটুক সবিনয়ে বললে, যে আজ্ঞে!

শ্রীগদাধরের সুপারিশের ফলে তিন দিনের মধ্যে বরুণের জায়গায় বটুক সেন বাহাল হল এবং বরুণ দহরমগঞ্জে বদলী হয়ে গেল। তার নতুন পদের নাম—কুক্কুটাণ্ড-বিবর্ধন-পরীক্ষা-সংস্থা-আয়ুক্তক, অর্থাৎ অফিসার ইন চার্জ হেন্‌স এগ এনলার্জমেণ্ট এক্সপেরিমেণ্টাল স্টেশন।

নির্দিষ্ট দিনে সরলাক্ষ আর বটুক গদাধরবাবুর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল। গদাধর বললেন, এই যে, এস এস। ওরে মাণ্ডবী, এদিকে আয়। এই ইনি হচ্ছেন শ্রীসরলাক্ষ হোম, মুশকিল আসান এক্সপার্ট। আর ইনি ডাক্তার বটুক সেন, আমাদের নতুন বানর-নির্বাসন-অধিকর্তা। খাসা লোক এঁরা।

নমস্কার বিনিময়ের পর বটুক বললে, সার, একটি অপরাধ হয়ে গেছে, আপনাকে আগে খবর দেওয়া উচিত ছিল, বড্ড তাড়াতাড়ি হল কিনা তাই পারি নি, মাপ করবেন। শ্রীমতী খঞ্জনার সঙ্গে কাল আমার শুভ পরিণয় হয়ে গেছে।

বটুকের পিঠ চাপড়ে, শ্রীগদাধর বললেন, জিতা রহো, বাহবা, বাহবা, বলিহারি শাবাশ! আমরা ভারী খুশী হলুম শুনে. কি বলিস মাণ্ডবী? খেতে শুরু কর তোমরা, আমি চট করে গিন্নীকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়ে আসছি।

মাণ্ডবী বটুককে বললে, ধন্য রুচি আপনার, বাবার কাছে ঘুষ খেয়ে সেই শুর্পনখাটাকে বিয়ে করে ফেললেন! খঞ্জনাই বা কি রকম মেয়ে, দু দিনের মধ্যে বরুণ-দাকে ভুলে গিয়ে আপনার গলায় মালা দিলে?

সরলাক্ষ বললে, তিনি অতি সুবুদ্ধি মহিলা, বরুণ-দার চাকরিটি মারেন নি, বটুক-দার চাকরি পাকা করে দিয়েছে, আমারও মুখরক্ষা করেছেন।

মাণ্ডবী বললে, আপনার আবার কি করলেন?

—আপনাকে কথা দিয়েছিলুম দুজনের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া বাধিয়ে দেব, মনে নেই? আপনি শুনে খুশী হবেন, খঞ্জনা বউ-দি মিস্টার বরুণকে ভীষণ গালাগালি দিয়ে একটি চিঠি লিখেছেন, আমিই সেটা ড্রাফ্‌ট করে দিয়েছি। এখন আপনার লাইন ক্লিয়ার। যদি বরুণ-দাকে আপনি একটি মোলায়েম চিঠি লেখেন তবে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার ফী-এর বাকী টাকাটা আপনাকে আর দিতে হবে না, আপনার বাবাই তা শোধ করবেন।

—উঃ, আপনাদের কি কোনও প্রিনসিপ্‌ল নেই, সেন্টিমেন্ট নেই, হৃদয় নেই, শোভন অশোভন জ্ঞান নেই? কি ভীষণ মানুষ আপনারা! মাপ করবেন, আপনাদের কাণ্ড দেখে হতভম্ব হয়ে যা তা বলে ফেলেছি।

গদাধরবাবু তার পাঠিয়ে ফিরে এলেন। অনেকক্ষণ নানা রকম আলাপ চলল, তার পর সরলাক্ষ আর বটুক চলে গেল।

পরদিন বরুণের কাছ থেকে মাণ্ডবী একটা আট পাতা চিঠি পেলে।

এখানেই থামা যেতে পারে, কারণ এর পরে যা হল তা আপনারা নিশ্চয় আন্দাজ করতে পেরেছেন। কিন্তু এমন পাঠক অনেক আছেন যাঁরা নায়ক নায়িকার একটা হেস্তনেস্ত না দেখলে নিশ্চিত হতে পারেন না। তাঁদের অবগতির জন্য বাকীটা বলতে হল।

সন্ধ্যার সময় শ্রীগদাধর সরলাক্ষর কাছে এলেন। সে একাই আছে, বটুক সস্ত্রীক সিনেমায় গেছে। গদাধর বললেন, ওহে সরলাক্ষ, এ তো মহা মুশকিলে পড়া গেল! মাণ্ডবীকে বরুণ মস্ত একটা চিঠি লিখেছে, বেশ ভাল চিঠি, খুব অনুতাপ জানিয়ে অনেক কাকুতি মিনতি করে ক্ষমা চেয়েছে। আমিও অনেক বোঝালুম, কিন্তু মাণ্ডবী গোঁ ধরে বসে আছে,—বাঙালে গোঁ, তার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে। চিঠিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, ছুঁচোকে আমি বিয়ে করতে পারব না। বাবা সরলাক্ষ, তুমি কালই তার সঙ্গে দেখা করে বুঝিয়ে ব'লো। বরুণের মতন পাত্র লাখে একটা মেলে না। তোমার অসাধ্য কাজ নেই, মাণ্ডবীকে রাজী করাতে যদি পার তো তোমাকে খুশী করে দেব।

সরলাক্ষ বললে, যে আজ্ঞে, আমি তার সঙ্গে দেখা করে সাধ্য মত চেষ্টা করব।

পরদিন শ্রীগদাধর সরলাক্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল হে, রাজী করাতে পারলে?

—উঁহু, বরুণের ওপর ভীষণ চটে গেছেন, শুধু ছুঁচো নয়, মীন মাইণ্ডেড মংকিও বলেছেন। আমার মতে চটপট তাঁর অন্যত্র বিবাহ হওয়া দরকার, নয়তো মনের শান্তি ফিরে পাবেন না। দারুণ একটা শক পেয়েছেন কিনা। তাঁর হৃদয়ে যে ভ্যাকুয়ম হয়েছে সেটা ভরতি করাতে হবে।

—কিন্তু এত তাড়াতাড়ি অন্য লোককে বিয়ে করতে রাজী হবে কেন? ভাল পাত্রই বা পাই কোথা?

—যদি অভয় দেন তো নিবেদন করি। অনুমতি পেলে নিজের জন্যে একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—তুমি! তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে কেন? ধর মাণ্ডবী রাজী হল, কিন্তু

আমার হোমরা চোমরা আত্মীয় স্বজনের কাছে জামাইএর পরিচয় কি দেব? মুশকিল আসান অধিকর্তা বললে তো চলবে না, লোকে হাসবে।

—আপনার কৃপা হলেই আমি একটা বড় পোস্ট পেয়ে যেতে পারি, আপনার জামাইএর উপযুক্ত।

কোন্ কাজ পারবে তুমি?

সরকার তো হরেক রকম পরিকল্পনা করছেন, মাটির তলায় রেল, শহরের চারদিক ঘিরে চক্রবেড়ে রেল, সমুদ্র থেকে মাছ, ড্রেনের ময়লা থেকে গ্যাস, আরও কত কি। আমিও ভাল স্কীম বাতলাতে পারি।

—বল না একটা।

—এই ধরুন, উপকণ্ঠ-গির্যাশ্রম।

—সে আবার কি. গির্জে বানাতে চাও নাকি?

—আজ্ঞে না। গিরি-আশ্রম হল গির্যাশ্রম, উপকণ্ঠ-গির্যাশ্রম মানে সাবর্বান হিল স্টেশন। সহজেই হতে পারবে। কলকাতার কাছে লম্বা চওড়ায় এক শ মাইল একটা জমি চাই, তাতে প্রকাণ্ড একটা লেক কাটা হবে, তার মাটি স্তূপাকার করে লেকের মধ্যিখানে দশ-বারো হাজার ফুট উঁচু একটা পিরামিড বা কৃত্রিম পাহাড় তৈরি হবে। দার্জিলিং যাবার দরকার হবে না. পাহাড়ের গায়ে আর মাথায় একটি চমৎকার শহর গড়ে উঠবে. বিস্তর সেলামী দিয়ে লোকে জমি লীজ নেবে। আঙুর আপেল পীচ আকরোট বাদাম কমলালেবু ফলবে, নীচের লেকে অজস্র মাছ জন্মাবে। পাহাড়ের মাথা থেকে বিনা পয়সায় বরফ পাবেন. ঢালু গা দিয়ে আপনিই হড়াক করে নেমে আসবে—

—চমৎকার, চমৎকার. আর বলতে হবে না। কালই আমি মিনিস্টার ইন চার্জ অভ ল্যান্ড আপ্লিফটের সংগে কথা বলব। কিন্তু তোমার পোস্টের নামটা কি হবে?

—পরিকল্পন-মহোপদেষ্টা. অর্থাৎ অ্যাডভাইজার-জেনারেল অভ স্কীম্স। সাড়ে তিন হাজার টাকা মাইনে দিলেই চলবে।

—নিশ্চিন্ত থাক বাবাজী. চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই আমি সব পাকা করে ফেলব। তুমি দেরি ক'রো না. লেগে যাও. এখন থেকেই মাণ্ডবীকে বাগাবার চেষ্টা কর।

মাণ্ডবী অতি লক্ষ্মী মেয়ে. আর সরলাক্ষর প্রেমের প্যাঁচ অর্থাৎ টেকনিকও খুব উঁচুদরের। পাঁচ দিনের মধ্যেই সে মাণ্ডবীকে বাগিয়ে ফেললে।

কিন্তু বরুণ বিশ্বাসের কি হল? তার কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। তাকে বিয়ে করবার জন্যে একটা মাদ্রাজী. দুটো পঞ্জাবী আর তিনটে ফিরিঙ্গী মেয়ে ছেঁকে ধরেছে, তা ছাড়া ওখানকার জজ-গিন্নী, ডেপুটি-গিন্নী আর উকিল-গিন্নীও নিজের নিজের আইবুড় মেয়েদের বরুণের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছেন। বেচারা কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

# আতার পায়েস

চুরির জন্যই যে চুরি তাতে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ পাওয়া যায়। দেশের কাজে চুরি, সরকারী কনট্রাক্টে চুরি, তহবিল তসরুফ, পকেট মারা, ইত্যাদির উদ্দেশ্য যতই মহৎ হক, তাতে আনন্দ নেই, শুধু স্থূল স্বার্থসিদ্ধি। গীতায় যাকে কাম্যকর্ম বলা হয়েছে, এসব চুরি তারই অন্তর্গত। কিন্তু যে চুরি অহেতুক, যা শুধু অকারণ পুলকে করা হয়, তা নিষ্কাম ও সাত্ত্বিক, অনাবিল আনন্দ তাতেই মেলে। যশোদাদুলাল শ্রীকৃষ্ণ ভালই খেতেন, কার্বোহাইড্রেট প্রোটীন ফ্যাট কিছুরই তাঁর অভাব ছিল না, তথাপি তিনি ননি চুরি করতেন। তাঁর কটিতটের রঙিন ধটী যথেষ্ট ছিল, বস্ত্রাভাব কখনও হয় নি, তথাপি তিনি বস্ত্রহরণ করেছিলেন। এই হল নিষ্কাম সাত্ত্বিক চুরির ভগবৎপ্রদর্শিত নিদর্শন। রামগোপাল হাইস্কুলের মাস্টার প্রবোধ ভটচাজ এইরকম চুরিতে জড়িয়ে পড়েছিল।

প্রবোধ মাস্টারের বয়স ত্রিশ, আমুদে লোক, ছাত্ররা তাকে খুব ভালবাসে। পুজোর বন্ধর দিন কতক আগে পাঁচটি ছেলে তার কাছে এল। তাদের মুখপাত্র সুধীর বললে, সার, মহা মুশকিলে পড়েছি।

প্রবোধ জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপারটা কি ?

—গেল বছর আমার বড়-দার বিয়ে হয়ে গেল জানেন তো? তার শ্বশুর ভৈরববাবু খুব বড়লোক, দেওঘরের কাছে গণেশমুণ্ডায় তাঁর একটি চমৎকার বাড়ি আছে। বউ-দি বলেছে, সে বাড়ি এখন খালি, পুজোর ছুটিতে আমরা জনকতক স্বচ্ছন্দে কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে আসতে পারি।

—এ তো ভাল খবর, মুশকিল কি হল ?

—ভৈরববাবু বলেছেন, আমাদের সঙ্গে যদি একজন অভিভাবক যান তবেই আমাদের সেখানে থাকতে দেবেন।

—তোমার বড়-দা আর বউ-দিকে নিয়ে যাও না।

—তা হবার জো নেই. ওরা মাইসোর যাচ্ছে। আপনিই আমাদের সঙ্গে চলুন সার। ক্লাস টেনের আমি. ক্লাস নাইনের নিমাই নরেন সুরেন আর ক্লাস এইটের পিণ্টু আমরা এই পাঁচ জন যাব. আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

—সঙ্গে চাকর যাবে তো ?

—কোনও দরকার নেই। সেখানে দরোয়ান আর মালী আছে, তারাই সব কাজ করে দেবে। খাবার জন্যে ভাববেন না সার। আমরা সঙ্গে স্টোভ নেব, কারি পাউডার নেব, চা চিনি গুঁড়ো দুধ আর বিস্কুটও দেদার নেব। ওখানে সস্তায় মুরগি পাওয়া যায়, বউ-দি কারি রান্না শিখিয়ে দিয়েছে। ওখানকার দরোয়ান পাঁড়েজী ভাত রুটি যা হয় বানিয়ে দেবে, আমরা নিজেরা দু বেলা ফাউল কারি রাঁধব। তাতেই হবে না ?

প্রবোধ বললে, সব তো বুঝলুম, কিন্তু আমাকে নিয়ে যেতে চাও কেন ? মাস্টার সঙ্গে থাকলে তোমাদের ফুর্তির ব্যাঘাত হবে না ?

সজোরে মাথা নেড়ে সুধীর বললে, মোটেই একদম একটুও কিছু ব্যাঘাত হবে না, আপনি সে রকম মানুষই নন সার। আপনি সঙ্গে থাকলে আমাদের তিন ডবল ফুর্তি হবে।

নিমাই নরেন সুরেন সমস্বরে বললে, নিশ্চয় নিশ্চয়।

পিন্টু বললে, সার, কোনান ডয়েলের সেই লস্ট ওঅর্লর্ড গল্পটা ওখানে গিয়ে বলতে হবে কিন্তু।

প্রবোধ যেতে রাজী হল।

দেওঘর আর জসিডির মাঝামাঝি গণেশমুণ্ডা পল্লীটি সম্প্রতি গড়ে উঠেছে। বিস্তর সুদৃশ্য বাড়ি, পরিচ্ছন্ন রাস্তা, প্রাকৃতিক দৃশ্যও ভাল। ভৈরববাবুর অট্টালিকা ভৈরব কুটীর আর তার প্রকাণ্ড বাগান দেখে ছেলেরা আনন্দে উৎফুল্ল হল এবং ঘুরে ঘুরে চার দিক দেখতে লাগল। বাগানে অনেক রকম ফলের গাছ। গোটা কতক আতা গাছে বড় বড় ফল ধরেছে, অনেকগুলো একেবারে তৈরি, পেড়ে খেলেই হয়।

প্রবোধ বললে, ভারী আশ্চর্য তো, ভৈরববাবুর দরোয়ান আর মালী দেখছি অতি সাধু পুরুষ।

সুধীর বললে, মনেও ভাববেন না তা, আমি এখানে এসেই সব খবর নিয়েছি সার। দরোয়ান মেহী পাঁড়ে আর মালী ছেদী মাহাতো এদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া। দুজনে দুজনের ওপর কড়া নজর রাখে তাই এ পর্যন্ত কেউ চুরি করবার সুবিধে পায় নি।

প্রবোধ বললে, আত্মকলহের ফলই এই। পাঁড়ে আর মাহাতো যদি একমত হত তবে স্বচ্ছন্দে আতা বেচে দিয়ে লাভটা ভাগাভাগি করে নিতে পারত।

নিমাই বললে, আচ্ছা সার, আমাদের দেশনেতাদের মধ্যে তো ভীষণ ঝগড়া তবুও চুরি হচ্ছে কেন?

সুধীর বললে, যা যাঃ, জেঠামি করিস নি। আগে বড় হ, তার পর পলিটিক্স বুঝবি।

নিমাই বললে, যদি দু-তিন সের দুধ যোগাড় করা যায় তবে চমৎকার আতার পায়েস হতে পারবে। আমি তৈরি করা দেখেছি খুব সহজ।

সুধীর বললে, বেশ তো, তুই তৈরি করে দিস। ও পাঁড়েজী, তুমি কাল সকালে তিন সের খাঁটী দুধ আনতে পারবে?

পাঁড়ে বললে, জরুর পারব হুজুর।

নাওয়া খাওয়া আর বিশ্রাম চুকে গেল। বিকেল বেলা সকলে বেড়াতে বেরুল। ঘণ্টা খানিক বেড়াবার পর ফেরবার পথে সুধীর বললে, দেখুন সার, এই বাড়িটি কি সুন্দর, ভীমসেন ভিলা। গেটের ওপর কি চমৎকার থোকা থোকা হলদে ফুল ফুটেছে!

আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে পিন্টু চেঁচিয়ে উঠল—ওই ওই একটা নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে গেল।

নিমাই বললে, এদিকে দেখুন সার, উঃ কি ভয়ানক পেয়ারা ফলেছে, কাশীর পেয়ারার চাইতে বড় বড়। নিশ্চয় এ বাড়িরও দরোয়ান আর মালীর মধ্যে ঝগড়া আছে তাই চুরি যায় নি।

ফটকে তালা নেই। সুধীর ভিতরে ঢুকে এদিক ওদিক উঁকি মেরে বললে, কাকেও

তো কোথাও দেখছি না, কিন্তু ঘরের জানালা খোলা, মশারি টাঙনো রয়েছে। বোধ হয় সবাই বেড়াতে গেছে। দরোয়ান, ও দরোয়ানজী, ও মালী!

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। তখন সকলে ভিতরে এসে ফটকের প্যাল্লা ভেজিয়ে দিল।

নিমাই বললে, একটা পেয়ারা পাড়ব সার?

প্রবোধ বললে, বাজারে প্রচুর পেয়ারা দেখেছি, নিশ্চয় খুব সস্তা, খেতে চাও তো কিনে খেয়ো। বিনা অনুমতিতে পরের দ্রব্য নিলে চুরি করা হয় তা জান না?

—জানি সার। চুরি করব না, শুধু একটা চেখে দেখব কাশীর পেয়ারার চাইতে ভাল কি মন্দ।

প্রবোধ পিছন ফিরে গম্ভীর ভাবে একটা তালগাছের মাথা নিরীক্ষণ করতে লাগল। মৌনং সম্মতিলক্ষণম্ ধরে নিমাই গাছে উঠল। পেয়ারা পেড়ে কামড় দিয়ে বললে, বোম্বাই আমের চাইতে মিষ্টি!

সুধীর বললে, এই নিমে, সারকে একটা দে।

নিমাই একটা বড় পেয়ারা নিয়ে হাত ঝুলিয়ে বললে, এইটে ধরুন সার, একটু চেখে দেখুন, চমৎকার।

পেয়ারায় কামড় দিয়ে প্রবোধ বললে, সত্যিই খুব ভাল পেয়ারা। আর বেশী পেড়ো না, তা হলে ভারী অন্যায় হবে কিন্তু। লোভ সংবরণ করতে শেখ।

ততক্ষণ নিমাই-এর সব পকেট বোঝাই হয়ে গেছে, তার সঙ্গীরাও প্রত্যেকে দু-তিনটে করে পেয়েছে। সুধীর বললে, এই নিমে, শুনতে পাচ্ছিস না বুঝি? সার রাগ করছেন, নেমে আয় চট করে, এক্ষুনি হয়তো কেউ এসে পড়বে।

হঠাৎ ক্যাঁচ করে গেটটা খুলে গেল, একজন মোটা বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর একটা রোগা মহিলা প্রবেশ করলেন। দুজনের হাতে গামছায় বাঁধা বড় বড় দুটি পোঁটলা। নিমাই গাছের ডাল ধরে ঝুলে ধুপ করে নেমে পড়ল।

বৃদ্ধ চেঁচিয়ে বললেন, অ্যাঁ, এসব কি, দল বেঁধে আমার বাড়ি ডাকাতি করতে এসেছ! ভদ্রলোকের ছেলের এই কাজ? ঝব্বু সিং, এই ঝব্বু সিং—বেটা গেল কোথায়!

পোঁটলা দুটি নিয়ে মহিলা বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। ঝব্বু সিং এক লোটা বৈকালিক ভাঙ খেয়ে তার ঘরে ঘুমুচ্ছিল, এখন মনিবের চিৎকারে উঠে পড়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে এল। সে হুঁশিয়ার লোক, গেটে তাড়াতাড়ি তালা বন্ধ করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বললে, হুজুর, হুকুম দেন তো থানে মে খবর দিয়ে আসি। হো বৈজনাথজী, ছিয়া ছিয়া, ভদ্দর আদমীর ছৌলিয়ার এহি কাম!

হুজুর বললেন, খুব হয়েছে, ডাকাতরা চোখের সামনে সব লুটে নিলে আর তুমি বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছিলে! তার পর, মশায়দের কোত্থেকে আগমন হল? এরা তো দেখছি ছোকরা, বজ্জাতি করবারই বয়েস; কিন্তু তুমি তো বাপু খোকা নও, তুমিই বুঝি দলের সদ্দার?

প্রবোধ হাত জোড় করে বললে, মহা অপরাধ হয়ে গেছে সার। এই নিমাই, সব পেয়ারা দরয়োনজীর জিম্মা করে দাও। আমরা বেশী খাই নি সার, মাত্র দু-তিনটে চেখে দেখেছি। অতি উৎকৃষ্ট পেয়ারা।

—কৃতার্থ হলুম শুনে। এরা বোধ হয় স্কুলের ছেলে। তোমার কি করা হয়? নাম কি?

—আজ্ঞে, আমার নাম প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য, মানিকতলার রামগোপাল হাই স্কুলের মাস্টার। এরা সব আমার ছাত্র, পুজোর ছুটিতে আমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে।

—খাসা অভিভাবকটি পেয়েছে, খুব নীতিশিক্ষা হচ্ছে! আমাকে চেন? ভীমচন্দ্র সেন, রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। রায়বাহাদুর খেতাবও আছে, কিন্তু এই স্বাধীন ভারতে সেটার আর কদর নেই। বিস্তর চোরকে আমি জেলে পাঠিয়েছি। তোমার স্কুলের সেক্রেটারিকে যদি লিখি—আপনাদের প্রবোধ মাস্টার এখানে এসে তার ছাত্রদের চুরিবিদ্যে শেখাচ্ছে, তা হলে কেমন হয়?

—যদি কর্তব্য মনে করেন তবে আপনি তাই লিখুন সার, আমি আমার কৃতকর্মের ফল ভোগ করব। তবে একটা কথা নিবেদন করছি। কেউ অভাবে পড়ে চুরি করে, কেউ বিলাসিতার লোভে করে, কেউ বড়লোক হবার জন্যে করে। কিন্তু কেউ কেউ, বিশেষত যাদের বয়েস কম, নিছক ফুর্তির জন্যেই করে। আমি অবশ্য ছেলেমানুষ নই, কিন্তু এই ছেলেদের সঙ্গে মিশে, এই শরৎ ঋতুর প্রভাবে, আর আপনার এই সুন্দর বাগানটির শোভায় মুগ্ধ হয়ে আমারও একটু বালকত্ব এসে পড়েছে। এই যে পেয়ারা চুরি দেখছেন এ ঠিক মামুলী কুকর্ম নয়, এ হচ্ছে শুধু নবীন প্রাণরসের একটু উচ্ছলতা।

—হুঁ। ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা, পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা। রবি ঠাকুর তোমাদের মাথা খেয়েছেন। বিয়ে করেছ?

—করেছি সার।

—তবে পুজোর ছুটিতে বউকে ফেলে এখানে এসেছ কি করতে? বনে না বুঝি?

—আজ্ঞে, খুবই বনে। কিন্তু তিনি তাঁর বড়লোক দিদি আর জামাইবাবুর সঙ্গে শিলং গেলেন, আমি এই ছেলেদের আবদার ঠেলতে পারলুম না তাই এখানে এসেছি! সার, যে কুকর্ম করে ফেলেছি তার বিচার একটু উদার ভাবে করুন। আপনি ধীর স্থির প্রবীণ বিচক্ষণ ব্যক্তি, ছেলেমানুষী ফুর্তির ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন—

—কে বললে ঊর্ধ্বে উঠে গেছি? আমাকে জরদ্‌গব গিধড় ঠাউরেছ নাকি?

—তাহলে আশা করতে পারি কি যে আমাদের ক্ষমা করলেন? আমরা যেতে পারি কি?

—পেয়ারাগুলো নিয়ে যাও, চোরাই মাল আমি স্পর্শ করি না। আচ্ছা, এখন যেতে পার, এবারকার মতন মাপ করা গেল।

এমন সময় মহিলাটি বাইরে এসে বললেন, কি বেআক্কেল মানুষ তুমি, এরা তোমার এজলাসের আসামী নাকি? তুমি এদের মাপ করবার কে? তোমাকে মাপ করবে কে শুনি? এখন যেয়ো না বাবারা, এই বারান্দায় এসে একটু ব'স।

ভীমবাবু বললেন, এদের খাওয়াবে নাকি? তোমার ভাঁড়ার তো ঢু ঢু, চা পর্যন্ত ফুরিয়ে গেছে, হরি সরকার বাজার থেকে ফিরলে তবে হাঁড়ি চড়বে।

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না, যা আছে তাই দেব। মিনিট দশ সবুর করতে হবে বাবারা।

গৃহিণী ভিতরে গেলে ভীমবাবু বললেন, উনি ভীষণ চটে গেছেন, না খাইয়ে ছাড়বেন না, অগত্যা ততক্ষণ এই এজলাসেই তোমরা আটক থাক। এখানে উঠেছ কোথায়?

প্রবোধ বললে, ভৈরব কুটীরে, স্টেশনের দিকে যে রাস্তা গেছে তারই ওপর।

ভীমবাবু বললেন, কি সর্বনাশ। যার ফটকের পাশে বেগনী বুগনভিলিয়ার ঝাড় আছে সেই বাড়ি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়িটার কোন দোষ আছে?

—নাঃ, দোষ তেমন কিছু নেই। তোমরা ওখানে উঠেছ তা ভাবি নি।

নিমাই বললে, ভুতে পাওয়া বাড়ি নাকি?

—ভূত কোন্ বাড়িতে নেই? এ বাড়িতেও আছে। ও পাড়াটায় বড্ড চোরের উপদ্রব, এ পাড়ার চাইতে বেশী।

একটু পরে ভীমবাবুর পত্নী একটা বড় ট্রেতে বসিয়ে একটি ধূমায়মান গামলা এবং গোটাকতক বাটি আর চামচ নিয়ে এলেন। ভীমবাবু একটা টেবিল এগিয়ে দিয়ে বললেন, এ কি এনেছ, আতার পায়েস যে! এর মধ্যেই তৈরি করে ফেললে?

গৃহিণী বললেন, আর তো কিছু নেই, এই দিয়েই একটু মিষ্টিমুখ করুক।

ভীমবাবু বললেন, সবটাই এনেছ নাকি?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি আর লোভ ক'রো না বাপু। ছেলেরা যে পেয়ারা পেড়েছে তাই না হয় একটা খেয়ো। চিবুতে না পার তো সেদ্ধ করে দেব।

সুধীর সহাস্যে বললে, সার, আমাদের ওখানে বিস্তর আতা ফলেছে, ইয়া বড় বড়। কাল সকালে পায়েস বানিয়ে আপনাদের দিয়ে যাব।

ভীমবাবু বললেন, না না, অমন কাজটি ক'রো না। আতা আমার সয় না।

ভৈরব কুটীরে ফিরে এসে নিমাই বললে, একি, গাছের বড় বড় আতাগুলো গেল কোথায়?

সুধীর বললে, বোধ হয় পাঁড়েজী সদ্দারি করে পেড়ে রেখেছে। ও পাঁড়ে, আতা কি হল?

পাঁড়ে ব্যস্ত হয়ে এসে মাথায় একটু চাপড় মেরে করুণ কণ্ঠে বললে, কি কহবো হুজুর, বহুত ঝামেলা হয়ে গেছে! এক মোটা-সা বুঢ়া আর এক দুবলা-সা বুঢ়ী মাঈ এসেছিল! বাবু পঠপট সব আতা ছিঁড়ে লিলে। আমি মানা করলে খাফা হয়ে বললে, চোপ রহো উল্লু। আমার ডর লাগল, শায়দ কোই বড়া অপসর উপসরকা বাবা উবা হোবে—

সুধীর বললে, হাতে লাল গামছা ছিল?

—জী হাঁ, উসি মে বাঁধ কে লিয়ে গেল।

হাসির প্রকোপ একটু কমলে নিমাই বললে, হলধর দত্তর 'চোরে চোরে' গল্পর চাইতে মজার!

প্রবোধ বললে, যাক, আমরা ঠকি নি, আতার পায়েস খেয়েছি, পেয়ারাও পেয়েছি। কিন্তু ভীমচন্দ্র সেন মশায়ের জন্য দুঃখ হচ্ছে, তাঁর গিন্নী তাঁকে বঞ্চিত করেছেন।

নিমাই বললে, ভাববেন না সার, দিন দুই পরেই আবার বিস্তর আতা পাকবে, তখন পায়েস করে ভীমসেন মশায় আর তাঁর গিন্নীকে খাওয়াব।

১৩৬০

# ভবতোষ ঠাকুর

ভবতোষ সরকারের বয়স তিপ্পান্ন। উলুবেড়ের সবডেপুটি ছিলেন, তিন বছর হল চাকরি ছেড়েছেন। এখন কেবল পড়েন আর ভাবেন। নিঃসন্তান, স্ত্রী আছেন। কলকাতায় ভাড়া বাড়িতে বাস করেন, পেনশন যা পান তাতে কোনও রকমে সংসার চলে।

সকাল আটটা। দোতলায় সিঁড়ির পাশে একটি ছোট ঘরে তক্তপোশে ছেঁড়া শতরঞ্জির উপর বসে ভবতোষ চোখ বুজে কি একটা ভাবছেন। তাঁর দুই ভক্ত জিতেন আর বিধু মেঝেতে মাদুরের উপর বসে আছে।

জিতেন বললে, প্রভু, শুনেছেন?

ভবতোষের সাড়া নেই।

জিতেন। প্রভু, দয়া করে একবারটি শুনুন।

এবারে ভবতোষের হুঁশ হল। বললেন, আঃ, কেন খামকা প্রভু প্রভু করছ? আমি সামান্য মানুষ, কারও প্রভু নই। ফের যদি প্রভু বল তো সাড়া দেব না।

জিতেন। বুঝেছি। আচ্ছা ঠাকুর—

ভবতোষ। দেবতা আর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকেই ঠাকুর বলে। আবার রসুয়ে বামুন আর পশ্চিম অঞ্চলের নাপিতকেও ঠাকুর বলে। আমি কায়স্থসন্তান, ঠাকুর হতে পারি না।

হাত জোড় করে জিতেন বললে, প্রভু, কায়স্থরা তো ক্ষত্রিয়, জনক আর শ্রীকৃষ্ণের স্বজাতি। তাঁদের মতন আপনিও তত্ত্বকথা বলে থাকেন, আপনার ব্রাহ্মণ ভক্তও অনেক আছে। দয়া করে যদি পইতেটি নিয়ে ফেলেন আর মাথায় একটি শিখা রাখেন তবে আর সংকোচের কারণ থাকবে না।

ভাবতোষ। দেখ জিতেন, হাজার বছর আগে হয়তো আমার পূর্বপুরুষরা পইতে ধারণ করতেন, কিন্তু পরে ব্রাহ্মণদের আজ্ঞায় তাঁরা ত্যাগ করেছিলেন। আমার ঠাকুরদার কাছে তাঁর ঠাকুরদার বর্ণনা শুনেছি—পরনে খাটো ধুতি, গায়ে মেরজাই, কাঁধে কোঁচানো চাদর, পায়ে নাগরা, মাথায় টিকি, কপালে ফোঁটা, আর মুখে ফারসী বুলি। আমার ঠাকুরদা অতি বুদ্ধিমান ছিলেন, মুরগি খেতে শিখে টিকি ফোঁটা আর ফারসী তিনটেই ত্যাগ করেন।

জিতেন । পাদরীদের পাল্লায় পড়েছিলেন বুঝি?

ভবতোষ। কারও পাল্লায় পড়বার লোক তিনি ছিলেন না।

বিধু বললে, ওহে জিতেন, ইনি পইতে আর টিকি নাই বা ধারণ করলেন, পুরুত ঠাকুর সাজলে এঁর মহত্ত্ব কিছুমাত্র বাড়বে না। আমি বলি কি, ইনি দাড়ি রাখুন, চুল বাড়তে দিন, গেরুয়া কাপড় পরুন, আর গোটা কতক মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিন। সাধু মহাত্মার এই হল লক্ষণ।

ভবতোষ মাথা নাড়লেন।

বিধু। আচ্ছা, দাড়ি জটা রুদ্রাক্ষ না হয় বাদ দিলেন। গোঁফটা কামিয়ে ফেলুন, গেরুয়া সিল্কের ধুতি পাঞ্জাবি পরুন, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি বাঁধুন, কিংবা কানঢাকা টুপি পরুন। তত্ত্বদর্শী স্বামী মহারাজদের বেশ ধারণ করুন।

ভবতোষ। আমি সাধু মহাত্মা নই, তত্ত্বদর্শীও নই। আমার সাজ যা আছে তাই থাকবে।

জিতেন। এবারে বুঝেছি। মুক্তপুরুষদের পইতে টিকি জটা গেরুয়া রুদ্রাক্ষ কিছুই দরকার হয় না। কিন্তু আপনাকে তো নাম ধরে ডাকা চলবে না। সবাই আপনাকে ঠাকুর বলে, আমরাও তাই বলব। দোহাই, এতে আপত্তি করবেন না। বলছিলুম কি—আপনি তো জীবন্মুক্ত পুরুষ, গৃহে বাস করলেও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, আপনার মুখের একটু কথা শোনবার জন্যে জজ ব্যারিস্টার ডাক্তার প্রফেসার মেয়ে পুরুষ সবাই লালায়িত। সবাই জানতে চায়—ইনি কি ব্রহ্মজ্ঞানী পণ্ডিত, না যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ? পরমহংস, না শুধুই পরম ভক্ত? ভগবানের অংশাবতার, না ষোল আনা ভগবান? কি বলব ঠাকুর?

ভবতোষ। বলবে, ইনি একজন রিটায়ার্ড সাবডেপুটি।

এই সময় ভবতোষের বাল্যবন্ধু নিখিল বাঁড়ুজ্যে এলেন। বললেন, কি হে ভবতোষ, কি রকম চলছে? বিস্তর ভক্ত জুটিয়েছ শুনছি, সুবিধে কিছু করতে পারলে?

ভবতোষ। নাঃ। যদি কোথাও একটা নিরিবিলি গুহা পাই তো পালিয়ে গিয়ে সেখানে ঢুকব।

নিখিল। পালাবে কেন? রামকৃষ্ণদেব তো ভক্তপরিবৃত হয়ে সুখে বাস করতেন।

ভবতোষ। তিনি পরমহংস ছিলেন, তাঁর মত ধৈর্য কোথায় পাব। তবে তিনিও মাঝে মাঝে উত্যক্ত হয়ে শালা বলে ফেলতেন।

জিতেন। নির্জন আশ্রমের অভাব কি ঠাকুর? আপনি একবারটি হাঁ বলুন, আপনার ভক্তরা বরানগরে বা কাশীতে বা রাঁচিতে চমৎকার আশ্রম বানিয়ে দেবে।

নিখিল। রাজী হয়ে যাও হে, তিন জায়গাতেই আশ্রম করাও। দু-চারটে গেস্ট রুম রেখো, আমরাও মাঝে মাঝে গিয়ে থাকব। এমন সুবিধে ছেড়ো না ভবতোষ।

জিতেন। দেখুন নিখিলবাবু, আপনি ঠাকুরকে নাম ধরে ডাকবেন না, তুমি বলবেন না, তাতে আমরা বড় ব্যথা পাই।

নিখিল। বেশ বেশ, আমিও এখন থেকে ঠাকুর আর আপনি বলব। কিন্তু যখন আর কেউ থাকবে না তখন নাম ধরেই ডাকব। কি বলেন?

ভবতোষ। হাঁ হাঁ।

প্রাতঃকালীন ভক্তসমাগম কি রকম হয়েছে দেখবার জন্য জিতেন আর বিধু নীচে নেমে গেল।

নিখিল বললেন, আচ্ছা ভবতোষ, তুমি তো বলতে যে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ, লোকসংগ্রহ অর্থাৎ লোকচরিত্রের উন্নতি সাধনই শ্রেষ্ঠ কর্ম। তবে এখন নির্জনে থাকতে চাচ্ছ কেন? শুধু নিজের মুক্তির জন্যে লুকিয়ে তপস্যা, আর নিজের পেট ভরাবার জন্যে লুকিয়ে খাওয়া, দুটোই তো স্বার্থপরতা।

ভবতোষ। আমি অক্ষম দুর্বল, বক্তৃতা দিতে পারি না, ধর্মপ্রচার করতে পারি

না, কীর্তন গাওয়া আসে না, লোকশিক্ষার পদ্ধতিও জানি না। বুদ্ধ যিশু শংকর চৈতন্য রামমোহন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গান্ধী—এঁদের শক্তির কণামাত্র আমার নেই, তাই শুধু আত্মচিন্তা করি। কেউ যদি আমার কাছে কিছু জানতে চায় তো যথাবুদ্ধি বলি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সত্য কথা শুনতে কেউ চায় না, সবাই স্বার্থসিদ্ধির সোজা উপায় বা অলৌকিক শক্তি খোঁজে।

জিতেন ফিরে এসে বললে, ঠাকুর, আজ বেশী লোক আসে নি, সবাই ভোট দিতে গেছে কিনা। চার-পাঁচ জন লোক নীচে দর্শনের জন্যে অপেক্ষা করছে।

নিখিল। কি রকম লোক জিতেনবাবু?

জিতেন। সেই গীতায় যেমন চতুর্বিধা ভজন্তে মাং আছে—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, আর জ্ঞানী।

ভবতোষ। জ্ঞানীদের চলে যেতে বল, তাদের যখন জ্ঞান আছেই তবে আবার এখানে কেন। অর্থার্থীদেরও বলে দাও আমার অর্থ দেবার সামর্থ্য নেই। আর যারা এসেছে একে একে পাঠিয়ে দাও।

জিতেন বেরিয়ে গেলে নিখিল প্রশ্ন করলেন, একে একে পাঠাতে বললে কেন? ও তো বিলাতী কায়দায় ইন্টারভিউ। ভক্তের দল মহাপুরুষকে সর্বদা ঘিরে থাকবে এই তো চিরকেলে দস্তুর।

ভবতোষ। যারা দেখা করতে আসে তাদের সকলের মতিগতি তো সমান নয়, যে যেমন তাকে সেই রকম উত্তর দিতে হয়। বুদ্ধি-ভেদ করতে গীতায় নিষেধ আছে।

প্রথমে এলেন মাধব ধর। ইনি একজন জিজ্ঞাসু। ধর মশায় ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে করজোড়ে বললেন, ঠাকুর, আপনার কৃপায় আমার অভাব কিছু নেই, ব্যবসা ভালই চলছে, বাড়ির সবাই ভালই আছে। শুধু একটা সমস্যা সমাধানের জন্যে আপনার কাছে এসেছি।

ভবতোষ। আপনার অভাব কিছু নেই শুনে বড় আনন্দ হল ধর মশায়, আপনি ভাগ্যবান লোক। আপনার সমস্যাটি কি তা বলুন।

মাধব। হেঁ হেঁ, আমাকে মশায় বলবেন না, আমি আপনার দাসানুদাস। সমস্যাটা হচ্ছে—ঠিকুজিতে আমার পরমাই লেখা আছে পঁচানব্বই বছর, এখন সবে ষাট চলছে। কিন্তু সেদিন তারাদাস জ্যোতিষী হাত দেখে বললেন, পঁচাত্তরেই মৃত্যুযোগ। ধরুন যদি পঁচাত্তরেই মারা যাই তবে বাকী বিশ বছরের কি হবে? কোষ্ঠী আর কররেখা কোনওটা তো মিথ্যে হতে পারে না।

ভবতোষ। ওহে নিখিল, তুমি তো একজন বড় অ্যাকাউন্টান্ট, ধর মশায়ের প্রশ্নটির জবাব তুমিই দাও।

নিখিল। নিশ্চিন্ত থাকুন ধর মশায়, বাকী বিশ বছর পরজন্মে ক্যারেড ফরোআর্ড হবে। প্রিভিলেজ লীভ আর পরমায়ু পচে যায় না।

ধর মশায় ভাবতে ভাবতে প্রস্থান করলেন। শ্রীপতি রায় ঘরে এলেন।

ভবতোষ। আসুন শ্রীপতিবাবু। আজ আবার কি মনে করে? আমি নিতান্ত অকিঞ্চন তা তো সেদিন বলেই দিয়েছি। আমার কাছে কিছু প্রত্যাশা করবেন না।

শ্রীপতি। হেঁ হেঁ, আমাকে শ্রীপতিবাবু বলবেন না, শুধু শ্রীপতি বা ছিরু।

বয়সে আপনার চাইতে কিছু বড় হলেও আমি আপনার দাসানুদাস। বড় দুর্ভাবনায় পড়ে আপনার কাছে এসেছি।

ভবতোষ। বলে ফেলুন।

শ্রীপতি। আপনার আশীর্বাদে আমার সাত ছেলে, তিন মেয়ে, তা ছাড়া গিন্নী আছেন। আমার বয়স পঁয়ষট্টি হল, ব্লাড প্রেশার ডায়াবিটিস বাত সবই আছে, কোন দিন মরব কিছুই ঠিক নেই। গিন্নীর বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই, সাত ছেলের একটাও মানুষ হল না, তিনটে মেয়ে প্রেম করতে গিয়ে তিন ব্যাটা ওআর্থলেস বর জুটিয়েছে। তাই এমন ব্যবস্থা করে দিতে চাই যাতে আমার অবর্তমানে এদের কোনও অভাব না থাকে।

ভবতোষ। আপনার ভাবনা কি, শুনতে পাই আপনি কোটিপতি। অ্যাটর্নিকে বলুন, তিনিই ব্যবস্থা করে দেবেন।

শ্রীপতি। কি জানেন, সাত ছেলের প্রত্যেককে দশ লাখ দিতে চাই, তিন মেয়ে আর গিন্নীকে সাত সাত লাখ। তার কমে এই মাগ্‌গি গণ্ডার দিনে চলতেই পারে না। তা ছাড়া মানত করেছি আপনার জন্যে একটি ভাল আশ্রম আর দেবমন্দির বানিয়ে দেব, তাতেও লাখ দুই লাগবে। একুনে দরকার এক ক্রোর, কিন্তু আমার পুঁজি মোটে পঁচাশি লাখ। আর পনরো লাখ না হলে চলবে না, তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

ভবতোষ। আপনি বিচক্ষণ ব্যবসায়ী হয়েও বিশ্বাস করেন আমি আপনাকে পনরো লাখ পাইয়ে দিতে পারি?

শ্রীপতি। বিশ্বাস করি বই কি ঠাকুর। আমার ব্যবসা-বুদ্ধিতে যা হয় না আপনার দৈব শক্তিতে তা নিশ্চয় হবে।

ভবতোষ পিছন ফিরে চোখ বুজে অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। শ্রীপতি বললেন, কি মুশকিল, ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন দেখছি। আমার আবার তাড়া আছে, দলবল নিয়ে পোলিং স্টেশনে যেতে হবে। আচ্ছা নিখিলবাবু, আপনি তো ঠাকুরের অন্তরঙ্গ, শ্রীগৌরাঙ্গের যেমন নিত্যানন্দ। আপনিই দয়া করে আমার জন্যে ঠাকুরকে একটু ধরুন না।

নিখিল। দেখুন মশায়, কেউ যখন বড় ডাক্তারকে কনসল্ট করতে আসে তখন প্রথমেই জানায় আগে কি রকম চিকিৎসা হয়েছিল, কোন্ কোন্ ডাক্তার দেখেছিল, কি কি ওষুধ খেয়েছিল। আগে আপনার কেস হিস্টরি অর্থাৎ পূর্বের ক্রিয়াকলাপ খোলসা করে জানাতে হবে। কালোবাজার, পারমিট, কনট্রাক্ট, চাল চিনি কাপড় সরবরাহ, ভেজাল ঘি তেল ওষুধের ব্যবসা—এসব চেষ্টা করে দেখেছেন কি?

শ্রীপতি। সবই দেখেছি দাদা, কিন্তু তেমন সুবিধে করতে পারি নি। হাজার হোক আমি বাঙালীর সন্তান, ধর্মজ্ঞান আছে, কালচার আছে, টুপি-পাগড়িধারীদের মতন বেপরোয়া ব্যবসাবুদ্ধি নেই।

নিখিল। ফটকা বাজার, লটারি, রেস—এসব চেষ্টা করে দেখেছেন?

শ্রীপতি। ওসবেও কিছু হয় নি। তিনজন রাজজ্যোতিষীর কাছে টিপ্‌স নিয়েছি, শনিমন্দিরে পুজো দিয়েছি, বগলামুখী কবচ আর ধূমাবতী মাদুলি ধারণ করেছি, রক্তমুখী নীলার আংটিও পরেছি। কিছুই হল না, শুধু বিস্তর টাকা গচ্চা গেল। সব ব্যাটা ঠক জোচ্চোর।

নিখিল। তাই তো রায় মশায়, কিছুই বাকী রাখেন নি দেখছি। আচ্ছা, সোনা করবার চেষ্টা করেছেন?

শ্রীপতি রায় সোৎসাহে বললেন, এইবার কাজের কথা বলেছেন নিখিলবাবু। ঠাকুর জানেন নাকি সোনা করতে?

নিখিল। ঠাকুর সবই জানেন, কিন্তু কিছু করবেন না। পরমহংসদেবের মতন ইনিও বলেন—টাকা মাটি, মাটি টাকা। সোনা তৈরী হল বিজ্ঞানীর কাজ, পরমাণু চুরমার করে আবার গড়তে হয়। আপনি ডক্টর বাঞ্ছারাম মহাপাত্রকে ধরুন। তিনি আমেরিকা থেকে সোনা তৈরি শিখে এসেছেন, কিন্তু ল্যাবরেটরির অভাবে কিছু করতে পারছেন না। আপনি লাখ পাঁচ-ছয় খরচ করে ল্যাবরেটরি বানিয়ে দিন, তিনি আপনার বাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

শ্রীপতি। তিনি কিছু সোনা করে নিলেই তো তাঁর টাকার যোগাড় হয়।

নিখিল। আপনি যে উলটো কথা বলছেন মশায়। আগে গরু তার পর দুধ, আগে ল্যাবরেটরি তবে তো সোনা।

শ্রীপতি রেগে গিয়ে বললেন, ও-সব ধাপ্পাবাজিতে ভোলবার লোক আমি নই। আপনাদের সেরেফ বুজরুকি।

নিখিল। ঠিক ধরেছেন শ্রীপতিবাবু। আচ্ছা, এখন আসুন, নমস্কার।

জিতেন আর বিধুর সঙ্গে অজয় ঘোষাল আর তার স্ত্রী সুভদ্রা এল, দুজনেরই বয়স কম। এরা পাশের বাড়িতে থাকে। ভবতোষের পায়ের উপর আছড়ে পড়ে সুভদ্রা বললে, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনুন বাবা, তাকে হারিয়ে আমি কি করে বাঁচব?

বিধু চুপিচুপি ভবতোষকে বললে, এঁদের একমাত্র ছেলেটি টাইফয়েডে ভুগে কাল মারা গেছে।

ভবতোষ বললেন, স্থির হয়ে ব'স মা, আমার পা ছাড়। চোখে মুখে একটু জল দাও,—বিধু, শিগগির একটু জল আন। আগে একটু শান্ত হও, নইলে আমার কথা বুঝতে পারবে কেন।

সুভদ্রা। আমার তিন বছরের খোকা, পদ্মফুলের মতন ছেলে, কোথায় গেল বাবা?

ভবতোষ। মা, তোমার নিষ্পাপ খোকা ভগবানের কোলে সুখে আছে। স্বর্গে গিয়ে কিংবা পরজন্মে তুমি তাকে ফিরে পাবে।

সুভদ্রা। ভগবান কেন তাকে নিলেন? তার খেলনা যে চারদিকে ছড়ানো রয়েছে, তার হাসি কান্না আবদার কি করে ভুলব বাবা, এই শোক কি করে সইব?

ভবতোষ। মহা মহা দুঃখও ক্রমশ সয়ে যায়, তুমিও সইতে পারবে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন—একথা বিশ্বাস কর তো?

সুভদ্রা। না বাবা, করি না। এই সর্বনাশ করে ভগবান আমার কি মঙ্গল করলেন? এত সব বুড়ো বুড়ী রয়েছে, তাদের ছেড়ে আমার খোকাকে নিলেন কেন?

ভবতোষ। ভগবান কেন কি করেন তা বোঝা তো আমাদের সাধ্য নয়। পূর্বজন্মের কর্মফলে লোকে ইহজন্মে সুখ দুঃখ ভোগ করে—একথা বিশ্বাস কর তো?

সুভদ্রা। পূর্বজন্মের কথা জানি না বাবা। কার পাপের ফলে আমার খোকা অকালে গেল? তার নিজের পাপ, না তার বাপের, না আমার? দয়াময় ভগবান

আমাদের পাপ করতে দিয়েছিলেন কেন? ঢের বড় বড় পাপীকে তো তিনি সুখে রেখেছেন।

ভবতোষ। মা, এখন তুমি বড় ব্যাকুল হয়ে আছ, পাপ পুণ্য কর্মফল এসব কথা এখন থাক, আগে তুমি একটু স্থির হও। তোমার মনে ভক্তি আছে?

সুভদ্রা। ভক্তি তো ছিল বাবা, এখন যে হতাশ হয়ে গেছি। যিনি আমার ছেলেকে কেড়ে নিলেন তাঁকে কি করে ভক্তি করব?

ভবতোষ। আচ্ছা, সে কথা পরে হবে, এখন শুধু মন শান্ত কর। যত পার জপ কর, স্তব পাঠ কর।

সুভদ্রা। কি জপ করব, কি স্তব করব, বলে দিন বাবা।

ভবতোষ। যা তোমার ভাল লাগে—হরিনাম, শিবনাম, দুর্গানাম, সত্যং শিব-সুন্দরম্। এই স্তবমালা বইখানি নিয়ে যাও, যে স্তব তোমার পছন্দ হয় আবৃত্তি ক'রো। ভগবানকে ব'লো—'দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা, দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।'

সুভদ্রা। আবার কবে আসব বাবা?

ভবতোষ। তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব।

সুভদ্রার ছোট ভাই বাইরে অপেক্ষা করছিল, সে তার দিদিকে নিয়ে চলে গেল। সুভদ্রা স্বামী অজয় বললে, আমার ব্যবস্থা কি করবেন ঠাকুর?

ভবতোষ। তোমার স্ত্রী আর তোমার একই ব্যবস্থা। তুমি পুরুষ মানুষ, সহজেই শোক দমন করতে পারবে, স্ত্রীকেও সান্ত্বনা দেবে। ওঁকে নিয়ে দিনকতক তীর্থভ্রমণ করে এস।

অজয়। ঠাকুর, এত শোকের মধ্যেও আপনার কাছে স্বীকার করছি—আমি বড় অবিশ্বাসী, দয়াময় ভগবানে আমার আস্থা নেই। সুভদ্রাকে যা বললেন, তাতে আমি শান্তি পাব না।

নিখিল। আপনাদের কথার মধ্যে আমি কথা বলছি, অপরাধ নেবেন না ঠাকুর। এই অজয়কে আমি খুব জানি, এর অহেতুকী ভক্তি হবে এমন মনে হয় না। কর্মফল, জন্মান্তর, পরলোকে পুনর্মিলন, মঙ্গলময় ঈশ্বর—ইত্যাদি মামুলী প্রবোধবাক্যে অজয় সান্ত্বনা পাবে না। তোতা পাখির মতন স্তবপাঠেও এর কিছু হবে না।

ভবতোষ। দু-চার দিন যাক, এরা দুজনে একটু শান্ত হক, তারপর আমি যথাসাধ্য প্রবোধ দেবার চেষ্টা করব।

নিখিল। ঠাকুর, আর একটা কথা নিবেদন করি। অজয়ের স্ত্রী বড়ই কাতর হয়েছে। সে যদি একটি বালগোপালের মূর্তি গড়িয়ে তার সেবা করে, তবে কেমন হয়? সন্তানহারা অনেক স্ত্রী এতে ভুলে থাকে দেখেছি। তাদের ধারণা হয়, শিশুকৃষ্ণের সেই বিগ্রহেই নিজের সন্তান লীন হয়ে আছে।

অজয়। না না নিখিলবাবু, ওসব চলবে না। সুভদ্রার আবার সন্তান হতে পারে, এখনকার শোকও ক্রমশ কমে যাবে, তখন ওই বালগোপাল একটি বোঝা হয়ে পড়বেন, লোকলজ্জায় তাঁকে ফেলাও চলবে না। যন্ত্রণা কমাবার জন্য এক-আধবার মরফীন দেওয়া চলে, কিন্তু একটি মানুষকে চিরকাল নেশাখোর করে রাখা কি উচিত?

ভবতোষ। অজয়ের কথা খুব ঠিক। নিখিল যা বললে তা ক্ষেত্রবিশেষে চলতে পারে, যেখানে শোক সইবার শক্তি নেই, যুক্তি বোঝবার মতন বুদ্ধি নেই, অন্য

সন্তানের সম্ভাবনাও নেই। সুভদ্রার ওপর কোন ভার চাপানো উচিত নয়। এখন তাকে নানা রকমে অন্যমনস্ক আর প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করতে হবে।

নিখিল। আচ্ছা, অজয়ের স্ত্রী যদি মন্ত্র নিয়ে পুজোঅর্চায় মগ্ন থাকে তো কেমন হয়?

অজয়। তাতেও আমার আপত্তি আছে। সেদিন এক বনেদী বড়লোকের বাড়ি গিয়েছিলাম। তাঁর বৈঠকখানায় তিনটি বড় বড় অয়েল পেণ্টিং আছে, প্রত্যেকটিতে একজন মহিলা সেজেগুজে আসনে বসে পুজো করছেন। সামনে সোনারুপোর হরেক রকম পুজোর বাসন ঝকমক করছে, নানা উপচার সাজানো রয়েছে, সন্দেশের ওপর পেস্তাটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। তাঁদের দৃষ্টি বিগ্রহের দিকে নয়, আগন্তুকের দিকে। যেন বলছেন, সবাই দেখ গো, আমরা পুজো করছি। খোঁজ নিয়ে জানলাম, একটি ছবি গৃহস্বামীর স্ত্রীর, আর দুটি তাঁর স্বর্গতা মা আর ঠাকুরমার। এঁদের পুজো একটা উপলক্ষ্য মাত্র, আসল উদ্দেশ্য আড়ম্বর, যেমন আজকালকার সর্বজনীন।

ভবতোষ। সকলেই লোক দেখানো পুজো করে না। সুভদ্রার যদি নিজের আগ্রহ হয় তবে সে মন্ত্র নিয়ে পুজো করুক, কিংবা বিনা আড়ম্বরে উপাসনা করুক, কিন্তু তার জন্যে তাকে হুকুম করা চলবে না। হুজুক থেকেও তাকে বাঁচাতে হবে। কালক্রমে অনেকের নিষ্ঠা কমে যায়, তবু তারা চক্ষুলজ্জায় ঠাট বজায় রাখে। আমি একজনকে জানতুম তিনি অহিংসার ব্রত নিয়ে নিরামিষাশী হয়েছিলেন। সাধুপুরুষ বলে তাঁর খ্যাতি হল। কিন্তু তিনি লোভ দমন করতে পারেন নি, একদিন হোটেলে লুকিয়ে খেতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন। নিখাকী মায়েরা বোধ হয় পুণ্যকর্ম ভেবেই উপবাস আরম্ভ করে, কিন্তু লোকেরা বাহবা শুনে শুনে তাদের কুবুদ্ধি হয়, শেষটায় প্রতারণার আশ্রয় নেয়। ভক্তি বা নিষ্ঠার অভাব, সন্ধ্যা-আহ্নিক পুজো-অর্চনা না করা, আমিষ ভোজন, কোনওটাই অপরাধ নয়। অনুষ্ঠানহীন নাস্তিক-দের মধ্যেও সাধুপুরুষ আছেন। যার ভাল লাগে, সে চিরজীবন একনিষ্ঠ হয়ে অনুষ্ঠান পালন করতে পারে। যদি ভাল না লাগে, তবে যেদিন খুশি ছেড়ে দিলেও কিছুমাত্র দোষ হয় না। কিন্তু নিষ্ঠা হারিয়ে লোক দেখানো অনুষ্ঠান পালন মহাপাপ। সুভদ্রাকে শান্ত করতে হবে, কিন্তু কোনও রকম বন্ধনে পড়ে তার বুদ্ধি যেন মোহগ্রস্ত না হয়।

অজয়। তবে তাকে জপ আর স্তব করতে বললেন কেন? ইংরিজী প্রবাদ আছে—ঘুম যদি না আসে, তবে ভেড়া গুনতে থাক। জপ আর স্তব করে মনে শান্তি আনাও সেইরকম নয় কি?

ভবতোষ। সেইরকম হলেই বা ক্ষতি কি। ওতে মন শান্ত হবার সম্ভাবনা আছে অথচ বাহ্য আড়ম্বর নেই। নিষ্ঠা না হলে বিনা চক্ষুলজ্জায় যেদিন ইচ্ছে ছেড়ে দেওয়া চলে।

অজয়। আপনি সুভদ্রাকে স্বর্গ পুনর্জন্ম কর্মফল মঙ্গলময় ভগবান—এইসব ছেলে ভুলনো কথা বললেন কেন ঠাকুর? আপনিও কি আধ্যাত্মিক মুষ্টিযোগে বিশ্বাস করেন?

ভবতোষ। দেখ অজয়, তুমি বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী যাই হও, একথা মান তো —তুমি আছ, আবার তোমার চাইতে বড়ও একটা কিছু আছে? সেই বড়কে বিশ্ব-প্রকৃতি, ব্রহ্ম, অ্যাবসলিউট, মহা অজানা, যা খুশি বলতে পার। সেই বৃহৎ বস্তুর মধ্যে তুমি ডুবে আছ, তা থেকেই তোমার জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ ভালমন্দর উৎপত্তি।

এই বস্তু কি রকম তা সাধারণ মানুষের জ্ঞানের অতীত, অথচ আমাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। বিজ্ঞানী দার্শনিক কবি আর ভক্ত সবাই কৌতূহলী, কিন্তু কেউ স্পষ্ট বুঝতে পারেন না। বিজ্ঞানী আর দার্শনিক শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর যুক্তিসিদ্ধ তথ্য খোঁজেন, যেটুকু জানতে পারেন তাতেই তুষ্ট হন, শিব বা অশিব, সুন্দর বা বীভৎস কিছুতেই তাঁদের পক্ষপাত নেই। কিন্তু কবি আর ভক্ত প্রমাণের অপেক্ষা রাখেন না, তাঁরা রস চান, ভাব চান, আনন্দ চান। এজন্য কল্পনা আর রূপকের আশ্রয় নিয়ে মানস বিগ্রহ রচনা করেন, সমগ্র বস্তুর ধারণা করতে না পারলেও খণ্ডে খণ্ডে অনুভব করেন, তবে দৈবাৎ কেউ কেউ পূর্ণানুভূতি পান। মিল্টন আর মধুসূদন পেগান ছিলেন না, তবু তাঁরা অমৃতভাষিণী বাগ্‌দেবীর আবাহন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশ আর দেশবাসীর ত্রুটি বিলক্ষণ জানতেন, তবু তাঁরা ঐশ্বর্যময়ী মাতৃভূমির বন্দনা করেছেন। Wordsworth বলেছেন—Great God ! I would rather be a pagan, suckled in a creed outworn...ইত্যাদি। মঙ্গলময় ভগবান না হলে সাধারণ ভক্তের চলে না, কাজেই অমঙ্গলের কারণস্বরূপ তাকে কর্মফল, জন্মান্তর, অরিজিনাল সিন, ফ্রি উইল, শয়তান, কলি ইত্যাদি মানতে হয়। ভক্ত কবি অমঙ্গলের কারণ খোঁজেন না, যেটুকু মঙ্গল পান তাতেই কৃতার্থ হন। তিনি দেখেন—'আছে আছে প্রেম ধূলায় ধূলায়, আনন্দ আছে নিখিলে।' তিনি বলেন—'এ জীবনে পাওয়াটাই সীমাহীন মূল্য, মরণে হারানোটা তো নহে তার তুল্য।'

অজয়। আমার উপায় কি হবে ঠাকুর? আমি বিজ্ঞানী নই, দার্শনিক নই, কবি নই, ভক্ত নই, কোনও রকম make-believeএও রুচি নেই।

ভবতোষ। মাথা ঠাণ্ডা করে বুদ্ধি খাটাও, বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ। এদেশের জ্ঞানীরা একদেশদর্শী নন, তাঁরা অত্যন্ত realist, মঙ্গল অমঙ্গল দুই শিরোধার্য করেছেন, বিরোধ মেটাবার প্রয়োজনই বোধ করেন নি। বলেছেন—ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং; আবার পরেই বলেছেন—গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্। জগতে নিত্য কত লোক মরছে, প্রতি নিমেষে কোটি কোটি জীব ধ্বংস হচ্ছে, কত লোকের সর্বনাশ হচ্ছে, তা দেখেও আমরা বিধাতার দোষ দিই না, অমঙ্গলের কারণ খুঁজি না, জগতের বিধান বলেই মেনে নিয়ে স্বচ্ছন্দে হেসে খেলে বেড়াই। কিন্তু যেমনি নিজে আঘাত পাই অমনি আর্তনাদ করে বলি—ভগবান, একি করলে, আমাকে মারলে কেন? গীতায় বিশ্বরূপের যে বর্ণনা আছে, তা ভয়ংকর, কিন্তু তা ধ্যান করলে মনের ক্ষুদ্রতা কমে। দার্শনিক Santayana লিখেছেন,—The truth is cruel, but it can be loved, and it makes free those who have loved it.

অজয়। আপনার কথা ভাল বুঝতে পারছি না ঠাকুর।

ভবতোষ। ক্রমশ বুঝতে পারবে। সকলের দুঃখ বোঝবার চেষ্টা কর, তোমার দুঃখ কমবে; সকলের সুখে সুখী হও, তোমার সুখ বাড়বে।

অজয় চলে গেল। একটু পরে নিখিল বিদায় নিলেন, তাঁর পিছনে জিতেন আর বিধুও নীচে নেমে এল।

নিখিল বললেন, কি হল জিতেনবাবু, আপনারা বড্ড যেন মুষড়ে গেছেন মনে হচ্ছে।

জিতেন। আরে ছি ছি, এমন করলে কি প্রতিষ্ঠা হয়, না মানুষের শ্রদ্ধা পাওয়া যায়? প্রেম, ভক্তি, ভগবানের লীলা এই সবের ব্যাখ্যান করতে হয়, কর্মফল জন্মান্তর পরলোকতত্ত্ব বোঝাতে হয়, কিছু কিছু বিভূতি আর দৈবশক্তি দেখাতে হয়, মিষ্টি মিষ্টি বচন বলতে হয়, তবে না ভক্তরা খুশী হবে। চেতলার গোলক ঠাকুর সেদিন কি সুন্দর একটা কথা বললেন 'মানুষ কি রকম জানিস? মাছির মা আর ফানুসের -নুষ। তোরা মাছির মতন আঁস্তাকুড়ে ভনভন করবি, না ফানুষ হয়ে ওপরে উঠবি?' কথাটি শুনে সবাই মোহিত হয়ে গেল। আর আমাদের ঠাকুরটির শুধু কটমটে আবোল-তাবোল বাক্যি, যেন জিয়মেট্রি পড়াচ্ছেন। শ্রীপতি রায় ভীষণ রেগে গেছেন, ঠাকুর তাঁকে গ্রাহ্যই করলেন না। তিনি ধনী মানী লোক, ক্যাডিলাক গাড়িতে এসেছিলেন, তাঁর অপমান করা কি উচিত হয়েছে? আমরা যতই ঠাকুরকে উঁচুতে তোলবার চেষ্টা করছি ততই উনি নেমে যাচ্ছেন।

নিখিল। যা বলেছেন। দেখুন জিতেনবাবু, সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের লেখায় একটি ফারসী বয়েতে পড়েছি, তার মানে হচ্ছে—পীর ওড়েন না, তাঁর চেলারাই তাঁকে ওড়ান। ভবতোষ ঠাকুরকে ওড়াবার জন্যে আপনারা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, কিন্তু উনি মাটি কামড়ে আছেন, কিছুতেই উড়বেন না। ওঁর আশা ছেড়ে দিন।

জিতেন। এর চাইতে উনি যদি মৌনী হয়ে থাকতেন কিংবা হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করতেন, তাও ভাল হত। আমাদের মাঠাকরুনটি অতি বুদ্ধিমতী, তাঁকে ঠাকুরের প্রতিনিধি করে আমরা একটি চমৎকার সংঘ খাড়া করতে পারতুম।

# নীল তারা
## ইত্যাদি গল্প

# নীল তারা

ষাট বৎসর আগেকার কথা, কুইন ভিক্টোরিয়ার আমল। তখন কলকাতায় বিজলী বাতি, মোটর গাড়ি, রেডিও, লাউড স্পীকার ছিল না, আকাশে এয়ারোপ্লেন উড়ত না, রবীন্দ্রনাথ প্রখ্যাত হন নি, লোকে হেমচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ কবি বলত। কিন্তু রাখাল মাস্টার মনে করত সে আরও উঁচু দরের কবি, হতাশের আক্ষেপের চাইতেও ভাল কবিতা লিখতে পারে। সে তার অনুগত ছাত্র নারানকে বলত, আজ কি একখানা লিখছি শুনবি?—ক্ষিপ্ত বায়ু ধূলি মাখে গায়। আর একটা শুনবি?—শুষ্ক বৃক্ষে ঝটিকার প্রভাব কোথায়। আর কেউ পারে এমন লিখতে?

রাখাল মুস্তৌফী শুধু এনট্রান্স পাস, কিন্তু বিদ্বান লোক, বিস্তর বাংলা ইংরেজী বই পড়েছিল। সেকালে বেশী পাস না করলেও মাস্টারি করা চলত। কবিতা রচনা ছাড়া গান বাজনা আর দাবা খেলাতেও তার শখ ছিল। প্রথম বয়সে রাখাল বেহালা জুবিলি হাইস্কুলে থার্ড মাস্টারি করত, তার পর দৈবক্রমে রূপচাঁদপুরের রাজাবাহাদুর রৌপ্যেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর সুনজরে পড়ে দু বৎসর তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করেছিল। কোনও কারণে সে চাকরি ছেড়ে তাকে চলে আসতে হয়। তার পর দশ বৎসর কেটে গেছে, এখন রাখাল বেহালায় তার পৈতৃক বাড়িতেই থাকে এবং আবার জুবিলি স্কুলে মাস্টারি করছে।

যখনকার কথা বলছি তখন রাখালের বয়স প্রায় তেত্রিশ। সুপুরুষ, কিন্তু চেহারার যত্ন নেয় না, উস্কখুস্ক চুল, দাড়ি কামায় না, তাতে একটু পাকও ধরেছে। পাড়ার লোকে বলে পাগলা মাস্টার। সেকালে লোকে অল্প বয়সে বিবাহ করত, কিন্তু রাখাল এখনও অবিবাহিত। বাড়িতে সে একাই থাকে, তার মা দু বৎসর আগে মারা গেছেন।

রবিবার, সকাল আটটা। রাখাল তার বাইরের ঘরের সামনের বারান্দায় একটা তক্তপোশে বসে হুঁকো টানছে আর কবিতা লিখছে। বাড়ি থেকে প্রায় এক শ গজ দূরে একটা আধপাকা রাস্তা এঁকে বেঁকে চলে গেছে। রাখাল দেখতে পেল, একটা ভাড়াটে ফিটন গাড়ি এসে থামল, তা থেকে দুজন সাহেব আর একজন বাঙালী নামল। গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল, আরোহীরা হন্‌হন্‌ করে রাখালের বাড়ির দিকে এগিয়ে এল।

সাহেবদের একজন লম্বা রোগা, গোঁফদাড়ি নেই, গাল একটু তোবড়া, সামনের চুল কমে যাওয়ায় কপাল প্রশস্ত দেখাচ্ছে। অন্য জন মাঝারি আকারের, দোহারা গড়ন, গোঁফ আছে, একটু খুঁড়িয়ে চলেন। তাঁদের বাঙালী সঙ্গীটি কালো, পাকাটে মজবুত গড়ন, চুল ছোট করে ছাঁটা, গোঁফের ডগা পাক দেওয়া, পরনে ধুতি আর সাদা ড্রিলের কোট। রাখাল হুঁকোটি রেখে অবাক হয়ে আগন্তুকদের দিকে চেয়ে রইল।

কাছে এসে লম্বা সাহেব হ্যাট খুলে বললেন, গুড মর্নিং সার। অন্য সাহেব হ্যাট না খুলেই বললেন, গুড মর্নিং বাবু। তাঁদের বাঙালী সংগী নীরবে রইলেন।

রাখাল সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম করে বলল, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং সার। ভেরি সরি, আমার বাড়িতে চেয়ার নেই, দয়া করে এই তক্তপোশে—এই উড্‌ন প্ল্যাটফর্মে বসুন।

লম্বা বললেন, দ্যাট্‌স অল রাইট, আমরা বসছি, আপনিও বসুন। মিস্টার রাখাল মুস্তৌফীর সঙ্গেই কি কথা বলছি?

আজ্ঞে হাঁ।

দুই সাহেব নিজের নিজের কার্ড রাখালকে দিয়ে তক্তপোশে বসলেন, রাখালও বসল। আগন্তুক বাঙালী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন, সাহেবের সঙ্গে একাসনে বসতে তিনি পারেন না।

গুঁফো সাহেব মুখের সিগারেট ফেলে দিয়ে বললেন, এই বেংগলী বাবু হচ্ছেন আমাদের দোভাষী বাঞ্ছারাম খাঞ্জা। বোধ হয় এঁর দরকার হবে না, আপনি ইংরেজী জানেন দেখছি, আমরা সরাসরি আলাপ করতে পারব। ওয়েল মুস্তৌফী বাবু, আমার এই ফেমস ফ্রেন্ডের নাম আপনি শুনেছেন বোধ হয়?

কার্ড দুটো ভাল করে পড়ে রাখাল বলল, আজ্ঞে শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না, ভেরি সরি।

—কি আশ্চর্য, আপনি তো একজন শিক্ষিত লোক, স্ট্রাণ্ড ম্যাগ্যাজিনে এঁর কথা পড়েন নি?

—পুওর ম্যান সার, স্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিন কোথা পাব? শুধু বংগবাসী জন্মভূমি আর মাঝে মাঝে হিন্দু পেট্রিয়ট পড়ি।

—ইংরেজী গল্পের বই পড়েন না?

—তা অনেক পড়েছি, স্কট ডিকেন্স লীটন জর্জ ইলিয়ট আমার পড়া আছে।

—ক্রাইম স্টোরিজ পড়েন না?

—রেনল্ড্‌সের বিস্তর নভেল পড়েছি, মায় মিস্ট্রিজ অভ দি কোর্ট অভ লণ্ডন।

—ফর শেম মুস্তৌফী বাবু। ওর বই ছুঁতে নেই, দেশদ্রোহী বজ্জাত লোক।

—তিনি কি করেছেন সার?

—সে লিখেছে, ফ্রেঞ্চ জাতি সবচেয়ে সভ্য, নেপোলিয়নের মতন গ্রেট ম্যান জন্মায় নি, আর ব্রিটিশ মন্ত্রীরা এতই অপদার্থ যে যত সব জার্মান বদমাস ধরে এনে আমাদের রাজকুমারীদের সঙ্গে বিয়ে দেয়। যাক সে কথা। তা হলে আমার এই বিখ্যাত বন্ধু সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না।

রাখাল একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলল, শুধু এইটুকু জানি, ইনি এই প্রথম এদেশে এসেছেন, কিন্তু আপনি নতুন আসেন নি।

লম্বা সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললেন, দ্যাট্‌স ফাইন! আর কি জানেন মিস্টার মুস্তৌফী?

—কাল রাত্রে আপনাদের ভাল ঘুম হয় নি।

—ভেরি ভেরি গুড! আর কি জানেন?

—আপনারা কাল লংকা খেয়েছিলেন।

—লংকা? ইউ মীন সীলোন, আইল্যাণ্ড অভ রাবণ?

—আজ্ঞে সে লংকা নয়। হিন্দী নাম মিরচাই, ইংরেজী নামটা মনে আসছে না।

রেড অ্যান্ড গ্রীন পড—হাঁ হাঁ মনে পড়েছে, চিলি, রেড পেপার, ক্যাপ্সিকম, ভেরি হট স্পাইস।

লম্বা সাহেব তাঁর বন্ধুকে বললেন, ওহে ওআটসন, দেখছ তো, সায়েন্স অভ ডিডক্শন এই বেঙ্গলী জেণ্টলম্যান ভালই জানেন। নাঃ, এদেশে শারলক হোম্সের পসার হবে না।

ওআটসন বললেন, মুস্তৌফী বাবু, আপনি কি ইয়োগা প্রাকটিস করেন?

রাখাল বলল, যোগশাস্ত্র? না, তা আমার জানা নেই। আমার বাবা কবিরাজি করতেন—ইণ্ডিয়ান সিস্টেম অভ মেডিসিন, তাঁর কাছ থেকে আমি কিছু শিখেছি। সমস্ত লক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে কারণ অনুমান করা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

ওআটসন প্রশ্ন করলেন, কাল রাত্রে আমাদের ভাল ঘুম হয় নি তা বুঝলেন কি করে?

শারলক হোম্স বললেন, এলিমেণ্টারি ওআটসন, অতি সহজ। আমাদের মুখে মশার কামড়ের দাগ রয়েছে। আমরা মশারির মধ্যে শুই নি, পাংখাপুলারও মাঝরাত্রে পালিয়েছিল। কিন্তু আর দুটো বিষয় টের পেলেন কি করে?

রাখাল বলল, খুব সহজে। আপনি এসেই টুপি খুলে আমাকে 'সার' বললেন। অভিজ্ঞ সাহেবরা সামান্য নেটিভকে এত খাতির করে না। এতে বুঝলাম আপনি এই প্রথমবার বিলাত থেকে এসেছেন। ডক্টর ওআটসন টুপি খোলেন নি, আমাকে 'বাবু' বললেন, তাতে বুঝলাম ইনি পাকা সাহেব, নতুন আসেন নি, এদেশের দস্তুর জানেন।

—লংকা খাওয়া জানলেন কি করে?

—আপনার আঙুলে তামাকের রং ধরেছে, দেখেই বোঝা যায় আপনি খুব সিগারেট সিগার বা পাইপ টানেন। ডক্টর ওআটসনের মুখে সিগারেট ছিল, কিন্তু আপনার ছিল না। আপনি মাঝে মাঝে জিবের ডগা বার করছিলেন, অর্থাৎ জিব জ্বালা করছে। অনভ্যস্ত লোকে লংকা খেলে এইরকম হয়, সিগারেট টানতে পারে না। ডক্টর ওআটসন পাকা লোক, লংকায় ওর কিছু হয় নি।

হোম্স হেসে বললেন। চমৎকার! এই ওআটসনের কথা শুনেই কাল রাত্রে হোটেলে মাল্লিগাটানি সুপ, চিকেন কারি, আর বেঙ্গল ক্লাব চাটনি খেয়েছিলাম, তিনটেই প্রচণ্ড ঝাল। আচ্ছা, আমাদের সংগী এই মিস্টার খাঞ্জা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন?

বাঞ্ছারামকে নিরীক্ষণ করে রাখাল বলল, ইনি তো পুলিসের লোক, চুলের ছাঁট, গোঁফের তা আর ড্রিলের কোট দেখলেই বোঝা যায়। তা ছাড়া থুতনির নীচে টুপির ফিতের দাগ রয়েছে।

বাঞ্ছারাম খাঞ্জা মাতৃভাষায় বললেন, হুঃ তুমি খুব চালাক লোক বট হে। আর ভি কিছু শুনাও তো দেখি?

—পশ্চিমকোটে বাড়ি। সম্প্রতি খুব মার খেয়েছিলেন, কাঁধে আর হাতে লাঠির চোট লেগেছিল। তার জড়ানো মির্জাপুরী লাঠি, তার ছাপ এখনও চামড়ার ওপর রয়েছে।

—আমার গায়ের দাগটাই দেখলে হে? শালা বলদেও পানওয়ালাকে কি পিটান পিটাঁইছি তার খবর রাখ মাস্টার?

হোম্স বললেন, মুস্তৌফী, আওয়ার ফ্রেণ্ড খাঞ্জার মুখ দেখে বুঝেছি এঁর সম্বন্ধেও আপনার অনুমান ঠিক হয়েছে। আচ্ছা, আপনি ও কি টোবাকো খাচ্ছিলেন?

ভার্জিনিয়া টার্কিশ ম্যানিলা জাভা কিউবা কইম্বাটুর প্রভৃতি তেষট্টি রকম টোবাকো আমি ধোঁয়া শুঁখেই চিনতে পারি, কিন্তু আপনারটা বুঝতে পারছি না। স্মেল্স গুড।

—এর নাম দা-কাটা তামাক, খুব সস্তা আর কড়া।

ড্যাকোটা? আমি যে শ্যাগ খাই তার চাইতে ভাল গন্ধ। কোথা পাওয়া যায়? আমি কিছু নিয়ে যেতে চাই।

—আমিই আপনাকে দু-তিন সের দিতে পারি, আমার বাড়ির তৈরি। কিন্তু পাইপে খাওয়া চলবে না, এইরকম হাবলবাবল চাই, হুক্কা কিংবা গড়গড়া। তার কায়দা আপনাকে শিখতে হবে। বিউটিফুল সায়েণ্টিফিক ইনভেনশন সার, জলের মধ্যে দিয়ে ধোঁয়া রিফাইণ্ড হয়ে আসে, জিব জ্বালা করে না।

—আপনার কাছ থেকে শিখে নেব। আচ্ছা, এখন কাজের কথা হ'ক। আমাদের আসার উদ্দেশ্য বোধ হয় বুঝেছেন?

—আপনারাও পুলিসের লোক?

—না, আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ, তবে দরকার হলে পুলিসকে সাহায্য করি বটে। আর আমার বন্ধু এই ডক্টর ওআটসন আমার সহকর্মী।

—রূপচাঁদপুরের কুমার স্বর্ণেন্দ্রনারায়ণ আপনাকে পাঠিয়েছেন তো? আগেই বলে দিচ্ছি, আমি কিছু জানি না, আমার কাছে কোনও খবর পাবেন না।

হোম্স বললেন, মিস্টার খাপ্পা, আপনার সাহায্য দরকার হবে না, আপনি ওই গাড়িতে গিয়ে বসুন।

বাঞ্ছারাম চোখ পাকিয়ে রাখালকে বললেন, ও মশায়, বেশী ফড়ফড় ক'রো না, তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, সাহেবদের কাছে যা জবানবন্দি করবে তাতে তুমিই ফাঁদে পড়বে।

বাঞ্ছারাম চলে গেলে হোম্স বললেন, মুস্তৌফী, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কিছুমাত্র অনিষ্ট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার চেষ্টার ফলে আপনার ভালই হবে।

রাখাল বলল, কুমার বাহাদুর আপনার মারফত আমাকে ঘুষ দিয়ে সন্ধান নিতে চান নাকি?

—তিনি ভাল মন্দ যে কোনও উপায়ে কার্যসিদ্ধি করতে চান, কিন্তু আমার পলিসি তা নয়। তাঁর স্বার্থ আর আপনার মঙ্গল দুইই আমি সাধন করতে চাই। আমি জানি, আপনি একজন সরলস্বভাব শিক্ষিত সৎলোক, আপনার উপর অনেক পীড়ন হয়েছে। আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনাকে কিছুই বলতে হবে না, এদেশে আসবার আগে যা শুনেছি এবং এখানে এসে অনুসন্ধান করে যা জেনেছি, সবই আমি বলে যাচ্ছি, যদি কোথাও ভুল হয়, আপনি জানাবেন।

—বেশ, আপনি বলে যান।

শার্লক হোম্স বলতে লাগলেন।—রূপচাঁদপুরের কুমারের এজেণ্ট মিস্টার গ্রিফিথ লণ্ডনে মাস খানিক আগে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বললেন, লেট রাজা রোপেণ্ডর—

রাখাল বলল, রৌপ্যেন্দ্রনারায়ণ।

—হাঁ হাঁ। ওই চোয়াল ভাঙা নামটা উচ্চারণ করা শক্ত, আমি শুধু রাজা বলব। গ্রিফিথ আমাকে যা জানিয়েছিলেন তা এই। এক বৎসর হল রাজা মারা গেছেন। দ্যাট ওলডম্যান এক স্ত্রী থাকতেই আর একটি ইয়ং গার্ল বিবাহ করেছিলেন। নূতন রানীকে খুশী করবার জন্য তিনি তাঁকে বিস্তর অলংকার দিয়েছিলেন, তার মধ্যে সব চেয়ে দামী হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড স্টার স্যাফায়ারের ব্রোচ।

রাখাল বলল, তার নাম নীল তারা, ব্লু স্টার। মহামূল্য রত্ন, যার কাছে থাকে তার অশেষ মঙ্গল হয়। রাজার এক পূর্বপুরুষ দুশ বৎসর আগে এক পোর্তুগীজ বোম্বেটের কাছ থেকে কিনেছিলেন। ও রত্নটি নাকি সীলোনের কোনও মন্দির থেকে লুট হয়েছিল।

—দ্যাটস্ রাইট। আপনি সে রত্ন দেখেছেন?

—না, শুধু শুনেছি। তার পর?

—দ্বিতীয় বিবাহের কয়েক মাস পরেই পড়ে গিয়ে রাজার পা আর কোমরের হাড় ভেঙে যায়, প্রায় আট বৎসর শয্যাশায়ী থেকে তিনি মারা যান। তার পর হঠাৎ এক-দিন নূতন রানী নিরুদ্দেশ হলেন। রাজার যিনি উত্তরাধিকারী—কুমার বাহাদুর, বিস্তর খোঁজ করেছেন, কিন্তু নীল তারা পান নি, পলাতক রানীরও কোনও খবর পান নি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে—রানী ফিরে আসুন, তিনি সসম্মানে রাজবাড়িতে নিজের মহলে থাকবেন, প্রচুর বৃত্তিও পাবেন। কিন্তু তাতে কোনও ফল হয় নি, এদেশের পুলিসও কোনও সন্ধান পায় নি। ঠিক হচ্ছে মুস্তৌফী?

—ওই রকম শুনেছি বটে। কিন্তু রাজার বিবাহের ব্যাপারটা আরও জটিল।

তা আমি জানি, সব রহস্যের আমি সমাধান করেছি। তার পর শুনুন। কুমার বাহাদুর তাঁর বিমাতার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত নন, তিনি শুধু রত্নটি উদ্ধার করতে চান। নীল তারা নূতন রানীর হাতে যাওয়ার কিছুকাল পরেই ওল্ড রাজা জখম হলেন, অনেক বৎসর কষ্টভোগ করে মারা গেলেন। তার পর নূতন রানী নিরুদ্দেশ হলেন। এস্টেটে নানারকম অমঙ্গল ঘটছে, ফসল হয় নি, খাজনা আদায় হচ্ছে না, তিনটে বড় বড় মকদ্দমায় হার হয়েছে, প্রজারা দাঙ্গা করছে, কুমার ডিসপেপসিয়ায় ভুগছেন। তাঁর বিশ্বাস, সবই নীল তারার অন্তর্ধানের ফল।

—আপনি তা মনে করেন না?

—না। নীল তারা যতই দামী হক, একটা পাথর মাত্র, অ্যালুমিনার পিণ্ড, তার শুভাশুভ কোনও প্রভাবই থাকতে পারে না। আমাদের দেশেও রত্ন সম্বন্ধে অন্ধ সংস্কার আছে। কুমারের লণ্ডন এজেণ্ট গ্রিফিথ আমাকে বলেছিলেন, নীল তারা ছোট রানীর ডাউরি বা স্ত্রীধন নয়, ও হল রাজবংশের সম্পত্তি, এয়ারলুম, পাগড়িতে পরবার অলঙ্কার। যিনি রাজা হবেন তিনিই এর অধিকারী। কুমার বাহাদুর শীঘ্র রাজা খেতাব পাবেন, সেজন্য নীল তারা তাঁরই প্রাপ্য। ছোট রানী তা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছেন।

রাখাল বলল, মিছে কথা। সমস্ত সম্পত্তি নিজের ইচ্ছামত দান বিক্রয়ের অধিকার বৃদ্ধ রাজার ছিল, তিনি ছোট রানীকে যা দিয়েছেন, তা স্ত্রীধন।

—আমি এখানকার অ্যাডভোকেট-জেনারেলের মত নিয়েছি। তিনিও মনে করেন স্ত্রীধন, তবে শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টে আর প্রিভিকাউন্সিলের বিচারে কি দাঁড়াবে বলা যায় না। যাই হক, নীল তারা উদ্ধারের জন্য কুমার বাহাদুর আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

—কুমার আমার কাছেও লোক পাঠিয়েছিলেন, ভয়ও দেখিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস আমি ছোট রানীর সন্ধান জানি। আপনি এদেশে এসে কিছু জানতে পেরেছেন?

—আমি এসেই রূপচাঁদপুর গিয়েছিলাম। সেখানে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আমাদের লেট ল্যামেণ্টেড রাজা বাহাদুর একটি স্কাউনড্রেল ছিলেন, যেমন লম্পট তেমনি নেশাখোর, আর ঘোর অত্যাচারী। দশ বৎসর আগে তাঁর এস্টেটে রামকালী রায় নামে একজন কাজ করতেন। তাঁর সন্তান ছিল না, সাবিত্রী নামে একটি অনাথা ভাগনীকে পালন করতেন। মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী, তখন তার বয়স আন্দাজ ষোল। রূপচাঁদপুরেরই ভাল পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয়েছিল। পাত্র আর পাত্রীর পরিবারের মধ্যে একটা দূর সম্পর্ক ছিল, কাছাকাছি বাসের ফলে ঘনিষ্টতাও হয়েছিল। পাত্রের কাছে পাত্রী লেখাপড়া শিখত। বিবাহের কথা হচ্ছে জেনে রাজা মেয়ের মামা রামকালীকে বললেন, খবরদার, অন্য কোথাও চেষ্টা করবে না, আমিই তোমার ভাগনীকে বিবাহ করব। মামা সাহসী লোক, রাজার কথা শুনলেন না, যার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল তার সঙ্গে বিবাহের আয়োজন করলেন। বরপক্ষ কন্যাপক্ষ উপস্থিত, কন্যার মামা সম্প্রদানের জন্য প্রস্তুত, পুরোহিত মন্ত্রপাঠের উপক্রম করছেন, এমন সময় রাজা সদলবলে উপস্থিত হলেন। কেউ কোনও বাধা দিতে সাহস করল না, কারণ রাজার দোর্দণ্ড প্রতাপ, আর তাঁর সঙ্গে পুলিসের দারোগাও শান্তিরক্ষা করতে এসেছিল। রাজার অনুচরেরা মেয়ের মামা আর বরের হাত পা বেঁধে তাদের সরিয়ে ফেলল, বরপক্ষ কন্যাপক্ষ ভয়ে ছত্রভঙ্গ হল। তখন রাজা বরের আসনে বসলেন, তাঁর নিজের পুরোহিত মন্ত্র পড়ল, রাজার এক মোসাহেব কন্যার খুড়ো সেজে অচৈতন্য সাবিত্রীকে সম্প্রদান করল। বিবাহের পর রাজা তাঁর নূতন পত্নীকে রাজবাড়িতে নিয়ে গেলেন। মামা দেশত্যাগী হলেন, আর পাত্রটি তার মাকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল।

—সেই পাত্রের পরিচয় আপনি জানেন?

—তার সঙ্গেই কথা বলছি। নাম রাখাল মুস্তৌফী, স্কুল মাস্টার, নিজেকে খুব বড় কবি মনে করে, যদিও তার একটা কবিতাও এ পর্যন্ত ছাপা হয় নি।

—নিজেকে বড় মনে করা কি দোষের?

—বোকা লোকের পক্ষে দোষের, তোমার আর আমার মতন বুদ্ধিমানের পক্ষে দোষের নয়।

—তার পর বলে যান।

—নূতন রানী সাবিত্রী বহুদিন পীড়িত ছিলেন। তাঁকে খুশী করে বশে আনবার জন্য রাজা চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, বিস্তর অলংকার মায় নীল তারা দিয়েছিলেন, বাসের জন্য আলাদা মহল আর অনেক দাসদাসীও দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষার জন্য মিশন স্কুলের সিস্টার থিওডোরাকে বাহাল করেছিলেন। কিন্তু বিবাহের পাঁচ মাস পরেই রাজা মাতাল অবস্থায় পড়ে গিয়ে জখম হয়ে শয্যা নিলেন। নূতন রানী তাঁর টীচারের সঙ্গেই সময় কাটাতে লাগলেন।

—সাবিত্রী এখন কোথায় আছে তাই বলুন।

—ব্যস্ত হয়ো না, সব কথা একে একে বলছি। রাজার মৃত্যুর পর নূতন রানীর উপর কড়া পাহারা বসল। তিনি খুব বুদ্ধিমতী, সিস্টার থিওডোরার সঙ্গে পরামর্শ করে পালাবার ব্যবস্থা করলেন। একদিন দুপুর রাত্রে চুপি চুপি রাজবাড়ি ত্যাগ করলেন, সঙ্গে নিলেন কিছু টাকা আর অলংকার এবং একজন বিশ্বস্ত দাসী। নীল তারা নিয়ে যাবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না, কিন্তু থিওডোরার সনির্বন্ধ অনুরোধে তাও

নিলেন। তার পর কলকাতায় এসে মিস সিসিলিয়া ব্যানার্জি নামে এক বাঙালী খ্রীষ্টান মহিলার বাড়িতে উঠলেন। থিওডোরাই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

—সাবিত্রীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?

—হয়েছে। রানী বললেন, আমি রাজবাড়ি থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন হয়েছি, এখানে এক মেয়ে স্কুলে চাকরিও যোগাড় করেছি। নীল তারা আমি রাখতে চাই না, আপনি নিয়ে যান, কুমারকে দেবেন। আমি বললাম, বিনামূল্যে দেবেন কেন, আপনার আর মুস্তৌফীর উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার খেসারত আদায় করে তবে দেবেন। রানী বললেন, আমার কিছু স্থির করবার শক্তি নেই, মামা মামীও বেঁচে নেই যে তাঁদের উপদেশ নেব। আপনি মুস্তৌফীর সঙ্গে কথা বলবেন, তিনি যা বলবেন তাই হবে। মুস্তৌফী, তোমার উপর তাঁর খুব শ্রদ্ধা আছে, গ্রেট রিগার্ড।

—তিনি কি খ্রীষ্টান হয়েছেন?

—সিস্টার থিওডোরা তার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু রানী মোটেই রাজী হয় নি।

—রানী বলবেন না, বলুন সাবিত্রী দেবী।

—ভেরি ওয়েল, সাবিত্রী দেবী, দি গডেস সাবিত্রী। দেখ ওআটসন, প্রেমে পড়লে নজর খুব উঁচু হয়, মনের ম্যাগনিফাইং পাওআর বেড়ে যায়। তোমার বিবাহের আগেও এই রকম দেখেছিলাম।

হোম্‌স তাঁর পকেট থেকে একটি বাক্স বার করে খুলে দেখালেন—সোনার ফ্রেমে বসানো নীল তারা, সুপারির মতন গড়ন, কিন্তু আরও বড়, ফিকে ঘোলাটে নীল রং, ভিতরে উজ্জ্বল তারার মতন একটি চিহ্ন, তা থেকে ছ দিকে ছটি রশ্মি বেরিয়েছে।

হোম্‌স বললেন, বহু কোটি বৎসর পূর্বে ভূগর্ভে তরল উত্তপ্ত অ্যালুমিনা ধীরে ধীরে জমে গিয়ে এই রত্ন উৎপন্ন হয়েছিল। এর বাজার দর খুব বেশী হবে না, বড় জোর দশ হাজার টাকা। কিন্তু কুমার যখন এর অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন আর ফিরে পাবার জন্য লালায়িত হয়েছেন তখন তাঁকে চড়া দাম দিতে হবে। মুস্তৌফী, বল কত টাকা আদায় করব?

রাখাল বলল, আমার মাথা গুলিয়ে গেছে, যা স্থির করবার আপনিই করুন।

—কবিদের বিষয়বুদ্ধি বড় কম, অবশ্য অনারেবল এক্সেপশন আছে, যেমন লর্ড টেনিসন। শোন মুস্তৌফী আমি চার লাখ আদায় করব, সাবিত্রী দেবীর দুই, তোমার দুই। এর বেশী চাইলে কুমার ভড়কে যেতে পারেন। তা ছাড়া আমাদের এদেশে আসার খরচ আর পারিশ্রমিকও তাঁকে দিতে হবে। ব্যাংক অভ বেঙ্গলে সাবিত্রীর অ্যাকাউণ্ট আছে, কুমার সেখানে চার লাখ জমা দিলেই তাঁকে নীল তারা সমর্পণ করব। আজ সন্ধ্যায় তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

—সাবিত্রীর ঠিকানা কি?

—তিন নম্বর কর্নওআলিস থার্ড লেন। মুস্তৌফী, আজই বিকালে তাঁর কাছে যেও। আশা করি তোমার কুসংস্কার নেই, বিধবা হলেও বাগ্‌দত্তা পাত্রীকে বিবাহ করতে রাজী আছ?...তবে আর ভাবনা কি, go, woo and win her। কাল সকালে হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। গুড বাই।

ওআটসন বললেন, এক্সকিউজ মি মুস্তৌফী বাবু, দাড়িটা কামিয়ে ফেলো। গুড বাই।

রাখাল বিকালে চারটের সময় সাবিত্রীর কাছে গিয়ে রাত সাড়ে আটটায় ফিরে এল। তার ছাত্র নারান বারান্দায় বসে ছিল। রাখাল বলল, কে ও নারান নাকি? হ্যারিকেনটা উসকে দে।

আলো বাড়িয়ে দিয়ে নারান বলল, একি মাস্টার মশায়, আপনাকে যে চেনাই যায় না!

—দাড়িটা কামিয়ে ফেলেছি। এত রাত্রে তুই যে এখানে?

—বাঃ ভুলে গেছেন! আপনি যে বলেছিলেন, আজ সন্ধ্যেবেলা ব্যাট্‌ল অভ সেজমুর পড়াবেন।

—দুত্তোর সেজমুর, ও আর এক দিন হবে। আজ ট্রামে আসতে আসতে কি একটা বানিয়েছি শুনবি?—বরষে ধারা, ভূমি শীতল, তাপিত তরু পেয়েছে জল; টানিছে রস তৃষিত মূল, ধরিবে পাতা ফুটিবে ফুল। তোদের হেম বাঁড়ুজ্যে নবীন সেন পারে এমন লিখতে?

১৩৬১

# তিলোত্তমা

সিদ্ধিনাথের নাম আপনারা শুনে থাকবেন।* বিদ্যার খ্যাতি আছে, সরকারী কলেজে পড়াতেন, কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় চাকরি ছেড়ে প্রায় তিন বৎসর নিষ্কর্মা হয়ে বাড়িতে বসে ছিলেন। এখন ভাল আছেন, শিবচন্দ্র কলেজে পড়াচ্ছেন। সম্প্রতি কুবুদ্ধির সম্বন্ধে থিসিস লিখে পিএচ. ডি. ডিগ্রী পেয়েছেন।

সিদ্ধিনাথের বাল্যবন্ধু উকিল গোপাল মুখুজ্যের বাড়িতে যথারীতি সান্ধ্য আড্ডা বসেছে। উপস্থিত আছেন—গোপালবাবু, তাঁর পত্নী নমিতা, নমিতার ছোট বোন (সিদ্ধিনাথের ভূতপূর্ব ছাত্রী) অসিতা, অসিতার স্বামী রমেশ ডাক্তার, আর সিদ্ধিনাথ। সিদ্ধিনাথের বাড়ি খুব কাছে। তাঁর স্ত্রী নবদুর্গা একটু সেকেলে, এই মেয়ে-পুরুষের আড্ডায় তিনি আসেন না।

আড্ডারম্ভে গোপালবাবু বললেন, ওহে সিদ্ধিনাথ, তুমি ডক্টরেট পেয়েছ তাতে আমরা সবাই খুশী হয়েছি। সম্মান তোমার বিদ্যের তুলনায় অবশ্য কিছুই নয়, তবে শোনায় ভাল—ডক্টর সিদ্ধিনাথ ভট্টাচার্জি। নমিতা তোমাকে আর অশ্রদ্ধা করতে পারবে না।

নমিতা বললেন, ডক্টর একটা নিতান্ত বাজে উপাধি, গণ্ডা গণ্ডা ডক্টর পথেঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আমি ওঁকে একটি ভাল উপাধি দিচ্ছি—বকবক্তা।

অসিতা বলল, মানে কি দিদি?

—মানে খুব সোজা। যে বকে সে বক্তা, আর যে বকবক করে সে বকবক্তা।

সিদ্ধিনাথ বললেন, থ্যাংক ইউ নমিতা দেবী, আপনার প্রদত্ত উপাধিটির মর্যাদা রাখতে আমি সর্বদাই চেষ্টা করব।

নমিতা বললেন, তবে আর সময় নষ্ট করেন কেন, আপনার বকবক্তৃতা এখনই শুরু করুন না।

—কোন্ বিষয় শুনতে চান? শংকরের অদ্বৈতবাদ, মার্কসের দ্বান্দ্বিক জড়বাদ, শরীরতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব না পরলোকতত্ত্ব?

গোপালবাবু বললেন, ওসব নীরস তত্ত্ব শুনতে চাই না। প্রেমের কথা যদি তোমার কিছু জানা থাকে তো তাই বল।

—হাড়ে হাড়ে জানা আছে। আমি নিজেই একবার বিশ্রী রকম প্রেমে পড়েছিলুম।

নমিতা বললেন, আস্পর্ধা কম নয়! বাড়িতে পাহারাওয়ালী গিন্নী থাকতে প্রেমে পড়লেন কোন্ আক্কেলে? বলতে লজ্জা হয় না?

—মানুষের যা স্বাভাবিক ধর্ম তা স্বীকার করতে লজ্জা হবে কেন। আপনার মুখেই তো শুনেছি যে অসিতার বউভাতের ভোজে আপনি গবগব করে চার গণ্ডা ভেটকি মাছের ফ্রাই খেয়েছিলেন। তার জন্যে তো আপনাকে রাক্ষসী কি মেছো-পেতনী বলছি না।

* সিদ্ধিনাথের পূর্বকথা "গল্পকল্প" পুস্তকে আছে।

গোপালবাবু বললেন, আঃ ঝগড়া কর কেন। নমিতা, সিধুকে বলতে দাও, তোমার মন্তব্য শেষে ক'রো।

সিদ্ধিনাথ বলতে লাগলেন।—ব্যাপারটা ঘটেছিল আমার বিবাহের আগে, গিন্নী থাকতে প্রেম হবার জো কি! তখন বয়স বাইশ-তেইশ, পোস্টগ্রাজুয়েটে পড়ি, বাবা মা দুজনেই বর্তমান। ওহে রমেশ ডাক্তার, তোমাদের শাস্ত্রে এই কথা বলে তো— কোনও দেশে একটা নতুন ব্যাধি যদি আসে তবে প্রথম প্রথম তা মারাত্মক হয়, কিন্তু দু-এক শ বছর পরে তার প্রকোপ অনেক কমে যায়?

রমেশ বলল, আজ্ঞে হাঁ, কোনও কোনও রোগের বেলা তাই হয় বটে।

—প্রেমও সেই রকম ব্যাধি। এর তিন দশা আছে। প্রাইমারি স্টেজে প্রেম হল নাইন্টি পারসেণ্ট লালসা, টেন পারসেণ্ট ভালবাসা। সেকণ্ডারি স্টেজে হাফ অ্যাণ্ড হাফ। টারশারিতে প্রায় সবটাই ভালবাসা, নামমাত্র লালসা। পুরাকালে পূর্বরাগ অর্থাৎ প্রেমের প্রথম আক্রমণ অতি সাংঘাতিক হত। কাদম্বরীতে বানভট্ট লিখছেন— মহাশ্বেতার প্রেমে পড়ে পুণ্ডরীক হার্ট ফেল করে মারা যায়। আরব্য উপন্যাসে অনেক নায়ক-নায়িকা প্রেমে শয্যাশায়ী হত। অমন যে জবরদস্ত রাজর্ষি আরংজেব বাদশা, তিনিও প্রথম যৌবনে গোলকণ্ডার এক নবাবনন্দিনীকে দেখে মরণাপন্ন হয়েছিলেন। আজকাল এরকম বড় একটা দেখা যায় না, কারণ মেয়ে পুরুষ সবাই খুব হিসেবী হয়েছে, তা ছাড়া দেদার প্রেমের গল্প প'ড়ে আর সিনেমার ছবি দেখে খানিকটা ইমিউনিটিও এসেছে। কিন্তু দৈবক্রমে আমি যে প্রেমের কবলে পড়েছিলুম তা সেই সেকেলে ভিরুলেণ্ট টাইপের। তবে বেশী ভুগতে হয়নি, পাঁচ দিনের মধ্যেই সেরে উঠি।

নমিতা বললেন, কিসে সারল, পেনিসিলিন না খ্যাপা কুকুরের ইনজেকশনে?

—ওষুধের কাজ নয়। গুরুর কৃপায় সেরেছিল।

—আপনি তো পাষণ্ড লোক, আপনার আবার গুরু কে?

—যিনি জ্ঞানদাতা বা শিক্ষাদাতা তিনিই গুরু। সম্প্রতি আমার দুটি গুরু জুটেছে—আমার ছাত্র পরাশর হোড়, আর এ পাড়ার বকাটে ছোকরা গুলচাঁদ। পরাশরের কাছে কবিতা রচনা শিখছি, আর গুলচাঁদের কাছে বাইসিক্‌ল চড়া।

অসিতা বলল, সার, আপনি তো বলতেন যে কাব্যচর্চা আর গাঁজা খাওয়া দুই সমান, তবে শিখছেন কেন? কিছু লিখছেন নাকি?

—রাম বল। লেখবার জন্যে শিখছি না, শুধু কবিতা লেখার প্যাঁচটা জানতে চাই। আর বাইসিক্‌ল শিখছি ট্রাম-বাসের ভাড়া বাঁচাবার জন্যে। দেখ অসিতা, কবিতা লেখা অতি সোজা কাজ, মাস খানিক প্র্যাকটিস করলে তুমিও পারবে, হয়তো তোমার দিদিও বছর খানিক চেষ্টা করলে পারবেন। কেন যে লোকে কবিদের খাতির করে—

নমিতা বললেন, বাজে কথা রাখুন। কার সঙ্গে প্রেম হয়েছিল? অত চট করে সারলই বা কি করে? প্রতিদ্বন্দ্বী আপনাকে ঠেঙিয়েছিল নাকি?

—ধৈর্য ধরুন, যথাক্রমে সবই শুনবেন। প্রেমে পড়ার চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই কাবু হয়েছিলুম। আহারে রুচি নেই, মাথা টিপটিপ করে, বুক ঢিপঢিপ করে, ঘুম মোটেই হয় না, লেখাপড়া চুলোয় গেল, চব্বিশ ঘণ্টা শয্যাশায়ী। মা বললেন, হাঁরে সিধু, তোর হয়েছে কি? কপালটা যেন ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে। বাবা ডাক্তার ডাকালেন। নাড়ী জিব

বুক পেট সব দেখে ডাক্তার বললেন, ডেংগু মনে হচ্ছে, ভয়ের কারণ নেই, নড়াচড়া বন্ধ রাখবে, লিকুইড ডায়েট চলবে। এক আউন্স ক্যাস্টর অয়েল এখনই খাইয়ে দিন, আর দশ গ্রেন কুইনীন নেবুর রস দিয়ে জলে গুলে এবেলা একবার ওবেলা একবার। মুখটা তেতো রাখা দরকার।

রামদাস কাব্যসাংখ্যবেদান্তচঞ্চু তখন ইউনিভার্সিটিতে প্রাচ্যদর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। এখন তিনি নাগপুরে আছেন। বয়স বেশী নয়, আমার চাইতে ছ-সাত বছরের বড়। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা একটু রসিক হয়ে থাকেন। রামদাসও রসিক লোক, ছাত্রদের সঙ্গে ইয়ারকি দিতেন, কিন্তু সকলেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। আমাকে তিনি বিশেষ রকম স্নেহ করতেন, কারণ বিদ্যায় আর রূপে আমিই ক্লাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলুম।

নমিতা বললেন, জন্ম ইস্তক বিদ্যের জাহাজ ছিলেন তা না হয় মানলুম, কিন্তু রূপ আবার কোথায় পেলেন? এই তো গুলিখোরের মতন চেহারা, গরুর মতন ড্যাবডেবে চোখ, শুয়োরকুঁচির মতন চুল—

—সকলেই আপনার মতন অন্ধ নয়, সমঝদার রূপদর্শী লোক ঢের আছে। দু দিন আমাকে ক্লাসে দেখতে না পেয়ে চঞ্চু মশায় জিজ্ঞাসা করলেন, সিদ্ধিনাথ কামাই করছে কেন? ছাত্ররা বলল, তার ভারী অসুখ। আমার বাবার সঙ্গে তাঁর বাবার বন্ধুত্ব ছিল, সেই সূত্রে চঞ্চু মশায় মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসতেন। অসুখ শুনে আমাকে দেখতে এলেন।

নমিতা বললেন, বকবক করে শুধু বাজে কথা বলছেন। প্রেমে পড়লেন অথচ প্রেমপাত্রীটির কোনও খবর নেই। তার নাম কি, পরিচয় কি, দেখতে কেমন, সব বৃত্তান্ত খুলে বলুন, আপনার রামদাস চুঞ্চুর কথা শুনতে চাই না।

—ব্যস্ত হবেন না, কি জাতি কি নাম ধরে কোথায় বসতি করে সবই শুনতে পাবেন। মেয়েটি দেখতে কেমন তা জানবার জন্যে ছটফট করছেন, নয়? আচ্ছা এখনই বলে দিচ্ছি—অতি সুশ্রী গৌরী তন্বী, আপনার মতন গোবদা নয়, হিংসুটেও নয়। গোপাল কি দেখে যে আপনার প্রেমে মজেছে তা বুঝতেই পারি না।

—বোঝাবার কোনও দরকার নেই, পরচর্চা না করে নিজের কথা বলুন।

—শুনুন। চঞ্চু মশায যখন দেখতে এলেন তখন আমার ঘরে আর কেউ ছিল না। আমি চিতপাত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছি, কপালে ওডিকলোনের পটি, চোখে উদাস করুণ দৃষ্টি, মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে আঃ ইঃ উঃ এঃ ওঃ প্রভৃতি কাতর ধ্বনি বেরুচ্ছে।

রামদাস প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে সিদ্ধিনাথ?

বললুম, কি জানি সার। শরীর অত্যন্ত খারাপ, বড় যন্ত্রণা, আমি আর বাঁচব না।

চুঞ্চু মশায় আমার নাড়ী দেখলেন, চোখ দেখলেন, বুক আর পিঠে হাত বুলুলেন। তার পর ঠোঁট কুঁচকে মাথা নেড়ে বললেন, হুঁ, সব লক্ষণ মিলে যাচ্ছে।

—কিসের লক্ষণ পণ্ডিত মশায়?

—সাত্ত্বিক বিকারের অষ্ট লক্ষণ প্রকট হয়েছে—স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গ বেপথু বৈবর্ণ্য অশ্রু মূর্ছা।

সাত্ত্বিক বিকার মানে কি সার?

—মানে, তুমি ঘোরতর প্রেমে পড়েছ, সুদুস্তর পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছ। ঠিক বলেছি কি না?

আমি চাপবার চেষ্টা করলুম না, বললুম, আজ্ঞে ঠিক।

—পাত্রীটি কে? নাম-ধাম বলে ফেল, যদি অলঙ্ঘনীয় বাধা না থাকে তবে সম্বন্ধের চেষ্টা করব।

—কোনও আশা নেই সার, বৈবাহিক অবৈবাহিক কোনও সম্পর্কই হবার জো নেই। আমার নাগালের একদম বাইরে।

চণ্ডু মশায় বললেন, যদি নাগালের বাইরেই হয় এবং কোনও আশা না থাকে তবে মিথ্যা তার চিন্তা করছ কেন? মন থেকে একেবারে মুছে ফেল।

—চেষ্টা তো করছি, কিন্তু পারছি না যে।

—আচ্ছা, তার ব্যবস্থা আমি করছি। আগে তার পরিচয় দাও।

আমি সবিস্তারে পরিচয় দিলুম। তাকে সিনেমায় দেখেছি, তিলোত্তমা-ছবিতে নায়িকার পার্টে—

নমিতা বললেন, আরে রাম রাম, ছি ছি, এত ভনিতার পর সিনেমার অ্যাকট্রেস! ইস্কুলের চ্যাংড়া ছেলেরাই তো সে রকম প্রেমে পড়ে। ডক্টর সিদ্ধিনাথ বকবক্তার নজর অত ছোট তা মনে করি নি, উঁচুদরের কিছু আশা করেছিলাম। অন্তত একটি পিস্তল-ওয়ালী অগ্নিদিদি, কিংবা নাটোরের বনলতা সেন।

অসিতা বলল, অমন আশা তোমার করাই অন্যায় দিদি, এঁর তো তখন কম বয়স, ডক্টর বা বকবক্তা কোনও খেতাবই পান নি।

সিদ্ধিনাথ বললেন, ছি ছি করবার কোন কারণ নেই, আমার মনোরথে আকাশের নক্ষত্র জোতা ছিল। তিলোত্তমা ছবিতে সে নায়িকা সাজত, তার নিজের নামও তিলোত্তমা। তার বাপ আর ঠাকুর্দা বাঙালী, ঠাকুমা বর্মী, মা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, দিদিমা ইংরেজ, দাদামশায় পঞ্জাবী। অ্যাভারেজ বাঙালী মেয়ে মোটেই সুশ্রী নয়। জারুল কাঠের মতন গায়ের রং, ছোট ছোট চোখ, এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত মুখের হাঁ—যেন ইঁদুর ধরা জাঁতিকল, মোটা ঠোঁট, থুতনি এতটুকু। বিশ্বাস না হয় তো আরশিতে মুখ দেখবেন।

নমিতা বললেন, বাঙালী পুরুষদের চেহারা কেমন তা শুনবেন? চোয়াড়ে গড়ন, অবলুস কাঠের মতন রং—

সিদ্ধিনাথ হাত নেড়ে বললেন, থামুন, থামুন, যা বলবার গোপালকে আড়ালে বলবেন, অন্যের কাছে পতিনিন্দা মহাপাপ। যা বলছিলাম শুনুন। তিলোত্তমার দেহে চার জাতের রক্ত মিশেছিল, সেজন্যই সে অসাধারণ সুন্দরী। গোড়ালি পর্যন্ত চুল, চাঁপা ফুলের মতন রং—

অসিতা বলল, রং কি করে টের পেলেন সার? তখন তো টেকনিকলার হয় নি।

—রংটা অনুমান করেছিলুম। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চকিত-হরিণীপ্রেক্ষণা, পীনস্তনী, নিবিড়নিতম্বা। কালিদাস যাকে বলেছেন—যুবতী বিষয়ে বিধাতার আদ্যা সৃষ্টি।

নমিতা বললেন, বিধাতার সৃষ্টি থোড়াই, আপনি আদেখলে হাঁদা ছিলেন তাই আসল রূপ টের পান নি। রং সুর্মা পরচুল তুলো আর খড় দিয়ে কি গড়া যায় তার কোনও আইডিয়াই আপনার নেই।

—হুঁ, রামদাস চণ্ডুও তাই বলেছিলেন বটে। তারপর শুনুন। তিলোত্তমার গলার আওয়াজ এত মিষ্টি যে তা বলবার নয়।

—উপমা খুঁজে পাচ্ছেন না? রূপুলী কণ্ঠস্বর বলা চলবে?

—ও হল ইংরিজীর অন্ধ নকল, কণ্ঠস্বর সোনালী রুপুলী হয় না। সোনা রুপোর আওয়াজও ভাল নয়। বরং স্টীলের তারের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যেতে পারে, যেমন বীণার ঝংকার কিংবা দামী ঘড়ির গংএর ডিং ডং। তার পর শুনুন। রামদাস চণ্ডু তিলোত্তমার বিবরণ শুনে প্রশ্ন করলেন, তার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?

বললুম, আলাপ কোথেকে হবে সার, সে থাকে বোম্বাইএ। তাকে কোনও দিন সশরীরে দেখি নি, শুধু ছবিতেই তার মূর্তি দেখেছি, ছবিতেই তার কথা আর গান শুনেছি।

চণ্ডু মশায় সহাস্যে বললেন, বেশ বেশ! কায়া দেখ নি, শুধু ছায়া দেখেছ। এখন শুয়ে শুয়ে ছায়াও দেখছ না, শুধু মায়া দেখছ। ভয় নেই, আমি তোমাকে উদ্ধার করব। সাংখ্য দর্শনে বলে—প্রকৃতি এক, আর পুরুষ অনেক। পুরুষ আসলে শুদ্ধ বুদ্ধ নির্বিকার, কিন্তু তার সামনে যখন প্রকৃতি সেজেগুজে নৃত্য করে তখন পুরুষের বিকার হয়, সে ভবযন্ত্রণা ভোগ করে। প্রজ্ঞা লাভ করলেই পুরুষের নেশা ছুটে যায়, প্রকৃতি অন্তর্হিত হয়। তুমি একজন পুরুষ, তিলোত্তমারূপা প্রকৃতি তোমার সামনে নেচেছিল, এখনও তোমার মনের মধ্যে নাচছে, তাই তোমার এই দুর্দশা। বৎস সিদ্ধিনাথ, প্রবুদ্ধ হও, তোমার পৌরুষ দেখাও, প্রকৃতিকে ধমক দিয়ে বল, দূর হ মায়াবিনী, ভাগো, গেট আউট। ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মোহমুক্ত হয়ে কৈবল্য লাভ কর।

আমি বললুম, ওসব তত্ত্বকথায় কিছুই হবে না সার।

—বেশ, সাংখ্যে যদি কাজ না হয় তবে অদ্বৈতবাদ শোন। এই জগতে হরেক রকম যা দেখছ তার কোনও অস্তিত্ব নেই, শুধুই মায়া। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তিনি পুরুষ নন, স্ত্রী নন, ক্লীবলিঙ্গ, এবং তুমিই সেই ব্রহ্ম।

—বলেন কি সার' আপনি ব্রহ্ম নন?

—আমিও ব্রহ্ম। তিলোত্তমা, তোমার সহপাঠীরা, তোমাদের ভাইসচ্যান্সেলার, প্রত্যেকেই ব্রহ্ম। সবাই এক, শুধু মায়ার জন্য আলাদা বোধ হয়।

—আপনি বলতে চান তিলোত্তমা আর আমাদের বাড়ির কুঁজী বুড়ী ঝি দুইই এক।

—তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুন্দর বা কুৎসিত, সাধু বা অসাধু, সব তুল্যমূল্য, এক পরমাত্মা সর্বভূতে বিরাজমান। বোকা লোক মনে করে এক সের তুলোর চাইতে এক সের লোহা বেশী ভারী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুইএরই ওজন সমান।

—মানি না সার। আপনি নীচের ওই উঠনে দাঁড়ান, আমি দোতালা থেকে আপনার মাথায় এক সের তুলো ফেলব, তার পর এক সের লোহা ফেলব। তার পরেও যদি বেঁচে থাকেন তবে আপনার কথা মানব।

অট্টহাস্য করে চণ্ডু মশায় বললেন, ওহে সিদ্ধিনাথ, গুরুমারা বিদ্যে এখনও তোমার হয় নি, একটু সায়েন্স পড়ো। তুমি গুরুত্ব আর আপেক্ষিক গুরুত্ব, ভার আর সংঘাত গুলিয়ে ফেলেছ।

আমি বললুম, যাই বলুন, সার, আপনার অদ্বৈতবাদে কোনও ফল হবে না। তিলোত্তমা হচ্ছে অলোকসামান্যা নারী, তার সঙ্গে কারও তুলনাই হতে পারে না। তার চেহারা অভিনয় আর গান আমাকে জাদু করেছে।

চণ্ডু মশায় বললেন, তবে কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ কর, যাকে বলে কমন সেন্স। পক্ষীরাজ ঘোড়া, আকাশকুসুম, শিংওয়ালা খরগোশ এ সবে বিশ্বাস কর?

—আজ্ঞে না, ওসব তো কল্পনা, কিন্তু তিলোত্তমা বাস্তব।

—একেবারে ভুল। কবি খুব হাতে রেখেই বলেছেন, অর্ধেক কল্পনা তুমি অর্ধেক মানবী। তোমার তিলোত্তমা অর্ধেক নয়, পনরো আনা কল্পনা। তুমি তার কতটুকু জান হে ছোকরা? তার মূর্তিটা জোড়াতালি দিয়ে তৈরী; তার ভাষা নিজের নয়, নাট্যকারের; তার গানও নিজের নয়, অন্য মেয়ে আড়াল থেকে গেয়েছে। একটা কৃত্রিম মানবীর চিত্রার্পিতা ছায়া দেখে তুমি ভুলেছ। তার মেজাজ তুমি জান না, হয়তো খেঁকী কুঁদুলী, হয়তো নেশা করে, হয়তো দেমাকে মটমট করছে, হয়তো তার কাল-চারও বিশেষ কিছু নেই।

একটু ভেবে আমি বললুম, পণ্ডিত মশায়, আপনার কথা শুনে এখন মনে পড়ছে—তিলোত্তমা সরোবরকে সড়োবড়, জিহ্বাকে জেহোভা, আর প্রেমকে ফ্রেম বলেছিল।

—তবেই বোঝ। তুমি আবার ভীষণ খুঁতখুঁতে। যদি তোমাদের মিলন হয়, তার সঙ্গে তুমি যদি ঘর কর, তবে দুদিনেই তার গ্ল্যামার লোপ পাবে। সেকালে কোলকাতার একজন অতি শৌখিন বনেদী বড়লোক ছিলেন। তিনি রোজ সন্ধ্যায় তাঁর রূপসী রক্ষিতার বাড়িতে যেতেন, দুপুর রাতে বাড়ি ফিরতেন। কোনও কারণে দুদিন যেতে পারেন নি। বিরহ যন্ত্রণা সইতে না পেরে তৃতীয় দিনে ভোর বেলায় তিনি হাজির হলেন। দেখলেন, তাঁর প্রেয়সী গামছা পরে গাড়ু হাতে কোথায় চলেছেন। তাই দেখে ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়ে বললেন, এঃ, তুমি—তুমি—

নমিতা বললেন, আপনি অতি অসভ্য, মুখে কিছুই বাধে না।

—ও তো আমি বলি নি, গুরুমুখে যা শুনেছি তাই আবৃত্তি করেছি। প্রেয়সীর সেই অদৃষ্টপূর্ব প্রাকৃত রূপ দেখে ভদ্রলোকের মোহ কেটে গেল, তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করে বৃন্দাবনবাসী হলেন।

নমিতা বললেন, আপনার নিজের কি হল তাই বলুন।

—তারপর চুণ্ডু মশায় বললেন, ওহে সিদ্ধিনাথ, এখন তোমাকে আসল তিলোত্তমার ইতিহাস বলছি শোন। সুন্দ উপসুন্দ দুই ভাই ছিল হরিহরাত্মা। তাদের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা বললেন, ভয় নেই, আমি দুদিনেই ওদের সাবাড় করে দিচ্ছি। তিনি ব্রাহ্মীমায়ায় এক সিন্থেটিক ললনা সৃষ্টি করলেন। জগতের যাবতীয় সুন্দর বস্তুর তিল তিল উপাদানের সংযোগে তৈরী সেজন্য তার নাম হল তিলোত্তমা। তার ট্রায়াল দেখবার জন্য দেবতারা ব্রহ্মসভায় সমবেত হলেন। ব্রহ্মার চার দিকে ঘুরে ঘুরে তিলোত্তমা নাচতে লাগল। পিতামহ প্রবীণ লোক, চক্ষুলজ্জা আছে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পারেন না, অথচ দেখবার লোভ ষোল আনা। অগত্যা তাঁর ঘাড়ের চার দিকে চারটে মুণ্ডু বার হল। ইন্দ্রের সর্বাঙ্গে সহস্র লোচন ফুটে উঠল, তাই দিয়ে তিনি চোঁ চোঁ করে তিলোত্তমার রূপসুধা পান করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ নাচ দেখে ব্রহ্মা বললেন, বাঃ, খাসা হয়েছে, এখন তুমি সুন্দ উপসুন্দর কাছে গিয়ে তাদের সামনে নৃত্য কর। তিলোত্তমা তাই করল। তাকে দখল করবার জন্য দুই ভাই কাড়াকাড়ি মারামারি করে দুজনেই মরল। দেবতারা নিরাপদ হলেন। ইন্দ্র বললেন, তিলোত্তমা, আমার সঙ্গে অমরাবতীতে চল, শচীকে বরখাস্ত করে তোমাকেই ইন্দ্রাণী করব। বিষ্ণু বললেন, খবরদার, তিলোত্তমার দিকে নজর দিও না, ও বৈকুণ্ঠে যাবে, আমার পদসেবা করবে। মহেশ্বর বললেন, ওহে বিষ্ণু, তোমার তো বিস্তর সেবাদাসী আছে, তিলোত্তমা আমার সঙ্গে

কৈলাসে যাবে, পার্বতীর একজন ঝি দরকার। তখন ব্রহ্মা বেগতিক দেখে বললেন, তিলোত্তমে, স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয়! তিলোত্তমা দড়াম করে ফেটে গেল অ্যাটম বোমার মতন। তার সমস্ত সত্তা বিশ্লিষ্ট হল, যে উপাদান যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেল—কান্তি বিদ্যুল্লতায়, কেশরাশি মেঘমালায়, মুখচ্ছবি পূর্ণচন্দ্রে, দৃষ্টি মৃগলোচনে, ওষ্ঠরাগ পক্ক বিম্বে, দন্তরুচি কুন্দকলিকায়, কণ্ঠস্বর বেণুবীণায়, বাহু মৃণালদণ্ডে, পয়োধর বিল্বফলে, নিতম্ব করিকুম্ভে, ঊরু কদলীকাণ্ডে। পড়ে রইল শুধু একটু রেডিও-অ্যাকটিভ ধোঁয়া।

অসিতা বলল, তিলোত্তমার মন কোথায় ফিরে গেল তা তো বললেন না সার।

—তার মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার কিছুই ছিল না, আত্মাও ছিল না। তিলোত্তমা একটা রোবট। পুরাণকথা শেষ করে চুণ্ডু মশায় প্রশ্ন করলেন, বৎস সিদ্ধিনাথ, এখন কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করছ কি? মোহ অপগত হয়েছে?

আমি লাফ দিয়ে উঠে বললুম, একদম সেরে গেছি সার। আমার মানসী তিলোত্তমাও এক্সপ্লোড করে বিলীন হয়েছে।

চুণ্ডু মশায় বললেন, এখনও বলা যায় না, কিছু ধোঁয়া থাকতে পারে। দেখ সিদ্ধিনাথ, তোমার চটপট বিবাহ হওয়া দরকার, তোমার বাপ মায়েরও সেই ইচ্ছা। আমার ছোট শালী নবদুর্গা দেখতে নেহাত মন্দ নয়, কাল বিকেলে আমাদের বাড়িতে এসে তাকে একবার দেখো।

আমি উত্তর দিলুম, দেখবার দরকার নেই সার। ছায়া দেখে একবার ভুলেছি, কায়া দেখে আর ভুলতে চাই না। ওই নবদুর্গা না বনদুর্গা কি নাম বললেন ওকেই বিয়ে করব। আপনি যখন বলছেন তখন আর কথা কি।

চুণ্ডু মশায় বললেন, ঠিক বলেছ সিদ্ধিনাথ। দশ মিনিট দেখে তুমি কি আর বুঝবে, আমি ত দশ বছরেও নবদুর্গার দিদি জয়দুর্গার ইয়ত্তা পাই নি। বিবাহ হয়ে যাক, তার পর ধীরে সুস্থে যত দিন খুশি দেখো।

তার পর চুণ্ডু মশায় বাবাকে বললেন, বাবা মা রাজী হলেন, দু মাসের মধ্যে নবদুর্গার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।

গোপালবাবু বললেন, সিদ্ধিনাথের ইতিহাস তো শেষ হল, এখন নমিতা তোমার মন্তব্য বলতে পার।

নমিতা বললেন, আপনার গিন্নীকে এই কেচ্ছা শুনিয়েছেন?

সিদ্ধিনাথ বললেন, শুনিয়েছি। আরও অনেক রকম জীবনস্মৃতি তাঁকে বলেছি, কিন্তু পতিবাক্যে তাঁর আস্থা নেই, আমার কোনও কথাই তিনি বিশ্বাস করেন না।

—জীবনস্মৃতি না ছাই, বকবক করে আবোলতাবোল বানিয়ে বলেছেন। আগাগোড়া মিথ্যে, শুধু নবদুর্গা সত্যি।

# জটাধরের বিপদ

নূতন দিল্লীর গোল মার্কেটের পিছনের গলিতে কালীবাবুর বিখ্যাত দোকান ক্যালকাটা টি ক্যাবিন। এই আড্ডাটির নাম নিশ্চয়ই আপনারা শুনেছেন।

সতরোই পৌষ, সন্ধ্যা ছটা। পেনশনভোগী বৃদ্ধ রামতারণ মুখুজ্যে, স্কুল-মাস্টার কপিল গুপ্ত, ব্যাংকের কেরানী বীরেশ্বর সিংগি, কাগজের রিপোর্টার অতুল হালদার এবং আরও অনেকে আছেন। আজ নিউইয়ার্স ডে, সেজন্য ম্যানেজার কালীবাবু একটু বিশেষ আয়োজন করেছেন। মাংসের চপ তৈরি হচ্ছে। রামতারণ-বাবু নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক লোক, কালীবাড়ির বলি ভিন্ন অন্য মাংস খান না। তাঁর জন্য আলাদা উনুনে মাছের চপ ভাজবার ব্যবস্থা হয়েছে।

সিগারেট তামাক আর চপ ভাজার ধোঁয়ায় ঘরটি ঝাপসা হয়ে আছে, বিচিত্র গন্ধে আমোদিত হয়েছে। উপস্থিত ভদ্রলোকদের জনকয়েক পাশা খেলছেন, কেউ খবরের কাগজ পড়ছেন, কেউ বা রাজনীতিক তর্ক করছেন।

অতুল হালদার বললেন, ওহে কালীবাবু, আর দেরি কত? চায়ের জন্যে যে প্রাণটা চ্যাঁ চ্যাঁ করছে। কিন্তু খালি পেটে তো চা খাওয়া চলবে না, চটপট খানকতক ভেজে ফেল।

কালীবাবু বললেন, এই যে সার, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চপ রেডি হয়ে যাবে।

এমন সময় জটাধর বকশী প্রবেশ করলেন।* চেহারা আর সাজ ঠিক আগের মতন আছে, ছ ফুট লম্বা মজবুত গড়ন, কাইজারী গোঁফ, গায়ে কালচে-খাকী মিলিটারী ওভারকোট, মাথায় পাগড়ির মতন বাঁধা কম্ফর্টার, অধিকন্তু কপালে গুটি-কতক চন্দনের ফুটকি আর গলায় একছড়া গাঁদা ফুলের মালা। ঘরে ঢুকেই বাজখাঁই গলায় বললেন, নমস্কার মশাইরা, খবর সবর সব ভাল তো।

বীরেশ্বর সিংগি একটু আঁতকে উঠলেন, রামতারণবাবু রেগে ফুলতে লাগলেন। কপিল গুপ্ত সহাস্যে বললেন, আসতে আজ্ঞা হক জটাধরবাবু, আপনি বেঁচে উঠেছেন দেখছি। আজকেও ভূত দেখাবেন নাকি?

পটকার মতন ফেটে পড়ে রামতারণবাবু বললেন, তোমাকে পুলিসে দেব, বেহায়া ঠক জোচ্চোর! ভূত দেখাবার আর জায়গা পাও নি!

জটাধর বকশী প্রসন্নবদনে বললেন, মুখুজ্যে মশায়ের রাগ হবারই কথা, আমার রসিকতাটা একটু বেয়াড়া রকমের হয়েছিল তা মানছি। মরা মানুষ সেজে আপনা-দের ভয় দেখিয়েছিলুম সেটা ঠিক হয় নি। তার জন্য আমি ভেরি সরি। মশাইরা যদি একটু ধৈর্য ধরে আমার কথা শোনেন তো বুঝবেন আমার কোন কুমতলব ছিল না।

রামতারণ মুখুজ্যে ক্রুদ্ধ বিড়ালের ন্যায় মৃদুমন্দ গর্জন করতে লাগলেন। কপিল গুপ্ত বললেন, কি বলতে চান বলুন জটাধরবাবু।

---

* জটাধরের পূর্বকথা 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প' পুস্তকে আছে।

অতুল হালদারের পাশে বসে পড়ে জটাধর বললেন, মশাইরা নভেল পড়ে থাকেন নিশ্চয়? প্রেমের গল্প, বড় ঘরের কেচ্ছা, ডিটেকটিভ কাহিনী, রূপসী বোম্বেটে, এই সব? তার জন্যে কিছু পয়সাও খরচ করে থাকেন। কিন্তু বলুন তো, গল্পের বইএ কিছু সত্যি কথা পান কি? আজ্ঞে না, আপনারা জেনে শুনে পয়সা খরচ করে ডাহা মিথ্যে কথা পড়েন, তা শরৎ চাটুজ্যেই লিখুন আর পাঁচকড়ি দেই লিখুন। কেন পড়েন? মনে একটু ফুর্তি একটু সুড়সুড়ি একটু টিপুনি একটু ধাক্কা লাগাবার জন্যে। গল্প হচ্ছে মনের ম্যাসাজ, চিত্তের ডলাইমলাই, পড়লে মেজাজ চাঙ্গা হয়। আমি কি-এমন অন্যায় কাজটা করেছি মশাই? রামতারণবাবু প্রবীণ লোক, ওকে ভক্তি করি, ওর সামনে তো ছ্যাবলা প্রেমের কাহিনী বলতে পারি না, তাই নিজেই নায়ক সেজে একটি নির্দোষ পবিত্র ভূতের গল্প আপনাদের শুনিয়েছিলুম।

রামতারণ বললেন, তোমার চা চুরুট পানের জন্যে আমার যে সাড়ে চোদ্দ আনা গচ্চা গিয়েছিল তার কি?

—তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ। ছ-সাত টাকার কমে আজকাল একটা ভাল গল্পের বই মেলে না সার। আমি সেদিন অতি সস্তায় আপনাদের মনোরঞ্জন করেছিলুম।

কপিল গুপ্ত বললেন, যাই হক, কাজটা মোটেই ভাল করেন নি, আচমকা সবাইকে একটা শক দেওয়া অতি অন্যায়। আর একটু হলেই তো বীরেশ্বরবাবুর হার্ট ফেল হত।

জটাধর হাত জোড় করে বললেন, আচ্ছা সে অপরাধের জন্যে মাপ চাচ্ছি, আজ তার দণ্ডও দেব। ও ম্যানেজার কালীবাবু মশাই, বিস্তর চপ ভাজছেন দেখছি, এক-একটার দাম কত? ছ আনা? বেশ বেশ। তা সস্তাই বলতে হবে, বড় বড় করেই গড়েছেন। ভাল মাস্টার্ড আছে তো? ছাতু গোলা নকল মাস্টার্ড চলবে না, তা বলে দিচ্ছি। এই ঘরে তেরো জন খাইয়ে রয়েছেন দেখছি, আমাকে আর কালীবাবুকে নিয়ে পনরো জন। প্রত্যেকে যদি গড়ে চারখানা করে চপ খান তা হলে পনরো ইন্টু চার ইন্টু ছ আনা, তাতে হয় সাড়ে বাইশ টাকা। তার সঙ্গে চা কেক পান তামাক ইত্যাদিও ধরুন বারো টাকা। একুনে হল পঁয়ত্রিশ টাকা। থামুন, আমার পুঁজি কত আছে দেখি।

জটাধর পকেট থেকে মনিব্যাগ বার করলেন এবং নোট গনতি করে বললেন, কুলিয়ে যাবে, আমার কাছে গোটা পঞ্চাশ টাকা আছে। কালীবাবু, আপনি কিছু বেশী করে মাল তৈরি করুন। এখন মশাইরা দয়া করে আমার সবিনয় নিবেদনটি শুনুন। আজ আপনারা সবাই আমার গেস্ট, আমার খরচে সবাই খাবেন। না না, কোনও আপত্তি শুনব না, আমার অনুরোধটি রাখতেই হবে, নইলে মনে শান্তি পাব না।

কপিল গুপ্ত বললেন, ব্যাপার কি জটাধরবাবু, এত দিলদরিয়া হলেন কেন?

জটাধরের মোটা গোঁফের নীচে একটি সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। ঘাড় চুলকে মাথা নীচু করে বললেন, আপনারা হলেন ঘরের লোক, আপনাদের বলতে বাধা কি! কি জানেন, আজ বড় আনন্দের দিন, আজ আমার শুভ বিবাহ—

রামতারণ বললেন, পৌষ মাসে শুভ বিবাহ কি রকম? তুমি ব্রাহ্ম না খ্রীষ্টান? আজ বিবাহ তো তুমি এখানে কেন?

—আজ্ঞে আমি খাঁটি হিন্দু। বিবাহের অনুষ্ঠানটি আজ বেলা এগারোটায় রেজিস্ট্রেশন অফিসে সেরে ফেলেছি। সিভিল ম্যারেজ তো পাঁজি দেখে হবার জো নেই, রেজিস্ট্রারের মর্জি মাফিক লগ্ন স্থির হয়। বিয়েটা চুকে গেলেই ভাবলুম, এখন তো দিল্লিতে আমার চেনা-শোনা বেশী কেউ নেই, মাসতুতো ভাইএর বাসায় উঠেছি, সে আবার পেটরোগা মানুষ, ভাল জিনিস খাবার শক্তিই নেই। কিন্তু বিয়ের দিনে পাঁচ জনে মিলে, ফুর্তি, একটু খাওয়াদাওয়া না করলে চলবে কেন? আপনাদের কথা মনে এল, ধরতে গেলে আমার আত্মীয় বন্ধু বরপক্ষ কন্যাপক্ষ সবই আপনারা, তাই এখানে চলে এলুম। আমাদের কালীবাবু দেখছি অন্তর্যামী, ফীস্ট তৈরি করেই রেখেছেন। যা আছে দয়া করে তাই আজ আপনারা খান। কিন্তু এখানে আপনাদের খাইয়ে তো আমার সুখ হবে না, আমার আস্তানায় একদিন আপনাদের পায়ের ধুলো দিতেই হবে, বউভাত খেতে হবে। বেশী কিছু নয়, চারটি পোলাও, একটু মাংস, একটু পায়েস, আর ঘণ্টিওয়ালার দোকানের জাহানগিরী বালুশাই। মুখুজ্যে মশাই নিষ্ঠাবান লোক তা জানি, কালীবাড়ির পাঁঠাই আনব। আমার স্ত্রীর রান্না খুব চমৎকার, আপনারা খেয়ে নিশ্চয় তারিফ করবেন। আর একটি নিবেদন আছে সার। এখানকার মিউনিসিপাল অফিসে একটা কাজের চেষ্টা করছি, সার্ভেয়ার-আমিনের পোস্ট। মুখুজ্যে মশাই যদি দয়া করে একটু সুপারিশ করেন তো এখনি কাজটি পেয়ে যাই। ওঁকে সবাই খাতির করে কিনা।

রামতারণবাবু বললেন, তা না হয় একটা সুপারিশ পত্র লিখে দেওয়া যাবে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তোমার বয়েস তো পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি মনে হচ্ছে, এখন দ্বিতীয় পক্ষ বিবাহ করলে নাকি?

আজ্ঞে না সার, এই সবে প্রথম পক্ষ। এত দিন নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি, বিবাহে রুচিও ছিল না, ভেবেছিলুম নির্ঝঞ্ঝাটে জীবনটা কাটিয়ে দেব। কিন্তু তা হল না, শেষটায় বন্ধনে জড়িয়ে পড়লুম। শুনবেন সব কথা সার?

রামতারণ বললেন, বেশ তো শোনাই যাক তোমার কথা। অবশ্য যদি গোপনীয় কিছু না হয়।

জটাধর জিব কেটে বললেন, রাম বল, আমার জীবনে গোপনীয় কিছু নেই। এই জটাধর বকশী একটু আমুদে বটে, কিন্তু খাঁটী মানুষ, চরিত্রে কোনও কলঙ্ক পাবেন না। ও ম্যানেজার কালীবাবু, আপনি খাবার পরিবেশন করুন, খেতে খেতেই কথা হবে। শুনুন মশাইরা।—

যুদ্ধের সময় সত্যিই আমি নর্থ বর্মায় মিলিটারিতে চাকরি করতুম। বেয়াল্লিশ সালের গোড়ায় যখন জাপানীরা রেঙ্গুনে বোমা ফেলতে লাগল তখন ইংরেজের ওপর আর ভরসা রইল না, প্রাণের ভয়ে আমরা সবাই পালালুম। টামু-ইম্ফল রোড দিয়ে দলে দলে নানা জাতের মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো চলল, রোগে আর অপঘাতে কত যে মারা গেল তার সংখ্যা নেই। কাগজে সে সব কথা আপনারা পড়েছেন। অনেক কষ্টে আমি যখন বর্মা বর্ডার পার হয়ে ইম্ফলে এলুম তখন একটি মেয়ে আমার শরণাপন্ন হল। বড় করুণ কাহিনী তার, অল্প বয়সে অনেক দুঃখ পেয়েছে। স্বামীর নাম বলহরি জোয়ারদার, রেঙ্গুনে তার মোটর মেরামতের কারখানা ছিল, ভালই রোজগার করত। জাপানীরা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে

গেল, তাদের মোটর মেকানিকের বড় অভাব ছিল কিনা। যাবার সময় বলহরি তার বউকে বলল, অচলা, চললুম, এ জীবনে হয়তো আর দেখা হবে না। তুমি যেমন করে পার পালাও দেশে ফিরে যাবার চেষ্টা কর। অচলা কাঁদতে কাঁদতে একটি বাঙালী দলের সঙ্গে রওনা হল। দলের সবাই একে একে মারা গেল, কলেরায়, টাইফয়েডে, বাঘের পেটে। অবশেষে অচলা আধমরা অবস্থায় মণিপুরে পৌঁছুল। আমার স্বভাবটা কি রকম জানেন, লোকের দুঃখ দেখতে পারি না, বিশেষ করে মেয়েছেলের। অচলাকে বললুম, আমার সঙ্গেই চল, আমি যদি বেঁচে থাকি তুমিও বাঁচবে।

রামতারণবাবু প্রশ্ন করলেন, অচলার মা বাপ কোথা ছিল?

—হায় রে, তার আবার মা বাপ! তারা বহু কাল থেকে পেগু শহরে বাস করত, সেখানেই বলহরির সঙ্গে অচলার বিয়ে হয়। জাপানীরা এসে পড়লে অচলার মা বাপ ভাই বোন কে কোথায় পালাল, বাঁচল কি মরল কেউ জানে না। তার পর শুনুন। অচলাকে নিয়ে তো কোনও গতিকে বিপদের গণ্ডি পেরিয়ে এলুম। তার পর মশাই বারো বচ্ছর নানা জায়গায় কাজ করেছি, ডিব্রুগড়ে, চাটগাঁয়ে, নোয়াখালিতে, রংপুরে, আরও অনেক স্থানে। কোনও চাকরিই স্থায়ী নয়, থিতু হয়ে কোথাও বাস করতে পারি নি। অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে এই দিল্লিতে এসে পড়েছি। স্থির করেছি আর নড়ব না, এখানেই একটা কাজ জুটিয়ে নেব। কাজের যোগাড়ও প্রায় হয়েছে, এখন মুখুজ্যে মশাই একটু দয়া করলেই পেয়ে যাব।

রামতারণ বললেন, কণ্ট্রাক্টর সেকেন্দর সিংকে আমি বলব, তার ইনফ্লুএন্স আছে, সে তোমার জন্য চেষ্টা করবে। আচ্ছা, তুমি তো বহু কাল ভ্যাগাবণ্ড হয়ে ঘুরেছ, অচলা অ্যাদ্দিন কোথায় ছিল?

—কোথায় আর থাকবে সার, আমার কাছেই ছিল। মেয়েটা বড় ভাল। রং তেমন ফরসা নয়, কিন্তু মুখের খুব শ্রী আছে। প্রথম প্রথম বড় কান্নাকাটি করত, তার পর ক্রমশ সামলে উঠল। কিন্তু মাস দুই আগে দেখলুম আবার ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে অচলা? জবাব দিল, আমার মরণ হয় না কেন।...আরে ব্যাপারটা কি খোলসা করেই বল না। অচলা বলল, তোমার জন্যে কি আমাকে বিষ খেয়ে জলে ডুবে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে?...ভাল জ্বালা, আরে আমার অপরাধটা কি? অচলা বলল, লোকে যে আমার বদনাম রটাচ্ছে, তা শুনতে পাও না?...কি মুশকিল, তা আমাকে করতে বল কি? অচলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, অ জটাইবাবু, তোমার কি বুদ্ধি-শুদ্ধি কিচ্ছু নেই?

কপিল গুপ্ত বললেন, তা অচলা কিছু অন্যায় বলে নি।

জটাধর বললেন, না মশাই, অচলা কিছু অন্যায় বলে নি, আমারও বুদ্ধি-শুদ্ধি বিলক্ষণ আছে। বিবাহের বন্ধনে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না, কিন্তু প্রজাপতি যদি নারীর রূপ ধরে পিছনে লাগেন তবে তাঁর নির্বন্ধ এড়ানো পুরুষের সাধ্য নয়। কে এক কবি লিখেছেন না?—শারদ লতিকা সম ললিত ললনাকায়। বাজে কথা মশাই, ললনা হচ্ছেন ছিনে জোঁক। ভেবে দেখলুম অচলাকে বিয়ে করে ফেলাই ভাল। তার স্বামী বলহরির কোনও পাত্তাই নেই, নিশ্চয় মরেছে। কিন্তু হিন্দু পদ্ধতিতে বিয়ে করায় বিস্তর ঝঞ্ঝাট, তাই সিভিল ম্যারেজই স্থির করলুম। রেজিস্ট্রার লালা হন্‌সরাজ চোপরা অতি ভাল লোক। বললেন,

বারো বছর যখন কেটে গেছে তখন ভাববার কিছু নেই, স্বচ্ছন্দে বিয়ে কর। তাই আজ বিয়ে করে ফেললুম।

রামতারণবাবু বললেন, কিন্তু একটা কর্তব্য যে বাকী রয়ে গেল, পূর্বের স্বামীর শ্রাদ্ধ করা উচিত ছিল।

—তা আর বলতে হবে না সার, আমার কাজে খুঁত পাবেন না। বারো বছর পূর্ণ হবা মাত্র অচলা তার লোহা আর শাঁখা ভেঙে ফেলল, সিঁদুর মুছল, থান পরল। তাকে দিয়ে দস্তুর মতন শ্রাদ্ধ করালুম, পাঁচটি ব্রাহ্মণও খাওয়ালুম। সবে তিন দিন আগে তার অশৌচান্ত হয়েছে। তার পর সিভিল ম্যারেজ চুকে যেতেই অচলা আবার সধবার লক্ষণ ধারণ করেছে। হাঁ, ভাল কথা মনে পড়ল। ও কালী-বাবু, এই সাতটা চপ আমি পকেটে পুরলুম, নিজে গবগবিয়ে খাব আর সহধর্মিণীকে কিছু দেব না তা তো হতে পারে না। তেমন স্বার্থপর আমি নই। বেচারী পনরো দিন নিরামিষ খেয়ে আছে। এই সাতটা চপের দামও আমি দেব।

অতুল হালদার বললেন, খুব ইণ্টারেস্টিং ইতিহাস। আমি নোট করে নিয়েছি, আমাদের হিন্দুস্থান মিরর কাগজে ছাপব। আপনার কোনও আপত্তি নেই তো জটাধরবাবু?

—কিছুমাত্র না, স্বচ্ছন্দে ছাপুন। যদি চান তো আরও ডিটেল দিতে পারি, অচলা আর আমার ফোটোও দিতে পারি।

এই সময় একটি লোক টি ক্যাবিনের দরজার কাছে এসে ভাঙা গলায় বলল, জটাধর বকশী এখানে আছে?

আগন্তুক লোকটি রোগা, বেঁটে, পরনে ময়লা খাকী প্যাণ্ট, নীল জার্সি, তার উপর মোটা পট্টুর বুক খোলা কোট, হাতে একটা বড় রেঞ্চ। তার প্রশ্নের উত্তরে জটাধর বললেন, আমিই জটাধর বকশী। আপনি কে মশাই?

—তোমার যম। এই কথা বলেই লোকটি ঘরে এসে খপ করে জটাধরের হাত ধরল।

রামতারণ বললেন, কে হে তুমি এখানে এসে হামলা করছ? জান, এ হল ট্রেসপাস, ক্রিমিন্যাল কেস। নাম কি তোমার?

—আমার নাম বলহরি জোয়ারদার। আপনাদের কিছু বলছি না মশাই, আমার দরকার এই শালা জটাধরের সঙ্গে?

রামতারণ বললেন, অ্যাঁ, অবাক কাণ্ড! তুমিই অচলার ভূতপূর্ব স্বামী নাকি?

—শুধু ভূতপূর্ব নই মশাই, দস্তুর মতন জলজ্যান্ত বর্তমান স্বামী, ভবিষ্যতেও স্বামী। এই পাজী জটে শালাকে যদি জেলে না পাঠাই তো আমার নাম বলহরি জোয়ারদার নয়।

রামতারণ বললেন, আচ্ছা ফ্যাসাদ! কি হে জটাধর, এখন করবে কি?

জটাধর করুণ স্বরে বললেন, আমার সর্বনাশ হবে সার, আপনিই একটা ফয়সালা করুন। এই বলে জটাধর রামতারণের পা ধরলেন।

রামতারণ বললেন, স্থির হও জটাধর, এ সব ব্যাপারে মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। মীমাংসা তো অচলার হাতে। সে যদি বলে, এই লোকটিই তার স্বামী, তবে আর

কথা নেই, তোমাকে তাই মেনে নিতে হবে। ও জোয়ারদার মশাই, আপনি অচলার সঙ্গে দেখা করেছেন?

—তা আর আপনাকে বলতে হবে না, তার কাছ থেকেই তো আসছি। আমাকে দেখে মাগী বেদম কান্না শুরু করেছে। আমি ধমক দিতে বলল, জটাই-বাবুকে ডেকে আন, তাঁর অমতে কিছু করতে পারব না। ওঃ, জটাই যেন তাঁর গুরুঠাকুর।

রামতারণ বললেন, ব্যাপারটা বিশ্রী রকম জটিল হল দেখছি। অচলা যদি জটাধরের কাছেই থাকতে চায় আর বলহরি তাতে রাজী না হয় তবে তো মহা ফ্যাসাদ, আদালতের ব্যাপার। কিন্তু বেআইনী কাজ তো কিছু হয় নি। নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে—একটা শাস্ত্রবচন আছে না? বারো বছর কেটে গেলে রীতিমত শ্রাদ্ধশান্তির পরে অচলার পুনর্বিবাহ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভূতপূর্ব স্বামীর ফিরে আসাই অন্যায়।

কপিল গুপ্ত বললেন, এনক আর্ডেনের মতন মানে মানে সরে পড়াই উচিত ছিল।

বলহরি বলল, আহা কি কথাই বললেন মশাই, প্রাণ জুড়িয়ে গেল। নিজের স্ত্রীর কাছে আসব না তো এই জটেকে দেখে জিব কেটে পালাব নাকি?

জটাধর বললেন, আমি এই বলহরি জোয়ারদার মশাইকে খেসারত হিসেবে কিছু টাকা দিতে রাজী আছি। এখন পঞ্চাশ দিতে পারি, বাসায় গিয়ে আরও পঞ্চাশ—

বলহরি গর্জন করে বলল, চোপ রও শুয়ার, একশ টাকায় আমার বউ কিনতে চাও? একটা পাঁঠীও ও দামে মেলে না।

কপিল গুপ্ত বললেন, ওহে জোয়ারদার, একটু বুঝে-সুজে তম্বি ক'রো। তুমি তো তালপাতার সেপাই, জটাধরের চেহারাটি দেখছ তো? এক চড়েই তোমাকে সাবাড় করতে পারে।

—এঃ, চড় মারলেই হল! দেখছেন না, ব্যাটা ভয়ে কেঁচো হয়ে আছে। পাঁচটি বচ্ছর মঞ্চুরিয়ার জাপানীদের কাছে ছিলাম মশাই, জুজুৎসুর প্যাঁচ ভাল করেই শিখেছি। তার পর চীনেদের সঙ্গে সাত বছর কাটিয়েছি। ছাড়তে কি চায়? তিনটে কমরেডকে গলা টিপে মেরে পালিয়ে এসেছি। জটাধরকে দুটি আঙুলের টোকায় কাত করতে পারি। চল্ হতভাগা।

কাঁচপোকা যেমন প্রকাণ্ড আরশোলাকে ধরে নিয়ে যায় তেমনি বলহরি জোয়ারদার জটাধরের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলে গেল।

রামতারণ মুখুজ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! আহা বেচারা আজ দুপুরে বিয়ে করেছে আর সন্ধ্যাবেলায় এই বিশ্রী কাণ্ড। অচলা মেয়েটার জন্যে সত্যিই দুঃখ হচ্ছে।

ম্যানেজার কালীবাবু নিবিষ্ট হয়ে হিসাব করছিলেন। এখন উচ্চস্বরে বললেন, চুলোয় যাক অচলা, আজকের খরচা দেবে কে? জটাধর তো আপনাদের বোকা বানিয়ে সরে পড়ল।

কপিল গুপ্ত বললেন, সরে পড়েছে তাতে হয়েছে কি? আমরা তো নিজের নিজের খরচে খেতে প্রস্তুতই ছিলুম। কালীবাবু, তুমি আমাদের নামে নামে বিল তৈরি কর।

কালীবাবু বললেন, কিন্তু ওই জটাধর যে নিজেই বারোটা চপ্, চারখানা কেক, আর চারটে বড় পেয়ালা চা খেয়েছে, তা ছাড়া বউকে দেবে বলে সাতটা চপ পকেটে পুরেছে। মোট দাম হল ন টাকা ছ আনা। এ খরচ কে দেবে?

কপিল গুপ্ত বললেন, মোটে ন টাকা ছ আনা? দেড়খানা উপন্যাসের দাম। খরচটা আমাদের মধ্যেই চারিয়ে দাও, কি বলেন মুখুজ্যে মশাই? জটাধরের বিবেচনা আছে, বেশী ঠকায় নি।

বীরেশ্বর সিংগি বললেন, আমি তখনই বুঝেছিলুম যে ওই বলহরিই হচ্ছে জটাধরের মাসতুতো ভাই, সাতটা চপ তার পেটেই যাবে।

# তিরি চৌধুরী

করুণাময় দত্তগুপ্ত কৃতী পুরুষ, মুনসেফ থেকে ক্রমে ক্রমে জেলা জজ তার পর হাইকোর্টের জজ হয়েছেন। ঈস্টারের বন্ধ, সকাল বেলা বাড়িতে খাস কামরায় বসে তিনি চা খাচ্ছেন আর খবরের কাগজ পড়ছেন, এমন সময় একটি মেয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করল।

ষোল-সতরো বছরের সুশ্রী মেয়ে, পরিপাটি সাজ। জস্টিস দত্তগুপ্ত তার দিকে তাকাতে সে বলল, আমার ঠাকুন্দাকে আপনি চেনেন, সলিসিটার্স চৌধুরী অ্যান্ড সন্সের প্রিয়নাথ চৌধুরী। আমার নাম তিরি।

করুণাময় বললেন, ও তুমি প্রিয়নাথবাবুর নাতনী, আমাদের সোমনাথের মেয়ে? বস ওই চেয়ারটায়। তা তোমার নাম তিরি হল কেন?

—কি জানেন , আমার মামা অঙ্কের প্রফেসার, আর আমি হচ্ছি তৃতীয় সন্তান, তাই মামা আমার নাম রেখেছিলেন তৃতীয়া। নামটা কটমটে, আমি ছেঁটে দিয়ে তিরি করেছি।

—তা বেশ করেছ। এখন কি চাই বল তো?

—আজ্ঞে, আমার ঠাকুমা বড় দুর্ভাবনায় পড়েছেন, একেবারে মুষড়ে গেছেন, ভাল করে খাচ্ছেন না, ঘুমুতে পারছেন না। দয়া করে আপনি তাঁকে বাঁচান।

—ব্যাপারটা কি? যদি বৈষয়িক কিছু হয় তবে তোমার ঠাকুন্দা আর বাবাই তো তার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

—বৈষয়িক নয়, হার্দিক।

—সে আবার কি।

—হার্টের ব্যাপার।

—তা হলে হার্ট স্পেশালিস্ট ডাক্তারকে দেখাও, আমি তো তার কিছুই করতে পারব না।

—আপনি নিশ্চয় পারবেন সার। আপনি অনুমতি দিন, আজ সন্ধ্যে বেলা ঠাকুমাকে আপনার কাছে নিয়ে আসব।

—তা না হয় এনো। কিন্তু কি হয়েছে তা তো আগে আমার একটু জানা দরকার।

—ব্যাপারটা গোপনীয়, ঠাকুমাই আপনাকে জানাবেন। আপনি কিছু ভাববেন না সার, শুধু ঠাকুমাকে আশ্বাস দেবেন যে সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি কানে একটু কম শোনেন। আমি দরকার মতন আপনাকে প্রম্‌ট করব, ফিসফিস করে বাতলে দেব।

করুণাময় সহাস্যে বললেন, ও ঠাকুমার ব্যবস্থা তুমি নিজেই করবে, আমি শুধু সাক্ষিগোপাল হয়ে থাকবো?

—আজ্ঞে হাঁ। আমার কথা তো ঠাকুমা গ্রাহ্য করবেন না, আপনার মুখ থেকে শুনলে তাঁর বিশ্বাস হবে। আপনাকে দারুণ শ্রদ্ধা করেন কিনা। ঠাকুমা বলেন, হাইকোর্টের জজরা হচ্ছেন ধর্মের অবতার, হাইকোর্টের দৌলতেই ঠাকুর্দা আর বাবা করে খাচ্ছেন।

—বাঃ, ঠাকুমা তো বেশ বলেছেন! তোমার বাবা কি ঠাকুর্দা আসবেন না?

—না না না, তাঁরা এলে সব মাটি হবে। হাসবেন না সার, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। ঠাকুমার দুশ্চিন্তা আমার জন্যে নয়, আমার কোনও স্বার্থ নেই।

—বেশ, আজ সন্ধ্যায় তাঁকে নিয়ে এস।

সন্ধ্যার সময় তিরি তার ঠাকুমাকে নিয়ে করুণাময়ের বাড়িতে উপস্থিত হল। নমস্কার বিনিময়ের পর তিরি বলল, এই ইনি হচ্ছেন আমার ঠাকুমা শ্রীমতী কনকলতা চৌধুরানী, সলিসিটার প্রিয়নাথ চৌধুরীর স্ত্রী। আর ইনি হচ্ছেন মাননীয় মিস্টার জস্টিস শ্রীকরুণাময় দত্তগুপ্ত। ঠাকুমা, ইনট্রোডিউস করে দিলুম, এখন তুমি মনের কথা খোলসা করে বল।

কনকলতা ধমকের সুরে বললেন, আমি কেন বলতে যাব লা? বুড়ো মাগী লজ্জা করে না বুঝি? তোকে এনেছি কি করতে? যা বলবার তুই বল।

তিরি বলল, বেশ আমিই বলছি। শুনুন ইওর লর্ডশিপ—

করুণাময় বললেন, বাড়িতে লর্ডশিপ নয়।

—আচ্ছা, শুনুন সার। আমার ঠাকুর্দাকে তো দেখেছেন, খুব সুপুরুষ, যদিও পঁচাত্তর পেরিয়েছেন। আর আমার এই ঠাকুমাকেও দেখুন, বেশ সুন্দরী, নয়? যদিও সাতষট্টি বছর বয়সের দরুন একটু তুবড়ে গেছেন, পুরনো ঘটির মতন।

কনকলতা একটু কালা হলেও নিজের সম্বন্ধে কথা হলে বেশ শুনতে পান। বললেন, আরে গেল যা, ও সব কথা বলতে তোকে কে বলছে?

তিরি বলল, এই সবই তো আসল কথা। তার পর শুনুন সার। পঞ্চান্ন বছর আগে, ঠাকুর্দার বয়স যখন কুড়ি, তখন প্রভাবতী ঘোষ নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ হয়। বারো-তেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে, ঠাকুর্দা তাকে একবার দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু আমার প্রঠাকুর্দা, অর্থাৎ ঠাকুর্দার বাবা ছিলেন একটি অর্থগৃধ্র—

করুণাময় বললেন, অর্থগৃধ্নু?

—আজ্ঞে না, অর্থগৃধ্র, শকুনির মতন লোলুপ। তিনি পাঁচ হাজার টাকা বরপণ হেঁকে বসলেন। প্রভাবতীর বাবা ছিলেন গরীব ইস্কুল মাস্টার, কোথায় পাবেন অত টাকা? সম্বন্ধ ভেস্তে গেল। ঠাকুর্দা মনের দুঃখে দিন কতক হেমচন্দ্র আওড়ালেন —ওরে দুষ্ট দেশাচার কি করিলি অভাগার। তার পর এই কনকলতা ঠাকুমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল। তিনি ঠকেন নি, ছ হাজার টাকা বরপণ পেলেন, এক রূপসী হারিয়ে আর এক রূপসী ঘরে আনলেন।

করুণাময় প্রশ্ন করলেন, সেই আগেকার মেয়েটির কি হল?

—আমার সেই মাইট-হ্যাভ-বিন ঠাকুমা প্রভাবতীর? তিনি কুমারী হয়েই রইলেন, খুব লেখাপড়া শিখলেন, অনেক জায়গায় মাস্টারি করলেন, আমেরিকায় গিয়ে ডক্টর অভ এডুকেশন ডিগ্রী নিয়ে এলেন, শেষকালে পাতিয়ালা উইমিন্স কলেজের প্রিন্সিপালও

হয়েছিলেন। সম্প্রতি রিটায়ার করে কলকাতায় এসেছেন। তার পর হঠাৎ একদিন সলিসিটার চৌধুরী অ্যান্ড সনসের অফিসে উপস্থিত। কি সমাচার? না, আলিপুরে একটা ছোট বাড়ি কিনবেন, তারই দলিল আমার ঠাকুর্দাকে দেখাতে চান। ঠাকুর্দা তাঁর পরিচয় পেয়ে খুব খুশী—বুঝতেই পারছেন, পুরাতনী শিখা, ওল্ড ফ্লেম। তারপর প্রভাবতী আমাদের বাড়িতে ঘন ঘন আসতে লাগলেন, আর ঠাকুমা ফোঁস করে জ্বলে উঠলেন, কলেরাপটাশ আর চিনিতে অ্যাসিড ঠেকালে যেমন।

—সে আবার কি রকম? তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠাই তো শুনেছি।

—তার চাইতে ভীষণ। জানেন না সার? আমার মেজদা একদিন দেখিয়েছিল। কলেজ থেকে কলেরাপটাশ চুরি করে এনে তার সঙ্গে চিনি মিশিয়ে ন্যাকড়ার পুঁটলিতে বেঁধে তাতে কি একটা অ্যাসিড ঠেকাল, অমনি ফোঁস করে জ্বলে উঠল।

—প্রভাবতী দেখতে কেমন?

—এখনও খুব রূপ।

কনকলতা চেঁচিয়ে বললেন, শাঁকচুন্নী বাবা, একবারে শাঁকচুন্নী!

করুণাময় হেসে বললেন, তবে আপনার ভাবনা কিসের?

—ও জজসায়েব, তা বুঝি জান না? ডাকিনী যোগিনী শাঁকচুন্নীদের বলে কত ছলা কলা, পুরুষকে ভেড়া বানিয়ে দেয়। আর এই তিরির ঠাকুর্দাটিও বড্ড হাবাগোবা, শুধু কপালগুণেই টাকা রোজগার করে, নইলে বুদ্ধি কি কিছু আছে? ছাই, ছাই। তুমি বুঝিয়ে সুজিয়ে বুড়োকে ওই ডাকিনীর হাত থেকে উদ্ধার কর বাবা।

তিরি ফিসফিস করে বলল, দেখুন, ঠাকুর্দার কিছু দোষ নেই, তিনি প্রভাবতীর সঙ্গে শুধু ভদ্র ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আমার ঠাকুমাটি হচ্ছেন সেকেলে আর অত্যন্ত হিংসুটে। আপনি এঁকে বলুন—সব ঠিক হয়ে যাবে।

করুণাময় বললেন, আপনি কিছু ভাববেন না মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

তিরি বলল, সাত দিনের মধ্যেই।

করুণাময় বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সাত দিনের মধ্যেই আমি সব ঠিক করে দেব।

তিরি বলল, ঠাকুমা শুনলে তো? এখন বাড়ি চল, রাত্তিরে ভাল করে খেয়ো। কাল আবার আমি এঁর কাছে খবর নেব। এখন তো আপনার কোর্ট বন্ধ, নয় সার? তা হলে কাল সকালে আবার দেখা করব। এখন উঠি।

পরদিন সকালে তিরি এলে করুণাময় বললেন, তুমি একটি সাংঘাতিক মেয়ে। তোমার কথায় ঠাকুমাকে তো আশ্বাস দিলাম, কিন্তু তার পর কি করব? কাল সারা রাত আমি ঘুমুতে পারি নি। বড় বড় দেওয়ানী মামলার রায় আমি অক্লেশে দিয়েছি, ফাঁসির হুকুম দিতেও আমার বাধে নি। কিন্তু এরকম তুচ্ছ বেয়াড়া ব্যাপারে কখনও জড়িয়ে পড়ি নি। তোমার ঠাকুর্দা প্রিয়নাথবাবুকে আমি কি করে বলব—মশায়, আপনার অবুঝ গিন্নী বেচারীকে কষ্ট দেবেন না, প্রভাবতীকে হাঁকিয়ে দিন?

তিরি বলল, আপনাকে কিছুই করতে হবে না সার, শুধু সাক্ষী হয়ে থাকবেন। কাল আপনাকে এক তরফের ইতিহাস বলেছি, আজ অন্য তরফের ব্যাপারটা শুনুন।

—অন্য তরফ আবার কে? তোমার ঠাকুমা নাকি।

—আজ্ঞে হাঁ। আমি বিস্তর রিসার্চ করে যা আবিষ্কার করেছি তাই বলছি

শুনুন। ঠাকুন্দা প্রিয়নাথের সঙ্গে বিয়ে হবার আগে ঠাকুমা কনকলতার একটি খুব ভাল সম্বন্ধ এসেছিল, বাগবাজারের হারু মিত্তিরের ছেলে গৌরগোপাল মিত্তির, এখন যিনি অল্ডারম্যান হয়েছেন। আমার ঠাকুন্দা সুপুরুষ বটে, কিন্তু গৌরগোপাল হচ্ছেন সুপার-সুপুরুষ, মূর্তিমান কন্দর্প। তাঁর বয়স যখন উনিশ-কুড়ি তখন ঠাকুমাকে একবার লুকিয়ে দেখেছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই বারো বছরের নোলক-পরা বোধোদয়-পড়া খুকীর প্রেমে পড়েছিলেন। তখন ওই রকমই রেওয়াজ ছিল কিনা। তাঁর বাবা হারু মিত্তিরও মেয়েটিকে পছন্দ করলেন আর ছ হাজার টাকা পণে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হলেন। সব ঠিক, এমন সময় গৌরগোপালের আর এক সম্বন্ধ এল। বউবাজারের বিপিন দত্তর মেয়ে, একমাত্র সন্তান, অগাধ বিষয়, সব সেই মেয়ে পাবে। হারু মিত্তির বিগড়ে গেলেন। আমার প্রপিতামহ ছিলেন অর্থগৃধ্নু, কিন্তু হারু মিত্তির একবারে দুকানকাটা চশমখোর চামচিকে, চামার পয়সা-পিশাচ। আমার ঠাকুমা কনকলতাকে তিনি নাকচ করে দিলেন, সম্পত্তির লোভে বিপিন দত্তর সেই বিশ্রী মেয়েটার সঙ্গে ছেলের বিয়ে স্থির করলেন। ছেলে গৌরগোপাল রামচন্দ্রের মতন সুবোধ, এখনকার তরুণদের মতন একগুঁয়ে নয়। কনকলতার বিরহে তিনিও দিনকতক হেমচন্দ্র আওড়ালেন—আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে। তার পর শুভদিনে ভেলভেটের ভাড়াটে ইজের-চাপকান প'রে সঙ সেজে তক্তনামায় চড়ে অ্যাসিটিলীন জ্বালিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে সেই অগাধ বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী কুৎসিত মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেললেন। তার কিছু দিন পরেই ঠাকুমার সঙ্গে ঠাকুন্দার বিয়ে হল।

করুণাময় বললেন, খাসা ইতিহাস। এখন করতে চাও কি?

—আজ বিকেলে সেই গৌরগোপালবাবুর সঙ্গে দেখা করব, তার পর কর্তব্য স্থির করে আপনাকে জানাব। আজকের মতন উঠি সার।

গৌরগোপাল মিত্র বিকাল বেলা তাঁর প্রকাণ্ড বৈঠকখানা ঘরে প্রকাণ্ড ফরাসে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গড়গড়া টানছেন আর চৈতন্যভাগবত পড়ছেন—এমন সময় তিরি এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল।

গৌরগোপাল বললেন, তুমি কে দিদি? চিনতে পারছি না তো।

—আজ্ঞে আমার নাম তিরি।

—তিরি কেন? টেক্কা কি বিবি হলেই তো মানাত।

—আমি মা-বাপের তৃতীয় সন্তান কিনা তাই তিরি নাম। আমার ঠাকুন্দার নাম শুনেছেন বোধ হয়—সলিসিটার প্রিয়নাথ চৌধুরী, আপনারই সমবয়সী হবেন।

—ও, তুমি প্রিয়নাথ চৌধুরীর নাতনী? তাঁর সঙ্গে মৌখিক আলাপ নেই, তবে বছর চার আগে একটা মকদ্দমায় তিনি আমার বিপক্ষের আর্টর্নি ছিলেন। খুব ঝানু লোক।

—সে মকদ্দমায় আপনি জিতেছিলেন?

—না দিদি, হেরে গিয়েছিলুম, লাখ দুই টাকা লোকসান হয়েছিল।

—তবেই তো মুশকিল। হেরে গিয়েছিলেন তার জন্যে প্রিয়নাথ চৌধুরীর নাতনীর ওপর তো আপনার রাগ হবার কথা।

—আরে না না, তোমার ওপর রাগ করে কার সাধ্য! এখন বল তো কি দরকার।

তিরি মাথা নীচু করে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, আপনি হচ্ছেন আমার হতে-হতে-ফসকে-যাওয়া ঠাকুন্দা।

গৌরগোপাল বললেন, বুঝতে পারলুম না দিদি, খোলসা করে বল।

—পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা স্মরণ করুন দাদু। কনকলতা বলে একটি মেয়ে ছিল, তাকে মনে পড়ে?

—কনকলতা? সে আবার কে?

তিরি বলল, সেকি দাদু, এর মধ্যেই মন থেকে মুছে ফেলেছেন? হায় রে হৃদয়, তোমার সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়! বারো বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে, একবার দেখেই তাকে আপনি ভীষণ ভালবেসেছিলেন। তার সঙ্গে আপনার বিয়ের সম্বন্ধও স্থির হয়েছিল, কিন্তু শেষটায় আপনার বাবা ভেস্তে দিলেন। কিছু মনে পড়ছে না?

—হাঁ হাঁ, এখন মনে পড়েছে, নামটা কনকলতাই বটে। ওঃ, সে তো মান্ধাতার আমলের কথা, লর্ড এলগিন কি কার্জনের সময়। তা কনকলতার কি হয়েছে?

—তিনিই আমার ঠাকুমা। ঠাওর করে দেখুন তো, পঞ্চান্ন বছর আগে দেখা সেই মেয়েটির সঙ্গে আমার চেহারার কিছু মিল পান কিনা। আপনি যদি অত পিতৃভক্ত না হতেন, একটু জেদ করতেন, তবে সেই কনকলতার সঙ্গেই আপনার বিয়ে হত, আপনিই আমার ঠাকুন্দা হতেন।

—ওঃ, কি চমৎকার হত! আমার কপাল মন্দ তাই তোমার ঠাকুন্দা হতে পারি নি। কিন্তু এখনই বা হতে বাধা কি? আমার তিন তিনটে নাতি আছে, অবশ্য তোমার মতন সুন্দর নয়। তাদের একটাকে বিয়ে করে ফেল না? ডাকব তাদের?

—এখন থাক দাদু। আমি বি. এ. পাশ করব, এম. এ. পাশ করব, বিলেতে যাব, তার পর সংসারের চিন্তা। শেকস্পীয়ার পড়েছেন তো? আমি এখন ইন মেডেন মেডিটেশন ফ্যান্সি ফ্রী। ছ বছর পরে যদি আপনার কোন নাতি আই-বুড়ো থাকে তো আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

—জো হুকুম তিরি দেবী চৌধুরানী। কি দরকারে এসেছ তা তো বললে না?

—সেই ছোট্ট কনকলতা মেয়েটি এখন কত বড়টি হয়েছে দেখতে আপনার ইচ্ছে হয় না দাদু?

—এতদিন তো তার কথা মনেই ছিল না, তবে আজ তোমাকে দেখে তোমার ঠাকুমাকেও দেখবার একটু ইচ্ছে হচ্ছে বটে। কি লেখাই হেম বাঁড়ুজ্যে লিখে গেছেন—ছিন্ন তুষারের ন্যায় বাল্যবাঞ্ছা দূরে যায় তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রহারে! কিন্তু তোমার ঠাকুমা তো আমাকে চিনবেন না। আমি তাঁকে লুকিয়ে দেখে-ছিলুম বটে, কিন্তু তিনি আমাকে কখনও দেখেন নি।

—নাই বা দেখলেন। শুনুন দাদু—আসছে শনিবার আমার জন্মদিন, আপনাকে আমাদের বাড়ি আসতেই হবে, এখানকার ঠাকুমাকেও নিয়ে যাবেন। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে চাই।

—দেখা তো হবে না দিদি। তিনি এখানে নেই, দু বছর হল স্বর্গে গেছেন। সেখানে তাঁর অনেক কাজ, ঘর-দোর জিনিসপত্র পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখবেন, চাকরদের তো বিশ্বাস করেন না, হলই বা স্বর্গের চাকর। আমি সেখানে গিয়েই

যাতে চটি জুতো, ফুলেল তেল, নাইবার গরম জল, সরু চালের ভাত, মাগুর মাছের ঝোল, চিনিপাতা দই, পানছেঁচা আর তৈরী তামাক পাই তার ব্যবস্থা করে রাখবেন।

—সতী-লক্ষ্মী স্বর্গে গিয়েও ধান ভানবেন! তবে কি আর হবে, আপনি একাই আসবেন, আমি কাল নিমন্ত্রণের কার্ড পাঠিয়ে দেব।

তিরি প্রণাম করে বিদায় নিল, তার পর জস্টিস করুণাময় দত্তগুপ্ত আর ডক্টর প্রভাবতী ঘোষের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরল।

তিরির বিস্তর বন্ধু, ইরা ধীরা মীরা ঝুনু বেণু রেণু উল্লোলা কল্লোলা হিল্লোলা প্রভৃতি একটি দঙ্গল। তিরি তাদের বলেছে, জানিস, আমি ঠিক রাত বারোটায় জন্মেছিলুম, একেবারে জিরো আওআর। কাজেই কোন্‌টা জন্মদিন, আগেরটা কি পরেরটা তা বলা যায় না। এখন থেকে দুটো জন্মদিন ধরব। আসছে শনিবার বিকেলে শুধু বুড়ো বুড়ীরা চা খেতে আসবে। রবিবার তোরা সবাই আসবি, হুল্লোড় করবি, গণ্ডে-পিণ্ডে গিলবি। বুঝেছিস? বন্ধুরা সমস্বরে জবাব দিয়েছে —আসিব আসিব সখী নিশ্চয় আসি-ই-ই-ব।

শনিবার বিকালে প্রিয়নাথ চৌধুরীর বাড়িতে জস্টিস করুণাময় দত্তগুপ্ত, অল্ডারম্যান গৌরগোপাল মিত্র আর ডক্টর প্রভাবতী ঘোষ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছেন। বাইরের লোক আর কেউ নেই। বাড়ির লোক আছেন তিরির ঠাকুন্দা ঠাকুমা বাবা মা আর স্বয়ং তিরি।

মাননীয় অতিথিদের সংবর্ধনা, সকলের সঙ্গে পরিচয়, আর উপহারের জন্য প্রশংসা শেষ হলে করুণাময়কে তিরি চুপিচুপি বলল, এইবার আপনার ভাষণটি বলুন সার।

করুণাময় বললেন, কল্যাণীয়া তিরির জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই যে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি, এটি একটি সামান্য পার্টি নয়। বিধাতার বিধানে যা ঘটে তা মাথা পেতে মেনে নেওয়া ছাড়া মানুষের গত্যন্তর নেই, কিন্তু কেউ কেউ ভবিতব্যকে অন্য রকমে কল্পনা করতে ভালবাসে। এই ধরুন—দশরথ যদি স্ত্রৈণ না হতেন, গোসাঘরে ঢুকে কৈকেয়ীকে একটি চড় লাগাতেন, তবে রামায়ণ অন্য রকমে লেখা হত। শান্তনু যদি বুড়ো বয়সে একটা মেছুনীর প্রেমে না পড়তেন তবে ভীষ্মই কুরুরাজ হতেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও হয়তো হত না। অষ্টম এডোআর্ড যদি একগুঁয়ে না হতেন, প্রাইম মিনিস্টার আর আর্চবিশপদের ফরমাশ অনুসারে বিবাহ করতেন তবে তাঁকে সিংহাসন ছাড়তে হত না। আমাদের এই তিরি মেয়েটি বিধাতার সঙ্গে ঝগড়া করে না, কিন্তু তাঁর বিধানের সঙ্গে আরও কিছু জুড়ে দিয়ে আত্মীয়ের গণ্ডি বাড়াতে চায়। সে জন্য সে তার হলেও-হতে-পারতেন ঠাকুন্দা আর ঠাকুমাকে এখানে ধরে এনেছে। তিরির আসল ঠাকুন্দা আর ঠাকুমা তো বাড়িতেই আছেন, তার বিকল্পিত ঠাকুন্দা শ্রদ্ধেয় অল্ডারম্যান গৌরগোপালবাবু আর বিকল্পিতা ঠাকুমা শ্রদ্ধেয়া ডক্টর প্রভাবতী ঘোষও দয়া করে এখানে এসেছেন। প্রিয়জনের এই সমাগমে তিরি যেমন ধন্য হয়েছে আমরাও তেমনি আনন্দলাভ করেছি।

কনকলতা তিরিকে জনান্তিকে বললেন, ওই বুড়ো আর বুড়ীটাকে এখানে কে আনলে রে?

তিরি বলল, গৌরগোপাল আর প্রভাবতী? আমি তো জানি না, জস্টিস

দত্তগুপ্ত হয়ত বাবাকে বলে থাকবেন। ঠাকুমা, তোমার ওই ফসকে-যাওয়া বর গৌরগোপালবাবু কি সুন্দর দেখতে! আহা, ওঁর সঙ্গে তোমার যদি বিয়ে হত তা হলে বাবার রং আরও ফরসা হত, আর আমারও রূপ উথলে উঠত, একেবারে ঢলঢল কাঁচা অঙ্গেরি লাবনি!

কনকলতা বললেন, দূর হ মুখপুড়ী, তোর মুখের বাঁধন কি একটুও নেই?

—কিন্তু ভাগ্যিস প্রভাবতীর সঙ্গে ঠাকুন্দার বিয়ে হয় নি, তা হলে আমার মুখটা চীনে প্যাটার্ন হত। ঠাকুমা, তোমারই জিত। পঞ্চান্ন বছর আগে ওই প্রভাবতীর একটা বর হাতছাড়া হয়েছিল, কিন্তু এত পাশ করেও উনি এ পর্যন্ত আর একটা বর জোটাতে পারলেন না, অথচ তুমি একমাসের মধ্যেই জুটিয়েছিলে, যদিও বিদ্যে বোধোদয় পর্যন্ত। তুমি কিন্তু গৌরগোপালবাবুর দিকে অমন করে আড়চোখে তাকিও না বাপু, ঠাকুন্দা মনে করবেন কি?

কনকলতা রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, কই আবার তাকাচ্ছি! কি বজ্জাত মেয়ে তুই! ও মাস্টার দিদি প্রভা, এই তিরিটাকে বেত মেরে সিধে করতে পার না? জ্বালিয়ে মারল আমাকে।

প্রভাবতী বললেন, তিরি, ঠাকুমাকে জ্বালিও না, এস আমার কাছে।

প্রভাবতী আর গৌরগোপাল পাশাপাশি ছিলেন। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাঁদের কাছে বসে পড়ে তিরি বলল, আর জ্বালাবার দরকার হবে না, ঠাকুমা ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন। কিন্তু আসল কাজ যে এখনও বাকী রয়েছে। আপনারা কিছু মনে করবেন না, আমি একটু স্বগতোক্তি করছি, যাকে বলে সলিলোকি।—প্রিয়নাথের সঙ্গে প্রভাবতীর বিয়ে হতে হতে হল না। আচ্ছা, তা না হয় না হল। গৌরগোপালের সঙ্গেও কনকলতার বিয়ে হতে হতে হল না। তাও না হয় না হল। কিন্তু প্রজাপতির নির্বন্ধে শেষটায় প্রিয়নাথের সঙ্গে কনকলতার বিয়ে হয়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে চিরকুমারী প্রভাবতী আর নবকুমার গৌরগোপালের কি করা উচিত? বিধাতার ইঙ্গিত কি?

প্রভাবতী বললেন, বিধাতার ইঙ্গিত—তোমাকে আচ্ছা করে বেত লাগানো দরকার।

গৌরগোপাল বললেন, আমার বাড়িতে পালিয়ে চল দিদি, কেউ বেত লাগাবে না।

তিরি বলল, হায় হায়, দেওয়ালের লেখা আপনাদের নজরে পড়ছে না? প্রজাপতির নির্বন্ধ বুঝতে পারছেন না? নাঃ, আপনাদের মনে কিছুমাত্র রোমান্স নেই, দুজনে মনে প্রাণে বুড়িয়ে গেছেন, বাহ্যাভ্যন্তরে শক্ত পাথর হয়ে গেছেন, একেবারে পাকুড় স্টোন। ভাগ্যিস আপনাদের সঙ্গে ঠাকুন্দা আর ঠাকুরমার বিয়ে ভেস্তে গিয়েছিল, নয়তো আমার বুড়ো ঠাকুন্দাকে বেত খেতে হত, আর বুড়ী ঠাকুমাকে বাঁদি হয়ে জন্ম জন্ম পান ছেঁচতে হত।

কনকলতা করুণাময়কে বললেন, হ্যাঁগা জজসাহেব, তিরি হাত নেড়ে ওদের কি বলছে?

—বোধ হয় ধমক দিচ্ছে।

—ছি ছি, মেয়েটার আক্কেল মোটে নেই, ভদ্রজন বাড়িতে এসেছে, তাদের ওপর তম্বি! ওর ঠাকুন্দা আশকারা দিয়ে মাথাটি খেয়েছে। তুমি ওকে খুব করে বকুনি দিও বাবা, বাড়ির লোককে তো গ্রাহ্যি করে না।

# শিবলাল

আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে মানিকতলা বাজারের দিকে যাচ্ছি। সিটি কলেজের কাছে এসে দেখি লোকারণ্য, দু-তিন জন লালপাগড়ি পুলিসও রয়েছে। ভিড় থেকে একটি ছেলে এগিয়ে এল। তার ব্যাজ নেই তবু ভঙ্গী দেখে বোঝা যায় যে সে একজন স্বেচ্ছাসেবক। হাত নেড়ে আমাকে বলল, যাতায়াত বন্ধ, এইখানে সবুর করুন।

জিজ্ঞাসা করলাম. কি হয়েছে? এত ভিড় কিসের?

—দেখুন না কি হচ্ছে। শিবলাল ভার্সস লোহারাম।

কিছুই বুঝলাম না। ছেলেটি ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে অন্যত্র গেল। একজন কনস্টেবলকে দেখে বললাম, ক্যা হুআ জমাদারজী?

দাঁত বার করে জমাদারজী বললেন, আরে কুছ নহি বাবু।

পুলিসের হাসি দুর্লভ। বুঝলাম দুর্ঘটনা নয়, কোনও তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু এত ভিড় কিসের জন্যে? যাতায়াত বন্ধ কেন? লোকে উদ্‌গ্রীব হয়ে কি দেখছে? কুস্তি হচ্ছে নাকি?

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক অতি কষ্টে ভিড় ভেদ করে উলটো দিক থেকে আসছেন। ছেলেরা তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তিনি জোর করে চলে এলেন। আমার কাছে পৌঁছতেই বললাম, কি হয়েছে মশায়?

এই সময় ভিড়ের মধ্য থেকে হাততালির শব্দ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে জনকতক ধমক দিল—চোপ. চোপ. গোল করবে না।

চুপি চুপি আবার প্রশ্ন করলাম, কি হয়েছে মশায়?

ভদ্রলোক বললেন, হয়েছে আমার মাথা। বেলা সাড়ে চারটের মধ্যে শ্যামবাবুর বাড়িতে পৌঁছুবার কথা, তা দেখুন না, ব্যাটারা পথ বন্ধ করে খামকা দেরি করিয়ে দিল।

একজন সৌম্যদর্শন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক আমার কাছে এলেন। তাঁর মাথায় টিকি, কপালে বিভূতির ত্রিপুণ্ড্রক, মুখে প্রসন্ন হাসি। আমাকে বললেন, কি হয়েছে জানতে চান? আসুন আমার সঙ্গে। ও তিনু, ও কেষ্ট, একটু পথ করে দাও তো বাবারা।

তিনু আর কেষ্ট দুই স্বেচ্ছাসেবক কনুইএর গুঁতো দিয়ে পথ করে দিল. আমরা এগিয়ে গেলাম। সঙ্গী ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম হরদয়াল মুখুজ্যে. এই পাড়াতেই বাস। মশায়ের নাম?

—রামেশ্বর বসু। আমিও কাছাকাছি থাকি, বাদুড়বাগানে।

ভিড় ঠেলে আরও কিছু দূর আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে হরদয়ালবাবু আঙুল বাড়িয়ে বললেন, দেখতে পাচ্ছেন?

দেখলাম দুটো ষাঁড় লড়াই করছে। গর্জন নেই, নড়ন চড়ন নেই, কিন্তু শীতল

সমর বলা যায় না, নীরব উষ্মা দুই যোদ্ধারই বিলক্ষণ আছে। একটি ষাঁড় প্রকাণ্ড, দেখেই বোঝা যায় বয়স হয়েছে, ঝুঁটি আর শিং খুব বড়, গলা থেকে থলথলে ঝালর নেমে প্রায় মাটিতে ঠেকেছে। অন্যটি মাঝারি আকারের, বয়সে তরুণ হলেও বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর তেজস্বী। দুই ষাঁড় শিং জড়াজড়ি করে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে পরস্পরকে ঠেলে ফেলবার চেষ্টা করছে। টগ-ওভ-ওআরের উলটো, টানাটানির বদলে ঠেলাঠেলি।

হরদয়াল বললেন, প্রায় এক ঘণ্টা এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলছে। প্রবীণ ষাঁড়টির নাম শিবলাল, আর তরুণটির নাম লোহারাম। স্বয়ং শিব কর্তৃক লালিত সেজন্য শিবলাল নাম। লোহারাম হচ্ছে এই পাড়ার ষাঁড়, লোহাওয়ালারা ওকে খেতে দেয়। লড়াই শুরু হতেই ওরা ওর ওপর বাজি ধরেছে। ওদের বিশ্বাস, ওই নওজওআন লোহারামের সঙ্গে বুড়ো শিবলাল পেরে উঠবেন না। কিন্তু পাড়ার বাঙালীরা জানে যে শেষ পর্যন্ত শিবলালেরই জয় হবে।

গান্ধী টুপি আর লম্বা কোট পরা এক ভদ্রলোক হরদয়ালের কথা শুনছিলেন। তিনি একটু ভাঙা বাংলায় বললেন, এ হরদয়ালবাবু, এর ভিতর প্রাদেশিকতা আনবেন না। এই লড়াই বিহার আর বঙ্গালের মধ্যে হচ্ছে না।

হরদয়াল বললেন, নিশ্চয়ই নয়। লোহারাম এই পাড়ার ষাঁড়, বিহারী কালোয়াররা ওকে খেতে দেয়, সেজন্য লোহারামকে বিহারী বলা যেতে পারে। কিন্তু শিবলাল বাঙালী নন, সর্বভারতীয় কস্মপলিটন ষণ্ড। এঁর জন্মভূমি কোথায় তা কেউ জানে না। তবে এঁর সম্বন্ধে আমার একটা থিওরি আছে, এঁর ইতিহাসও আমি কিছু কিছু জানি।

টুপিধারী লোকটি একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে চলে গেলেন। আমি বললাম, ইতিহাসটি বলুন না হরদয়ালবাবু।

হরদয়াল বললেন, সবুর করুন। লড়াইটা চুকে যাক, তারপর আমার বাড়িতে আসবেন, চা খাবেন, শিবলালের কথাও শুনবেন।

লড়াই শেষ হতে দেরি হল না। শিবলাল হঠাৎ একটি প্রকাণ্ড গুঁতো লাগাল। লোহারাম ছিটকে সরে গেল, তার পর ল্যাজ উঁচু করে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে পালাল। দর্শকরা চিৎকার করে বলতে লাগল, শিবলালজী কি জয়! লোহা-রাম দুও।

প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিতাড়িত করে শিবলাল গজেন্দ্রগমনে হেলে দুলে চলল, না জানি কি জানি হয় পরিণাম দেখবার জন্যে আমরাও তার পিছু নিলাম। একটা বাঙালী ময়রার দোকানের সামনে পিতলের থালায় শিঙাড়া আর নিমকি সাজানো রয়েছে। শিবলাল তাতে মুখ দিল। ত্রস্ত হয়ে ময়রা হাঁ হাঁ করে উঠল। দর্শকেরা ধমক দিয়ে বলল, খবরদার, বাধা দিও না, পেট ভরে খেতে দাও, তোমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে এমন অতিথি পেয়েছ। দু থালা নিঃশেষ করে শিবলাল এদিক ওদিক তাকাচ্ছে দেখে একজন ভলান্টিয়ার তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, এগিয়ে এসো বাবা।

পাশেই একটি হিন্দুস্থানী হালুইকরের দোকান। সামনের বারকোশে সদ্য ভাজা দালপুরির স্তূপ দেখিয়ে ভলান্টিয়ার বলল, যত খুশি খাও বাবা। আপত্তি নিষ্ফল জেনে হালুইকর চুপ করে রইল। অচিরাৎ দালপুরি শেষ হল। একটি ছেলে দোকানের ভিতরে ঢুকে ছোলার দাল, আলুর দম, আর জিলিপির গামলা টেনে

এনে সামনে রাখল। শিবলাল সমস্ত উদরস্থ করে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করতে লাগল। দর্শকরা বলল, আর কি আছে জলদি নিকালো। দোকানদার বিষন্ন মুখে বলল, কুছ ভি নহি, সব খা ডালা।

হরদয়ালবাবু হাতে একটু জল নিয়ে শিবলালের গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, নমঃ শিবায়। শিবলাল ফোঁস ফোঁস শব্দ করে বিবেকানন্দ রোডের দিকে চলে গেল।

হরদয়ালবাবুর বাড়ি কাছেই। কৌতূহলের বসে আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। বাইরের ঘরে ফরাসের উপর আমাকে বসিয়ে হরদয়াল চাকরকে হুকুম করলেন, ওরে, জলদি এর জন্যে চা তৈরি করে আন।

আমি বললাম, আপনি ব্যস্ত হবেন না, এ সময় চা খাওয়া আমার অভ্যাস নেই। শুধু শিবলালের ইতিহাস শুনব। আপনার কি একটি থিওরি আছে বলেছিলেন, তাও শুনতে চাই।

হরদয়াল বললেন, সবই বলব। চা খাবেন না তো একটু শরবত আনতে বলি? খুব মাইল্ড সিদ্ধির শরবত? বৃদ্ধ বয়সে একটু খাওয়া ভাল। তাও নয়? সিগারেট?

—ওসব কিছুই দরকার নেই। আপনি শিবলালের কথা বলুন।

—বেশ, তাই বলছি শুনুন। এই যে শিবলালজীকে দেখেছেন, এঁকে সামান্য ষাঁড় মনে করবেন না। মাদাম ব্লাভাৎস্কি বলেছেন, মানবের চাইতেও যেমন বড় আছেন মহামানব বা সুপারম্যান, তেমনি পশুর ওপর আছেন মহাপশু, সুপারবীস্ট। হিমালয়বাসী স্নোম্যান হচ্ছেন সেইরকম প্রাণী। এঁদের বড় একটা দেখা যায় না, কালে ভদ্রে লোকালয়ে আগমন করেন। এই শিবলাল হচ্ছেন একজন সুপারবীস্ট। মহোক্ষ জানেন? সংস্কৃত গ্রন্থে অনেক উল্লেখ আছে। মহোক্ষ মানে মহাষণ্ড, উক্ষ আর ইংরিজী অক্স একই শব্দ। শিবলালের প্রথম আবির্ভাব কোথায় হয়েছিল, বর্তমান বয়স কত, তা কেউ জানে না। আমার পিতামহ ওঁকে কাশীতে দেখেছিলেন। আবার তাঁর পিতামহ ওঁকে হরিদ্বারে দেখেছিলেন। তবেই বুঝুন ওঁর বয়সটা কত। আর, চেহারাটি দেখুন, আমাদের বাংলা ষাঁড় কিংবা ভাগলপুর সীতামাড়ি বা হিসারের ষাঁড়, কারও সঙ্গে মিল নেই। মহেঞ্জোদারো আর হরপ্পার যে সব পোড়া মাটির সীল পাওয়া গেছে তার ছবি দেখেছেন তো? তাতে যে মহাষণ্ডের মূর্তি আছে তার সঙ্গে এই শিবলালের রূপ মিলিয়ে দেখুন। সেই বিশাল বপু, সেই উন্নত ককুদ, সেই বৃহৎ শৃঙ্গ, সেই ভূলুণ্ঠিত গলকম্বল। প্রাচীন সৈন্ধব জাতি অর্থাৎ ইন্ডস ভ্যালির লোকরা শৈব ছিলেন। তাঁদের উপাস্য দেবতা শিবের বাহন যে মহোক্ষ, তাঁরই মূর্তি পোড়া মাটির মুদ্রায় অঙ্কিত আছে। আমার থিওরিটা কি জানেন? এই শিবলালজীই হচ্ছেন পুরাকালীন সৈন্ধব জাতির মহোক্ষ, এখন পর্যন্ত ধরাধামে আছেন। এতটা যদি বিশ্বাস নাও করেন তবে এ কথা মানতে বাধা নেই যে শিবলাল সেই সৈন্ধব মহোক্ষেরই বংশধর। কি বলেন আপনি?

—অসম্ভব নয়।

—আচ্ছা, এখন এঁর কীর্তিকলাপ শুনুন। চার বছর আগে ইনি কাশীতে বিশ্বনাথ মন্দিরের নিকটে বিচরণ করতেন। একদিন ভোরবেলা মন্দিরের দরজার সামনে নিদ্রিত ছিলেন, একজন পাণ্ডা এঁকে ঠেলা দিয়া তাড়াবার চেষ্টা করে। যখন কিছুতেই উঠলেন না তখন পাণ্ডা লাথি মারতে লাগল। শিবলাল ক্রুদ্ধ হয়ে

শিং দিয়ে পান্ডার পেট ফুটো করে দিলেন। তারপর থেকে কাশীধামে ও'কে আর দেখা গেল না। মাস দুই পরে উনি ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় বৈদ্যনাথের মন্দিরে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাওয়া গেল, ঝাঁঝার জঙ্গলে একটা রয়াল বেঙ্গল টাইগারের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, কোনও মহাকায় প্রাণী শিঙের গুঁতোয় তার পেট ফুটো করেছে, পা দিয়ে মাড়িয়ে সর্বাঙ্গ চূর্ণ করে দিয়েছে। এই শিবলালজীরই কর্ম তাতে সন্দেহ নেই। পান্ডাদের পরিচর্যায় ও'র ঘা শীঘ্রই সেরে গেল। কিন্তু কি একটা অসম্মানের জন্যে বিরক্ত হয়ে উনি বৈদ্যনাথধাম ত্যাগ করলেন এবং ঘুরতে ঘুরতে তারকেশ্বরে এলেন। আবার দিন কতক পরে সেখান থেকে চুঁচড়োর ষাঁড়েশ্বর তলায় উপস্থিত হলেন। প্রায় তিন বছর হল সেখান থেকে কালীঘাটে এসে নকুলেশ্বর মন্দিরের কাছে আস্তানা করেছেন। আজকাল সেখানেই রাত্রিযাপন করেন, দিনের বেলায় শহরের নানা স্থানে পর্যটন করে বেড়ান।

আমি বললাম, চমৎকার ইতিহাস। আচ্ছা, বসুন আপনি, আমি এখন উঠি।

হরদয়ালবাবু হাত নেড়ে বললেন, আরে এখনই উঠবেন কি? শিবলালজীর যা শ্রেষ্ঠ কীর্তি, মহত্তম অবদান, তাই বাকী রয়েছে। বলছি শুনুন। কামধেনু ডেয়ারি ফার্মের নাম শুনেছেন?

—আজ্ঞে হাঁ। সেখান থেকেই তো আমার বাড়িতে দুধ আসত। শেষকালে ওদের কুবুদ্ধি হল, মোষের দুধ, গুঁড়ো দুধ, জল, এইসব মিশিয়ে খদ্দের ঠকাতে লাগল। তখন তাদের দুধ নেওয়া বন্ধ করলাম।

—প্রায় দু বছর হল কামধেনু ডেয়ারি ফেল হয়েছে। কেন ফেল হল জানেন? ওই বাবা শিবলালের কোপে পড়ে। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। কামধেনু ডেয়ারির তিন শ গরু ছিল, ঢাকুরের ওদিকে বড় বড় গোয়ালে তারা থাকত। সকালে দুধ দোহার পর আট-দশ জন রাখাল তাদের গড়ের মাঠে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিত। দিন ভর তারা ঘাস খেত, তারপর বেলা পড়লে রাখালরা তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেত।

সেই সময় শিবলাল চুঁচড়ো থেকে কালীঘাটে আগমন করেন। উনি সমস্ত দিন টোটো করে ঘুরতেন, সন্ধ্যের কিছু আগে গড়ের মাঠে গিয়ে খানিকক্ষণ নিরিবিলিতে বায়ুসেবন করতেন। একদিন কি খেয়াল হল, বেলা তিনটের সময় মাঠে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, একপাল নধর গরু চরে বেড়াচ্ছে। শিবলাল প্রীত হয়ে নাসিকা উত্তোলন করে কয়েকবার হর্ষসূচক ঘোঁত ঘোঁত ধ্বনি করলেন। [illegible]র যায় কোথা! সেই আহ্বান শুনে কামধেনু ডেয়ারির তিন শ গরু হাম্বা রব করে ছুটে এসে শিবলালকে বেষ্টন করল। রাসমন্ডলের মধ্যবর্তী গোপিকাবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শিবলাল শোভমান হলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি মাঠ ত্যাগ করে সবেগে চললেন, সমস্ত গরু অভিসারিকা হয়ে তাঁর অনুসরণ করল। হেস্টিংস ছাড়িয়ে ডায়মন্ড-হারবার রোড দিয়ে শিবলালের অনুগামিনী ধেনুবাহিনী মার্চ করে চলল, রাখালরা লাঠি নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করল। কিন্তু তিন শ গরু যদি স্বেচ্ছায় একটি ষাঁড়ের সঙ্গে ইলোপ করে তবে তাদের আটকাবে কে? বেগতিক দেখে কয়েক জন রাখাল ফিরে গিয়ে কর্তাদের খবর দিল। তখন তিন জন ডিরেক্টর—গোবরচন্দ্র ঘোষ, গোবর্ধনলাল মাথুর, আর হাজী কোরবান আলী মোটরে চড়ে ছুটলেন, একটা লরিতে তাঁদের অনুচররাও চলল। মগরাহাটের কাছাকাছি এসে দেখলেন, একটি মাঠে শিবলালজী তাঁর সঙ্গিনীদের সঙ্গে ঘাস খাচ্ছেন। কর্তারা স্থির করলেন, ওই ষাঁড়টিকে কাবু না করলে তাঁদের গোধন উদ্ধার করা যাবে না। তাঁদের হুকুমে

জনকতক সাহসী লোক লাঠি নিয়ে শিবলালজীকে আক্রমণ করল। তখন সমস্ত গরু একযোগে শিং বাগিয়ে তেড়ে এল, ডেয়ারির লোকরা ভয় পেয়ে পালাল। কর্তারা হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন, কয়েকজন রাখাল গরুদের ওপর নজর রাখবার জন্যে সেখানে রয়ে গেল।

তারপর ডেয়ারির কর্তারা আরও তিন-চার দিন গরু চরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না। শেষকালে স্থির করলেন যে মগরাহাটের ওই মাঠটা লীজ নিয়ে ওখানেই ডেয়ারির জন্য গোশালা করবেন। ভেজাল দুধ দিয়ে কোনও রকমে খদ্দের ঠেকিয়ে রাখা হল, ওদিকে জমির মালিকের সঙ্গেও কথাবার্তা চলতে লাগল। তখন আর এক বিপদ উপস্থিত। শিবলালজী মুক্ত জীব, বেশী দিন সংসার মায়ায় বদ্ধ হয়ে থাকতে পারবেন কেন? সাত দিন পরেই তাঁর গোষ্ঠ-লীলার শখ মিটে গেল, রাত্রিযোগে তিনি একাকী কালীঘাটে প্রত্যাবর্তন করলেন।

—গরুগুলোর কি হল? কর্তারা তাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন তো?

—রাম বল, ফেরাবার জো কি? চারদিকের গাঁ থেকে চাষারা এসে সব গরু লুট করে নিয়ে গেল।...দেখুন রামেশ্বরবাবু এই শিবলালজীর মাহাত্ম্য দেশের লোক এখনও বুঝল না। আমি দুগ্ধ-মন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলাম—মশায়, ওঁকে হরিণ-ঘাটায় নিয়ে গিয়ে তোয়াজ করুন, আপনাদের গোবংশের অশেষ উন্নতি হবে। এমন পেডিগ্রি-সম্পন্ন মহাকুলীন ষাঁড় আর পাবেন কোথা? কিন্তু মন্ত্রীমশায় কিছুই করলেন না, তিনি শুধু সীতামাড়ি, হরিয়ানা, হিসার, শর্ট হর্ন, জার্সি—এই সব বোঝেন। আচ্ছা, আজ এখন উঠতে চান? মধ্যে মধ্যে আসবেন দয়া করে, আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় বড় খুশী হলাম রামেশ্বরবাবু। নমস্কার।

# নীলকণ্ঠ

লেকের ধারে তিন বার চক্কর দিয়েছি, সন্ধ্যা হয়ে এল। বাড়িমুখো হব এমন সময় কাতর কণ্ঠস্বর কানে এল—ও মশায়, দয়া করে আমার কাছে একটু বসুন না।

ভদ্রলোক একটা বেঞ্চে একা বসে আছেন। রোগা চেহারা, চুল উস্ক খুস্ক, দাড়িও সম্প্রতি কামান নি। বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। মুখ দেখে মনে হল শারীরিক বা মানসিক কষ্ট ভোগ করছেন। আমি তাঁর পাশে বসতেই বললেন, আপনার নাম আর ঠিকানা?

আর কেউ হঠাৎ এমন প্রশ্ন করলে ধমক দিতাম, কিন্তু এঁর উপর রাগ হল না। বললাম, আমার নাম সুশীলচন্দ্র চন্দ্র, কাছেই থাকি একুশ নম্বর কার্তিক নশকর লেনে। কেন বলুন তো?

ভদ্রলোক নোটবুক বার করে একটা পাতা ছিঁড়ে খচখচ করে কিছু লিখলেন। তারপর কাগজটি মুড়ে আমাকে বললেন, ধরুন, পকেটে রেখে দিন, হারাবেন না যেন।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কাগজ নিয়ে আমি কি করব! আপনার নাম কি মশায়?

—আমার নাম শ্রীনীলকণ্ঠ তবলদার। হাল ঠিকানা প্লট নম্বর পঞ্চান্ন, কপিল রোড এক্সটেনশন, ডাক্তার বঙ্কিম পালের বাড়ি। কাগজটা যত্ন করে রাখবেন, আপনি যাতে বিপদে না পড়েন তার জন্যে লিখে দিয়েছি।

—বিপদে পড়ব কেন?

—পুলিস আপনাকে নিয়ে টানাটানি করতে পারে তাই লিখে দিয়েছি—আমার মৃত্যুর জন্যে আমি ভিন্ন আর কেউ দায়ী নয়।

—আপনারই বা মৃত্যু হবে কেন?

নীলকণ্ঠ তবলদার চক্ষু বিস্ফারিত করে বিকৃতমুখে একটু হেসে বললেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে এই দেখুন।...বলেই পকেট থেকে একটা শিশি বার করে ঢকঢক করে সবটা খেয়ে ফেললেন।

লোকটির কাণ্ড দেখে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, একি করলেন! আমি লোক ডাকছি—

নীলকণ্ঠ বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত ধরলেন এবং পকেট থেকে একটা ছুরি বার করে বললেন, খবরদার উঠবেন না বলছি, তা হলে আমার টুঁটিটা কেটে ফেলব।

বদ্ধ পাগল। একে বাঁচানো যাবে কি করে? কাছাকাছি কেউ নেই, দূরে কয়েক জন বেড়াচ্ছে। চিৎকার করে ডাকতে যাচ্ছি, নীলকণ্ঠ আমার মুখ চেপে ধরে বললেন, খবরদার, টুঁ শব্দটি করলেই আমি নিজেকে জবাই করব।

বললাম, আপনার মতলবটা কি মশায়? একাই তো মরতে পারতেন, আমাকে ডাকবার কি দরকার ছিল?

নীলকণ্ঠ একটু নরম হয়ে বললেন, রাগ করবেন না সুশীলবাবু। অন্তিম মুহূর্তে আমার ইতিহাসটি আপনাকে শোনাতে চাই, নইলে মরেও শান্তি পাব না।

—আপনি তো এখনই মরবেন, ইতিহাস শোনাবেন কখন?

নীলকণ্ঠ তাঁর হাতঘড়ি দেখে বললেন, এখন সওয়া ছটা, সাড়ে ছটা পর্যন্ত সময় পাওয়া যাবে। পনরো মিনিট পরে মরব!

—কি খেয়েছেন?

—হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড। শিশিটা শুঁকে দেখুন, বাদামের গন্ধ পাবেন।

—ও জিনিস খেলে তো সঙ্গে সঙ্গে মরবার কথা। এখনও বেঁচে আছেন কি করে?

—হুঁ হুঁ, এটি আমারই আবিষ্কার দাদা। ফটোগ্রাফি করেছেন কখনও? এক্সপোজ করে দোকানে ফিল্ম দিলেন, সব কাজ তারাই করে দিল, সে রকম ফাঁকির ফোটোগ্রাফি নয়। নিজে ডেভেলপ করেছেন কখনও? পটাশ ব্রোমাইডে কি হয় জানেন? রিটার্ডেশন হয়, ছবি ফুটে উঠতে দেরি হয়। যা খেয়েছি তাতে টু পারসেণ্ট হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড আর তিন গ্রেন ব্রোমাইড আছে, তার ফলে বিষক্রিয়া পিছিয়ে গেছে। বুঝতে পারছেন না? সিদ্ধির সঙ্গে মাকড়শার ঝুল মিশিয়ে খেলে জোর নেশা হয় জানেন তো? একে বলে সিনারজিস্টিক এফেক্ট। কিন্তু ঝুলের বদলে যদি ইঁদুর-নাদি মেশান তবে নেশা ধরতে দেরি হবে, কারণ ইঁদুর-নাদি হল অ্যাণ্টি-সিনারজিস্টিক। পটাশ ব্রোমাইডের ক্রিয়াও সেই রকম। পাস করি নি বটে, কিন্তু বাড়িতে বিস্তর পড়েছি, হেন সায়েন্স নেই যা জানি না। আমার বন্ধু বঙ্কিম পাল তার ডিসপেনসারিতে আমারই প্রিস্‌ক্রিপশন মাফিক মিক্‌শ্চার বানিয়ে দিয়েছে।

—বন্ধু হয়ে আপনাকে বিষ দিলেন?

—তা না দেবে কেন। আমার প্রাণ আমার নিজের সম্পত্তি, নির্ব্যূঢ় স্বত্বে ভোগ দখল করতে পারি, যেমন খুশি দান বিক্রয় বা ধ্বংসের অধিকারও আমার আছে। আপনাদের আইন আমি গ্রাহ্য করি না। বঙ্কিম ডাক্তারও উদার লোক, তার প্রেজুডিস মোটেই নেই। সে তার বন্ধুর অন্তিম অনুরোধ পালন করেছে।

—শুধু শুধু মরছেন কেন?

—শুধু শুধু নয় মশায়। এই পৃথিবীর ওপর ঘেন্না ধরে গেছে, কেবল ভেজাল নকল ঠকামি আর জোচ্চুরি। এই সামনের দুটো দাঁত দেখুন, কাঁকর মিশানো চাল খেয়ে ভেঙে গেছে। পাঁচটি বচ্ছর ড্রপসিতে ভুগেছি, ভেজাল সরষের তেল খেয়ে! দু বছর ধরে সর্দিতে ভুগছি, মুরগির মাংস বলে ব্যাটারা কচ্ছপ খাইয়েছে। তেল ঘি দুধ দই মসলা সর্বত্র ভেজাল। কংগ্রেস সরকারও ভেজাল, সর্বত্যাগী গান্ধীজীর নাম করে সমস্ত ক্ষমতা হাতিয়েছে আর মোটা মোটা মাইনে দিয়ে এক পাল খাঞ্জা খাঁ নবাব পুষছে। কমিউনিস্ট পার্টিও ভেজাল, দেশ সুদ্ধ লোককে ভেড়া বানিয়ে ডিক্‌টেটারি চালাবার মতলব। অধিক কি বলব মশায়, বিবাহে পর্যন্ত ভেজাল। আর সব কোনও রকমে সইতে পারি, কিন্তু ভেজাল বউ অসহ্য।

—ভেজাল বউ কি রকম? কালো মেয়ে রং মেখে আপনাকে ঠকিয়েছে নাকি?

—আরে না মশায়, কালোতে আমার কোনও আপত্তি নেই। আমি নিজেই বা কোন্ ফরসা।

—কুলকন্যা সেজে কুলটা আপনার ঘরে এসেছে?

—তা হলে তো উপায় ছিল, শুদ্ধি অর্থাৎ ডিস্ইনফেক্ট করিয়ে নিয়ে সংসার-ধর্ম করতাম। বলছি শুনুন। আমি ছেলেবেলা থেকেই প্রবাসী। বাবা ডোংগরগড়ে কাঠের কারবার করতেন, তিনি গত হবার পর আমিও তা করছি। বন্ধুরা বলল, ওহে নীলকণ্ঠ, বুড়ো হতে চললে এইবারে একটা বউ আন। কথাটা মনে লাগল, তাই বিবাহ করবার জন্যে কলকাতায় এলাম। বঙ্কিম ডাক্তার আমার বাল্যবন্ধু, সে ছাড়া কলকাতায় আমার চেনা লোক নেই। তার বাড়িতেই আছি। হঠাৎ একদিন হেবো এসে উপস্থিত। তাকে আগে কখনও দেখি নি, পরিচয় দিল —সে আমার দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাই। খুব চালাক ছোকরা। আমাকে বলল, শুনুন দাদা, শহুরে মেয়েরা রাবিশ, আমাদের গ্রামে চলুন, খুব ভাল পাত্রী আমার সন্ধানে আছে। হেবোর সঙ্গে চালতাডাঙায় গেলাম, খরচের জন্যে তিন শ টাকাও তাকে দিলাম। পাত্রীটি দেখলাম নেহাত মন্দ নয়। নম নম করে বিবাহ হয়ে গেল। তারপর ফুলশয্যার রাত্রে একলা পেয়ে কনে আমাকে কি বলল জানেন? —ও মোসাই, দুটো সিগ্রেট দিন তো, সমস্ত দিন না খেয়ে ভোচকানি লেগেছে। আমি অবাক হয়ে তার দিকে চাইতেই বলল, ঘাবড়াও কেন প্রাণনাথ? ক্যায়সা বউ পেয়েছ দেখ না ঠাওর করে। আমার চাঁদমুখে একবার হাতটি বুলিয়ে দেখ, দু নম্বর সিরিশ কাগজের মতন ঠেকছে না? দু দিন পরে দেখবে ইয়া মোচ ইয়া দাড়ি।

—পুরুষের সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়েছিল নাকি?

—হাঁ মশায়। আমি বিয়ে পাগলা নই, এমন কিছু বুড়োও হই নি, তবু আমাকে ঠকিয়েছিল। পরদিন হেবোকে গালাগাল দিতেই সে বলল, কি সর্বনাশ, দেশের লোককে বিশ্বাস করবার জো নেই। ওই বজ্জাত নিমাই মিত্তিরটার এই কাজ, নিজের শালীপো মটরাকে কনে সাজিয়ে ঠকিয়েছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন দাদা, নিমে শালাকে দেখে নেব। যা হবার হয়ে গেছে, এখন মটরাকে গোটা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বিদেয় করুন, নইলে আদালতে খোরপোশের দাবি করবে।

আমি বললাম, খুব করুণ ইতিহাস নীলকণ্ঠবাবু। কিন্তু পনরো মিনিট কাবার হতে চলল, এখনও তো আপনি মরলেন না।

—আঃ ব্যস্ত হন কেন। বিদ্যাসাগর লিখেছেন, মরণের অবধারিত কাল নাই। বিষ খেলেই যে বাঁধাধরা সময়ের মধ্যে মরতে হবে এমন কোনও নিয়ম নেই, মানুষের ধাত অনুসারে কিছু এদিক ওদিক হয়। আচ্ছা, আমার নাড়ীটা একবার দেখুন তো, বড্ড যেন কাহিল ঠেকছে।

নাড়ী দেখে আমি বললাম, দিব্যি সুস্থ সবল লোকের নাড়ী, ক্ষীণে বলবতী প্রাণঘাতিকা নয়। আপনি এখনই মরবেন না নীলকণ্ঠবাবু, অনর্থক আমাকে আটকে রেখেছেন। আমি এখন উঠি।

—আপনি তো ভারী স্বার্থপর লোক মশায়! একটা মানুষ মরতে বসেছে, তার শেষ অনুরোধ রাখবেন না? পনরো মিনিটের জায়গায় না হয় বিশ কি পঁচিশ মিনিটই হল। যা বলছিলাম শুনুন। হেবো আমাকে বলল, আবার আপনার বিয়ে দেব দাদা, আমাদের ভজু-মামাকে লাগিয়ে দেব, তুখড় লোক, তাকে কেউ ঠকাতে পারবে না। আপনি এখন কলকাতায় ফিরে যান, ভজু-মামা পাত্রী স্থির করেই আপনার সঙ্গে দেখা করবে।

—তবে আপনি মরতে চান কেন! বিবাহ তো হবেই।

—আর বিশ্বাস করি না মশায়, এখন ইহলোক ছেড়ে চলে যাওয়াই ভাল মনে করি।

—কোথায় যেতে চান, স্বর্গে?

—রাম বল, স্বর্গেও ভেজাল। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র বরুণ সব পালিয়েছেন, এখানকার অবতাররা সেখানে গিয়ে জাঁকিয়ে বসেছেন। আমি মঙ্গল গ্রহে যাব স্থির করেছি। পরশু শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখেছিলাম—

আমি উঠে পড়ে বললাম, মাপ করবেন নীলকণ্ঠবাবু, আমাকে এখন যেতেই হবে। আপনার মৃত্যুর ঢের দেরি, বহু বৎসর বাঁচবেন। আপনার বন্ধু বঙ্কিম ডাক্তার আপনাকে ঠকিয়েছেন। আচ্ছা বসুন, নমস্কার।

নীলকণ্ঠবাবু আমাকে ফেরাবার জন্যে চিৎকার করতে লাগলেন, কিন্তু আমি আর দাঁড়ালাম না।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই মনে হল, আহা, পাগল লোকটিকে একলা ফেলে এসেছি, আজ একবার খোঁজ নেওয়া উচিত। ডাক্তার বঙ্কিম পালকে চিনি, বেলা নটার সময় তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলাম।

নীলকণ্ঠবাবু নীচের বারান্দায় বসে সিগারেট টানছেন। আমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আসুন আসুন সুশীলবাবু। দেখুন, জগতে আপনিই একমাত্র খাঁটী মানুষ, আমার বন্ধু বঙ্কিম ডাক্তারও ভেজাল চালিয়েছে, হাইড্রোসায়ানিকের বদলে বাদামের শরবৎ খাইয়েছে। নেহাৎ বন্ধু লোক, নইলে পুলিসে খবর দিতাম।

আমি বললাম, বঙ্কিম ডাক্তার খুব ভাল কাজ করেছেন, তিনি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তাই আপনার বেয়াড়া অনুরোধ রাখেন নি।

এই সময় একটি লোক এসে বলল, নীলকণ্ঠ তবলদার এখানে থাকতেন?

নীলকণ্ঠ বললেন, আপনি কে মশায়?

—আমি সম্পর্কে নীলকণ্ঠের মামা হই, ভজু-মামা, চালতাডাঙার হেবো আমাকে পাঠিয়েছে।

নীলকণ্ঠ ভয় পেয়ে চুপি চুপি আমাকে বললেন, আপনিই কথা বলুন দাদা, আমি আর ওদের ফাঁদে পা দিচ্ছি না।

আমি প্রশ্ন করলাম, কি দরকার আপনার?

—বড়ই দুঃসংবাদ, নীলকণ্ঠ বেচারা মারা গেছে।

আমরা দুজনেই চমকে উঠে বললাম, অ্যাঁ, বলেন কি!

—হ্যাঁ মশায়। কাল সন্ধ্যেয় কলকাতায় পেঁছেই সোজা এখানে এসেছিলাম, একটা ভাল সম্বন্ধ পেয়েছি কিনা। এসে দেখি, নীলকণ্ঠ নেই, ডাক্তারবাবুও বেরিয়ে গেছেন। একটি ছোকরা কম্পাউণ্ডার বলল, নীলকণ্ঠবাবু চার আউন্স বিষ নিয়ে লেকে গেছেন, তাঁর মতলব ভাল নয়, যান যান, এখনই সেখানে গিয়ে খবর নিন। গিয়ে শুনলাম, লেকের ধারে একটা লাশ পাওয়া গেছে, পুলিস মর্গে চালান দিয়েছে।

আমি বললাম, লেকে তো প্রায়ই লাশ পাওয়া যায়, ও জায়গাটা হলো হতাশ প্রেমের ভাগাড়। নীলকণ্ঠবাবু কি দুঃখে মরবেন?

ভজু-মামা বললেন, না মশায়, আপনি জানেন না, নির্ঘাৎ নীলকণ্ঠ। বেচারা হতাশ হয়েছে কিনা। আমি তখনই ছুটে মর্গে গেলাম, কিন্তু ঢুকতে পেলাম না।

বলল, এখন ঘর বন্ধ, কাল সকালে এসো। আজ সকালে আবার সেখানে গেলাম। সারি সারি সব শুয়ে আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে আমাদের নীলকণ্ঠ। হেবোর কাছে তার চেহারার যেমন বর্ণনা শুনেছি হুবহু মিলে গেল।

নীলকণ্ঠ এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এখন আতঙ্কিত হয়ে বললেন, বয়স কত?

—তা পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে।

—বলেন কি! রং ফরসা না ময়লা?

—ময়লা বটে।

—তবেই তো সর্বনাশ! গায়ে কোট না পাঞ্জাবি?

—পাঞ্জাবি। ধুতির ওপর আজকাল কেউ কোট পরে না মশায়, পশ্চিমে বাঙালী ছাড়া।

—গোঁফ আছে না নেই? পায়ে কি রকম জুতো?

—গোঁফ আছে বই কি। পায়ে কাবুলী জুতো।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নীলকণ্ঠ বললেন, তবে সে লাশ আমার নয়। আমি পাঞ্জাবি পরি না, গোঁফ রাখি না, কাবুলী জুতোও আমার নেই। যাক, বাঁচা গেল। মরবার মতলবটা এখন ছেড়ে দিয়েছি।

আমি বললাম, ভগবান আপনাকে রক্ষা করেছেন নীলকণ্ঠবাবু।

ভজু-মামা বললেন, আরে তুমিই আমাদের নীলকণ্ঠ? এতক্ষণ বলতে হয়। আশ্চর্য, রাখে কৃষ্ণ মারে কে। আজকেই কালীঘাটে একটা পুজো দিতে হবে বাবা, দাও তো পাঁচটা টাকা। তোমার জন্যে আমি একটি চমৎকার সম্বন্ধ এনেছি নীলু, একেবারে ডানাকাটা পরী।

সম্বন্ধের কথা শুনেই নীলকণ্ঠ ভয় পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে দোতলায় চলে গেলেন। ভজু-মামা বললেন, পালিয়ে গেল কেন!

আমি উত্তর দিলাম, নীলকণ্ঠবাবুর বিবাহে অরুচি হয়ে গেছে। ও'র শরীর আর মন ভাল নেই, আপনি ও'কে বিরক্ত করবেন না, চলে যান।

—আপনি আমাকে তাড়াবার কে মশায়? নীলু আমার ভাগনে, ওর কিসে ভাল হয় তা আমি বুঝব। আপনি এর মধ্যে আসেন কেন? ডেকে আনুন নীলুকে।

এই সময় বঙ্কিম ডাক্তার ওপর থেকে নেমে এলেন। ভজুকে বললেন, আবার কি করতে এসেছ হে?

—আমার ভাগনে নীলকণ্ঠকে এখনি ডেকে দিন।

—তার সঙ্গে দেখা হবে না। দূর হও এখান থেকে।

—আপনি বললেই দূর হব। আগে নীলকণ্ঠ আসুক, তাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। এখানে পরের বাড়িতে কেন সে থাকবে?

—সুশীলবাবু, দেখবেন এই লোকটা যেন না পালায়, আমি পুলিসে টেলিফোন করছি। ওরে ফটকটা বন্ধ করে দে।

ফটক বন্ধ হবার আগেই ভজু-মামা নক্ষত্র বেগে সরে পড়লেন।

# জয়হরির জেব্রা

এই আখ্যানের নায়ক জয়হরি হাজরা, নায়িকা বেতসী চাকলাদার, উপনায়ক উপনায়িকা গুটিকতক জন্তু, যথা—একটি বিলাতী কুত্তা, একটি দেশী কুত্তী, একটি আরবী ঘোড়া এবং একটি ভারতীয় জেব্রা। লেডিজ ফার্স্ট—এই আধুনিক নীতি অনুসারে প্রথমে বেতসীর পরিচয় দেব, তার পর জয়হরির কথা বলব। জন্তুদের অবতারণা যথাস্থানে করলে চলবে।

বেতসী বিলাতে জন্মেছিল, রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের পাঁচ বৎসর পরে। তার বাপ মা ব্রিটিশভক্ত ছিলেন, সেজন্য মেয়ের নাম এলিজাবেথ রেখেছিলেন, সংক্ষেপে বেট্‌সি। কিন্তু সে নাম পরে বদলানো হয়। ভারতবর্ষে ফেরবার সময় জাহাজে একজন ইংরেজ স্ত্রীলোক বেট্‌সির মাকে ডার্টি নিগার বলেছিল, তাতেই রেগে গিয়ে তিনি তখনই মেয়ের বেট্‌সি নাম বদলে বেতসী করলেন।

বেতসীর বাবা প্রতাপ চাকলাদার ধনীর সন্তান। এদেশে শিক্ষা সমাপ্ত করে সস্ত্রীক বিলাত গিয়েছিলেন এবং সেখানে পাঁচ-ছ বৎসর বাস করে কৃষি ও পশু-পালন শিখেছিলেন। ফিরে এসে উলুবেড়ের কাছে তাঁর পৈতৃক জমিদারি হোগলবেড়েতে তিন শ বিঘা জমির উপর ফুল ফল ফুলকপি বাঁধাকপি বীট গাজর টমাটো ইত্যাদির বাগান এবং বিস্তর গরু রেখে ডেয়ারি ফার্ম করলেন, তা ছাড়া ভেড়া ছাগল শুয়োর মুরগি হাঁস পুষে তারও ব্যবসা চালাতে লাগলেন। একটি উত্তম বাগানবাড়ি বানিয়ে সপরিবারে সেখানেই বাস করতেন, মাঝে মাঝে কলকাতায় যেতেন। সতরো বৎসর ধরে ব্যবসা ভালই চলল, লাভও প্রচুর হতে লাগল। তার পর প্রতাপ চাকলাদার মারা গেলেন।

বেতসীর মা অতসী মুশকিলে পড়লেন। স্বামীর হাতে গড়া অত বড় ব্যবসাটি চালাবার ভার কাকে দেবেন? তাঁর ছেলে নেই, একমাত্র সন্তান বেতসী। নায়েব হরকালী মাইতি কাজের লোক বটে, কিন্তু অত্যন্ত বুড়ো হয়েছেন, তাঁর উপর নির্ভর করা চলে না। স্থির করলেন সব বেচে দিয়ে যাবেন। কিন্তু বেতসী বলল, কিচ্ছু ভেবো না মা, আমি চালাব, বাবার কাছে সব শিখেছি। অতসী ভরসা পেলেন না, তবু মেয়ের জেদ দেখে ভাবলেন, দু বছর দেখাই যাক না, তার পর না হয় বেচে ফেলা যাবে। একটি উপযুক্ত জামাই যদি পাওয়া যায় তবে আর কোনও ভাবনা থাকে না। কিন্তু মেয়েটা যে বেয়াড়া, এত বয়েসেও তার কাণ্ডজ্ঞান হল না।

অতসী উঠে পড়ে জামাইএর খোঁজ করতে লাগলেন। মেয়েকে নিয়ে ঘন ঘন কলকাতায় গেলেন, পার্টি দিলেন, বহু পরিবারের সঙ্গে মিশলেন, বাছা বাছা পাত্র-দের হোগলবেড়েতে নিমন্ত্রণ করে আনলেন, কিন্তু কিছুই ফল হল না। প্রতাপ চাকলাদারের সম্পত্তির লোভে অনেক সুপাত্র আর কুপাত্র এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু বেতসীর সঙ্গে দু দিন মেশার পরেই সরে পড়ল। তার গড়ন ভাল, রং খুব ফরসা, কিন্তু মুখে লাবণ্যের একটু অভাব আছে। সে মেমের মতন ব্রীচেস পরে ঘোড়ায়

চড়ে তার শ বিঘা ফার্ম পরিদর্শন করে, কর্মচারীদের উপর হুকুম চালায়, শাসনও করে। তার রূপ চিত্তাকর্ষক নয়, মেজাজও উগ্র, সেজন্য তার মায়ের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। বেতসী বলল, তোমার জামাই না জুটল তো বড় বয়েই গেল, আমি কারও তোয়াক্কা রাখি না, বাবার ফার্ম একাই চালাব। কিন্তু অতসী দেখলেন, ফার্মের আয় আগের মতন হচ্ছে না। বেতসী তার মাকে আশ্বাস দিলে—কোন ভয় নেই, দু-দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

জয়হরি হাজরার নামটি সেকেলে, কিন্তু সেজন্য তার বাপ মাকে দায়ী করা যায় না, তার হরিভক্ত ঠাকুরদাদাই ওই নাম রেখেছিলেন। জয়হরি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান, লেখাপড়ায় খুব ভাল, একটা স্কলারশিপ যোগাড় করে বিলাত গিয়েছিল, সুতো আর কাপড় রঙানো শিখে তিন বছর পরে ফিরে এল। এসেই আমেদাবাদের একটি বড় মিলে তার চাকরি জুটে গেল। দু বছর পরে তা ছেড়ে দিয়ে নিজেই একটি ব্লীচিং অ্যান্ড ডাইং ফ্যাক্টরি খুলল। সে কারখানা খুব ভালই চলছিল, লাভও বেশ হচ্ছিল, তার পর এক দুর্ঘটনা হল। জয়হরির শিকারের শখ ছিল, গণ্ডাল স্টেটের জঙ্গলে একটা বুনো শুয়োরের আক্রমণে তার পা জখম হল। ঘা সারল, কিন্তু জয়হরি একটু খোঁড়া হয়ে গেল, হাঁটবার সময় তাকে লাঠিতে ভর দিতে হয়। এর কিছু আগে তার বাপ মা মারা গিয়েছিলেন। সে তার কারখানা ভাল দামে বেচে দিয়ে পৈতৃক পুরনো বাস্তুভিটা খাগড়াডাঙায় চলে এল। এই গ্রামটি হোগলবেড়ের লাগাও।

জয়হরির অর্থলোভ নেই, বিবাহেরও ইচ্ছা নেই। সে হিসাব করে দেখেছে তার যা পুঁজি আছে তাতে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু যে বিদ্যা সে শিখেছে তার চর্চা একেবারে ছাড়তে পারল না। খাগড়াডাঙার পুরনো ছোট বাড়িটা মেরামত করে বাসের উপযুক্ত করে নিল, এবং সেখানেই নানা রকম পরীক্ষা করে শখ মেটাতে লাগল। কিন্তু সুতো আর কাপড় ছোবানো নয়, জীবন্ত জন্তুর গায়ে রং ধরানো।

জয়হরির জমির একদিকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা, আর তিন দিকে ধান খেত। রাস্তার দিকে সে কাঁটা তারের বেড়া লাগিয়েছে, আর সব দিকে ফণিমনসা বাগ-ভেরেণ্ডা ইত্যাদির পুরনো বেড়াই আছে। তার বাড়ির সামনে এখন আর জঙ্গল নেই, সুন্দর একটি মাঠ হয়েছে, তার মাঝে মাঝে কয়েকটি গাছ আছে। বাড়ির পিছন দিকে গোটাকতক চালা ঘর উঠেছে, তাতে তার পোষা জন্তু আর কয়েকজন চাকর থাকে। জয়হরি এখানে আসার কয়েক মাস পরেই দেখা গেল তার বাড়ির সামনের মাঠে হরেক রকম অদ্ভুত জানোয়ার চরে বেড়াচ্ছে। আশেপাশের গ্রাম থেকে বহু লোক এসে দেখে যেতে লাগল।

বেতসীর কাছে খবর পেঁছুল, খাগড়াডাঙায় একজন খোঁড়া বাবু আজব চিড়িয়াখানা বানিয়েছে, পয়সা লাগে না, কলকাতা থেকেও লোকে দেখতে আসছে। বেতসীর একটু রাগ হল। চাকলাদার বংশ এই অঞ্চলের সব চেয়ে মান্য গণ্য জমিদার। একজন বাইরের লোক এসে চিড়িয়াখানা বানিয়েছে অথচ সেখানে একবার পায়ের ধুলো দেবার জন্যে বেতসী আর তার মাকে অনুরোধ করা হয় নি কেন? বেতসী শুনেছে, লোকটার নাম জয়হরি হলেও সে নাকি বিলাত ফেরত, সুতরাং

তাকে অবজ্ঞা করে উড়িয়ে দিতে পারল না। কৌতূহল দমন করতে না পেরে একদিন সকাল বেলা সে তার প্রকাণ্ড কুকুর প্রিন্সকে সঙ্গে নিয়ে জয়হরির জন্তুর বাগান দেখতে গেল।

তারের বেড়ার ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে বেতসী অবাক হয়ে দেখতে লাগল। তিনটে নীল রঙের ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। একটা সবুজ মেনী বেরালের কাছে চারটে বেগনী বাচ্চা লাফালাফি করছে। একটা অদ্ভুত জানোয়ার ঘাস খাচ্ছে, গায়ের রং হলদে, তার উপর ঘোর ব্রাউন রঙের ফোঁটা। বেতসী প্রথমে ভেবেছিল চিতা বাঘ, কিন্তু দাড়ি আর শিং দেখে বুঝল জন্তুটা আসলে ছাগল। একটু দূরে একটা ডোবার কাছে গোটা কতক ময়ূরকণ্ঠী রঙের রাজহাঁস প্যাঁক প্যাঁক করছে। বাড়ির ছাত থেকে হঠাৎ এক ঝাঁক লাল নারঙ্গী হলদে সবুজ নীল বেগনী রঙের পায়রা উড়ে চক্কর দিতে লাগল, যেন কেউ রামধনু কুচি কুচি করে আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছে। বেতসী উপর দিকে চেয়ে দেখছিল, এমন সময় তার কানে এল—নমস্কার, দয়া করে ভিতরে আসবেন কি?

বেতসী মাথা নামিয়ে দেখল, একজন সুদর্শন যুবা বেড়ার ফটক খুলে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে পায়জামা আর পাঞ্জাবি, হাতে একটা মোটা লাঠি। প্রতিনমস্কার করে বেতসী বলল, আপনিই জয়হরিবাবু? আমার কুকুর নিয়ে ভিতরে যেতে পারি কি?...থ্যাংক্‌স।

বেড়ার ভিতরের মাঠে এসে বেতসী বলল, অদ্ভুত সব জানোযাব বানিযেছেন। এর উদ্দেশ্য কিছু আছে না শুধুই ছেলেখেলা?

জয়হরি সহাস্যে বলল, আর্ট মাত্রই ছেলেখেলা। আমি এক নতুন রকমের আর্টের চর্চা করছি। লোকে কাগজ আর ক্যাম্বিসের উপর আঁকে, কাদা পাথর ধাতুর মূর্তি গড়ে। আমি তা না করে জীবন্ত প্রাণীর উপর রং লাগাচ্ছি। আমার মিডিয়ম আর টেকনিক একেবারে নতুন।

—নীল ভেড়া, সবুজ বেরাল, ছাগলের গায়ে বাঘের ছাপ, একে আর্ট বলতে চান নাকি?

—আজ্ঞে হাঁ। প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণ হল নিকৃষ্ট আর্ট। যা আছে তার বৈচিত্র্য সাধন এবং তাকে আরও মনোরম করাই শ্রেষ্ঠ আর্ট। সুকুমার রায় লিখে-ছেন—লাল গানে নীল সুর হাসি হাসি গন্ধ। কথাটা ঠাট্টা হলেও আর্টের মূল সূত্র এতেই আছে।

—আমি তা মনে করি না। শুনেছি আপনি সুতো আর কাপড় রঙানো শিখে এসেছেন। এখানে সময় নষ্ট না করে কোনও মিলে চাকরি নেন না কেন? জানোয়ারের গায়ে রং লাগানো একটা বদখেয়াল ছাড়া কিছু নয়।

—সকলের দৃষ্টিতে বদখেয়াল নয়। আমাদের কলামন্ত্রী রঙ্গবাহাদুর নাদান আমার কাজ দেখে খুব তারিফ করেছেন। বলেছেন, সোভিয়েট সরকারকে একশ আটটি লাল ঘুঘু উপহার পাঠালে বড় ভাল হয়, তিনি নেহেরুজীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে পরামর্শ করবেন।

এই সময় বেতসীর পিছন দিকে এমন একটি ব্যাপার ঘটল যার ফল সুদূর-প্রসারী। একটি গোলাপী রঙের দেশী কুকুর জয়হরির কাছে আসছিল, তাকে দেখেই বোঝা যায় মাসখানিক আগে তার বাচ্চা হয়েছে। বেতসীর বিলাতী কুকুর প্রিন্স তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। সে বিস্তর স্বদেশী আর ভারতীয় কুক্কুরী

দেখেছে, কিন্তু এমন পদ্মকোরকবর্ণা সারমেয়ী পূর্বে তার নজরে পড়ে নি। প্রিন্স বার কতক সেই গোলাপী কুত্তীকে প্রদক্ষিণ করে তার গা শুঁকল, তার পর আর একটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করল। তখন গোলাপী হঠাৎ ঘ্যাঁক করে প্রিন্সের পায়ে কামড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। কেঁউ কেঁউ করতে করতে প্রিন্স বেতসীর কাছে এল।

অগ্নিমূর্তি হয়ে বেতসী বলল, একি! আপনার নেড়ী কুত্তী আমার প্রিন্সকে কামড়ে দিল আর আপনি চুপ করে রইলেন!

জয়হরি বলল, আপনি ভয় পাবেন না, আমার কুকুরটার শরীরে রোগ নেই। কুকুররা এমন কামড়াকামড়ি করে থাকে, তাতে ক্ষতি হয় না। আপনি অনুমতি দেন তো আপনার কুকুরের পায়ে একটু টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে দিতে পারি।

—আপনার হাতুড়ে চিকিৎসা আমি চাই না। কেন আপনার কুকুরকে রুখলেন না? কত বড় বংশে আমার এই আলসেশ্যানের জন্ম তা জানেন? প্রিন্সের বাপ ফ্রেডরিক দি গ্রেট, মা মারাইয়া তেরেজা। আপনার নেড়ী কুত্তী একে কামড়াবে আর আপনি হাঁ করে দেখবেন!

—ঘটনাটা হঠাৎ হয়ে গেল, আগে টের পেলে আমি বাধা দিতাম। কিন্তু আসল দোষী আপনার কুকুর, ও কেন নেড়ী কুত্তীর কাছে গেল? উচ্চকুলোদ্ভব হলেও আপনার প্রিন্সের নজর ছোট। অনেক বোকা লোক পেণ্ট করা মেয়ে দেখলে ভুলে যায়। প্রিন্সও সেই রকম নেড়ী কুত্তীর গোলাপী রং দেখে ভুলেছে, জানে না যে ওটা কংগো রেডের রং।

—কাছে গেছে বলেই প্রিন্সকে কামড়াবে?

—আপনি একটু স্থির হয়ে ব্যাপারটি বোঝবার চেষ্টা করুন। আমি যদি হঠাৎ আপনাকে অপমান করতাম—খবরের কাগজে যাকে বলে শ্লীলতা হানি, তা হলে আপনি কি করতেন? চুপ করে সইতেন কি?

—আপনাকে লাথি মারতাম, হাতে চাবুক থাকলে আচ্ছা করে কষিয়ে দিতাম।

—ঠিক কথা, সে রকম করাই আপনার উচিত হত। নারী মাত্রেরই আত্মসম্মান রক্ষার অধিকার আছে। আমাদের এই ভারতবর্ষ হচ্ছে বীরাঙ্গনা সতী নারীর দেশ। সেই ট্রাডিশন এ দেশের কুত্তীদের মধ্যেও একটু থাকবে তা আর বিচিত্র কি।

—ও সব বাজে কথা শুনতে চাই না। আপনি ওই নেড়ীকে গুলি করে মারবেন কিনা বলুন। আর আমার প্রিন্সের যে ইনফেকশন হল তার ড্যামেজ কি দেবেন বলুন।

—মাপ করবেন মিস চাকলাদার, কুত্তীটার বা আমার কিছুমাত্র অপরাধ হয় নি। শুধু শুধু দণ্ড দেব কেন?

—বেশ। আমার উকিল আপনাকে চিঠি পাঠাবেন। আদালত আপনাকে রেহাই দেয় কিনা দেখব।

বাড়ি ফিরে এসে বেতসী স্থির হয়ে থাকতে পারল না, তখন মোটরে চড়ে উলুবেড়ে গেল। সেখানকার উকিল বিষ্ণু বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে তার বাবার খুব বন্ধুত্ব ছিল। তাঁকে সব কথা উত্তেজিত ভাষায় তড়বড় করে জানিয়ে বেতসী বলল, ওই জয়হরি হাজরাকে সাজা দিতেই হবে জেঠামশাই, যত টাকা লাগে খরচ করব।

বিষ্ণুবাবু বললেন, আগে মাথা ঠাণ্ডা করে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা কর। যদি মনে কর যে তোমার কুকুরের রোগ হবার ভয় আছে তবে আজই ওকে কলকাতায় পাঠাও, বেলগাছিয়া হাসপাতালে অ্যাণ্টিরাবিজ ইনজেকশন দিয়ে দেবে। কিন্তু মকদ্দমার খেয়াল ছাড়ো। জয়হরির কুকুরটা যদি খেপা হত আর তোমার কুকুরকে রাস্তায় কামড়ে দিত তা হলেও বা কথা ছিল। কিন্তু তোমার কুকুর জয়হরির কম্পাউণ্ডে ঢুকে কামড় খেয়েছে, এতে কোন ক্লেম আনা যায় না, মকদ্দমা করলে লোক হাসবে।

বিষ্ণুবাবু কিছুই করতে রাজী হলেন না। বেতসী তাঁর কাছ থেকে মহকুমা হাকিম অরুণ ঘোষের বাড়ি গেল। তাঁকে নিজের পরিচয় আর ব্যাপারটা জানিয়ে বলল, সার, আপনাকে এর প্রতিকার করতেই হবে, আপনি পুলিসকে অর্ডার দিন। জয়হরির খেঁকী কুকুরটা ডেঞ্জারস, তাকে এখনই মারা দরকার। আর জয়হরি একটা বুজরুক শারলাটান, নকল জানোয়ার বানিয়ে লোক ঠকাচ্ছে। জন্তুর গায়ে রং ধরানো তো একরকম ক্রুয়েলটিও বটে। তাকে অর্ডার করুন যেন তিন দিনের মধ্যে তার চিড়িয়াখানা ভেঙে দেয়।

অরুণ ঘোষ একটু হেসে বললেন, আমি পুলিসকে বলে দিচ্ছি যেন জয়হরি-বাবুর কুকুরটার খবর রোজ নেওয়া হয়। হাইড্রোফোবিয়ার লক্ষণ দেখলে অবশ্যই তাকে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু জয়হরিবাবু যা করছেন তা তো বেআইনী নয়, সাধারণের অনিষ্টকরও নয়। তাঁকে তো আমি জব্দ করতে পারি না মিস চাকলাদার।

বেতসী অত্যন্ত রেগে গিয়ে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এল। অনেকক্ষণ ভেবে ঠিক করল, সে নিজেই জয়হরিকে সাজা দেবে। আগে একটা আলটিমেটম দেবে, তা যদি না শোনে তবে মার লাগাবে। লোকটা খোঁড়া, বেশী মারা ঠিক হবে না, এক ঘা চাবুক লাগালেই যথেষ্ট। জনকতক লোক যাতে জয়হরির নিগ্রহ দেখে তারও ব্যবস্থা করতে হবে। লোকে জানুক যে বেতসী চাকলাদার নিজেই বজ্জাতকে শাসন করতে পারে।

বেতসী তার ধোবা নিমাই দাস আর সর্দার-মালী গগন মণ্ডলকে ডেকে আনিয়ে বলল, ওহে, কাল সকালে আটটার সময় তোমরা জয়হরি হাজরার চিড়িয়াখানার সামনে হাজির থেকো।

নিমাই বলল, সেখানে গিয়ে কি করতে হবে দিদিসায়েব?

—কিছু করতে হবে না, শুধু একটা তামাশা দেখবে।

—যে আজ্ঞে, আমার ভাগনে নুটুকেও নিয়ে যাব।

গগন মণ্ডল বলল, আমার ছেলে দুটোকেও নিয়ে যাব দিদিসায়েব।

পরদিন সকালবেলা বেতসী তার আরবী ঘোড়ায় চড়ে একটা চাবুক হাতে নিয়ে জয়হরির মাঠের সামনে উপস্থিত হল। নিমাই ধোবা আর গগন মালী তাদের পরিবারবর্গের সঙ্গে আগেই সেখানে হাজির ছিল।

জয়হরি বেড়ার ধারে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে তার ভেড়া আর ছাগলের পরস্পর ঢু মারা দেখছিল। বেতসীকে দেখে স্মিতমুখে বলল, গুড মর্নিং মিস চাকলাদার, আপনার প্রিন্স ভাল আছে তো?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বেতসী বলল, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, একবার বাইরে আসুন।

ফটকের বাইরে এসে জয়হরি বলল, হুকুম করুন।

ঘোড়ার উপর সোজা হয়ে বসে বেতসী বলল, দেখুন জয়হরিবাবু, আপনাকে একটা আলটিমেটম দিচ্ছি। কাল আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চাইবেন কি না? আর সেই নেড়ী কুত্তীটাকে গুলি করবেন কি না? নিতান্ত যদি মায়া হয় তবে গঙ্গার ওপারে বিদায় করবেন কি না?

জয়হরি বলল, দুঃখপ্রকাশে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, আপনি অকারণে আমার উপর চটেছেন তাতে আমি দুঃখিত। কিন্তু ক্ষমা চাইতে বা নেড়ী কুত্তীকে মারতে বা তাড়াতে পারব না।

চাবুক তুলে বেতসী বলল, তবে এই নিন।

বেতসীর চাবুক জয়হরির পিঠে পড়বার আগে একটু পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর বিবরণ আবশ্যক। মাঠের একটা কদম গাছের আড়াল থেকে একটি জেব্রা বেরিয়ে এল, কিন্তু বেতসীর সেদিকে নজর ছিল না। এই ভারতীয় জন্তুটি আফ্রিকার জেব্রার চাইতে কিছু ছোট, পেট একটু বেশী মোটা, কিন্তু গায়ের রং আর ডোরা দাগে কোনও তফাত নেই। অচেনা জানোয়ার দেখে নিমাই ধোবার ভাগনে নুটু বলল, মামা ওটা কি গো?

নিমাই বলল, চিনতে লারছিস? ও তো আমাদের সৈরভী রে, সেই যে গাধীটার মাজায় বাত ধরেছিল, বোঁচকা বইতে লারত, তাই তো জয়হরিবাবুকে দশ টাকায় বেচে দিনু। আহা, এখন ভাল খেয়ে আর জিরেন পেয়ে সৈরভীর কিবে রূপ হয়েছে দেখ! বাবু আবার চিত্তির বিচিত্তির করে বাহার বাড়িয়ে দিয়েছে।

সৈরভী তার পুরনো মনিবকে চিনতে পেরে খুশী হয়ে এগিয়ে আসছিল। বেতসীর চাবুক যখন জয়হরির পিঠে পড়বার উপক্রম করেছে ঠিক সেই মুহূর্তে সৈরভীর কণ্ঠ থেকে আনন্দধ্বনি নির্গত হল—ভূঁ-চী ভূঁ-চী। তার অদ্ভুত রূপ দেখে আর ডাক শুনে বেতসীর ঘোড়া সামনের দু পা তুলে চিঁ-হি-হি করে উঠল। বেতসী সামলাতে পারল না, ধুপ করে পড়ে গেল। পড়েই অজ্ঞান।

জ্ঞান ফিরে এলে বেতসী দেখল, একটা ছোট গেলাস তার মুখের কাছে ধরে জয়হরি বলছে, একটু খেয়ে ফেলুন, ভাল বোধ করবেন।

ক্ষীণ স্বরে বেতসী প্রশ্ন করল, কি ওটা?

—বিষ নয়, ব্রাণ্ডি। খেলে চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

—আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

—এখন দেখছেন না, একটু আগে দেখেছিলেন বটে। আপনি যেন মহিষাসুর বধের জন্যে খাঁড়া উঁচিয়েছেন, কিন্তু আপনার বাহনটি হঠাৎ ভড়কে গিয়ে আপনাকে ফেলে দিল। তাতেই আপনার একটু চোট লেগেছে। নিমাই আর গগনের বউ ধরাধরি করে আপনাকে আমার বাড়িতে এনে শুইয়েছে। ওকি করছেন? খবরদার ওঠবার চেষ্টা করবেন না, চুপ করে শুয়ে থাকুন। আপনার মায়ের কাছে লোক গেছে, ডাক্তার নাগকে আনবার জন্যে উলুবেড়েতে মোটর পাঠানো হয়েছে। তাঁরা এখনই এসে পড়বেন।

একটু পরে বেতসীর মা এসে পড়লেন। আরও কিছু পরে ডাক্তার নাগ তাঁর ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বেতসীকে পরীক্ষা করে বললেন, হাতে আর কোমরে

চোট লেগেছে, ও কিছু নয়, চার-পাঁচ দিনে সেরে যাবে। ডান পায়ের ফিবিউলা ভেঙেছে—সামনের সরু হাড়টা।...হাঁ হাঁ জোড়া লাগবে বইকি। ভয় নেই, খোঁড়া হবে যাবেন না, কিছুদিন পরেই আগের মতন হাঁটতে পারবেন।...আরে না না, জয়হরিবাবুর মতন লাঠি নেবার দরকার হবে না। আজ কাঠ দিয়ে বেঁধে দেব, তিন-চার দিন পরে সদর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে এক্স-রে করাব, তারপর প্লাস্টার ব্যাণ্ডেজ লাগাব। দরকার হয়তো একজন নার্স পাঠাতে পারি।

বেতসী নিজের বাড়িতে এলে ডাক্তার তার চিকিৎসার যথোচিত ব্যবস্থা করলেন। বিছানায় শুয়ে সে বিগত ঘটনাবলী ভাবতে লাগল।

নায়েব হরকালী মাইতি বহুদিনের পুরনো লোক। তাঁর স্ত্রী মাইতি-গিন্নী শয্যাগত বেতসীকে রোজ সন্ধ্যাবেলা দেখতে আসেন। বুড়ীর মুখের বাঁধন নেই। কিন্তু তাঁর এলোমেলো কথায় বেতসী চটে না, বরং মজা পায়। পড়ে যাবার দু সপ্তাহ পরে বেতসী অনেকটা ভাল বোধ করছে, বিছানা ছেড়ে ইজিচেয়ারে বসেছে।

মাইতি-গিন্নী তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন—সবই গেরোর ফের দিদিমণি, কপালের লিখন! ভদ্দর লোকের ছেলের ওপর কেনই বা তোমার রাগ হল, কেনই বা মেম-সায়েবের মত ঘোড়সওয়ার হয়ে তাকে মারতে গেলে! তার তো কিছুই হল না, লাভের মধ্যে তুমি ঠ্যাং ভাঙলে।

বেতসী বলল, তুমি দেখো মাইতি-দিদি, আমি সেরে উঠে তাকে চাবুক মেরে জব্দ করি কি না।

—হা রে দিদিমণি, চাবুক মেরে কি বেটাছেলে জব্দ করা যায়! ওদের একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে হয়, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটতে হয়। বেটাছেলে ঢিট করবার দাবাই হল আলাদা।

—দাবাইটা তুমি জান নাকি ?

—ওমা তা আর জানি না! সাড়ে তিন কুড়ি বয়স হল, তিন কুড়ি বছর ধরে বুড়ো মাইতির কাঁধে চেপে রইছি। দাবাইটা বলছি শোন। আগে ভুলিয়ে ভালিয়ে বশ করতে হয়, আশকারা দিয়ে যত্ন-আত্তি করে মাথাটি খেতে হয়। তার পর যখন খুব পোষ মানবে, তুমি না হলে তার চলবেই না, তখন নাকে দড়ি দিয়ে চরকি ঘোরাবে, নাজেহাল করবে, কড়া কড়া চোপা ছাড়বে, নাকানি-চোবানি খাওয়াবে। তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি নেই দিদিমণি, আগেই চাবুক মারতে গিয়েছিলে। তাই তো গাধা ডেকে উঠল, ঘোড়া ভড়কাল, তুমি পড়ে গিয়ে পা ভাঙলে। জয়হরিবাবু মানুষটা তো মন্দ নয়, এখানে এসে তোমার খবর নিয়ে যাচ্ছে। দেখতে শুনতে কথাবার্তায় ভালই, তোমারই মতন বিলেত দেখা আছে, সেও খোঁড়া তুমিও খোঁড়া। বাধা তো কিছুই দেখছি না, কিন্তু তোমার মা যে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, অমন মারমুখো খাণ্ডার মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে না, কিন্তু জয়হরির মতন পাত্র তো আর হাতছাড়া করতে পারি না, আমার ভাইঝি বেবির সঙ্গে তার সম্বন্ধের চেষ্টা করব, দাদাকে লিখব বেবিকে যেন এখানে পাঠিয়ে দেন।

মাইতি-গিন্নী চলে যাবার পর বেতসীর মনে নানা রকম ভাবনা ঠেলাঠেলি করতে লাগল। সম্মুখ সমরে তার পরাজয় হয়েছে, সে জখম হয়ে বাড়িতে আটকে আছে। ডাক্তারের মতন মিথ্যাবাদী দুটি নেই, এই সেদিন বলল এক মাস, আবার

এখন বলছে তিন মাস। ওদিকে শত্রু হাসছে, তার নেড়ী কুত্তী আর গাধাটাও বোধ হয় হাসছে। জয়হরির আস্পর্ধা কম নয়, এখানে এসে খোঁজ নিয়ে মহত্ত্ব দেখাচ্ছে। বেবিকে বিয়ে করবেন? ইস, করলেই হল! বেতসী শত্রুকে কিছুতেই হাতছাড়া হতে দেবে না, মাইতি-বুড়ীর দাবাই প্রয়োগ করবে। কূট যুদ্ধে শত্রুকে কাবু করে বশে আনাতেও বাহাদুরি আছে। জয়হরি গাধাকে জেব্রা বানিয়েছে, বেতসী কি জয়হরিকে ভেড়া বানাতে পারবে না? সারা রাত ঘুম হল না, মনের মধ্যে যেন ঝড় বইতে লাগল।

সকালে উঠেই বেতসী আরশিতে নিজের মুখখানা একবার দেখে নিল, তার পর মতি স্থির করে শত্রুর প্রতি তার প্রথম বোমা ছাড়ল, জয়হরিকে দু লাইন চিঠি লিখে পাঠাল—আপনার কুত্তী আর গাধাটাকে ক্ষমা করলুম, আপনাকেও করলুম। আপনিও আমাকে ক্ষমা করতে পারেন।

# শিবামুখী চিমটে

ঝিণ্টুর মুখ থেকে থার্মমিটার টেনে নিয়ে তার মা বললেন, নিরেনব্বুই পয়েণ্ট চার। আজ রাত্তিরে শুধু দুধবার্লি খাবি। ঘুরে বেড়াবি না, এই ঘরে থাকবি। আমাদের ফিরতে কতই আর দেরি হবে, এই ধর রাত বারোটা।

ঠোঁট ফুলিয়ে ঝিণ্টু বলল, বা রে, তোমরা সকলে মজা করে মাদ্রাজী ভোজ খাবে আর আমি একলাটি বাড়িতে পড়ে থাকব, হুঁ—

—আরে রাম বল, ওকে কি ভোজ বলে! মাছ নেই, মাংস নেই, শুধু তেঁতুলের পোলাও, লংকার ঝোল, আর টক দই। যজ্ঞস্বামী আয়ার ওঁর অফিসের বড় সাহেব, তাঁর মেয়ের বিয়ে, আর আয়ার-গিন্নীও অনেক করে বলেছে, তাই যাচ্ছি। তোর জন্যে এই মেকানো রইল, হাওড়া ব্রিজ তৈরি করিস। সুকুমার রায়ের তিনখানা বই রইল, ছবি দেখিস। কিন্তু বেশী পড়িস নি, মাথা ধরবে। তোর পিসীকে বলে যাচ্ছি রাত সাড়ে আটটায় দুধবার্লি দেবে। খেয়েই শুয়ে পড়বি। পিসী তোর কাছে শোবে।

—না, পিসীমাকে শুতে হবে না। তার ভীষণ নাক ডাকে, আমার ঘুম হবে না। আমি একলাই শোব।

—বেশ, তাই হবে।

ঝিণ্টুর বয়স দশ, লেখাপড়ায় মন্দ নয়, কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল আর দুরন্ত। তার মা বাবা আর ছোট বোন নিমন্ত্রণ খেতে গেল আর সে একলা বাড়িতে পড়ে রইল, এ অসহ্য। একটু জ্বর হয়েছে তো কি হয়েছে? সে এখনই দু মাইল দৌড়ুতে পারে, ব্যাডমিণ্টন খেলতে পারে, সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে তেতলার ছাতে উঠতে পারে। বাড়িতে গল্প করারও লোক নেই। পিসীমাটা যেন কি, দুপুর বেলা আপিসে যায় আর সকালে বিকেলে রাত্তিরে শুধু নভেল পড়ে। ঝিণ্টুর ক্লাসফ্রেণ্ড জিতুর পিসীমা কেমন চমৎকার বুড়ো মানুষ, কত রকম গল্প বলতে পারে। জিতু বলে, হ্যাঁরে ঝিণ্টু, তোর সরসী পিসী সেজেগুজে আপিস যায় কেন? মালা জপবে, বড়ি দেবে, নারকেলনাড়ু আমসত্ত্ব কুলের আচার বানাবে, তবে না পিসীমা!

মেকানো জোড়া দিয়ে ঝিণ্টু অনেক রকম ব্রিজ করল, আবার খুলে ফেলল। সাড়ে আটটার সময় সরসী পিসী তাকে দুধবার্লি খাইয়ে বলল, এইবার ঘুমিয়ে পড় ঝিণ্টু।

ঝিণ্টু বলল, সাড়ে আটটায় বুঝি লোকে ঘুমোয়? তুমি তো অনেক বই পড়, তা থেকে একটা গল্প বল না।

সরসী উত্তর দিল, ওসব গল্প তোর ভাল লাগবে না।

—খালি প্রেমের গল্প বুঝি?

—অতি জেঠা ছেলে তুই। বড়দের জন্যে লেখা গল্প ছোটদের ভাল লাগে নাকি? এই তো সেদিন তোর মা শেষের কবিতা পড়ছিল, তুই শুনে বললি, বিচ্ছিরি। আলো নিবিয়ে দিই, ঘুমিয়ে পড়।

সরসী পিসী চলে গেলে ঝিণ্টু শুয়ে পড়ল, কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। এক ঘণ্টা এপাশ ওপাশ করে সে বিছানা থেকে তড়াক করে উঠে পড়ল। তার মাথায় খেয়াল এসেছে, একটা অ্যাডভেঞ্চার করতে হবে। ডিটেকটিভ, ডাকাত, বোম্বেটে, গুপ্ত ধন, এই সবের গল্প সে অনেক পড়েছে। আজ রাত্রে যদি সে গুপ্ত ধন আবিষ্কার করতে পারে তো কেমন মজা হয়! সে তার মায়ের কাছে শুনেছিল, তার এক বৃদ্ধপ্রজেঠামহ অর্থাৎ প্রপিতামহের জেঠা পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। অনেককাল হল তিনি মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর তোরঙ্গটি তেতলার ঘরে এখনও আছে। সেই তোরঙ্গ খুলে দেখলে কেমন হয়?

ঝিণ্টুর একটা টর্চ আছে, দেড় টাকা দামের একটা পিস্তলও আছে। পিস্তলটা কোমরে ঝুলিয়ে টর্চ নিয়ে সে তেতলায় উঠল। সেখানে সিঁড়ির পাশে একটি মাত্র ঘর, তাতে শুধু অদরকারী বাজে জিনিস থাকে। সেই ঘরে ঢুকে ঝিণ্টু সুইচ টিপে আলো জ্বালল। তার বৃদ্ধপ্রজেঠামহ করালীচরণ মুখুজ্যের তোরঙ্গটা এক কোণে রয়েছে। বেতের তৈরি, তার উপর মোষের চামড়া দিয়ে মোড়া, অদ্ভুত গড়ন, যেন একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ। যে তালা লাগানো আছে তাও অদ্ভুত। দেয়ালে এক গোছা পুরনো চাবি ঝুলছে। ঝিণ্টু একে একে সব চাবি দিয়ে তালা খোলবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সে হতাশ হয়ে ফিরে যাবার উপক্রম করছে, হঠাৎ নজরে পড়ল, তোরঙ্গের পিছনের কবজা দুটো মরচে পড়ে খয়ে গেছে। একটু টানাটানি করতেই খসে গেল। ঝিণ্টু তখন তোরঙ্গের ডালা পিছন থেকে উলটে খুলে ফেলল।

বিশ্রী ছাতা-ধরা গন্ধ। উপরে কতকগুলো ময়লা গেরুয়া রঙের কাপড় রয়েছে, তার নীচে এক গোছা তালপাতায় লেখা পুঁথি আর তিনটে মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। তার নীচে আবার কাপড়, তামার কোষা-কুষি, সাদা রঙের সরার মতন একটা পাত্র, একটা মরচে ধরা ছোট ছুরি, একটা সরু কলকে, অত্যন্ত ময়লা এক টুকরো নেকড়া, আর একটা চিমটে। ঝিণ্টু যদি চৌকস লোক হত তা হলে বুঝত —সাদা সরাটা হচ্ছে খর্পর অর্থাৎ মড়ার মাথার খুলি, আর ছুরি কলকে নেকড়া চিমটে হচ্ছে গাঁজা খাওয়ার সরঞ্জাম।

বিরক্ত হয়ে ঝিণ্টু বলল, দুত্তোর, টাকা কড়ি হীরে মানিক কিচ্ছু নেই, তবে চিমটেটি মন্দ নয়, আন্দাজ এক ফুট লম্বা, মাথায় একটা আংটা, তাতে আবার আরও তিনটে আংটা গোর্ছা করে লাগানো আছে। চিমটের গড়ন বেশ মজার, টিপলে মুখটা শেয়ালের মতন দেখায়, দু পাশে দুটো চোখ আর কানও আছে। বহুকালের জিনিস হলেও মরচে ধরে নি, বেশ চকচকে। তোরঙ্গ বন্ধ করে চিমটে নিয়ে ঝিণ্টু তার ঘরে ফিরে এল।

আলো জেবলে বিছানায় বসে ঝিণ্টু সুকুমার রায়ের বইগুলো কিছুক্ষণ উলটে পালটে দেখল। পাশের ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজল। এইবার ঘুম পাচ্ছে। শোবার আগে সে আর একবার চিমটেটা ভাল করে দেখল। নাড়া পেয়ে মাথার আংটাগুলো ঝমঝম করে বেজে উঠল। তার পরেই এক আশ্চর্য কাণ্ড।

দরজা ঠেলে এক অদ্ভুত মূর্তি ঘরে ঢুকল। বেঁটে গড়ন, ফিকে ব্রুন্যাক কালির মত গায়ের রং, মাথার চুলে ঝুটি বাঁধা, মুখখানা বাঁদরের মতন, নন্দলালের আঁকা

নন্দীর ছবির সঙ্গে কতকটা মিল আছে। পরনে গেরুয়া রঙের নেংটি, পায়ে খড়ম। মূর্তি বলল, কি চাও হে খোকা?

ঝিণ্টু প্রথমটা ভয়ে আঁতকে উঠল। কিন্তু সে সাহসী ছেলে, মূর্তিমান অ্যাডভেঞ্চার তার সামনে উপস্থিত হয়েছে, এখন ভয় পেলে চলবে কেন। ঝিণ্টু প্রশ্ন করল, তুমি কে?

—ঢুণ্ডুদাস চণ্ড। তোমার পূর্বপুরুষ পিশাচসিদ্ধ হয়েছিলেন তা শুনেছ? আমি সেই পিশাচ।

—তোমাকেই সিদ্ধ করেছিলেন বুঝি?

—দূর বোকা, আমাকে সিদ্ধ করে কার সাধ্য! তিনি সাধনা করে নিজেই সিদ্ধ হয়েছিলেন, আমাকে বশ করেছিলেন। এই শিবামুখী চিমটেটি আমিই তাঁকে দিয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে এই বন্দোবস্ত হয়েছিল যে চিমটে বাজালেই আমি হাজির হব, আমাকে যা করতে বলা হবে তাই করব। কিন্তু করালী মুখুজ্যে ছিলেন নির্লোভ সাধু পুরুষ, কখনও ধন দৌলতের জন্যে আমাকে ফরমাশ করেন নি। শুধু হুকুম করতেন—লে আও তম্বাকু, লে আও গঞ্জা, লে আও ওমদা কারণবারি বিলায়তী শরাব, লে আও অচ্ছী অচ্ছী ভৈরবী। তিনি মারা যাবার পর থেকে আমি নিষ্কর্মা হয়ে আছি। শোন খোকা—আজ হল বৈশাখী অমাবস্যা। এক শ বছর আগে এই অমাবস্যার রাত দুপুরে তোমার প্রপিতামহের জেঠা করালী-চরণ মুখুজ্যে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। শর্ত অনুসারে আজ ঠিক সেই লগ্নে আমি কিংকরত্ব থেকে মুক্তি পাব, তার পর যতই চিমটে বাজাও আমি সাড়া দেব না। এখনও ঘণ্টা দুই সময় আছে। তোমার ডাক শুনে আমি এসেছি, কি চাই বল।

একটু ভেবে ঝিণ্টু বলল, একটা হাঁসজারু দিতে পার?

—সে আবার কি?

ঝিণ্টু বই খুলে ছবি দেখিয়ে বলল, এই রকম জন্তু, হাঁস আর শজারুর মাঝামাঝি।

—ও, বুঝেছি। কিন্তু এ রকম জানোয়ার তো রেডিমেড পাওয়া যাবে না, সৃষ্টি করতে সময় লাগবে। ঘণ্টাখানিক পরে আমি একটা হাঁসজারু পাঠিয়ে দেব।

ঝিণ্টু বলল, তা না হয় এক ঘণ্টা দেরিই হল, ততক্ষণ আমি ঘুমুব। কিন্তু তুমি বেশী দেরি ক'রো না, মা বাবা সবাই এসে পড়বে।

পিশাচ অন্তর্হিত হল।

ঝিণ্টু ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ খুটখুট শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল। আলো জ্বালাই ছিল, ঝিণ্টু দেখল, একটা কিম্ভূত-কিমাকার জানোয়ার ঘরে ছুটোছুটি করছে। তার মাথা আর গলা হাঁসের মতন, ধড় শজারুর মতন, সমস্ত গায়ে কাঁটা খাড়া হয়ে আছে. চার পায়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে আর প্যাঁক প্যাঁক করে ডাকছে। ঝিণ্টু উঠে বসল, আদর করে ডাকল—আ আ চু চু। হাঁসজারু পোষা কুকুরের মতন লাফিয়ে দুই থাবা তুলে কোলে উঠতে গেল। ঝিণ্টুর হাঁটুতে কাঁটার খোঁচা লাগল, সে বিরক্ত হয়ে বলল, যাঃ, সরে যা, গায়ে যে একটু হাত বুলিয়ে দেব তারও জো নেই!

এই ঘরের ঠিক নীচের ঘরটি সরসী পিসীর। খাওয়ার পর সরসী একটা গোটা উপন্যাস সাবাড় করে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাথার উপর দুপদাপ শব্দ হওয়ায় তার ঘুম ভেঙে গেল, বিরক্ত হয়ে বলল, আঃ, পাজী ছেলেটা এখনও ঘুময় নি, দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সরসী উপরে উঠে ঝিণ্টুর ঘরে ঢুকেই চমকে উঠে বলল, ও মা গো, এটা আবার কোত্থেকে এল!

ঝিণ্টু বলল, ও আমি পুষেছি, কোনও ভয় নেই, কিচ্ছু বলবে না। কাল নাপিত ডেকে গায়ের কাঁটা ছাঁটিয়ে দেব, তা হলে আর হাতে ফুটবে না। একটু দুধ আর বিস্কুট এনে দাও না পিসীমা, বেচারার খিদে পেয়েছে।

আত্মরক্ষার জন্য সরসী ঝিণ্টুর খাটের উপর উঠে বলল, এটাকে কোত্থেকে পেয়েছিস শিগ্‌গির বল ঝিণ্টে।

হাত নেড়ে মুখভঙ্গী করে ঝিণ্টু বলল, ইঃ বলব কেন!

—লক্ষ্মীটি, বল কোথা থেকে এটা এল।

—আগে দিব্বি গাল যে কারুক্কে বলবে না।

—কালীঘাটের মা কালীর দিব্বি, কাকেও বলব না।

ঝিণ্টু তখন সমস্ত ব্যাপারটি খুলে বলল। সরসীর বিশ্বাস হল না, বলল, তুই বানিয়ে বলছিস ঝিণ্টু। করালী জেঠা পিশাচসিদ্ধ ছিলেন এই রকম শুনেছি বটে, কিন্তু ও একটা বাজে গল্প।

বাজে গল্প! তবে এই দেখ—

ঝিণ্টু চিমটে নেড়ে ঝন ঝন শব্দ করতেই ঢুণ্ডুদাস চণ্ডের আবির্ভাব হল। সরসী ভয়ে কাঠ হয়ে চোখ কপালে তুলে অবাক হয়ে দেখতে লাগল। পিশাচ বলল, কি চাই খোকা?

ঝিণ্টু হুকুম করল, মটর ভাজা, বেশ বড় বড়। বেশী করে দিও, পিসীমাও খাবে।

পিশাচ অন্তর্হিত হল। একটু পরেই একটা কাগজের ঠোঙা শূন্য থেকে ধপ করে ঘরের মেঝেতে পড়ল। সদ্য ভাজা বড় বড় মটরে ভরতি, এখনও গরম রয়েছে। এক মুঠো নিয়ে ঝিণ্টু বলল, পিসীমা, একটু খেয়ে দেখ না।

সরসী গালে হাত দিয়ে বলল, অবাক কাণ্ড! বাপের জন্মে এমন দেখি নি, শুনিও নি। কিন্তু তুই কি বোকা রে খোকা। কোথায় দু-চার লাখ টাকা, মস্ত বাড়ি, দামী মোটর গাড়ি, এই সব চাইবি, তা নয়, চাইলি কিনা হাঁসজারু আর মটর ভাজা! ছি ছি ছি। আচ্ছা, তোর ওই চিমটেটা একবারটি আমাকে দে তো।

পিসীর উপর ঝিণ্টুর কোনও দিনই বিশেষ টান নেই। ভেংচি কেটে বলল, ইস দিলুম আর কি! এই শেয়ালমুখো চিমটে আমি কারুক্কে দিচ্ছি না। তোমার কোন্ জিনিস দরকার বল না, আমি আনিয়ে দিচ্ছি।

—তুই ছেলেমানুষ, গুছিয়ে বলতে পারবি না।

—আচ্ছা, আমি ঢুণ্ডুদাসকে ডাকছি। তুমি যা চাও আমাকে বলবে, আর আমি ঠিক সেই কথা তাকে বলব।

অগত্যা সরসী রাজী হল। ঝিণ্টু চিমটে নাড়তেই আবার পিশাচ এসে বলল, কি চাই?

ঝিণ্টু বলল, চটপট বলে ফেল পিসীমা, এক্ষুনি হয়তো বাবা মা এসে পড়বে।

ঝিণ্টুর জবানিতে সরসী যা চাইলে তার তাৎপর্য এই। আগে ওই জানোয়ার-

টাকে বিদেয় করতে হবে। তার পর দুর্লভ তালুকদার নামক এক ভদ্রলোককে ধরে আনতে হবে। তিনি কানপুর উলেন মিলে চাকরি করেন। বাসার ঠিকানা জানা নেই।

হাঁসজারু আর পিশাচ অন্তর্হিত হল।

ঝিণ্টু বলল, কানপুরের ভদ্রলোককে এনে কি হবে পিসীমা?

—তাকে আমি বিয়ে করব।

—বিয়ে করবে কি গো! তুমি তো বুড়ো ধাড়ী হয়েছ।

—কে বলল, বুড়ো ধাড়ী! আমার বয়েস তো সবে পঁচিশ।

—মা যে বলে তোমার বয়েস চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ?

—মিথ্যে কথা, তোর মা হিংসুটে, তাই বলে। আর আমি তো আইবুড়ো মেয়ে, বয়েস যাই হক বিয়ে করব না কেন?

পিশাচ ফিরে আসবার আগে একটু পূর্বকথা বলার দরকার। বারো-তের বছর পূর্বে সরসী যখন কলেজে পড়ত তখন দুর্লভ তালুকদারের সঙ্গে তার ভাব হয়। দুর্লভ বলেছিল, আমার একটি ভাল চাকরি পাবার সম্ভাবনা আছে, পেলেই তোমাকে বিয়ে করব। কিছুদিন পর দুর্লভ চাকরি পেয়ে কানপুরে গেল। সেখান থেকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখত—বড় মাগ্‌গি জায়গা, তোমার উপযুক্ত বাসাও পাই নি, মাইনে মোটে দু'শ টাকা, দুজনের চলবে কি করে? আশা আছে শীঘ্রই সাড়ে তিনশ টাকার গ্রেডে প্রমোশন পাব, ভাল কোয়াটার্সও পাব। লক্ষ্মীটি সরসী, তত দিন ধৈর্য ধরে থাক। তার পর ক্রমশ চিঠি আসা কমতে লাগল, অবশেষে একেবারে বন্ধ হল। সরসী বুঝল যে দুর্লভ মিথ্যাবাদী, কিন্তু তবু তাকে সে ভুলতে পারে নি।

পিশাচ একটি মোটা লোককে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এসে ধপ করে মেঝেতে ফেলে বলল, এই নাও খোকা, তোমার পিসীর বর। এখন বেহুঁশ হয়ে আছে, একটু পরেই চাঙ্গা হবে।

দুর্লভের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ঝিণ্টু বলল, উঃ, মামাবাবু ক্লাব থেকে ফিরে এলে যে রকম গন্ধ বেরয় সেই রকম লাগছে। ও ঢুণ্ডু মশাই, একে জাগিয়ে দাও না।

পিশাচ বলল, নেশায় চুর হয়ে আছে। কানপুরের একটা বস্তিতে ও ইয়ারদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল, সেখান থেকে তুলে এনেছি। এই, উঠে পড় শিগ্‌গির।

ঠেলা খেয়ে দুর্লভের চেতনা ফিরে এল। চোখ মেলে বলল, তোমরা আবার কে?

ঝিণ্টু বলল, পিসীমা, যা বলবার তুমি একে বল।

—আমি পারব না, তুই বল খোকা।

—ও মশাই, শুনছেন? এ হচ্ছে আমার সরসী পিসীমা, আইবুড়ো মেয়ে। একে আপনি বিয়ে করুন।

দুর্লভ বলল, আহা কি কথাই শোনালে! বিয়ে কর বললেই বিয়ে করব?

পিশাচ বলল, করবি না কি রকম? তোর বাবা করবে।

একটি পৈশাচিক চড় খেয়ে দুর্লভ বলল, মেরো না বাবা, ঘাট হয়েছে। বেশ, বিয়ে করছি, পুরুত ডাক। কিন্তু বলে রাখছি, অলরেডি আমার একটি বাঙালী স্ত্রী আর খোট্টা জরু আছে। সরসী যদি তিন নম্বর সহধর্মিণী হতে চায় আমার আর আপত্তি কি? সবাই মিলে এক বিছানায় শুতে হবে কিন্তু

সরসী বলল, দূর করে দাও হতভাগা মাতালটাকে।

ঝিণ্টুর আদেশে পিশাচ দুর্লভকে তুলে নিয়ে চলে গেল। ঝিণ্টু বলল, আচ্ছা পিসীমা, তোমার অপিসে তো অনেক ভাল ভাল বাবু আছে, তাদের একজনকে আনাও না।

একটু ভেবে সরসী বলল, আমাদের হেড অ্যাসিস্টাণ্ট যোগীন বাড়ুজ্যের স্ত্রী দু বছর হল মারা গেছে। যোগীনবাবু লোকটি ভাল, তবে কালচার্ড নয়, একটু বয়সও হয়েছে। বড্ড তামাক খায়, কথা বললে হুঁকো হুঁকো গন্ধ ছাড়ে। তা কি আর করা যাবে, অত খুঁত ধরলে চলে না, সব পুরুষই মোর অর লেস ডার্টি। কিন্তু যোগীনবাবু রাজী হবে কি? মোটা বরপণ পেলে হয়তো—

ঝিণ্টু বলল, বরপণ কি? গয়না আর টাকা? সে তুমি ভেবো না পিসীমা, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

চিমটে বাজিয়ে পিশাচকে ডেকে ঝিণ্টু বলল, পিসীমার আপিসে সেই যে যোগীন বাঁড়ুজ্যে কাজ করে—ঠিকানাটা কি পিসীমা? তিন নম্বর বেচু মিস্ত্রী লেন—সেইখান থেকে তাকে ধরে নিয়ে এস। আর শোন, পিসীমাকে একগাদা গয়না আর অনেক টাকা দাও।

সরসীর সর্বাঙ্গ মোটা মোটা সোনার গহনায় ভরে গেল, পাঁচটা থলিও ঝনাত করে তার পায়ের কাছে পড়ল। পিশাচ চলে গেল।

একটা থলি তুলে সরসী বলল, সের পাঁচ-ছয় ওজন হবে।

ঝিণ্টু বলল, পাঁচ শ টাকায় সওয়া ছ-সের, হাজার টাকায় সাড়ে বারো সের, লাখ টাকায় একত্রিশ মন দশ সের। 'জ্ঞানের সিন্দুক' বইয়ে আছে।

পিশাচ যোগীন বাঁড়ুজ্যেকে পাঁজাকোলা করে এনে মেঝেতে ফেলল।

ঝিণ্টু বলল, এও নেশা করেছে নাকি?

পিশাচ বলল, নেশা নয়, অজ্ঞান করে নিয়ে এসেছি, একটু ঠেলা দিলেই চাঙ্গা হবে। থাম, আগে আমি সরে পড়ি, নয়তো আমাকে দেখে আবার ভিরমি যাবে।

ঠেলা খেয়ে যোগীন বাঁড়ুজ্যে উঠে বসলেন। হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বললেন, দুর্গা দুর্গা, এ আমি কোথায়? একি, মিস সরসী মুখার্জী এখানে যে! উঃ, কত গহনা পরেছেন! আপনার বিবাহের নিমন্ত্রণে এসেছি

মুখ নীচু করে সরসী বলল, খোকা, তুই বল।

ঝিণ্টু বলল, স্যার, আপনি আমার সরসী পিসীমাকে বিয়ে করুন, ইনি আইবুড়ো মেয়ে, বয়স সবে পঁচিশ। দেখছেন তো, কত গয়না, আবার পাঁচ থলি টাকাও আছে, এক-একটা পাঁচ-ছ সের।

যোগীনবাবু বললেন, বাঃ খোকা, তুমি নিজেই সালংকারা পিসীকে সম্প্রদান করছ নাকি? তা আমার অমত নেই, মিস মুখার্জির ওপর আমার একটু টাঁকও ছিল। তবে কিনা ইনি হলেন মডার্ন মহিলা, তাই এগুতে ভরসা পাই নি। গহনাগুলো বড্ড সেকেলে, কিন্তু বেশ ভারী মনে হচ্ছে, বেচে দিয়ে নতুন ডিজাইনের গড়ালেই চলবে। কিন্তু ব্যাপারটা যে কিছুই বুঝতে পারছি না, এখানে আমি এলুম কি করে?

সরসী বলল, সে কথা পরে শুনবেন। এখন বাড়ি যান, কাল সকালে এসে আমার দাদাকে বিবাহের প্রস্তাব জানাবেন। এই আংটিটা পরুন তা হলে ভুলে যাবেন না।

—ভুলে যাবার জো কি! কাল সকালেই তোমার দাদাকে বলব। এখন কটা

বেজেছে? বল কি, পৌনে বারো! তাই তো, বাড়ি যাব কি করে, ট্রাম বাস সব তো বন্ধ।

ঝিণ্টু বলল, কিচ্ছু ভাববেন না সার, একবারটি শুয়ে পড়ে চোখ বুজুন তো।

যোগীন বাঁড়ুজ্যে সুবোধ শিশুর ন্যায় শুয়ে পড়ে চোখ বুজলেন। শিবামুখী চিমটের আওয়াজ শুনে পিশাচ আবার এল। ঝিণ্টু তাকে ইশারায় আজ্ঞা দিল—এঁকে নিজের বাড়িতে পৌঁছে দাও!

বারোটা বাজল। সরসী বলল, দাদা বউদি এখনই এসে পড়বে। যাই, গহনা-গুলো খুলে ফেলি গে, টাকার থলিগুলোও তুলে রাখতে হবে। তোর মোটে বুদ্ধি নেই, টাকা না চেয়ে নোট চাইলি না কেন? ঝিণ্টু বাবা আমার, কোনও কথা কাকেও বলিস নি।

—না না, বলব কেন। এই যা, ঢুণ্ডুদাসের কাছে একটা বেঁজি চেয়ে নিতে ভুলে গেছি। ইস্কুলের দরোয়ান রামভজনের কেমন চমৎকার একটি আছে, খুব পোষা, কাঁধের ওপর নেপটে থাকে।

—ভাবিস নি খোকা, যত বেঁজি চাস তোর পিসেমশাই তোকে কিনে দেবে। তুই আর জ্বর গায়ে জাগিস নি, শুয়ে পড়।

—কোথায় জ্বর! সে তো ঢুণ্ডুদাসকে দেখেই সেরে গেছে।

—হ্যাঁরে খোকা, আমরা স্বপ্ন দেখছি না তো? সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি দেখি গহনা আর টাকা সব উড়ে গেছে?

—গেলই বা উড়ে। যোগীনবাবু আবার গড়িয়ে দেবে, টাকাও দেবে।

—যোগীনবাবুও যদি উড়ে যায়?

—যাক গে উড়ে। তুমি এই মটরভাজা একটু খেয়ে দেখ না, কেমন কুড়কুড়ে। বেশ করে চিবিয়ে গিলে ফেল, তা হলে কিছুতেই উড়ে যেতে পারবে না।

# দ্বান্দ্বিক কবিতা

ভূপতি মুখুজ্যে এই আড্ডার নিয়মিত সদস্য নয়, মাঝে মাঝে আসে। সে কোন্নগরে থাকে কিন্তু কলকাতার সব খবর রাখে। আমুদে লোক, বয়স চল্লিশ হলেও ভাঁড়ামি করতে তার বাধে না।

আজ সন্ধ্যায় যতীশ মিত্রের আড্ডাঘরে ঢুকেই ভূপতি সেকেলে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার ভঙ্গীতে সুর করে হাত নেড়ে বলল,

শুন-ন-গ-র-বা-আ-সি-গণ
আশ্চর্য খবর মহা সেন্‌সে-শন
শুন ন-গ-র—

বৃদ্ধ পিনাকি সর্বজ্ঞ এখানে রোজ চা খেতে আসেন। বললেন, ফাজলামি রাখ, যা বলবার সোজা ভাষায় বল।

ভূপতি আবার সুর করে বলল,

আমাদের কবি ধূর্জটিচরণ
ছিরু ঘোষকে করেছে গুরু বরণ,
মার্ক্‌সীয় বৈষ্ণব মঠে নিয়েছে শরণ,
সব সম্পত্তি নাকি করিবে অর্পণ।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, গাঁজা টেনে এসেছ নাকি? ছিরু ঘোষ লোকটা কে?

ভূপতি বলল, জানেন না? কমরেড শ্রীদাম ঘোষ, সম্প্রতি মঠস্বামী শ্রীদাম মহারাজ হয়েছেন?

—ওকে চিনি না, তবে তোমাদের কবি ধূর্জটিচরণকে বার কতক দেখেছি বটে, বছর দুই আগে যতীশের কাছে মাঝে মাঝে আসত। মার্ক্‌সীয় বৈষ্ণব মঠ আবার কি? জান নাকি যতীশ?

যতীশ মিত্র বলল, একটু আধটু জানি, কমরেড ছিরুর সঙ্গে এককালে আলাপ ছিল। আর ধূর্জটির সঙ্গে তো এক ক্লাসে পড়েছি, কিন্তু সে যে ছিরুর শিষ্য হয়েছে তা জানতুম না।

পিনাকি সর্বজ্ঞ বললেন, মার্ক্‌সীয় বৈষ্ণব মঠ নামটা যেন সোনার পাথরবাটি, কাঁঠালের আমসত্ব। মার্ক্‌সের শিষ্যরা তো ঘোর নাস্তিক, তারা আবার বৈষ্ণব হল কবে?

যতীশ বলল, কালক্রমে সবই বদলে যায়। ডব্‌লু সি বনার্জির সময় কংগ্রেস যা ছিল এখনও কি তাই আছে? লেনিন আর ট্রট্‌স্কির পলিসি কি এখনও বজায় আছে? বেঁচে থাকলে আরও কত কি দেখবেন সর্বজ্ঞ মশাই। তান্ত্রিক ফাসিজ্‌ম, মার্কিন অদ্বৈতবাদ, ভারতীয় সর্বাস্তিবাদ—

উপেন দত্ত বলল, হেঁয়ালি রাখ যতীশ-দা, মার্ক্‌সীয় বৈষ্ণব মঠ ব্যাপারটা কি বুঝিয়ে দাও।

যতীশ বলল, সব বৃত্তান্ত আমার জানা নেই, যতটুকু জানি তাই বলছি। ছেলেবেলা থেকেই ছিরুর একটু কমরেডী মতিগতি ছিল। কলেজ ছাড়ার পর সে একজন উগ্র সাম্যবাদী হয়ে উঠল, প্রতিপত্তিও খুব হল। শুনেছি শেষকালে সে ওদের দলের একজন কর্তা ব্যক্তি হয়েছিল। কিন্তু ছিরুর সঙ্গে পার্টির লোক-দের মতের মিল হল না। তাদের গুরু রাশিয়া, কিন্তু ছিরু বলল, সব দেশে একই ব্যবস্থা চলতে পারেন না। ভারতের লোক হচ্ছে ধর্মপ্রাণ, ধর্ম বাদ দিয়ে কোনও রাজনীতি এখানে দাঁড়াতেই পারে না। এই দেখ, বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে মা-দুর্গা বানিয়েছিলেন। আমাদের অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের এক হাতে থাকত বোমা, আর এক হাতে গীতা। দেশবন্ধু কৃষ্ণপ্রেমী হয়ে পড়লেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তান্ত্রিক সাধনা করতেন। শ্রীঅরবিন্দ লাইফ ডিভাইন নিয়ে মেতে রইলেন। গান্ধীজী রঘুপতি রাঘবের কীর্তন করতেন। গুরুজী গোলবালকরও রামভক্ত, যদিও তাঁর ভক্তি একটু দুসরী কিসিম কী। কমিউনিজম এদেশে জুত করতে পারছে না তার কারণ এর কোনও ঐশ্বরিক অবলম্বন নেই। মহান স্তালিন, মহান মাও-সে-তুং বলে যতই চেঁচাও তাতে প্রাণ সাড়া দেবে না। ভক্তি চাই, অবতার চাই। সাম্য-বাদকে ঢেলে সাজাতে হবে। ছিরু ঘোষ বিগড়ে গেছে দেখে পার্টির কর্তারা তাকে দল থেকে দূর করে দিল। কিন্তু ছিরু দমবার পাত্র নয়, অনেক বড়লোক ভক্ত জুটিয়েছে, তাদের টাকায় মার্ক্সীয় বৈষ্ণব মঠ প্রতিষ্ঠা করে নিজে মঠাধীশ শ্রীদাম মহারাজ হয়েছে। বড় বড় ব্যবসায়ীরা তার পৃষ্ঠপোষক, শীঘ্রই সে অবতার হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের ধূর্জটি কবির তো কোনও দিন ধর্মে বা পলিটিক্সে মতি ছিল না, সে কি করে ছিরুর কবলে পড়ল বুঝতে পারছি না।

ভূপতি বলল, ছিরুর সব খবর আমি রাখি, ধূর্জটিরও নাড়ী নক্ষত্র জানি, সে দূর সম্পর্কে আমার শালা হয়। ছেলেবেলা থেকেই ধূর্জটি কবিতা লিখত, তার কবিখ্যাতি আছে, গোটাকতক বইও আছে। অনেক কবি যেমন করে থাকে সেই রকম ধূর্জটিও একটি মানসী প্রিয়া খাড়া করে তার উদ্দেশে কবিতা লিখত।

উপেন দত্ত বলল, এর মানে আমি মোটেই বুঝতে পারি না। আমাদের ছোট বড় বিবাহিত অবিবাহিত যত কবি আছেন তাঁদের অনেকে একটি মনগড়া মেয়ের উদ্দেশে কবিতা লেখেন? এতে তাঁদের কি লাভ হয়?

যতীশ বলল, শাস্ত্রে আছে, সাধকদের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপকল্পনা। কবিরা তেমনি প্রেমাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য একটি পরমা প্রেয়সীর কল্পনা করেন। এ একরকম তান্ত্রিক নায়িকাসাধনা।

পিনাকী বললেন, বাজে কথা। একে বলে মনে মনে ব্যভিচার। যাদের স্ত্রী নেই কিংবা স্ত্রী পছন্দ হয় না সেই সব কবিই মনগড়া নারীর সঙ্গে প্রেম করে।

উপেন বলল, সর্বজ্ঞ মশাই যা বললেন তা হয়তো ঠিক, যতীশ-দার কথাও ঠিক। কিন্তু কবিদের এইরকম প্রেমলীলার জন্যে তাদের স্ত্রীরা চটে না কেন? মেয়ে কবিও তো ঢের আছে, তারা তো মনগড়া প্রেমিকের উদ্দেশে কবিতা লেখে না।

যতীশ বলল, কেউ কেউ লেখে বই কি। তবে খুব কম, কারণ কায়মনোবাক্যে সতীধর্ম পালন করার সংস্কার এদেশের বেশীর ভাগ মেয়ের এখনও আছে। পুরুষ-দের সে বালাই নেই। কবিদের স্ত্রীরা মনে করে, ছাগলে কি না খায়, কবিরা কি না লেখে, তাতে দোষ ধরলে চলে না।

ভূপতি বলল, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে গণ্ডগোল বাধে, স্বামী-স্ত্রীর জীবন-যাত্রায় ওলটপালট ঘটে, যেমন ধূর্জটিদের হয়েছে। ওদের সব খবরই আমি রাখি, বলছি শোন—

ধূর্জটি যখন ছোট তখনই তার বাপ-মা মারা যান, এক মামা তাকে নিজের কাছে রেখে পালন করেন। শিক্ষা শেষ করে ধূর্জটি তার মামার কারবারে যোগ দিল, দেদার কবিতাও লিখতে লাগল। তার পর তার বিয়ে হল। দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন লিখেছেন ধূর্জটির ঠিক সেই রকম মনে হল—ভাবলাম বাহা বাহা রে, কি রকম যে হয়ে গেলুম বলব তাহা কাহারে। এতদিন সে কাল্পনিক প্রিয়ার উদ্দেশে কবিতা লিখত, এখন জীবন্ত প্রিয়ার ওপর লিখতে লাগল। বউএর শংকরী নামটা সেকেলে বলে ধূর্জটি বদলাতে চেয়েছিল কিন্তু বউ রাজী হল না, বলল, ও আমার জেঠামশায়ের দেওয়া নাম, বদলানো চলবে না; তোমার নামটাই বা কি এমন মধুর? অগত্যা সেকেলে শংকরীকেই সম্বোধন করে ধূর্জটি লিখতে লাগল —নন্দনের উর্বশী, পাতালপুরীর রাজকন্যা, সাগর থেকে ওঠা ভিনস, আমার হৃদয় যা চায় তুমি ঠিক তাই গো, এই সব।

কিছু কাল এই রকমে চলল, তার পর ক্রমশ ধূর্জটির হুঁশ হল মানসী প্রিয়ার সঙ্গে তার বিবাহিত প্রিয়ার মিল নেই। শংকরী কাব্যরস বোঝে না, তার মনে রোমান্স নেই। বিয়ের সময় সে আত্মীয় আর বন্ধুদের কাছ থেকে বিস্তর সস্তা উপহার পেয়েছিল। তার উদ্দেশে লেখা ধূর্জটির কবিতাগুলোও যেন তার কাছে মামুলী উপহারের শামিল। সে সংসারের কাজ আর তার নবজাত খোকাকে নিয়েই ব্যস্ত। ধূর্জটি বেচারা আবার তার কাল্পনিক প্রিয়ার উদ্দেশে চুটিয়ে কবিতা লিখতে লাগল আর শংকরী সাংসারিক কাজে ডুবে রইল।

তার পর হাঙ্গামা বাধাল বিশাখা। সে আমার খুড়তুতো শালী, অত্যন্ত ফন্দিবাজ মেয়ে, ধূর্জটির বউ শংকরীর সঙ্গে এক কলেজে পড়েছিল। তার স্বামী নরেশ এঞ্জিনিয়ার, আগে কাঁচড়াপাড়ায় কাজ করত, তার পর বদলী হয়ে কলকাতায় এল, ধূর্জটির বাড়ির পাশেই বাসা করল। বিশাখাকে কাছে পেয়ে শংকরী খুব খুশী হল।

একদিন বিশাখা বলল, তোর বর তো একজন বিখ্যাত কবি। আজকাল কবিতার বই কেউ কেনে না, কিন্তু ধূর্জটিবাবুর বই বেশ বিক্রি হয় শুনেছি। আচ্ছা, উনি কার উদ্দেশে অত প্রেমের কবিতা লেখেন? তোমার জন্যে নিশ্চয় নয়, তা হলে 'স্বপ্নে দেখা অচিন প্রিয়া' এই সব লিখতেন না।

শংকরী বলল, কারও উদ্দেশে লেখে না। কবিরা খেয়ালী লোক, মনগড়া একটা কিছু খাড়া করে তার উদ্দেশে লেখে।

—সত্যি বা মনগড়া যাই হক, তোমার রাগ হয় না?

—ও সব আমি গ্রাহ্য করি না!

—এ তোমার ভারী অন্যায়, এর পর পস্তাতে হবে। আর দেরি নয়, এখন থেকে স্টেপ নাও।

—কি করতে বল তুমি?

—একটা মনগড়া পুরুষের উদ্দেশে তুমিও কবিতা লিখতে শুরু কর।

—রাম বল। কবিতা লেখা আমার আসে না, আর লিখলেই বা ছাপবে কে?

—সে তুমি ভেবো না। 'নিস্যান্দিনী' পত্রিকা দেখেছ তো? তার সম্পাদক তরণী সেন আমার দেওর রমেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তোমার লেখা ছাপাবার ব্যবস্থা আমি করে দেব। আর, কবিতা লেখা খুব সোজা, দেদার চুরি করবে, ওখান থেকে এক লাইন এখান থেকে এক লাইন নেবে, তার সঙ্গে নিজের কিছু জুড়ে দেবে। এখন গদ্য কবিতার যুগ, মিলের ঝঞ্ঝাট নেই, যা খুশি এলোমেলো করে সাজিয়ে দিলেই গদ্য কবিতা হয়ে যায়।

বিশাখার জেদের ফলে শংকরী রাজী হল। দুজনে মিলে একটা কবিতা খাড়া করল, বিশাখার দেওর রমেশ সেটা তরণী সেনের কাছে নিয়ে গেল।

তরণী বলল, আরে ছ্যা, একে কি কবিতা বলে। 'ওগো আমার বধু, তুমি ডুমুর ফুলের মধু!' এ রকম সেকেলে কাঁচা লেখা ছাপলে আমার পত্রিকা কেউ পড়বে না।

রমেশ তার বউদিদির সঙ্গে পরামর্শ করে তৈরি হয়েই গিয়েছিল। বলল, আচ্ছা তরণী, তোমার পত্রিকার লাভ কত হয়?

—লাভ কোথায়, এখনও ঘর থেকে গচ্চা দিতে হয়।

—তবে বলি শোন। প্রতি মাসে আমি পাঁচ-ছটা কবিতা আনব, প্রত্যেকটি ছাপবার জন্যে পাঁচ টাকা হিসেবে দেব। তাতে পঁচিশ-তিরিশ টাকা পাবে। রাজী আছ?

তরণী সেন বলল, তা মন্দ কি, কাগজের খরচটা তো উঠবে। টাকা পেলে প্রতি সংখ্যায় দশটা ছাপতে রাজী আছি। কিন্তু দেখ ভাই, নিতান্ত রাবিশ না হয়।

—আরে না না। শংকরী দেবীর নামে ছাপা হবে বটে কিন্তু বেশীর ভাগ আমার বউদিই লিখবেন। তাঁর হাত খুব পাকা।

নিস্যান্দিনী পত্রিকায় শংকরী দেবীর নামে কবিতা ছাপা হতে লাগল। তা দেখে ধূর্জটির মনে কিঞ্চিত কৌতুক আর করুণার উদয় হল। সে তার স্ত্রীকে বলল, বেশ তো, শখ যখন হয়েছে লিখতে থাক। এখন বড্ড কাঁচা, লিখতে লিখতে হাত পাকতে পারে। চাও তো আমি সংশোধন করে দিতে পারি। শংকরী বলল, না, না, তোমার কিছু করতে হবে না, যা পারি আমিই লিখব। বদনাম হয় তো আমারই হবে, তোমার ক্ষতি হবে না।

শংকরী দেবীর কবিতা কাঁচা থেকে পাকা, ঠাণ্ডা থেকে গরম এবং গরম থেকে গরমতর হতে লাগল। পাঠকরা বলল, কি চমৎকার! একজন আধুনিক সমালোচক লিখলেন—এক অনাস্বাদিতপূর্ব রসঘন কাব্যমধুরিমা, নদীর অন্তর্নিহিত ফল্গু-ধারার স্বতঃ উৎসারিত উৎস, এর তুলনা নেই। নিস্যান্দিনী পত্রিকার কাটতি হুহু করে বেড়ে গেল। তরণী সেনকে রমেশ বলল, আর টাকা দিচ্ছি না, এখন থেকে তুমিই দেবে, প্রতি কবিতায় দশ টাকা। 'প্রগামিনী'র সম্পাদক অনুকূল চৌধুরী তাই দেবেন বলেছেন। তরণী বলল, আচ্ছা আচ্ছা, শংকরী দেবী টাকা না হয় নাই দেবেন। কিন্তু দক্ষিণা দেবার সামর্থ্য এখনও আমাদের হয় নি, আরও কিছু দিন সবুর করতে হবে।

উপেন দত্ত বলল, শংকরী দেবীর কবিতা পড়েছি বলে মনে হয় না। আপিসের যা খাটুনি, সাহিত্য চর্চার ফুরসতই নেই। এই আড্ডায় এসে পাঁচ জনের মুখে যা একটু শুনতে পাই। আচ্ছা যতীশ-দা, তোমার কাছে নিস্যান্দিনী নেই?

যতীশ বলল, আমি পয়সা দিয়ে রাবিশ কিনি না।

ভূপতি বলল, শংকরী দেবীর কবিতা শুনতে চাও? কিছু কিছু আমার মনে আছে, বলছি শোন। একটা হচ্ছে এই রকম—

আমি চিনি গো চিনি তোমারে,
তুমি থাক মহাপ্রাচীরের এপারে।
কি মিষ্টি তোমার আধো আধো বুলি,
রুশকে বল লুশ, দু টাকাকে ত লুপি।
ওগো লাল চীনের জঙ্গী জওআন,
তোমার নয়ন বাঁকা, বর্ণ স্বর্ণচাঁপা,
সিল্কমসৃণ শ্যাময় লেদার তোমার চামড়া,
ওই নির্লোম বুকে ঠাঁই চাই ঠাঁই চাই।

আর একটা বলি শোন—

ও বিদেশী পাখতুনিস্থানবাসী,
তাগড়া জাক্কাখেল, আমি তোমায় ভালবাসি।
নর্ডিক নীল তোমার সুর্মা পরা চোখ,
সেমেটিক নাকের নীচে মোটা ছাঁটা গোঁফ।
তোমার লোমজংগল বুকে টেনে নাও আমাকে,
ক্র্যাংক-শাফ্‌টের মতন দুই হাতে জাপটে ধর,
মড়মড়িয়ে ভেঙে দাও আমার পাঁজরা,
পিষে ফেল, পিষে ফেল।

এই সব কবিতা নিস্যান্দিনী পত্রিকায় দেদার ছাপা হতে লাগল। 'কাঙ্ক্ষার ঝংকার' নাম দিয়ে শংকরীর একটা কবিতাসংগ্রহ প্রকাশিত হল, তিন মাসের মধ্যেই তিনটে সংস্করণ ফুরিয়ে গেল। ধূর্জটি নিজের রচনা নিয়েই মেতে থাকত, তার বউ কি লিখছে, তা পড়ে লোকে কি বলছে, এ সব খবর রাখত না। একদিন তার এক সাহিত্যিক বন্ধু একখানা কাঙ্ক্ষার ঝংকার দেখিয়ে বলল, ওহে ধূর্জটি, এই শংকরী দেবী তোমারই গৃহিণী তো? ওঃ, ভদ্রমহিলা কি সব অদ্ভুত কবিতা লিখছেন, রেগুলার হট স্টফ। পড়ে তোমার মনে একটু ইয়ে হয় না? আমাদের সাইকোলজিস্ট প্রফেসার ভড় বলছিলেন, এ হচ্ছে উদ্দাম লিবিডো।

ধূর্জটির ভাবনা হল। স্ত্রীর কাছ থেকে তার কবিতার বই চেয়ে নিয়ে খুব মন দিয়ে পড়ল। তার মেজাজ বিগড়ে গেল। শংকরীকে বলল, এ সব কি ছাই ভস্ম লেখা হচ্ছে? লোকে যে ছি ছি করছে।

শংকরী বলল, করুক গে ছি ছি, খুব বিক্রি তো হচ্ছে। আরও একখানা বই ছাপবার জন্যে প্রেসে দিয়েছি।

মাথা নেড়ে ধূর্জটি বলল, ওসব চলবে না বলছি।

—বা রে মজা! তুমি লিখলে দোষ হয় না, আমার বেলা দোষ! 'ওগো সর্বনাশী, আমি ভালবাসি তোমার ঠোঁটের ওই মোনালিসা হাসি'—তুমি এই সব ছাই ভস্ম লেখ কেন?

—আমার সঙ্গে তোমার তুলনা! কাল্পনিক রমণীর ওপর কবিতা লিখলে পুরুষের দোষ হয় না, কিন্তু মেয়েদের সে রকম লেখা অতি গর্হিত।

—বেশ, তুমি কবিতা লেখা বন্ধ কর, তোমার সব বই পুড়িয়ে ফেল, আমিও তাই করব।

ধূর্জটি রেগে আগুন হয়ে বেরিয়ে গেল।

উপেন দত্ত বলল, যত নষ্টের গোড়া আপনার শালী বিশাখা। খামকা এই ঝগড়া বাধিয়ে তাঁর কি লাভ হল?

ভূপতি বলল, হুঁ, বিশাখার স্বামী নরেশও তাই বলেছে, খুব ধমকও দিয়েছে। তার পর শোন। শংকরীর কাছে সব কথা শুনে বিশাখা তার সখীর হয়ে লড়তে গেল। ধূর্জটিকে বলল, আপনার বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি? ঘরে অমন সুন্দরী বউ থাকতে কোথাকার কে অচিন প্রিয়ার উদ্দেশে আপনি কবিতা লেখেন কোন্ আক্কেলে? তাতে শংকরীর রাগ হবে না? শোধ তোলবার জন্যে সেও যদি ওই রকম লেখে তাতে অন্যায়টা কি মশাই?

ধূর্জটি বলল, তা বলে চীনেম্যান আর কাবলীওয়ালার উদ্দেশে প্রেমের কবিতা লিখবে?

—আচ্ছা আচ্ছা, এখন থেকে না হয় বাঙালী তরুণদের উদ্দেশেই লিখবে। কিন্তু তার চাইতে ভাল—আপনি আজ থেকে নিজের গিন্নীর নামে কবিতা লিখুন, যেমন প্রথম প্রথম লিখতেন। আর সেও আপনার নামে লিখুক। এক বাড়িতে যখন বাস করছেন, দুইজনেই যখন কবি, তখন রেসিপ্রোসিটি না হলে চলবে কেন?

ধূর্জটি কিন্তু বুঝল না, তার মন অস্থির হয়ে উঠল। ভাল করে খায় না, ঘুমায় না, অপিসের কাজেও মন দেয় না। এই অবস্থায় একদিন ছিরু ঘোষের সঙ্গে তার দেখা হল। ছিরু তখন মঠাধীশ মণ্ডলেশ্বর হাজার-আট-শ্রী হিজ হোলিনেস শ্রীদাম মহারাজ। দশ আঙুলে দশটা হীরের আংটি, বাসন্তী রঙের সিল্ক ভিন্ন পরে না। সে মিষ্টি মিষ্টি করে অনেক তত্ত্বকথা শোনাল, ধূর্জটি মুগ্ধ হল। ছিরু বলল, কোনও চিন্তা নেই, তোমার সমস্ত ক্ষোভ আমি দূর করে দেব, তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে যাতে পরমা শান্তি পাও তার ব্যবস্থা করব।

তারপর ছিরু ধূর্জটিকে যে লেকচারটি দিল তার সারমর্ম এই।—তোমাদের এই দাম্পত্যকলহ মার্কস-কথিত দ্বান্দ্বিক নিয়মেই হয়েছে। তুমি কাল্পনিক প্রিয়ার উদ্দেশে কবিতা লেখ, তাতে তোমার স্ত্রী চটে উঠল—এ হল থিসিস। তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তোমার স্ত্রী কাল্পনিক পুরুষের উদ্দেশে লিখতে লাগল, তুমি চটে উঠলে—এ হল অ্যান্টিথিসিস। এখন দরকার সিন্থিসিস, তা হলেই সব মিটে যাবে। তোমরা দুজনে আমার মঠে চলে এস, নিত্য সৎকথা শোন, আর এই দুখানা বই দিচ্ছি, ভাল করে প'ড়ো—প্রেমসিন্ধুতরঙ্গভঙ্গিমা এবং ডায়ালেক্‌টিক্যাল বৈষ্ণভিজ্‌ম। পড়লে যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী ভক্তি আর শ্রীমার্কসে অচলা নিষ্ঠা হবে। তার পর ধূর্জটি আর তার স্ত্রী মার্কসীয় বৈষ্ণব মঠে চলে গেল।

যতীশ বললে, ধূর্জটি বোকা নয়, তবে কবিরা বড় সেণ্টিমেণ্টাল হয়, ভাবের ঝোঁকে অনেক সময় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তার স্ত্রীও শুনেছি খুব চালাক মেয়ে। আমার বিশ্বাস ওরা বেশী দিন মঠে টিকতে পারবে না, শীঘ্রই অরুচি হয়ে যাবে।

ভূপতি মুখুজ্যে উঠে পড়ে বলল, তোমরা বস, আমি চললুম। কর্তাবাবুর খেয়াল হয়েছে কূর্মঅবতার যাত্রা শুনবেন, তারই বায়না দিতে শিবপুরে যেতে হবে। যে ছোকরা কূর্ম সাজে তার নাচ নাকি অতি অপূর্ব।

সাত দিন পরে ভূপতি আবার আড্ডায় উপস্থিত হয়ে হাত নেড়ে সুর করে বলল,

শুন ন-গ-র-বা-আ-সি-গণ
বিচিত্র খবর চিত্তচমৎকরণ।
আমাদের মিসেস ধূর্জটিচরণ
ছিরু ঘোষকে করেছেন দংশন,
আর ধূর্জটি দিয়েছে বেদম পিটন।
স্বামী-স্ত্রী করেছে স্বগৃহে গমন,
আর ছিরুর হাতে হয়েছে সেপ্‌টিক ভীষণ,
আর-জি-করে হবে অ্যাম্পুটেশন।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, আঃ ভাঁড়ামি রাখ, সমস্ত কথা খোলসা করে বল।

ভূপতি বলল, খোলসা করেই তো বললুম। আচ্ছা ছন্দোবন্ধ বাক্য যদি আপনাদের বোধগম্য না হয় তবে গদ্যতেই বলছি। ধূর্জটি আর তার স্ত্রী ফিরে এসেছে শুনে আজ সকালে ওদের ওখানে গিয়েছিলুম। বিশ্রী ব্যাপার। মঠে যাবার দিন কতক পরে ছিরু মহারাজ ওদের বলল, এখানে স্বামী-স্ত্রীর একত্র থাকা নিষিদ্ধ, মেয়েরা আর পুরুষরা আলাদা আলাদা মহলে বাস করবে, নতুবা সাধনায় বিঘ্ন হবে। শ্যামসুন্দরই একমাত্র পুরুষ, শ্রীরাধাই একমাত্র নারী। স্ত্রীপুরুষ সকলকেই রাধা-ভাবে ভাবিত হতে হবে, সেই হল আসল কমিউনিজ্‌ম। তারপর একদিন শংকরীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ছিরু বলল, শ্যাম সে পুরুষোত্তম, পতি সে পুরুষাধম। আমার দেহেই শ্যামের অধিষ্ঠান হয়েছে। শ্রীরাধে, তুমি আমাকে ভজনা কর। হাত ধরে টানাটানি করতেই শংকরী চিৎকার করে উঠল, আর ছিরুর ডান হাতে এক ভীষণ কামড় বসিয়ে দিল। চিৎকার শুনে ধূর্জটি ছুটে এসে ছিরুকে বেদম কিল চড় লাথি লাগাল। মঠে মহা হইচই, ধূর্জটি আর তার স্ত্রী সোজা বাড়ি চলে গেল। তাদের মিটমাট হয়ে গেছে। শুনলাম ধূর্জটি কবিতা ছেড়ে দিয়ে সরল বীজগণিত রচনা করবে, আর শংকরী রবিবারের কাগজে নতুন রান্না লিখবে—কাঁকড়ার কচুরি, পেঁয়াজের পায়েস, এই সব।

যতীশ বলল, এই ব্যাপারের পর ছিরুর ভক্তরা বিগড়ে যায় নি?

—তা কেন যাবে, অবতারদের সবই তো লীলাখেলা।

—ছিরুর হাত সত্যিই অ্যাম্পুটেট করবে নাকি?

—ডাক্তারের যদি কর্তব্যজ্ঞান থাকে তবে নিশ্চয়ই করবে।

# ধনু মামার হাসি

ভোলানাথ ছিল আমাদের ক্লাসের ছেলেদের সর্দার। তার বয়েস সকলের চাইতে বেশী, পর পর তিন বৎসর ফেল করে ক্লাস নাইনে স্থায়ী হয়ে আছে। তার সঙ্গেই আমার বেশী ভাব ছিল।

আমাদের শহরটা বড় নয়, মোটে একটি সিনেমা। মাঝে মাঝে ফুটবল ম্যাচ হত, পুজোর সময় থিয়েটার হত, পুজোও জাঁকিয়ে হত। এসব ছাড়া আমাদের ফুর্তির অন্য উপায় ছিল না। একদিন হেডমাস্টার বললেন, কাল শনিবার ছুটির পর তোরা থাকবি, স্বামী ব্যোমপ্রকাশজী এসেছেন, তাঁর লেকচার শুনবি।

নীরস হিন্দী বক্তৃতা শোনবার আগ্রহ আমাদের ছিল না, কিন্তু খোলা মাঠে দল বেঁধে বসাতেও একটা মজা আছে। ব্যোমপ্রকাশ এক ঘণ্টা ধরে সদুপদেশ দিলেন। চুরি, মিথ্যা কথা, অবাধ্যতা প্রভৃতি কুকর্মের পরিণাম, পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার, প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলে পরিশেষে একটি মন্ত্র সর্বদা আমাদের ইয়াদ রাখতে বললেন—নেকী করনা ঔর বদী ছোড়না, অর্থাৎ ভাল কাজ করবে আর মন্দ কাজ ছাড়বে।

বক্তৃতা শেষ হলে আমরা সকলে খুব হাততালি দিলাম। ভোলা আমার পাশেই বসেছিল, হঠাৎ সে খ্যাঁক খ্যাঁক করে বিশ্রী রকম হেসে উঠল। আমি বললাম, ওকি রে?

ভোলা বলল, একটু হেসে নিলাম। এই নতুন হাসিটা প্র্যাকটিস করছি, ধনু মামার কাছে শিখেছি।

—ধনু মামা আবার কে?

—আমার দিদিমার পিসেমশাই ধনঞ্জয় দত্ত, খুব বুড়ো মানুষ। মা তাঁকে বলে ধনু দাদা, তাই তিনি আমার মামা হন। দশ দিন হল এসেছেন, আমাদের বাড়িতেই বরাবর থাকবেন। চমৎকার হাসেন ধনু মামা, কিন্তু বেশী নয়, খুব যখন ফুর্তি হয় তখন।

—তোর তা শেখবার কি দরকার?

—নতুন বিদ্যে শিখতে হয় রে। তুইও তো মুখে দুটো আঙুল পুরে সিটি বাজানো শিখছিস। আমার হাসিটা এখনও ঠিক হচ্ছে না, সুর দুরস্ত করতে আরও সাত দিন লাগবে। চল্ না আমাদের বাড়ি, ধনু মামার হাসি শুনে আসবি। আর একটা চার পয়সা দামের ছোট খাতা কিনে নে। ধনু মামা যদি জিজ্ঞেস করে—কি করতে এসেছ হে ছোকরা? তুই অমনি খাতা খানা এগিয়ে দিয়ে বলবি—আজ্ঞে, একটি বাণী নিতে এসেছি।

মোড়ের দোকান থেকে খাতা কিনে ভোলার সঙ্গে চললাম। তার বাপ ঠিকাদারি করেন, বেশীর ভাগ বাইরেই ঘুরে বেড়ান। বাড়িতে তার মা আছেন, দুটো ছোট ভাইও আছে। ভোলার কাছে শুনলাম, ধনঞ্জয় দত্তর তিন কুলে কেউ নেই, কিন্তু

বুড়োর নাকি বিস্তর টাকা আছে। তিনি ওদের বাড়িতে স্থায়ী হয়ে বাস করবেন। এতে ভোলার বাবা আর মা খুব খুশী হয়েছেন।

ধনু মামা রোগা বেঁটে মানুষ, কালো রং, তোবড়া গাল, আসল বা নকল কোনও দাঁত নেই? সাদা চুল, খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি গোঁফ, বোধ হয় সাত দিন নাপিতের হাত পড়ে নি। তাঁর শোবার ঘরে তক্তপোশে উবু হয়ে বসে হুঁকো টানছেন, ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে।

আমি প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম। ভোলা পরিচয় দিল—এ আমার বন্ধু রামেশ্বর, এক ক্লাসে পড়ে।

ধনু মামা কপাল কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে ব্যাঙের মতন মোটা গলায় বললেন, কি মতলবে এসেছিস রে?

খাতাটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, আজ্ঞে, বাণী নিতে।

—বাণী? সে আবার কি?

ভোলা আমার হয়ে উত্তর দিল, বাণী জানেন না? সদুপদেশ আর কি, যাতে এর আখেরে ভালো হয় সে রকম কিছু কথা আপনার কাছে চাচ্ছে।

ধনু মামার ঠোঁটে একটু হাসি ফুটে উঠল। বললেন, মন দিয়া লেখাপড়া শিখিবে, সদা সত্য কহিবে, চুরি করিবে না—এই সব তো?

আমি বললাম, আজ্ঞে হাঁ, ওই রকম যা হক কিছু।

ধনু মামা বললেন, রাত্তিরে ভাল দেখতে পাই না, হাতও কাঁপে। একটা কবিতা বলছি, তুই লিখে নে, নীচে আমি দস্তখত করে দেব। লেখ—পরের ধন লইবে না, তাহাতে বিপদ; চোরের ধন লইতে পার, অতি নিরাপদ।

অদ্ভুত বাণী শুনে আমি হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ধনু মামা বললেন, কি রে, পছন্দ হল না বুঝি।

ভয়ে ভয়ে বললাম, আপনি ঠাট্টা করছেন স্যার।

ধনু মামা মাথাটি পিছনে হেলিয়ে চোখ মিটমিট করে উপর দিকে চাইলেন। তাঁর বদনমণ্ডলের সবটা কুঁচকে গেল এবং তাতে যেন তরঙ্গ উঠতে লাগল। তার পর মুখ থেকে বিকট হাসির আওয়াজ বেরুল—খ্যাঁক খ্যাঁক খ্যাঁক। আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে ভোলা চুপি চুপি বলল, শুনলি তো?

ধনু মামা বললেন, এই ভোলা, একে আমার কাছে এনেছিস কেন রে? ও তো দেখছি ভাল ছেলে, তোর মত বকাটে নয়। আমার কথা শুনলে এর স্বভাব বিগড়ে যাবে।

ভোলা বলল, আপনি জানেন না ধনু মামা, এই রামেশ্বর হচ্ছে ওয়েট ক্যাট, মানে ভিজে বেড়াল। আপনি নির্ভয়ে একে উপদেশ দিতে পারেন।

ধনু মামা বললেন, উপদেশ তো তোরা বিস্তর শুনেছিস, আমি আর বেশী কি বলব। তবে যেটুকু আমি আবিষ্কার করেছি তা তো ওকেই বলে দিলাম।

সাহস পেয়ে আমি বললাম, কি করে আবিষ্কার করলেন বলুন না মামাবাবু।

প্রসন্ন মুখ ধনু মামা বললেন, জানতে চাস? আচ্ছা, বলছি। তোরা তো সোজা ইস্কুল থেকে এসেছিস, জলটল খাস নি তো? ওরে ভোলা, তোর মার কাছ

থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে চট করে তিতু ময়রার দোকান থেকে এক পো গজা আর এক পো জিলিপি কিনে আন।

ভোলা খাবার আনতে গেল। ধনু মামা আমাকে বললেন, খাবার আসুক, তোরা খেতে খেতে আমার গল্প শুনবি। ততক্ষণ বরং তুই আমার পা টিপে দে।

আমি ধনু মামার পদসেবা করতে লাগলাম। একটু পরেই ভোলা খাবারের ঠোঙা নিয়ে এল, বাড়ির ভিতর থেকে দু গেলাস জলও আনল। ধনু মামা বললেন, খেতে লেগে যা তোরা। না না, আমার জন্য রাখতে হবে না, আমি ও সব খাই না।

গজায় কামড় দিয়ে আমি বললাম, এইবার বলুন মামাবাবু।

ধনু মামা বললেন, দেখ, যা বলব তা ঠিক তত্ত্বকথা নয়। আর কেউ হলে এসব রহস্য প্রকাশ করত না, কিন্তু আমি কারও তোয়াক্কা রাখি না। বয়েস বিস্তর হয়েছে, ডাক্তার বলেছে রক্তের চাপ দু শ চল্লিশ থেকে হঠাৎ এক শ চল্লিশে নেমেছে। লক্ষণ ভাল নয়, বেশ বুঝছি শিগ্‌গির এক দিন মুখ থুবড়ে পড়ে মরব। ফাদার কনফেসার কাকে বলে জানিস? যে পাদরীর কাছে খ্রীষ্টানরা মাঝে মাঝে নিজের কুকর্ম স্বীকার ক'রে মন হালকা করে তাকেই বলে।

ভোলা বলল, গল্প শুনেছি—গেঁয়ো লোক গঙ্গাস্নানে এসেছে, পুরুত তাকে মন্ত্র পড়াচ্ছে—আম্র চুরি, জাম্র চুরি, ভাদ্রমাসে ধান্য চুরি, মন্দ স্থানে রাত্রিযাপন, মদ্যপান আর কুঁকড়া ভক্ষণ, হক্কল পাপ বিমোচন, গঙ্গা গঙ্গা—সেই রকম নাকি?

—হাঁ। আজ তোরাই আমার ফাদার কনফেসার। আমার ইতিহাসটা বলছি শোন—

অনেক বছর আগেকার কথা। তখন আমার বয়স আঠারো-উনিশ, নাম ছিল হাবুলচন্দ্র। লেখাপড়া বেশী শিখি নি, অবস্থা খুব খারাপ, বাড়িতে মা ছাড়া কেউ ছিল না। মারা যাবার আগের দিন মা বললেন, বাবা হাবুল, এই পাড়াগাঁয়ে বেকার বসে থাকিস নি, দহরমগঞ্জে তোর কাকার কাছে যাবি, যা হক একটা হিল্লে লাগিয়ে দেবেন।

মা মারা গেলে দহরমগঞ্জে গেলাম, বেশ বড় জায়গা। কাকা ওখানকার মস্ত কারবারী গয়াপ্রসাদ প্রয়াগদাসের ফার্মে চালান লিখতেন। এই ফার্মের পত্তন করে-ছিলেন গয়াপ্রসাদ। তিনি গত হলে তাঁর ছেলে প্রয়াগদাস মালিক হন। আমি যখন ওখানে যাই তখন প্রয়াগদাসের বয়েস আন্দাজ পঞ্চাশ। গুটিকতক নাবালক ছেলেমেয়ে আছে, দ্বিতীয় পক্ষের একটি স্ত্রীও আছে। প্রয়াগদাস বাতে পঙ্গু হয়ে প্রায় বিছানাতেই শুয়ে থাকতেন, অগত্যা তাঁর খুড়তুতো ভাই বৃদ্ধিচাঁদকে ম্যানেজার করে ব্যবসা চালাবার সমস্ত ভার দিয়েছিলেন। বৃদ্ধিচাঁদের বয়েস প্রায় তিরিশ, নিঃসন্তান, স্ত্রী গত হলে আর বিয়ে করেন নি।

সে সময়ে আমার চেহারাটি এমন মর্কটের মতন ছিল না, বেশ নাদুশ নুদুশ বেঁটে গড়ন, ফুলো ফুলো গাল, একটু বোকা বোকা ভাব। দেখতে যেন চোদ্দ-পনের বছরের ছেলে। লোকে বলত, এই হাবুলটা হচ্ছে হাবা গোবা। আমি মনে মনে হাসতাম আর যতটা পারি বোকা সেজে থাকতাম। তাতে লাভও হত। লোকে আমাকে বিশ্বাস করত, অনেক সময় আমার সামনে গুপ্ত কথা বলে বসত। কাকা আমাকে বৃদ্ধিচাঁদের কাছে নিয়ে গিয়ে হাত জোড় করে বললেন, হুজুর,

আপনাদের আশ্রয়ে বুড়ো হয়ে গেছি, আমি আর ক দিন। দয়া করে আমার ভাইপো হাবুলচন্দরকে যা হয় একটা কাজ দিন।

বৃদ্ধিচাঁদ আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন তারপর পিঠে একটা কিল মেরে বললেন, আরে হাব্বু, তুই তো বোরা পাগল আছিস, কোন কাম করিবি? আচ্ছা, এখন তোকে পাঁচ টাকা মাহিনা দিব, আমার খাস আরদালী হয়ে ইধর উধর চিঠ্‌ঠি লিয়ে যাবি। পারবি তো? আমি খুব ঘাড় দুলিয়ে বললাম, জী হুজুর, পারব।

তখনই আরদালীর পদে বহাল হয়ে গেলাম। বৃদ্ধিচাঁদ শৌখিন লোক, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গদিতে বসতেন না, টেবিল চেয়ার আলমারি দিয়ে তাঁর অপিস-ঘর সাজিয়েছিলেন; ঘণ্টা বাজিয়ে আমাকে ডাকতেন। আমার কাজ খুব হালকা, বৃদ্ধিচাঁদের খাস কামরার দরজার পাশে একটা টুলে বসে থাকতাম, তাঁর ছোটখাটো ফরমাশ খাটতাম, মাঝে মাঝে তাঁর চিঠি বিলি করতাম। চিঠি বইবার জন্য তিনি আমাকে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ দিয়েছিলেন।

হাবা গোবা মনে করে সবাই আমাকে ঠাট্টা করত, আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকতাম আর বোকার মতন হাসতাম। কিন্তু কান সর্বদা খাড়া থাকত, গুজগুজ ফিসফিস করে কে কি বলছে সব মন দিয়ে শুনতাম। ক্রমশ আমার কানে এল—বৃদ্ধিচাঁদ খুব তুখড় কাজের লোক, সকলের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারও ভাল। কিন্তু হাতটান আছে, ফার্মের টাকা সরিয়ে থাকেন, জুয়ো খেলেন, নেশা করেন, অন্য দোষও আছে।

রামনবমীর দিন ওঁদের নতুন খাতা হত। তার আগের দিন বড় বড় খদ্দেররা তাদের দেনা চুকিয়ে দিত। আমি বাহাল হবার পাঁচ-ছ মাস পরেই ওঁদের বছর কাবার হল, যাকে বলে সাল তামামি। রাত্রি পর্যন্ত কাজ চলবে তাই আমাদের জলখাবারের জন্যে প্রচুর কচৌড়ি আর লাড্ডু আনা হল। অনেক রাত পর্যন্ত টাকা আসতে লাগল, বৃদ্ধিচাঁদ কামরায় বসে নিজেই নোট আর টাকা গনতি করতে লাগলেন, আমি নোটের বাণ্ডিল বাঁধতে লাগলাম। চেক খুব কম, খুচরো টাকাও কম, বেশীর ভাগই পাঁচ শ, এক শ আর দশ টাকার নোট।

রাত এগারোটার সময় কাজ শেষ হল, আমলারা ছুটি পেয়ে চলে গেল। বৃদ্ধিচাঁদ আমাকে বললেন, হিসাব মিলাতে আমার কিছু দেরি হবে, হাব্বু, তুই দরজায় বসে থাক, আমার কামরায় কাকেও ঢুকতে দিবি না। আর শোন্—এই প্যাকিটটা তোর কাছে রাখ্, কাল মথুরানাথ মিসিরের কিতাবের দোকানে ফেরত দিয়ে বলবি, এসব জাসুসী কহানী (অর্থাৎ ডিটেকটিভ গল্প) বৃদ্ধিচাঁদজী পড়তে চান না, ভক্তমাল গ্রন্থ যদি থাকে তো তাঁকে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বই-এর প্যাকেটটা আমার চিঠি বিলির ব্যাগে পুরে আমি কামরার বাইরে পাহারায় বসলাম, বৃদ্ধিচাঁদ দরজা বন্ধ করে হিসাব মেলাতে লাগলেন। দরজার কবজার কাছে একটু ফাঁক ছিল, তাই দিয়ে আমি উঁকি মেরে দেখতে লাগলাম। ঘরে কেরোসিনের একটা বড় ল্যাম্প জ্বলছে, বৃদ্ধিচাঁদ টেবিলের ওপর নোটের বাণ্ডিলগুলো নাড়াচাড়া করছেন, মাঝে মাঝে একটা বোতল থেকে মদ ঢেলে খাচ্ছেন। তাঁর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল, একটু পরেই খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দ বার হল, যেন খেঁক-শেয়াল ডাকছে। তিনি চেক আর খুচরো টাকা লোহার আলমারিতে বন্ধ করলেন, আর সমস্ত নোটের গোছা এক সঙ্গে খবরের কাগজে জড়িয়ে সরু দড়ি দিয়ে

বাঁধলেন। তার পর পাশের ঘর থেকে একটা ছোট স্টীল ট্রাংক এনে মেঝেতে রেখে খুললেন। তাতে কাপড় চোপড় রয়েছে।

ঠিক এই সময় আপিস ঘরের সামনের রাস্তায় একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল। সইস চেঁচিয়ে আমাকে বলল, এ হাব্বু, মাইজী এসেছেন, বুদ্ধিচাঁদজীকে জলদি আসতে বল।

মাইজী হচ্ছেন কারবারের মালিক, প্রয়াগদাসের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, বুদ্ধিচাঁদ যাকে ভাবীজী অর্থাৎ বউদিদি বলেন। আমি দরজা একটু ফাঁক করে বললাম, হুজুর, মাইজী এসেছেন, আপনাকে ডাকছেন। বুদ্ধিচাঁদ বিরক্ত হয়ে বললেন, আঃ, আসবার সময় পেলেন না, এত রাত্রে টাকা চাইতে এসেছেন! কাজের সময় যত সব বখেড়া। আমাকে তো এখনই রওনা হতে হবে, ট্রেনের টাইম হয়ে এল। হাব্বু, তুই ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ভিতরে বসে থাক্, কেউ যেন না ঢোকে। আমি ভাবীজীকে বিদায় করে এখনই আসছি।

বুদ্ধিচাঁদ তাঁর তোরঙ্গের কাপড়ের মধ্যে নোটের বাণ্ডিলটা গুঁজে দিলেন। ডালা বন্ধ করতে পারলেন না, একটু উঁচু হয়ে রইল। আমাকে বললেন, হাব্বু, তুই তোরঙ্গের উপরে বসে থাক, আমি তুরন্ত আসছি।

বুদ্ধিচাঁদ বেরিয়ে যেতেই সিদ্ধিদাতা গণেশ আমাকে বুদ্ধি দিলেন। তাড়াতাড়ি তোরঙ্গ থেকে নোটের বাণ্ডিলটা বার করে আমার ব্যাগে যে বইএর প্যাকেট ছিল তা তোরঙ্গে গুঁজে দিলাম। নোটের বাণ্ডিল আর বইএর প্যাকেট আকারে প্রায় সমান ছিল।

একটু পরে বুদ্ধিচাঁদ ফিরে এলেন। দেখলেন, আমি তোরঙ্গের উপর গট হয়ে বসে আছি, আমার চাপে ডালাটি ঠিক হয়ে বসেছে। ডালা একটু তুলে ভিতরে হাত দিয়ে দেখলেন বাণ্ডিলটা ঠিক আছে কিনা। তার পর চাবি বন্ধ করে বুদ্ধিচাঁদ ব্যস্ত হয়ে আমাকে বললেন, আমি এখনই বহরমপুর রওনা হচ্ছি, ব্যাংকে টাকা জমা দিতে হবে। আর সময় নেই, তুই আমার তোরঙ্গটা স্টেশন পর্যন্ত পেঁাছে দে।

বুদ্ধিচাঁদ আপিস-ঘরে তালা লাগিয়ে তার চাবিটা আমাকে দিয়ে বললেন, কাল সকালে বৈজনাথবাবুকে দিয়ে আসবি। বৈজনাথ ছিলেন ফার্মের বড়বাবু, দূর সম্পর্কে মালিকের শালা।

আমার ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে আর বুদ্ধিচাঁদের তোরঙ্গ মাথায় নিয়ে আমি আগে আগে চললাম, বুদ্ধিচাঁদ আমার পিছনে চললেন। স্টেশন খুব কাছে। সেখানে পেঁাছে টিকিট কেনা মাত্র ট্রেন এসে পড়ল। তোরঙ্গটা আমার হাত থেকে নিয়ে বুদ্ধিচাঁদ উঠে পড়লেন, আর আমাকে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, তোর বকশিশ। তখনই ট্রেন ছাড়ল।

আমি তাড়াতাড়ি কাকার বাসায় ফিরে এলাম এবং নোটের বাণ্ডিল সুদ্ধ ব্যাগটা বালিশের মতন মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম মোটেই হল না। বুদ্ধিচাঁদের হাসিটা ছিল ছোঁয়াচে. সমস্ত রাত জেগে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগলাম। আমার একটা তোবড়া টিনের তোরঙ্গ ছিল, তাতেই সর্বস্ব থাকত। সকালে সেই তোরঙ্গে নোটের বাণ্ডিল রেখে বৈজনাথবাবুর বাড়ি গিয়ে তাঁকে আপিসের চাবি দিলাম। বুদ্ধিচাঁদ বহরমপুর গেছেন শুনে তিনি বললেন, বহুত তাজ্জব কি বাত। তখনই তিনি প্রয়াগদাসের কাছে গেলেন।

বেলা দশটা নাগাত হই হই কাণ্ড। সমস্ত শহরে রটে গেল—বৃদ্ধিচাঁদ বিস্তর টাকা নিয়ে পালিয়েছেন, ফার্মের অপিস পুলিসে ফেরাও করেছে, প্রয়াগদাসের দু জন উকিলও সেখানে গেছেন। আমি কাকাকে বললাম, আমার মনিব তো ফেরার, এখানে থেকে কি করব, কলকাতায় গিয়ে কাজের চেষ্টা করি গে। কাকার তখন বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, কিছুই বললেন না। আমি আমার টিনের তোরঙ্গ নিয়ে কলকাতায় চলে গেলাম। শুনেছিলাম দু দিন পরে পুলিস আমাকে সাক্ষী তলব করেছিল, কিন্তু আমি তখন নাগালের বাইরে।

এর পরের কথা খুব সংক্ষেপে বলছি। কলকাতায় পৌঁছেই নামটা বদলে ধনঞ্জয় করলাম। যে হোটেলে উঠেছিলাম, দু দিন পরে সেখানেই বাজার সরকারের চাকরি জুটে গেল। তার জন্যে অবশ্য পঞ্চাশ টাকা জমানত দিতে হয়েছিল।

ভোলা বলল, ধনু মামা, আসল কথাই তো আপনি বললেন না। কত টাকা সরিয়েছিলেন?

—এখন পর্যন্ত ঠিক করে গুনতে পারি নি,—খাজাঞ্চীর কাজ তো আমার রপ্ত নেই। এক বার গুনে হল দেড় লাখের কাছাকাছি, আর একবার হল চোদ্দ হাজার কম, আর একবার ত্রিশ হাজার বেশী। ভাবলাম, দুত্তোর, ঠিক করে জেনে কি হবে, টাকা তো ব্যাংকে দিচ্ছি না, আমার কাছেই থাকবে। তারপর রোজগারের চেষ্টায় লেগে গেলাম, সে সব বৈষয়িক কথা তোদের ভাল লাগবে না। একটা বিয়েও করেছিলাম, কিন্তু বউটা টিকল না। আমার এই রুপো বাঁধানো কলি হুঁকোটি সেই বিয়েতেই দান পেয়েছিলাম। পঞ্চাশ বছর ধরে অনেক রকম ব্যবসা করেছি, তেজারতিও করেছি। রোজগার মন্দ হয় নি। আমার বাবুগিরি আর বদখেয়াল ছিল না, তাই পুঁজির টাকা খরচ হয় নি, বরং একটু বেড়েই গেছে। শেষ বয়সে আর রোজগারের ইচ্ছে রইল না, শক্তিও গেছে, তাই কলকাতা ছেড়ে এই নিরিবিলিতে বাস করতে এসেছি। এইবার গীতাখানা একবার পড়ে ফেলতে হবে।

ভোলা বলল, বৃদ্ধিচাঁদের কি হল?

—তাঁর নামে হুলিয়া বেরিয়েছিল, শুনেছি তিনি সাধু সেজে হরিদ্বারে ছিলেন, পুলিস সেখানেই তাঁকে ধরে। অনেক দিন মামলা চলল, বৃদ্ধিচাঁদ তাঁর জবানবন্দিতে বলেছিলেন—চুরি তো করেছে সেই শয়তান হাব্বু শালা, আমি শুধু বদনামের ভয়ে ভেগেছিলাম। তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করে নি। বৃদ্ধিচাঁদের নিশ্চয় জেল হত, কিন্তু তাঁর ভাবীজী তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন। স্ত্রীর অনুরোধে প্রয়াগদাস মকদ্দমা মিটিয়ে ফেলেন। শুনেছি বৃদ্ধিচাঁদ আসামে গিয়ে কাঠের কারবার ফেঁদেছিলেন।

ভোলা বলল, আচ্ছা ধনু মামা, আপনার অত টাকা কাকে দিয়ে যাবেন?

—তোর মাকে অনেক টাকা দেব, আমার খুব সেবা করছে কিনা। বাকী আমার সঙ্গেই যাবে।

—সেকি! মরে গেলে কেউ টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে নাকি?

—আমি ঠিক পারব, তোরা দেখে নিস।

ধনু মামার কথা শেষ হল। আমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি চলে গেলাম।

সাত দিন পরে একজন লোক আমাদের ইস্কুলে খবর দিল, ধনু মামা হঠাৎ মারা গেছেন, ভোলাকে তার মা এখনই বাড়ি যেতে বলেছেন। ছুটি নিয়ে আমিও ভোলার সঙ্গে গেলাম।

ধনু মামাকে উঠনে শোয়ানো হয়েছে। তাঁর মুখ একটু ফাঁক হয়ে আছে, যেন হাসতে হাসতেই মারা গেছেন। পাড়ার জন কতক মেয়ে পুরুষ ভোলার মাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছেন। তিনি চিৎকার করে হাত নেড়ে বলছেন, পাজী হতভাগা নিমকহারাম বুড়ো, এত দিন সেবা যত্ন করলাম আর দিয়ে গেলেন মোটে দু শ! সর্বনেশে কুচুণ্ডে জোচ্চোর ছ্যাঁচড়। আমাকে না হয় ফাঁকি দিলি, দান ধ্যানের জন্যও তো রেখে যেতে পারতিস!

ভোলা খোঁজ নিয়ে আমাকে যা জানাল তা এই।—ধনু মামার তোরঙ্গ থেকে দুটো বাণ্ডিল আর একটা লেখা কাগজ বেরিয়েছে। ছোট বাণ্ডিলটার উপর লেখা আছে—ভোলার জননী কল্যাণীয়া শ্রীমতী নন্দরানীকে আমার উপার্জিত এই দুই শত টাকা নগদ দান করিলাম; ইহাই যথেষ্ট, স্ত্রীলোকের অধিক লোভ ভাল নহে। বড় বাণ্ডিলের উপর লেখা আছে—খুলিবে না, ইহা আমার দৈবলব্ধ নিজস্ব ধন, যেমন আছে তেমনি আমার চিতায় দিবে। কাগজটায় লেখা আছে—আমার যে রুপো বাঁধানো ঢাকাই কলি হুঁকা আছে তাহা শ্রীমান ভোলানাথ পাইবে; এবং আমার আঙ্গুলে যে রুপার গণেশ-মার্কা আংটি আছে তাহা ভোলানাথের বন্ধু শ্রীমান রামেশ্বর পাইবে।

ভোলার মা কিন্তু ধনু মামার অন্তিম ইচ্ছা পালন করেন নি, বড় বাণ্ডিলটাও খুলে দেখেছেন। তাতে বিস্তর নোট আছে বটে, কিন্তু তার দাম এক পয়সাও নয়, সমস্ত কাঁচি দিয়ে কুচি কুচি করে কাটা! তাঁর দৈবলব্ধ ধনের অপব্যবহার যাতে না হয় ধনু মামা তার ব্যবস্থা করে গেলেন। ভোলার মা সেই নোটের কুচি ঝেঁটিয়ে ফেলে দিলেন। হুঁকোটি ভোলার ভোগে লাগেনি, তার মা আছড়ে ভেঙে ফেলে রুপোর পাত খুলে নিলেন। কিন্তু আমাকে বঞ্চিত করেন নি, গণেশ-মার্কা রুপোর আংটিটা আমাকে দিয়েছিলেন। ধনু মামার সেই স্মৃতিচিহ্ন আমি সযত্নে রেখেছি।

# মাঙ্গলিক

সভাপতি বললেন, ওঃ, আমাদের কি অচিন্তনীয় সৌভাগ্য! যে মহাপুরুষ আজ এই মহতী সভায় পদার্পণ করেছেন তাঁর সমুচিত সংবর্ধনা করি এমন সামর্থ্য আমাদের নেই। এঁর মুখের ভাষা আমাদের অবোধ্য। আমাদের বাগযন্ত্র এঁর নাম উচ্চারণ করতে পারে না, আমাদের লেখনীও তা ব্যক্ত করতে পারে না। তবে এই মহান অতিথির কি পরিচয় দেব? শুধু বলতে পারি ইনি মাঙ্গলিক। এদেশে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অমানুষী প্রতিভার বলে ইনি আমাদের বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেছেন এবং তাতেই নিজের বাণী দিবেন। এঁর সময় অতি অল্প, আধ ঘণ্টা পরেই স্বলোকে প্রত্যাবর্তন করবেন। আপনারা প্রশ্ন করে বাধা দেবেন না, এঁর শ্রীমুখ থেকে যে সুসমাচার নিঃসৃত হবে তাই ভক্তিভরে শ্রবণ মনন ও হৃদয়ে ধারণ করুন।

সামনের মাইক্রোফোনটা ঠেলে দিয়ে সর্বজনীন পুজোর লাউড স্পীকারের মতন কান ফাটা নিনাদে মাঙ্গলিক বলতে লাগলেন।—

ওহে সভাপতি আর উপস্থিত মানুষেরা—গোড়াতেই জানিয়ে রাখছি, বাজে কথা আমি বলি না। তোমাদের এই সভাপতি মাননীয় কি না, মহাশয় কি না, তার প্রমাণ নেই, সেজন্য ও সব না বলে শুধু সভাপতি বলেছি। যারা আমার বাণী শুনতে এখানে এসেছে তাদের ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলাগণ বলতেও আমি রাজী নই। তোমাদের মধ্যে কত জন ভদ্র আর কত জন অভদ্র আছে তা আমি জানব কি করে? কোনও প্রাণিজাতির উল্লেখ করতে হলে কেউ ভেড়া-ভেড়ী বা ছাগল-ছাগলী বলে না, শুধু ভেড়া বা ছাগল বললে তৎ তৎ প্রাণীর স্ত্রীপুরুষ দুই-ই বোঝায়। অতএব ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলা না বলে আমি তোমাদের যে শুধু মানুষ বলে সম্বোধন করেছি তাই যথেষ্ট। যাক্, এখন আমার বক্তব্য শোন। তোমাদের অসংখ্য জিজ্ঞাস্য আছে, নানা বিষয় জানবার জন্যে ছটফট করছ, তা আমি বুঝি। কিন্তু আমার সময় অতি অল্প আর তোমাদের বোধশক্তিও অতি ক্ষীণ, সেজন্য অতি সংক্ষেপে ভাষণ দিচ্ছি।

তোমাদের কৌতূহল কিয়ৎ পরিমাণে নিবৃত্তির জন্যে জানাচ্ছি—আমরা বিশ জন মঙ্গল গ্রহ থেকে এই ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবতরণ করেছি। পরে অন্যান্য দেশেও আমরা যাব। আমাদের উদ্দেশ্য—মানবজাতির কিঞ্চিৎ মঙ্গল সাধন। কি করে এসেছি জানতে চাও? উড়ন চাকতিতে চড়ে আসি নি, থালা বা রেকাবিতে চড়েও আসি নি। অতি সোজা উপায়ে ঝুপ করে নেমেছি, উল্কাপাত যেমন করে হয়। পতনের দারুণ বেগ কি করে সয়েছি, তোমাদের স্থূল বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যাই নি কেন—এ সব জানতে চেয়ো না, জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

তোমরা বুঝতে পারবে না। আমাকে যেমন দেখছ আমার আসল মূর্তি তেমন নয়, উপস্থিত প্রয়োজনে এই পৃথিবীর উপযুক্ত দেহ ও বেশ ধারণ করেছি। আর একটা কথা তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। তোমাদের অর্থাৎ মানব-জাতির এখন শৈশবদশা চলছে, কিন্তু মঙ্গল-গ্রহবাসী আমরা অত্যন্ত প্রবীণ ও পরিপক্ক। আমাদের তুলনায় তোমরা নিরতিশয় অপোগণ্ড, বিদ্যাবুদ্ধিতে দশ কোটি বৎসর পিছিয়ে আছ। অতএব আমি যে সদুপদেশ দিচ্ছি তা নিয়ে তর্ক করো না, নির্বিচারে মেনে নাও, তাতেই তোমাদের মঙ্গল হবে।

আগে তোমাদের বহিরঙ্গ অর্থাৎ দেহ বেশ চাল-চালন ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু বলছি তার পর অন্তরঙ্গ অর্থাৎ পলিটিক্সের আলোচনা করব। মানুষ জাতিব দেহের গড়ন মন্দ নয়, তবে কদাচারের ফলে তোমরা তা কুৎসিত করে ফেলেছ। কেউ দেদার লুচি মণ্ডা মাংস ঘি দুধ খেয়ে মোটা থপথপে হয়েছে, কেউ হরদম চা সিগারেট পান দোক্তা প্রভৃতি বিষ খেযে চেয়ারাটি পাকাটে করে ফেলেছ। বোকামি আর অত্যাচারের ফলে কেউ কেউ ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছ। তোমাদেব পরিচ্ছন্নতার অত্যন্ত অভাব দেখছি। জীবাণুতত্ত্ব তোমরা একটু আধটু জান, তবু গতানুগতিক ফ্যাশনের বশে নিজের শরীর আর গৃহকে ব্যাকটিরিয়ার ভাণ্ডার বানিয়েছ। এখানে অনেকের গোঁফ দেখছি, কয়েক জনের দাড়িও দেখছি। দশ-বারো জন টেকো মানুষ ছাড়া আর সকলের মাথায় চুলও দেখছি। আর মেয়েদের মাথায় তো চুলের জঙ্গল। ছি ছি ছি! এও কি জান না যে গোঁফ দাড়ি আর চুল হচ্ছে বীজাণুর আড়ত? তোমাদের স্বাস্থ্যবিশারদগণ অতি অকর্মণ্য, তাই এই কদর্য প্রথা তুলে দেবার কোন চেষ্টা করেন নি। কামিয়ে ফেল, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সবাই নেড়া হও আর গোঁফ দাড়ি উৎপাটন করে ফেল। আমার শিরস্ত্রাণ দেখছ তো, পাতলা টাইটেনিয়ম ধাতুর তৈরী। এতে চুলের কাজ হয় অথচ ময়লা জমে না। এরকম জিনিস যদি এদেশে দুর্লভ হয় তবে এ্যালুমিনিয়মের টুপি পর। মেয়েরা যদি তাদের সেকেলে ফ্যাশন বজায় রাখতে চায় তবে টুপির পেছনে খোঁপার মত ঘটি জুড়ে দিতে পারে। ইচ্ছা হলে তাতে বেল ফুলের মালা জড়ানো চলবে। কিন্তু স্ত্রী আর পুরুষের আলাদা সাজের দরকারই হবে না, সে কথা পরে বলছি। তোমাদের বাড়িতে যেসব কম্বল রাগ কার্পেট শতরঞ্জি আর পরদা আছে, নির্মম হয়ে পুড়িয়ে ফেল। যাতে ধুলো আর ব্যাকটিরিয়া জমতে পাবে এমন জিনিস রেখো না।

তোমরা অনেকে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছ তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গুমট গরমে কোন আক্কেলে জামা কাপড় পরে আছ? শিশু আর পশুর মতন সরল হও, সব টান মেরে খুলে ফেলে দাও, সর্বাঙ্গে হাওয়া লাগুক। এই গরম দেশে বৎসরে ন মাস ধুতি পাঞ্জাবি প্যাণ্ট শার্ট শাড়ি ব্লাউজ একেবারেই অনাবশ্যক, স্বচ্ছন্দে দিগম্বর হয়ে থাকতে পার। শুধু মাথায় একটা পাতলা ধাতুর টুপি আর পায়ে এক জোড়া জুতো, এ ছাড়া কিছুই পরবে না। তবে হাঁ, কাঁধ থেকে ফিতে দিযে একটা ঝুলি ঝোলাতে পার, তাতে টাকাকড়ি নোটবুক, পেনসিল কলম রুমাল ইত্যাদি থাকবে। আরশি পাউডার, মুখে আর গায়ে লাগাবার রংও তাতে রাখতে পার। অবশ্য শীতের সময় সবাই জামা কাপড় পরবে, রবার বা প্লাসটিকের। ইওরোপ আমেরিকার মেয়েদের একটু বুদ্ধি আছে, তারা ক্রমশ দিগম্বরী হচ্ছে। কিন্তু ওখানকার পুরুষরা বড় বোকা আর লাজুক, অনর্থক কাপড়ের বোঝা বয়ে বেড়ায়। তোমরা ভাবছ আমি নিজের শরীর আগাগোড়া ঢেকে রেখেছি কেন। ভুল বুঝেছ,

আমার অঙ্গে যা দেখছ তা বস্ত্র নয়, এই পৃথিবীর ভীষণ অভিকর্ষের চাপে পাছে আমার হালকা শরীরটি চেপটে যায় এবং এখানকার অত্যধিক অক্সিজেন পাছে বুকের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাই বর্ম ধারণ করেছি। এই বর্মের অভ্যন্তরে আমি সদ্যোজাত শিশুর মতন নেংটা।

তোমাদের এই পৃথিবীতে পুরুষের তুলনায় নারীর অবস্থা বড় মন্দ দেখছি। ভোট আর জীবিকার ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার পেলেও স্ত্রীজাতির সুবিধা হবে না। গহনা আর শৌখিন বস্ত্রে ওদের ভুলিয়ে রাখলেও ন্যায়বিচার হবে না। ওদের দুর্দশার কারণ প্রাকৃতিক। মানুষ জাতির স্ত্রীরা গর্ভধারণ করে কিন্তু পুরুষরা করে না, প্রকৃতির এই পক্ষপাতের ফলে স্ত্রীজাতি পূর্ণভাবে আত্মনির্ভর হতে পারে না, পুরুষ কিংবা রাষ্ট্রের অনুগ্রহ না পেলে তাদের চলে না। কুমারী থাকলে অথবা গর্ভরোধ করলে অবস্থার উন্নতি হবে না। প্রাণী মাত্রেই সন্তান চায়, এই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা দমন করা অন্যায়। একমাত্র উপায়—স্ত্রী আর পুরুষের ভেদ লোপ করা, অর্থাৎ স্ত্রী যেমন মাঝে মাঝে গর্ভবতী হয় পুরুষও তেমনি মাঝে মাঝে গর্ভবান হবে। স্ত্রী আর পুরুষ দুরকম মানুষ থাকাই অন্যায়। যেমন শামুক প্রভৃতি কয়েক প্রকার প্রাণী তেমনি আমরা মাঙ্গলিকরা উভয়লিঙ্গ হার্মা-ফ্রোডাইট, প্রত্যেকেই অর্ধনারী অর্ধপুরুষ। আমাদের স্বামী-স্ত্রী ভেদ নেই। কিন্তু দম্পতি আছে, সন্তানের প্রয়োজন হলে দম্পতির দুজনেই পালা করে গর্ভধারণ করে। মানুষেরও সেই ব্যবস্থা দরকার। তোমাদের কেন্দ্রীয় সংসদে পুংস্ত্রীসমীকরণের জন্যে একটা আইন পাস করিয়ে নাও, তার পর যা করবার আমরা করব। মাঙ্গলিক শরীরবিজ্ঞানীরা অনায়াসে তোমাদের দেহের অদলবদল করে দিতে পারবেন এবং এক বার করে দিলে বংশানুক্রমে তা বজায় থাকবে।

এখন পলিটিক্স সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলছি। এই পৃথিবীতে রাষ্ট্রচালনার দু রকম রীতি আছে দেখছি। একটি হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র অর্থাৎ এক জন বা এক দল ধূর্ত লোক সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করে রাখে, তাদের শাসন আর সবাই ভেড়ার পালের মতন মেনে নেয়। অন্য রীতি হচ্ছে লোকতন্ত্র, অর্থাৎ জনসাধারণ যাদের নির্বাচন করে তারাই রাষ্ট্র চালায়। কিন্তু নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে বিস্তর অকর্মণ্য আর দুশ্চরিত্র লোক থাকে। দেশের অধিকাংশ লোক যদি সাধু বুদ্ধিমান হত তবে লোকতন্ত্রে মোটামুটি কাজ চলত। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি এখনও অত্যন্ত কাঁচা আর চরিত্রেও বিস্তর গলদ আছে। এমন অবস্থায় স্বৈরতন্ত্র আর লোকতন্ত্র দুটোই তোমাদের পক্ষে অনিষ্টকর। তোমরা মনে কর, স্বাধীনতা পেয়েছ। ছাই পেয়েছ। আসল স্বাধীনতা লাভের উপায় বলছি শোন।

তোমাদের মধ্যে ক জন এয়ারোপ্লেন জাহাজ রেলগাড়ি বা গরুর গাড়ি চালাতে পার? রাষ্ট্রচালনা কি তার চাইতে সহজ মনে কর? সবাই মিলে দেশ শাসন করবে এ দুর্বুদ্ধি ত্যাগ কর। আনাড়ী লোকের তা সাধ্য নয়। হয়তো লক্ষ বৎসর পরে মানুষ জাতি লায়েক হবে, কিন্তু তত দিন তোমাদের হিতকামী গুরু বা অভিভাবক দরকার। আমরা মাঙ্গলিকরা সেই দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছি। তোমাদের নানা রাজনীতিক দল আছে, ও সবে যোগ দিও না। নতুন দল তৈরি কর—ইণ্ডো-মার্স বা ভারত-মঙ্গল পার্টি। আগামী ইলেকশনে তোমরা প্রতিনিধি খাড়া করবে, আমরা সর্বতোভাবে তোমাদের সাহায্য করব। সমস্ত আসনই তোমরা দখল করতে পারবে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তারপর প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সভায় একমাত্র

দল হয়ে ঢুকে পড়, আমাদের হাতে শাসনের ভার ছেড়ে দাও। তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবে, খাবে দাবে ফুর্তি করবে, কবিতা আর গল্প লিখবে, গান শুনবে, হরেক রকম নাচ দেখবে, আর রাষ্ট্রচালনার সমস্ত ঝক্কি আমরা নেব। শুধু ভারত নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই এই ব্যবস্থা চালাতে হবে। মানুষ আর মাঙ্গলিকের এই নিবিড় সম্পর্ক ঘটলেই তোমরা বুঝতে পারবে—আমাদের যা মতামত তোমাদেরও তাই, আমরা যা ভাল মনে করি তাই তোমাদের পক্ষে ভাল। আসল স্বাধীনতা আর ডিমোক্রাসি একেই বলে। অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমার ভয় খাচ্ছ? ও সব ছেলে-ভুলনো জুজু আমরা গ্রাহ্য করি না, সমস্ত ফুঁয়ে উড়িয়ে দেব, বদমাশ গুন্ডা-দের ঝাড়ে বংশে সাবাড় করব।

আজ এই পর্যন্ত। আর একদিন এসে সব কথা তোমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেব। সভাভঙ্গের আগে সবাই সমস্বরে আওয়াজ তোল—স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক, লোকতন্ত্র জাহান্নমে যাক, ইয়ে আজাদী ঝুটা হৈ, হমারা দাদা মাঙ্গলিক, ভারত-মঙ্গল জিন্দাবাদ!

# নিধিরামের নির্বন্ধ

নিধিরাম সরকার ভেবে ভেবেই মারা গেলেন। তাঁর শারীরিক ব্যাধি বা আর্থিক অভাব ছিল না, সাংসারিক শোক তাপও তিনি পান নি, তবু দুর্ভাবনায় তাঁর জীবনান্ত হল।

নিধিরাম সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান দেশহিতৈষী লোক, কিন্তু অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। তাঁর মনে নিরন্তর সংশয় উঠত—সুরেন বড়ুজ্যে না বিপিন পাল, বেঙ্গলী না ইংলিশম্যান—কার উপদেশ ভাল? গান্ধীজী না দেশবন্ধু, নেতাজী না পণ্ডিতজী—কার মতে চলা উচিত? কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, কমিউনিস্ট আর সমাজতন্ত্র দল কোনওটাই তাঁর পছন্দ হয় নি। দেশের হিতার্থে তিনি বক্তৃতা দেন নি, ছেলে খেপান নি, ডাকাতি করেন নি, সুতো কাটেন নি, জেলে যান নি, শুধু মনে মনে মঙ্গলের পথ খুঁজেছেন। অবশেষে নৈরাশ্য আর চিন্তাবিষে জর্জর হয়ে দেহত্যাগ করলেন। তাঁর এক শাস্ত্রজ্ঞ বন্ধু বললেন, মরবেই তো, সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। আর এক ইঙ্গবঙ্গ বন্ধু বললেন, কেয়ার কিল্‌ড এ ক্যাট।

নিধিরাম পরলোকে এলে বিধাতা তাঁকে বললেন, বৎস, তুমি সন্দেহাকুল কর্মবিমুখ হলেও তোমার চরিত্রটি প্রায় নিষ্পাপ ছিল, তাই এই আনন্দলোকে এসেছ। কি আনন্দ ভোগ কবতে চাও তা বল।

নিধিরাম উত্তর দিলেন, ভগবান, আনন্দ চাই না। পৃথিবী অধঃপাতে যাচ্ছে, যাতে রক্ষা পায় তাই করুন।

বিধাতা বললেন, তুমি দেখছি মরে গিয়েও ভববন্ধনে জড়িয়ে আছ। ওহে নিধিরাম, পৃথিবী নেই, তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়েছে। শুধু আমি আছি, এবং আমিই তুমি।

—প্রভু, পলিপ্‌সিজম্‌ আর অদ্বৈতবাদ আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি মরে গেলেও জগৎ থাকবে না কেন? সমস্ত পৃথিবীর ভাল যদি নাও করেন তবে অন্ততঃ ভারতের যাতে ভাল হয় তাই করুন।

—ভালই তো চিরকাল করে আসছি।

—তার লক্ষণ তো কিছুই দেখছি না, যা করে থাকেন তা শুধু লীলাখেলা।

—ও, আমার লীলাখেলা তোমার পছন্দ নয়, তোমার ফরমাশী খেলা চাও? ‘নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা, আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।’—এই তোমার আবদার? বেশ, তোমার দেশের কিরকম ভাল চাও তাই বল।

—মানুষ ভাল না হলে দেশের ভাল হবে না। আপনি দেশের অন্তত সিকি লোককে ভাল করে দিন, তারাই বাকী সবাইকে শোধরাতে পারবে।

—আচ্ছা, চৈতন্য মহাপ্রভু আর রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ভাল লোক মনে কর তো?

কপালে যুক্তকর ঠেকিয়ে নিধিরাম বললেন, ও'রা অবতার কি না জানি না, তবে মহাপুরুষ তাতে সন্দেহ নেই।

—ভারতের সিকি লোক মানে ন কোটি। যদি ন কোটি ভারতবাসী শ্রীচৈতন্য বা শ্রীরামকৃষ্ণের তুল্য হয়ে যায় তা হলে তোমার মনস্কাম পূর্ণ হবে তো?

মাথা চুলকে নির্ধিরাম বললেন, ভগবান, ও'রা যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। দেশের চার আনা লোক যদি বিরাগী ভক্ত হয়ে যায় আর বাকী বারো আনা তাদের অনুসরণ করে তবে সংসার যে ছারখারে যাবে। আমাদের দরকার কর্মী বুদ্ধিমান জনহিতৈষী সংসারী সৎপুরুষ। ত্যাগী ভক্ত সন্ন্যাসী গুটিকতক হলেই চলবে।

—উত্তম কথা। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ছিলেন না, তুমি যে সব গুণ চাচ্ছ তাও তাঁর প্রচুর ছিল। যদি ভারতের ন কোটি লোক রবীন্দ্রনাথের তুল্য হয়ে যায় তা হলে খুশী হবে তো?

নির্ধিরাম আবার নমস্কার করে বললেন, প্রভু, পাঁচ শ বৎসরের যদি একটি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয় তাতেই দেশ ধন্য হবে। কিন্তু যদি বিস্তর আসেন তবে আদি রবীন্দ্রনাথের মাহাত্ম্য যে খর্ব হবে, তাঁকে হয়তো খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

—আচ্ছা, যদি ন কোটি মহাত্মা গান্ধীর মতন কর্মী জনহিতৈষীর আগমন হয়?

—একই আপত্তি প্রভু। মহাত্মা গান্ধীকেও সস্তা করতে চাই না। আমাদের দেশ অসাধু অকর্মণ্য চোর ঘুষখোর বজ্জাত লোকে ভরে গেছে, তাদের পরিবর্তে দরকার সচ্চরিত্র সাধারণ কাজের মানুষ। লোকোত্তর পুরুষ খুব কম হলেই চলবে।

—বুঝেছি, লোকোত্তর পুরুষের ইনফ্লেশন চাও না। আচ্ছা, যদি দেশের সিকি লোক জওহরলালের মতন হয়ে যায় তা হলে চলবে তো?

একটু ভেবে নির্ধিরাম বললেন, নেহেরুজী জ্ঞানী কর্মী দূরদর্শী জনহিতৈষী সৎপুরুষ তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের সমস্ত মন্ত্রী আর সরকারী অফিসের কর্তারা যদি তাঁর মতন হয়ে যায় তা হলে দেশের অশেষ মঙ্গল হবে। কিন্তু সে রকম ন কোটি লোকের কাজই দেশে নেই, তাঁদের দিয়ে তো মোটা কাজ করানো চলবে না।

—আচ্ছা যদি ন কোটি উদ্‌যোগী কর্মবীর ধনপতির আবির্ভাব হয় তা হলে তোমার আশা মিটবে?

—আপনি পরিহাস করছেন প্রভু। ন কোটি ব্যবসাদার কর্মবীরের স্থান কোথায়? কার ধন নিয়ে তাঁরা ধনপতি হবেন? অরণ্যের চার আনা পশু যদি বাঘ হয় আর বাকী বারো আনা যদি হরিণ হয় তবে আগে হরিণরা লোপ পাবে তার পর বাঘরা না খেয়ে মরবে। আমার নিবেদনটি শুনুন। ন কোটি মুক্তাত্মা সন্ন্যাসী, বা ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, বা রাজনীতিজ্ঞ সুশাসক হলে চলবে না। আর ন কোটি ব্যবসায়ী তো উপদ্রব স্বরূপ। নানারকম সাধারণ সচ্চরিত্র কর্মীরই দরকার—চাষী কারিগর শিল্পী বাস্তুকার যন্ত্রী বিজ্ঞানী শিক্ষক বিচারক পরিচালক কেরানী ইত্যাদি। তা ছাড়া অল্প গুটিকতক কলাবিৎ অর্থাৎ লিখিয়ে আঁকিয়ে গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়েও চাই। লোকোত্তর পুরুষ কোটিতে এক-আধটি হলেই ঢের।

—তুমি যে রকম চাচ্ছ সেরকম কাজের লোক তো দেশে আছেই।

—কিন্তু তাদের মধ্যে যে বিস্তর মূর্খ আর দুর্বৃত্ত লোক আছে, তারাই মঙ্গল হতে দিচ্ছে না।

—ওহে নির্ধিরাম, ব্যস্ত হয়ো না। তোমার দেশে যত মূর্খ আর দুর্বৃত্ত আছে তারা খেয়োখেয়ি মারামারি করে আপনিই ধ্বংস হয়ে যাবে, তার পর কালক্রমে সুবুদ্ধি সৎপুরুষের আবির্ভাব হবে।

—তবেই হয়েছে। আপনি অনন্তকাল এক্সপেরিমেণ্ট করতে পারেন, কিন্তু দেশের লোকের অত ধৈর্য নেই, তারা নানা দলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাল মন্দ উপায় খুঁজছে। আপনি ইচ্ছা করলেই তাদের সুপথে চালাতে পারেন।

—আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই। সৃষ্টি স্থিতি আর লয় ঘড়ির কাঁটার মতন যথানিয়মে হচ্চে, জাগতিক ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করি না।

—ভগবান, বেশী কিছু চাচ্ছি না, লোকে যাতে অসংযমী উচ্ছৃঙ্খল আর সমাজ-দ্রোহী না হয় সেই ব্যবস্থা করুন।

—দেখ নিধিরাম, সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থার উদ্দেশ্যে তোমার দেশে চাতুর্বর্ণ্য স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু এখন তার পরিণাম কি হয়েছে দেখছ তো? তুমি যে রকম চাচ্ছ তা পাবে ইতর প্রাণীর মধ্যে, তারা কখনও স্বজাতির ধর্ম ভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু মানুষ চিরকালই মতলবে চলে।

—প্রভু, যদি একজন জবরদস্ত অবতার পাঠিয়ে দেন তবে তিনি তো অবলীলা-ক্রমে সাধুদের পরিত্রাণ দুষ্কৃতদের বিনাশ আর ধর্মসংস্থাপন করতে পারবেন।

—তুমি কি মনে কর সিভিলিয়ানদের মতন একদল অবতার আমি পুষে রেখেছি আর দরকার হলেই পাঠাব? মানুষ মাত্রেই অবতার, কেউ কম কেউ বেশী। জনসমাজের অল্পাধিক মঙ্গল যে করতে পারে সেই অবতার। তোমারও সেই শক্তি আছে। যদি ইচ্ছা কর তুমি আবার জন্মগ্রহণ করে তোমার জাতভাইদের উদ্ধারের চেষ্টা করতে পার।

—আমার কতটুকু ক্ষমতা প্রভু? আমার কথা শুনবেই বা কে?

—বুড়োরা না শুনুক, তারা আর কদিনই বা বাঁচবে। ছেলেরা শুনতে পারে, তারা এখনও ঝানু হয়ে যায় নি।

—হা ভগবান, আপনি দেখছি কোনও খবরই রাখেন না!

—শোনো নিধিরাম। ছেলেরা বুড়োদের কথা না শুনুক, সমবয়সীদের কথা শুনতে পারে। তুমি পৃথিবীতে ফিরে যাও, জাতিস্মর না হলেও তোমার সদিচ্ছার সংস্কার থাকবে। বালক কিশোর আর যুবকদের তুমি সুমন্ত্রণা দিও।

—আমি একটি মন্ত্রণাই জানি—আগে বিনয় ও শিক্ষা তার পর কর্মপথ।

—বেশ তো, ওই মন্ত্রণাই দিও।

—আমার কথায় কেউ যদি কান না দেয়?

—তোমার চাইতে যাঁরা ঢের বড় অবতার তাঁদের কথাও সকলে শোনে নি। তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রো, তাতেই জন্ম সার্থক হবে। এক বারে কিছু করতে না পারলে বার বার অবতরণ ক'রো। যদি অনন্তকালেও কিছু করতে না পার তা হলেও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষতি হবে না।

# স্মৃতিকথা

নয়নচাঁদ পাইনের ঘড়ির দোকান আছে, নানারকম শখও আছে। তিনি শাস্ত্র পড়েন, পাখোয়াজ বাজান, মাছ ধরেন, সাহিত্যের খবরও রাখেন। প্রবীণ লোক, পাড়ার সকলেই খাতির করে। সকালবেলা আমার কাছে এসে বললেন, এই নাও তোমার ঘড়ি। হেয়ারস্প্রিং বদলে দিয়েছি, পনরো টাকা দিও, তুমি পাড়ার ছেলে, অয়েলিংএর চার্জ আর তোমার কাছে নেব না।

টাকা নিয়ে নয়নচাঁদ বললেন, ও কি লেখা হচ্ছে?

উত্তর দিলুম, একটা স্মৃতিকথা লিখছি।

—বেশ বেশ, গল্পের চাইতে ঢের ভাল। কিন্তু বেশী মিছে কথা লিখো না, যা রয় সয় তাই লিখবে। কলেরা থেকে উঠেই ফুটবল ম্যাচ খেলেছ, দেশের জন্যে দশ বছর জেল খেটেছ, তিনটে মেয়ে তোমাকে প্রেমপত্র লিখেছিল, রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে তোমার পিঠ চাপড়েছিলেন, এসব লিখতে যেয়ো না। আর একটি কাজ তোমাদের করা উচিত, কিছু লেখবার আগে এক্সপার্ট ওপিনিয়ন নেবে, ডাক্তার উকিল প্রোফেসার ব্যবসাদার এইসব লোকের। তা হলে আর মারাত্মক ভুল করে বসবে না।

পাইন মশায়ের উপদেশ মনে লাগল। যা লেখবার আগেই স্থির করে ফেলেছি, তবে বিশেষজ্ঞদের মত এখনও নেওয়া যেতে পারে।

প্রথমেই গেলুম ডাক্তার নির্মল মুখুজ্যের কাছে। তিনি বললেন, কি খবর, কোমরের বেদনাটা আবার বেড়েছে নাকি?

—না না, ওসব কিছু নয়। আচ্ছা ডাক্তার, আমি যদি কোনও লোকের দুই কাঁধে হাত দিয়ে খুব চাপ দিই তা হলে তার শিরদাঁড়া ভাঙতে পারে?

—কতখানি চাপ?

—এই ধর দু-আড়াই মন।

অর্থাৎ এক শ কিলোগ্রামেরও কম। তাতে লোকটা কাবু হতে পারে, স্ক্যাপিউলা ফ্র্যাকচার হতে পারে, কিন্তু তিন-চার মন চাপের কমে শিরদাঁড়া ভাঙবে মনে হয় না। ও কাজ করতে যেয়ো না, ফৌজদারিতে পড়বে।

ডাক্তারকে থ্যাংক্‌স দিয়ে উকিল নগেন সেনের কাছে গেলুম। তিনি বললেন, ওহে, আমার একটা বিল এখনও শোধ কর নি, টাকাটা কালকের মধ্যে পাঠিয়ে দিও।

যে আজ্ঞে। একটা কথা জানতে এসেছি।—একটি মেয়ে যদি জুলুম ক'রে একজন পুরুষকে বিবাহে রাজী করায় এবং পুরুষটি পরে অস্বীকার করে, তা হলে ব্রীচ অভ প্রমিস মকদ্দমা চলতে পারে?

—যদি প্রমাণ হয় যে জবরদস্তির ফলে পুরুষটি রাজী হয়েছিল তা হলে কেস টিকবে না।

—আচ্ছা, যদি প্রমাণ হয় যে জবরদস্তির পরেও পুরুষটি খোশ-মেজাজে মেয়েটিকে প্রিয়ে বলেছিল?

—তাই বলেছিলে নাকি হে? আচ্ছা বোকা তুমি। নাঃ, তা হলে আর নিস্তার নেই। তোমার এ কুবুদ্ধি হল কেন?

—আজ্ঞে আমি নই। আচ্ছা, চললুম, নমস্কার।

তার পর গেলুম দাশু মল্লিকের কাছে। লোকটি বিখ্যাত মাতাল, তবে মেজাজ ভাল। আমাকে দেখেই বললেন, আরে তোমাকেই খুঁজছিলুম, একটা দরকারী কথা জানতে চাই। তুমি তো কেমিস্ট্রি পড়েছিলে?

—সে বহুকাল আগে, এখন সব ভুলে গেছি।

—একটু তো মনে আছে, তাতেই কাজ চলবে। দেখ ভাই, বড়ই মুশকিলে পড়েছি, কাণ্ট্রি আমার সয় না, অথচ বিলিতী একবারে আগুন, শুনছি সবরকম মদই বন্ধ করা হবে, যত সব গো মুখ্খু আইন তৈরী করছে। আচ্ছা, মিষ্টি জিনিস গেঁজে উঠলেই তো মদ হয়?

—তা হয়। কিন্তু বাড়িতে ওসব করতে যাবেন না, ফ্যাসাদে পড়বেন।

—আরে না না। আমি একটা মতলব ঠাউরেছি, আবকারির বাবার সাধ্য নেই যে ধরে। মনে কর আমি এক পো চিনি কিংবা গুড় খেলুম, সেই সঙ্গে একটু ঈস্ট বা পাঁউরুটিওয়ালাদের খামি খেলুম। তাতে পেটের মধ্যে বুঁদ কেটে স্পিরিট হবে না?

—আজ্ঞে না, আপনার পেটটি তো ভাঁটি নয়। গেঁজে ওঠবার আগেই হজম হয়ে যাবে, না হয় প্রস্রাবের সঙ্গে বেরুবে।

—তবেই তো মুশকিল। যাক তোমার কি দরকার বল।

—আচ্ছা মল্লিক মশায়, যদি মদ খাওয়ার অভ্যাস না থাকে তবে কতটা খেলে নেশা হবে?

—বেশ বেশ, ওদিকে তোমার মতি হয়েছে জেনে খুশী হলুম। ট্রাই করেই দেখ না, এক আউন্স রম বা জিন থেকে শুরু করতে পার।

—আজ্ঞে আমি নই, আমার স্মৃতিকথার একটি লোককে খাওয়াতে চাই।

—আরে দূর দূর। তা আউন্স চারেক খাওয়াতে পার, গল্পের নেশায় তো দাম লাগবে না।

দাশু মল্লিককে নমস্কার করে বিদায় নিলুম। এখনও অনেক এক্সপার্ট বাকী, দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী, প্রত্নবিশারদ, পুরাণজ্ঞ, আরও কত কি। অত অভিমত নেবার সময় নেই, একটু না হয় ভুলই হবে। এখন স্মৃতিকথা আরম্ভ করা যাক।—

রাজনন্দিনী পুষ্কলা বললেন, পিসীমা, এই দেখ দু শ খিলি পান সেজেছি। মুক্তোপোড়া চুন, কেরল দেশের কেয়াখয়ের, ঘিএ ভাজা সুপুরি আর তুমি যেসব মসলা ভালবাস—এলাচ লবঙ্গ দারচিনি জাফরান কর্পূর হিং রশুন বিটনুন ইত্যাদি তেত্রিশ রকম সব দিয়েছি। তোমার পানের বাটা ভরতি হয়ে গেছে। এইবারে স্মৃতিকথা বলতে হবে কিন্তু।

রাজভগিনী শূর্পনখা খুশী হয়ে বললেন, লক্ষ্মী মেয়ে তুই। আশীর্বাদ করি রূপে গুণে নিখুঁত একটি বরের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়ে যাক, তা হলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই।

—বর এখন থাকুক, তুমি স্মৃতিকথা বল।

—সে সব দুঃখের কাহিনী শুনে কি হবে? ওঃ, অযোধ্যার সেই বজ্জাতদের কথা মনে পড়লেই আমার মাথা বিগড়ে যায়, দাঁত কিড়মিড় করে, রক্ত টগবগিয়ে ফোটে, শোক উথলে ওঠে।

—তা হ'ক, তুমি বল।

বিকাল বেলা দোতলার বারান্দায় বাঘের চামড়ার উপর বসে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে শূর্পনখা সমুদ্রবায়ু সেবন করছিলেন, পুষ্কলা পানের বাটা এনে তাঁর পাশে বসলেন।

রাবণবধের পর দু বৎসর কেটে গেছে। বিভীষণ রাজা হয়েই লংকার প্রাসাদ মন্দির উপবন প্রভৃতি মেরামত করিয়েছেন। হনুমান যে ভীষণ ক্ষতি করেছিলেন তার চিহ্ন এখন বেশী দেখা যায় না। বিভীষণ তাঁর ছোটবোনকে একটি আলাদা মহল দিয়েছেন, শূর্পনখা তাঁর চেড়ীদের সঙ্গে সেখানে বাস করেন। বিভীষণ আর সরমার উপর মনে মনে প্রচণ্ড আক্রোশ থাকলেও তাঁদের কিশোরী কন্যা পুষ্কলাকে তিনি স্নেহ করেন।

রাক্ষস ছলৎকারু খুব ভাল কারিগর, যুদ্ধের সময় ইন্দ্রজিতের আজ্ঞায় সে মায়াসীতা গড়েছিল। ইন্দ্রজিৎ তাঁর রথের উপরে সেই মূর্তি কেটে ফেলে হনুমানকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিলেন। শূর্পনখা এখন যে সুন্দরী কাঠের নাসাকর্ণ ধারণ করেন তাও ওই ছলৎকারুর রচনা। দেখতে প্রায় স্বাভাবিক, সহজে ধরা যায় না, কিন্তু শূর্পনখার কথার নাকী সুর দূর হয় নি।

পঁচিশ খিলি পান একসঙ্গে মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করে শূর্পনখা তাঁর স্মৃতিকথা বলতে লাগলেন।—জানিস কলা, লঙ্কার এই রাজবংশ যেমন মহান তেমনি বিপুল। আমাদের মাতামহ ছিলেন প্রবল-প্রতাপ সুমালী, বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে তিনি লঙ্কা ত্যাগ করে রসাতলে আশ্রয় নেন। তখন যক্ষদের রাজা কুবের লঙ্কা অধিকার কবল। সুমালীর কন্যা কৈকসী (যাঁর অন্য নাম নিকষা) মহামুনি বিশ্রবার ঔরসে তিন পুত্র এক কন্যা লাভ করেন। বড় ছেলে রাবণ, মেজো কুম্ভকর্ণ, ছোট তোর বাপ বিভীষণ, আর তাঁদের ছোট আমি। বিশ্রবার প্রথম পক্ষে এক ছেলে ছিল, সেই হল কুবের। রাবণ ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠলেন, তখন বিশ্রবা মুনির উপদেশে কুবের লঙ্কা ছেড়ে হিমালয়ের ওপারে পালিয়ে গেল, লঙ্কা আবার আমাদের দখলে এল।

পুষ্কলা বললেন, ওসব ইতিহাস তো আমার জানা আছে, তুমি নিজের কথা বল। তোমার একবার বিয়ে হয়েছিল না?

আরও পঁচিশ খিলি পান মুখে পুরে শূর্পনখা বললেন, বিয়ে তো একবার হয়েছিল। দানবরাজ বিদ্যুজ্জিহ্ব আমার স্বামী ছিলেন, অতি সুপুরুষ আর আমার খুব বাধ্য। কিন্তু বড়দার তো কাণ্ডজ্ঞান ছিল না, কালকেয় দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় নিজের ভগিনীপতিকেই মেরে ফেললেন। আমি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে লঙ্কেশ্বরকে যাচ্ছেতাই গালাগালি দিলুম। তিনি বললেন, চেঁচাস নি বোন, একটা স্বামী মরেছে তো হয়েছে কি? যুদ্ধের সময় আমি প্রমত্ত হয়ে শরক্ষেপণ করি, তোর স্বামীকে চিনতে না পেরে বধ করে ফেলেছি। যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন শোক সংবরণ কর, তোর জন্যে আমি ভাল ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমাদের মাসতুতো ভাই খর চোদ্দ হাজার সৈন্য নিয়ে দণ্ডকারণ্যে যাচ্ছে, তুইও তার সঙ্গে সেখানে যা। খর তোর সমস্ত আজ্ঞা পালন করবে। দণ্ডকারণ্য খাসা জায়গা,

বিস্তর ঋষি সেখানে তপস্যা করেন, অনেক ক্ষত্রিয় রাজাও মৃগয়া করতে যান। সেখানে তুই অনায়াসে আর একটি স্বামী জুটিয়ে নিতে পারবি।

খর-দাদার সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে গেলুম। সত্যিই ভাল জায়গা, বিশেষ করে জনস্থান অঞ্চল, সেখানে আমরা বসতি করলুম। কিন্তু বড়দার সব কথা সত্যি নয়, ক্ষত্রিয় সেখানে কেউ আসত না, ঋষিও খুব কম, রাক্ষসের ভয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে তপস্যা করত। তবে খাবার জিনিসের অভাব নেই, বিস্তর আম কাঁঠাল কলা নারকেল, মধুও প্রচুর, নানা জাতের হরিণও পাওয়া যায়।

পুষ্কলা প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা পিসীমা, তুমি ঋষি খেয়েছ?

মুখে আবার পঁচিশ খিলি পান পুরে শূর্পনখা বললেন, আমার বাপ মহামুনি বিশ্রবা ঋষি-খাওয়া পছন্দ করতেন না। ছোটলোক রাক্ষসরা নরমাংস ভালবাসে, কিন্তু আমরা রাজবংশের মেয়েপুরুষ বড় একটা খেতুম না। তবে কোনও মানুষের উপর বেশী চটে গেলে তাকে ভক্ষণ করতুম আর পুজো-পার্বণে নিকুম্ভিলা দেবীস্থানে নরবলি দিয়ে সেই পবিত্র মাংস খেতুম। আমি বার পাঁচেক ঋষি খেয়েছি, ছিবড়ে বড় বেশী, কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজা আর রাজপুত্রদের মাংস ভাল, কচি পাঁঠার মতন। সে সব দিন আর নেই রে পুষ্কলা, তোর বাপের কি যে মতিচ্ছন্ন হল, সব বন্ধ করে দিয়েছে। তারপর শোন—দণ্ডকারণ্যে বেশ ফুর্তিতেই ছিলুম, কিন্তু দিন কতক পরে বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগল, মনটা উদাস হয়ে পড়ল। বড় ঘরানার দানব বা রাক্ষস সে অঞ্চলে কেউ নেই, অগত্যা ঋষির সন্ধান করতে লাগলুম। বেশীর ভাগই বুড়ো হাবড়া, মাথায় জটা, এক মুখ দাড়িগোঁফ, তাদের সঙ্গে প্রেম হতে পারে না।

দণ্ডকারণ্যে আমার একটি সঙ্গিনী জুটেছিল, জম্ভলা রাক্ষসী, গোদাবরীতীরে থাকত। সে আমাকে বলল, সখী, তুমি ভেবো না, আমি একটি সুন্দর তরুণ ঋষি যোগাড় করে দেব। জম্ভলা খুব চালাক আর কাজের মেয়ে, চারদিকে ঘুরে সন্ধান নিতে লাগল। তার পর একদিন বলল, চমৎকার একটি ছোকরা ঋষি পেয়েছি দিদিরানী, আমাকে মুক্তোর হার বকশিশ দিতে হবে কিন্তু। জম্ভলা যে খবর দিল তাতে জানলুম, মুদ্গল নামে একটি সুন্দর তরুণ ঋষি সম্প্রতি জনস্থানে এসেছেন, গোদাবরী নদীর ধারে কুটীর বানিয়ে তপস্যা করছেন। সেই দিনই বিকেলে তাঁকে দেখতে গেলুম।

পুষ্কলা প্রশ্ন করলেন, খুব সেজেগুজে গিয়েছিলে তো?

আরও পঁচিশ খিলি পান মুখে পুরে শূর্পনখা বললেন, তা আর তোকে বলতে হবে না। চোখে কাজল, কপালে তেলাপোকার টীপ, গালের রং যেন দুধে-আলতা, ঠোঁটে তেলাকুচো, খোঁপায় শিমুল ফুল, কানে ঝুমকো-জবা, গলায় সাতনরী মুক্তোর মালা, পরনে নীল শাড়ি, বুকে সোনালী কাঁচুলি, আর এক গা গহনা। দেখলে পুরুষের মুণ্ডু ঘুরে যায়। মুদ্গল ঋষির আশ্রমে যখন পৌঁছলুম তখন তিনি বেদপাঠ করছিলেন। তাঁকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলুম, আমার আগেকার স্বামীর চাইতে ঢের ভাল দেখতে। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে তিনি বললেন, ভদ্রে, তুমি কে? কি প্রয়োজনে এসেছ? আমি উত্তর দিলুম, তপোধন, আমি রাজকন্যা শুক্তিনখা—

পুষ্কলা বললেন, ও নাম আবার কোথা থেকে পেলে?

—আসল নামটা ভদ্রলোকের কাছে বলতে ইচ্ছে হল না। বাবা বিশ্রবার যেমন বুদ্ধি, তাই একটা বিশ্রী নাম রেখেছেন। শূক্তিনখা—কিনা ঝিনুকের মতন ধার যার নখ। তার পর আমি বললুম, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমি কাছেই থাকি। তিন মাস ধরে বিভীতক ব্রত পালন করছি, অহোরাত্রে শুধু একটি বিভীতক ফল অর্থাৎ বয়ড়া আহার করি। কাল আমার ব্রতের পারণ হবে, সেজন্যে একটি ব্রাহ্মণভোজন করাতে চাই। আপনি কৃপা করে কাল মধ্যাহ্নে এই দাসীর কুটীরে পদধূলি দেবেন।

—আচ্ছা পিসীমা, সেই কচি ঋষিটিকে দেখে তোমার নোলা সপসপিয়ে উঠল না?

—তুই কিছুই বুঝিস না। যার প্রতি অনুরাগ হয় তাকে উদরসাৎ করা চলে না। মানুষটাকে যদি খেয়েই ফেলি তবে প্রেমের আর রইল কি? তার পর শোন। —মুদ্গল ঋষি বললেন, সুন্দরী, তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম, কাল মধ্যাহ্নে তোমার ওখানেই ভোজন করব।

পরদিন মুদ্গল এলে তাঁকে খুব খাওয়ালুম, নানা রকম ফল, মৃগমাংস আর পায়সান্ন। তাঁর ভোজন শেষ হলে বললুম, তপোধন, এক ঘটি এই মাধ্বীক পান করে দেখুন, অতি স্নিগ্ধ পানীয়, বনজাত পুষ্প থেকে মধুকর যে মধু আহরণ করে তাই দিয়ে আমি নিজে এই মাধ্বীক তৈরি করেছি। মুদ্গল বললেন, খেলে মত্ততা আসবে না তো? বললুম, না না, মাদক দ্রব্য কি আপনাকে দিতে পারি? খেলে মন প্রফুল্ল হবে, একটু পুলক আসবে। আপনি নির্ভয়ে পান করুন।

মুদ্গল চেখে চেখে সবটা খেলেন। বললেন, হুঁ, খুব ভালই তৈরি করেছ, বেশ ঝাঁজ। আর আছে? বললুম, আছে বইকি। মুদ্গল চোঁ চোঁ করে আর এক ঘটি খেলেন, তার পর আরও পাঁচ ঘটি। দেখলুম তাঁর চোখ বেশ ড্যাবডেবে হয়েছে, নাকের ডগায় গোলাপী রং ধরেছে, ঠোঁটে একটু বোকা-বোকা হাসি ফুটেছে, হাত একটু কাঁপছে। এইবারে এঁকে বলা যায়।

বললুম, মুনিবর, আপনাকে দেখে আমি মোহিত হয়েছি, আপনিই আমার প্রাণেশ্বর। আমাকে গন্ধর্ব মতে বিবাহ করুন।

মুদ্গল কিন্তু তখনও বাগে আসেন নি। বললেন, সুন্দরী, তোমার কুল শীল কিছুই জানি না, পাণিগ্রহণ করব কি করে? তা ছাড়া শাস্ত্রে বলে, স্ত্রীজাতি স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নয়। তুমি অবলা নারী, পিতা-মাতার অধীন, তাঁরাই তোমাকে পাত্রস্থ করবেন।

আমি বললুম, আমার পিতা-মাতা না থাকারই মধ্যে, তাঁরা আমার খোঁজ নেন না। আমার আসল পরিচয় শুনুন, আমি হচ্ছি লঙ্কেশ্বর রাবণের ভগিনী।

চমকে উঠে ঋষি বললেন, অ্যাঁ, তুমিই শূর্পনখা? যতই রূপবতী হও রাক্ষসীকে আমি বিবাহ করতে পারি না। শুনেছি শূর্পনখা অতি ভয়ংকরী, নিশ্চয় তুমি মায়ারূপ ধারণ করে এসেছ।

আমি বললুম, ওহে মুদ্গল, রূপ তো নিতান্তই বাহ্য। আমি যদি মায়াবলে আমার বাহ্য রূপ বর্ধিত করি তাতে অন্যায়টা কি? তোমার ভয় নেই, এই মনোহর রূপেই আমি সর্বদা তোমাকে দর্শন দেব, কেবল রাত্রিতে শয়নকালে রূপসজ্জা বর্জন করব, নইলে আমার ঘুম হবে না। প্রদীপ নিবিয়ে অন্ধকারে আমি তোমার পাশে শোব।

—তোমাকে বিশ্বাস কি? যদি রাত্রিতে তোমার ক্ষুধার উদ্রেক হয় তবে হয়তো আমাকে ভক্ষণ করে ফেলবে।

—ভয় নেই, যাকে তাকে আমি খাই না, আর পতি তো নিতান্ত অভক্ষ্য। শোন মুদ্গল, আমাকে বিবাহ করলে অতুল ঐশ্বর্য পাবে, দশানন রাবণ, যাঁর ভয়ে ত্রিভুবন কম্পমান, মহাকায় মহাবল কুম্ভকর্ণ, আর সুবুদ্ধি ধর্মপ্রাণ বিভীষণ—এই তিনজনকে শ্যালকরূপে পেয়ে ধন্য হবে।

মুদ্গল ঋষি দেখতে বোকার মতন হলেও অত্যন্ত একগুঁয়ে, কিছুতেই বশে এলেন না। আমার রাগ হল, বললুম, আমাকে অবলা ললনা ঠাউরেছ, নয়? দেখ আমার বল।

মুদ্গলের দুই কাঁধে হাত দিয়ে চেপে বললুম, লাগছে?

—ছাড় ছাড়।

—এই এক মন চাপ দিলুম, লাগছে?

—উঃ, ছাড় ছাড়।

—এই দু মন চাপ দিলুম, বিয়ে করতে রাজী আছ?

মুদ্গল যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেন, মাধ্বীক যা খেয়েছিলেন মুখ দিয়ে সব হড়হড় করে বেরিয়ে গেল। আমি বললুম, এই তিন মন চাপ দিলুম, আর একটু দিলেই তোমার মেরুদণ্ড মচকে ভেঙে যাবে। বল, প্রাণেশ্বর হতে রাজী আছ?

আর্তনাদ করে মুদ্গল বললেন, আছি আছি।

—আকাশে দিবাকর, আমার চতুর্দিকে এই চেড়ীবৃন্দ, আর সম্মুখে ওই উচ্ছিষ্ট-লোভী কুকুর, সবাই সাক্ষী রইল, আবার বল, রাজী আছ?

—ওরে বাপ রে! আছি আছি। রাক্ষসী, তুমিই আমার প্রাণেশ্বরী।

তখন হাত তুলে নিয়ে আমি বললুম, আজই রাত্রির প্রথম লগ্নে বিবাহ।

কাতর হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মুদ্গল বললেন, প্রিয়ে, একটি দিন অপেক্ষা কর, আমার গায়ের ব্যথা মরুক, পিঠ সোজা হক। কাল আমার গুরুদেব মহর্ষি কুলথ আসবেন, তাঁর অনুমতি আর আশীর্বাদ নিয়ে তোমাকে পত্নীত্বে বরণ করব।

আমি বললুম, বেশ, তাই হবে। কিন্তু খবরদার, যদি সত্যভ্রষ্ট হও তবে আমার জঠরে যাবে, সেখান থেকে সোজা নরকে।

একদিন পরে মুদ্গলের আশ্রমে গিয়ে দেখলুম, তার গুরু মহর্ষি কুলথ এসে-ছেন। আমি প্রণিপাত করলে তিনি প্রসন্ন হাস্য করে বললেন, রাক্ষসনন্দিনী, তোমাদের প্রণয়ব্যাপার শুনে আমি অতীব প্রীত হয়েছি। আশীর্বাদ করি, তোমাদের দাম্পত্যজীবন মধুময় হক। দেখি তোমার হাতখানা।

আমার কররেখা অনেকক্ষণ ধরে দেখে কুলথ বললেন, হুঁ, ভালই দেখছি, তোমার ভাগ্যে অদ্বিতীয় রূপবান পতিলাভ আছে। তা আমার এই শিষ্যটি খর্বকায় আর দুর্বল হলেও রূপবান বটে।

আমি বললুম, ভগবান, ওই রূপেই আমি তুষ্ট। আপনি শিষ্যের কররেখা দেখেছেন?

মহর্ষি বললেন, দেখেছি বইকি। এক অদ্বিতীয়া সুন্দরীকে মুদ্গল পত্নীরূপে লাভ করবে।

হৃষ্ট হয়ে আমি বললুম, মহর্ষি, আপনার গণনা একেবারে নির্ভুল, রূপের জন্য আমি লঙ্কাশ্রী উপাধি পেয়েছি। সমগ্র জম্বুদ্বীপেও আমার তুল্য সুন্দরী পাবেন না।

কুলথ বললেন, তাই নাকি? তবে তোমাকে আমি জম্বুশ্রী উপাধি দিলুম। কিন্তু রাক্ষসনন্দিনী, তোমার কিঞ্চিৎ ন্যূনতা আছে। সম্প্রতি দশরথপুত্র রাম-লক্ষ্মণ

বনবাসে এসেছেন, নিকটেই পঞ্চবটীতে কুটীর নির্মাণ করে বাস করছেন। রামের ভার্যা জনকতনয়া সীতাও তাঁদের সঙ্গে আছেন। তিনি তোমার চাইতে একটু বেশী সুন্দরী।

আমি রেগে গিয়ে বললুম, আমার চাইতে সুন্দরী এই তল্লাটে কেউ থাকবে না, সীতাকে আমি ভক্ষণ করে ফেলব। তার কাছে নিয়ে চলুন আমাকে।

মহর্ষি বললেন, তোমার সংকল্প অতি সাধু। এস আমার সঙ্গে।

কুলথ আর মুদ্গলের সঙ্গে তখনই পঞ্চবটীতে গেলুম। একটু দূরে বনের আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখলুম, কুটীরের দাওয়ায় বসে সীতা তরকারি কুটছে। পুরুষ জাতটাই অন্ধ, বলে কিনা আমার চাইতে সুন্দরী! বড়দা পর্যন্ত সীতার জন্যে খেপেছিলেন। তার পর দেখলুম, দূর্বাদলশ্যাম ধনুর্ধর এক যুবা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল, তার পিছনে আর একটি যুবা এক ঝুড়ি ফল মাথায় করে নিয়ে এল। বুঝলুম এরাই রাম-লক্ষ্মণ।

পুষ্কলা বললেন, দেখেই তোমার মুণ্ডু ঘুরে গেল তো?

—ওঃ কি রূপ, কি রূপ! মানুষ অত সুন্দর হয় আমার জানা ছিল না। নিমেষের মধ্যে আমার মনোরথ বদলে গেল। কুলথকে বললুম, মহর্ষি, আমি ওই সীতাকে এখনই ভক্ষণ করছি, কিন্তু আপনার শিষ্য মুদ্গলকে আমার আর প্রয়োজন নেই, অদ্বিতীয় রূপবান ওই রামই আমার বিধিনির্দিষ্ট পতি, ওঁকেই আমি বরণ করব, ওঁর কাছে আপনার শিষ্য মর্কট মাত্র।

মহর্ষি বললেন, ছি রাক্ষসী, ও কথা বলতে নেই, তুমি যে বাগদত্তা।

উত্তর দিলুম, কথা আমি দিই নি, আপনার শিষ্যই দিয়েছিল, তাও স্বেচ্ছায় নয়, তিন মন চাপে কাবু হয়ে প্রাণেশ্বরী বলেছিল। ওকে আমি মুক্তি দিলুম। আমি এখনই রামের সঙ্গে মিলিত হব, আপনারা এখানে থেকে কি করবেন, চলে যান।

আমার কথা শেষ হতে না হতে মুদ্গলের হাত ধরে মহর্ষি কুলথ বেগে প্রস্থান করলেন।

শূর্পনখা অন্যমনস্ক হলেন দেখে পুষ্কলা বললেন, থামলে কেন পিসীমা, তার পর কি হল?

—ন্যাকামি করিস নি, কি হল তুই জানিস না নাকি?

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে শূর্পনখা চিৎকার করে উঠলেন—ওরে রেমো সর্বনেশে, কি করলি রে! তার পর ছটফট করে হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন, তাঁর কাঠের নাক-কান খসে পড়ল, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে লাগল, দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল, চোখ কপালে উঠল।

পুষ্কলা চেঁচিয়ে বললেন, এই চেড়ীরা, শিগগির আয়, পিসীমা ভিরমি গেছেন। মুখে জলের ছিটে দে, জোরে বাতাস কর, লংকা পুড়িয়ে নাকের ফুটোয় ধোঁয়া দে।

# বিচিন্তা

এই প্রবন্ধগুলি গত সাত বৎসরে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। গল্প নয়, 'রম্যরচনা'ও নয়, সাধারণের ভাল লাগবে কিনা জানি না। কিন্তু বাঙালী পাঠকের রুচি আজকাল প্রসারিত হয়েছে, অন্তত জনকয়েকের চিন্তার খোরাক যোগাবে এই আশায় প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল।

—রাজশেখর বসু

# ইহকাল পরকাল

ইংরেজীতে প্রবাদ আছে—অন্ধকার ঘরে একজন অন্ধ একটি কালো বেরালকে ধরবার চেষ্টা করছে, কিন্তু বেরাল সে ঘরেই নেই ; একেই বলে দার্শনিক গবেষণা।

দার্শনিক সিদ্ধান্ত বাঁধাধরা নয়, তাই এই উপহাস। বৈজ্ঞানিক মত প্রায় সর্বসম্মত। কোনও এক মতে যদি মোটামুটি কাজ চলে তবে সকল বিজ্ঞানীই তা মেনে নেন, এবং পরে যদি আরও ব্যাপক ও যুক্তিসম্মত নূতন মত আবিষ্কৃত হয় তবে বিনা দ্বিধায় পূর্বের ধারণা ছেড়ে দিয়ে নূতন মতের অনুবর্তী হন। পূর্বে লোকে মনে করত যে পৃথিবী স্থির হয়ে আছে, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রই ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ধারণা অনুসারেও গ্রহণ প্রভৃতি অনেক জ্যোতিষীক ব্যাপারের গণনা করা যেত, সেজন্য সেকালের বিজ্ঞানীরা তা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকজন বুঝেছিলেন যে এই সিদ্ধান্তে অনেক বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অবশেষে দেখা গেল যে সূর্য স্থির এবং পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহই তাকে বেষ্টন করে ঘোরে—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে জ্যোতিষগণনা সরল হয় এবং সমস্ত অসংগতির অবসান হয়। তখন সকল বিজ্ঞানীই নূতন মত মেনে নিলেন। নিউটনের মহাকর্ষবাদ এতদিন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু আইনস্টাইনের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত অধিকতর যুক্তি-সম্মত মনে হওয়ায় সকল বিজ্ঞানীই এখন তা মেনে নিয়েছেন, যদিও সব রকম স্থূল গণনায় নিউটনের সূত্রেই কাজ চলে।

দার্শনিক তত্ত্বে এরকম সর্বসম্মতি দেখা যায় না। বিজ্ঞানশিক্ষার্থী তাঁর পাঠ্য-পুস্তকে যেসব তথ্যের বর্ণনা পান তা সুপ্রতিষ্ঠিত। তথ্যের যাঁরা আবিষ্কর্তা বা মতের যাঁরা প্রবর্তক তাঁদের নাম পুস্তকে থাকে বটে, কিন্তু তা নিতান্ত গৌণ। পক্ষান্তরে দার্শনিক পাঠ্যপুস্তকে কোনও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না ; শংকর বা রামানুজ বা বৌদ্ধাচার্যগণ কি বলেছেন, স্পিনোজা হিউম বার্কলি হেগেল প্রভৃতির মত কি—এই সব আলোচনাই থাকে, সত্যজিজ্ঞাসু পাঠককে দিশাহারা হতে হয়। আমাদের টোলের বা কলেজের ছাত্ররা যা পড়েন তা দার্শনিক তথ্য নয়, দার্শনিক চিন্তার ইতিহাস। বিজ্ঞান আর দর্শনের এই প্রভেদের কারণ—বিজ্ঞান প্রধানত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নিয়ে কারবার করে, তার সহায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং তদাশ্রিত অনুমান ; কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য কিনা তা বারবার পরীক্ষা বা নিরীক্ষার পর স্থির করা হয়। জুল বললেন, এতটা শক্তি রূপান্তরিত হয়ে এতটা তাপ উৎপন্ন করে ; তিনি পরীক্ষা করে তা দেখিয়ে দিলেন। তার পর বহু বিজ্ঞানী অনুরূপ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলেন যে জুলের সিদ্ধান্ত ঠিক। গীতায় আছে, মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নব বস্ত্র পরে, সেইরূপ জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নব শরীর গ্রহণ করে ; কিন্তু গীতাকার প্রমাণ দিলেন না। বার্কলি বললেন, ঈশ্বরের চৈতন্যই সকল পদার্থের আধার, কিন্তু কোন্ উপায়ে ঐশ্বরিক চৈতন্য উপলব্ধি করা যায় তা বললেন না। দার্শনিকমতের প্রমাণ নেই—অন্তত আদালতে গ্রাহ্য হতে পারে এমন প্রমাণ নেই, তাই পরস্পর-বিরুদ্ধ নানা মতের উৎপত্তি হয়েছে এবং লোকে রুচি অনুসারে পুনর্জন্ম স্বর্গ-নরক নির্বাণ দ্বৈতবাদ মায়াবাদ দেহাত্ম-বাদ প্রভৃতি যা খুশি মেনে নেয়।

বিজ্ঞান আর দর্শনের মাঝে একটি প্রান্তভূমি আছে, পণ্ডিতরা বহু দিন থেকে সেখানে প্রবেশের চেষ্টা করছেন। এই গহন প্রদেশে এখনও ইচ্ছামত পরীক্ষা বা নিরীক্ষা চলে না, তাই তত্ত্বান্বেষীকে প্রধানত অনুমান আর কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। যাঁরা কঠোর যুক্তিবাদী তাঁরা অতি সতর্ক হয়ে যথাসাধ্য অপক্ষপাতে রহস্য ভেদের চেষ্টা করছেন। বলা বাহুল্য, এই অনুসন্ধানে এখনও বেশী মতৈক্যের আশা নেই এবং কল্পনার বিলাস অবাধে চলছে। তারই নমুনাস্বরূপ কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি।

বিদ্যাসাগর বোধোদয়ে লিখেছেন (ভাষাটি ঠিক মনে নেই)—'আমরা ইতস্তত যে সমুদায় বস্তু দেখিতে পাই তাহাদিগকে পদার্থ কহে।' আর একটু বিশদ করে বলা যেতে পারে—আমরা যেসব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথক পৃথক বিষয়ের সংস্রবে আসি তাদের নাম পদার্থ। মানুষ জন্তু গাছ নক্ষত্র পাহাড় নদী বাড়ি ইট শস্যকণা জীবাণু সবাই পদার্থ। পদার্থের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ হতে পারে, কিন্তু অনেক পদার্থের উৎপত্তি-বিনাশ দেখবার সুযোগ আমাদের নেই, যেমন নক্ষত্র, হিমালয় পর্বত। পদার্থ মাত্রই নিরন্তর বদলাচ্ছে, আজ যেমন আছে কাল তেমন থাকবে না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন অত্যন্ত মন্থর, সেজন্য আমাদের অগোচর।

একটি দার্শনিক সংজ্ঞা আছে—একদেশসম্বন্ধ। আমি যখন কোনও গাড়িতে চড়ি বা বিছানায় শুই তখন আমার সর্ব দেহ দিয়ে গাড়ি বা বিছানার সমস্তটা ব্যাপ্ত করে থাকি না, এক অংশেই থাকি, তাই তার সঙ্গে আমার একদেশসম্বন্ধ হয়। মায়ের সঙ্গে কোলের ছেলের, আমার সঙ্গে আমার হাতে ধরা কলমের এই সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ অল্পকালস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, একবার ঘুচে গিয়ে আবার স্থাপিত হতে পারে, চিরকালের জন্য লুপ্তও হতে পারে। একদেশসম্বন্ধের ন্যায় এককালসম্বন্ধও আমরা কল্পনা করতে পারি। আমার পিতা এখন মৃত। তিনি আর আমি কয়েক বৎসর একই কালে বিদ্যমান ছিলুম, তখন তাঁর সঙ্গে আমার এককালসম্বন্ধ ছিল। দুজন লোক যদি একই মুহূর্তে জন্মায় এবং এক সঙ্গেই মরে তবে বলা যেতে পারে যে তাদের সমকালসম্বন্ধ আছে, এমন সম্বন্ধ দুর্ঘট। কোনও সময়ে জগতে যত লোক জীবিত থাকে তাদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় বা সাক্ষাৎকার না হলেও এককালসম্বন্ধ হয়। এই সম্বন্ধ মৃত্যুতে ছিন্ন হয়, একদেশসম্বন্ধের ন্যায় পুনর্বার স্থাপিত হতে পারে না। জীবন-মৃত্যু মিলন-বিরহ আমাদের পক্ষে চিত্তবিক্ষোভকর গুরুতর ব্যাপার, কিন্তু উদাসীন তত্ত্বদর্শী বলেন—

যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ
সমেত্য চ ব্যাপেয়াতাং তদ্‌বদ্‌ভূতসমাগমঃ।
(মহাভারত, শান্তিপর্ব)

—মহাসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এক খণ্ড কাষ্ঠ অপর এক খণ্ড কাষ্ঠের সঙ্গে মিলিত হয়, আবার দূরে চলে যায়; প্রাণিগণের মিলন-বিরহও সেইরূপ।

আমরা কি শুধুই 'কাষ্ঠং কাষ্ঠং'? মৃত্যুর পরে কি পুনর্বার মিলনের সম্ভাবনা নেই? হিন্দু খ্রীষ্টান মুসলমান এক বাক্যে বলেন, অবশ্যই আছে, আত্মা

মরে না, পরজন্মে অথবা স্বর্গে বা নরকে আবার মিলন হতে পারবে। এই ধারণায় মন তৃপ্ত হতে পারে, কিন্তু যুক্তিবাদী তত্ত্বান্বেষী এমন শূন্যগর্ভ আশ্বাসে ভোলেন না। তিনি বলেন, ইহকালে আমাদের অস্তিত্ব কি রকম তাই আগে জানা দরকার, পরকালের কথা পরে ভাবব। শাস্ত্রে আছে—'আত্মানং বিদ্ধি', আত্মাকে জান। আত্মা বললে ঠিক কি বোঝায় তা জানি না; তার বদলে প্রত্যক্ষ স্থূল সত্তাকে বোঝবার চেষ্টা করব।

বোধোদয়ের মতে আমি একটি চেতন পদার্থ, ধরাধামে আমার অস্তিত্ব জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। বাল্যকালে আমি যেরকম ছিলাম এখন সেরকম নেই, শরীর আর মতিগতি অনেক বদলেছে। এই পরিবর্তমান আমি একই পদার্থ? বহু লোকে বলেন, দেহের আর মনের যতই অদলবদল হ'ক তোমার আত্মা বরাবর একই আছে, পরলোকেও থাকবে। যাঁরা বলেন তাঁরা কেউ পরলোক-ফেরত নন, সুতরাং তাঁদের কথার মূল্য নেই। গীতায় আছে, জীব আদিতে ও মরণান্তে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত; অর্থাৎ জন্মের আগে এবং মৃত্যুর পরে জীবের অবস্থা অজ্ঞাত, কেবল জীবিতাবস্থাই জ্ঞাত। অতএব এই প্রত্যক্ষ জীবিতাবস্থারই বিচার করে দেখা যাক আমার সত্তা কিরকম। আমার ছেলেবেলার ছবির সঙ্গে বুড়ো বয়সের ছবির অল্প মিল থাকতে পারে, কিন্তু দুটি বিভিন্ন ক্ষণিক বিষয়ের প্রতিরূপ। আমার স্বভাব, শক্তি, রুচি, বিদ্যাবুদ্ধিরও এইরকম পরিবর্তন হয়েছে। বস্তুত আমি একটি পদার্থ নই, অসংখ্য পদার্থের পরম্পরা, যেমন সিনেমার ছবি। মনে করুন হীরাবাই-নাটকের সিনেমা-ফিল্ম দশ হাজার ফুট লম্বা। তার সমস্ত রীলকে বলা যেতে পারে হীরাবাই ফিল্ম, কিন্তু এক টুকরোকে এ নাম দেওয়া যায় না। ফিল্মের রীল যখন কৌটায় থাকে তখন খানিকটা জায়গা জুড়ে থাকে, অর্থাৎ তার দু-চার ঘন-ফুট দেশব্যাপ্তি আছে। কিন্তু তার ছবি যখন পর্দায় দেখানো হয় তখন তার প্রায় ২০ বর্গ-ফুট দেশব্যাপ্ত হয় এবং সেই সঙ্গে প্রায় দু ঘণ্টা কালব্যাপ্ত হয়। দেশে কালে ব্যাপ্ত এই চিত্র পরম্পরাই হিরাবাই-নাটকের যথার্থ প্রতিরূপ; ফিল্মের রীল সেই প্রতিরূপের উৎপাদক মাত্র।

অতএব আমার যথার্থ সত্তা আমার সমগ্র জীবন। শুধু দেশে কালে ব্যাপ্ত আমার শরীর নয়, আমার চিত্ত ও কর্মও এই সত্তার অঙ্গীভূত। যদি সত্তর বৎসর বাঁচি তবে এই সময়ের মধ্যে আমার শারীরিক মানসিক যত পরিবর্তন হয়েছে, আমি সুখ দুঃখ অনুরাগ বিরাগ যা ভোগ করেছি, সুকর্ম দুষ্কর্ম যা করেছি, সব সুদ্ধ নিয়ে আমার সত্তা। আমাকে পদার্থ বললে ছোট করা হবে, আমি সত্তর বৎসর ব্যাপী একটি ঘটনাপ্রবাহ। এ ভিন্ন যদি আমার অন্যবিধ সত্তা মানা হয় তবে তা ক্ষণিক, অসম্পূর্ণ, অথবা অপ্রমাণিত!

আপাতদৃষ্টিতে হিমালয় যতই অটল মনে হ'ক, তারও পরিবর্তন ঘটছে, অতএব হিমালয় একটি ঘটনাপ্রবাহ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও এইরকম, তাই 'জগৎ' আর 'সংসার' নাম। গঙ্গার যে জলরাশি এই মুহূর্তে দেখছি পর মুহূর্তে তা চলে গেছে, তার স্থানে অন্য জলরাশি এসেছে, তটরেখাও ক্রমশ বদলাচ্ছে, গঙ্গার কোনও অংশই স্থায়ী নয়। এই কারণেই গ্রীক পণ্ডিত হেরাক্লাইট বলেছিলেন, একই নদী দুবার পার হওয়া যায় না। নির্বাত স্থানে প্রদীপের শিখা একটি স্থির পদার্থ বলে

মনে হয়। তেলের বাষ্প আর বাতাসের অক্সিজেন একসঙ্গে মিশে জ্বলছে এবং এই দুই উপাদান নিরন্তর বদলাচ্ছে; এই ঘটনাপ্রবাহকেই আমরা দীপশিখা রূপে দেখি।

প্রদীপ নিবে গেলে তার শিখা কোথায় যায়? মৃত্যুর পরেও কি আত্মার অস্তিত্ব থাকে? আমরা কিছুই জানি না। নদী আর প্রদীপ অচেতন তাই তাদের আত্মার কথা আমাদের মনে আসে না। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চেতন অবস্থায় যে অহংজ্ঞান থাকে, আমি পূর্বে এই করেছিলাম, এখন এই করছি, এই ছিলাম, এখন এই হয়েছি—এই ধারাবাহিক জ্ঞান বা স্মৃতিই আমার ব্যক্তিত্ব, তাকেই আত্মা মনে করতে পারি। মহাভারতের উপমা অনুসারে বলা যেতে পারে—মহা-কালসমুদ্রে ঘটনাপ্রবাহরূপ অসংখ্য কাষ্ঠ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, আমি তাদেরই একটি। অন্যান্য যে সকল সচেতন কাষ্ঠ আমার সংসর্গে আসে—অর্থাৎ তাদের সঙ্গে যখন আমার এককালসম্বন্ধ হয় তখন তাদের আমি জীবিত মনে করি। যে কাষ্ঠ সরে যায় তাকে মৃত মনে করি। আমি যখন আমার সঙ্গীদের কাছ থেকে দূরে চলে যাই তখন তারা আমাকে মৃত মনে করে। তার পরে আমার চৈতন্য বা ব্যক্তিত্ববোধ থাকে কিনা তা বলা আমায় সাধ্য নয়।

এই পর্যন্ত মেনে নিতে বাধা হয় না, কিন্তু পরে যা বলছি তা বিভিন্ন পণ্ডিতের অনুমান বা কল্পনা মাত্র। সিনেমার ছবি একবার দেখানো হলেই তার বিনাশ হয় না; চিত্রপ্রবাহরূপ যে ঘটনার একবার অবসান হয়েছে আবার তা দেখানো যেতে পারে, কারণ, তার মূলীভূত ফিল্মের তো বিনাশ হয় নি। আমাদের জীবনরূপ চলচ্চিত্রের মূলস্বরূপ কি কিছু নেই? বিজ্ঞানী বলেন, আমরা যে লাল নীল প্রভৃতি রং দেখি তা দর্শনেন্দ্রিয়ের বিভ্রম মাত্র, আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের ভেদই আমাদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন রং বলে মনে হয়। সেই রকম বলা যেতে পারে যে মহাকাল একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, আমাদের মনের গুণে (বা দোষে)-ই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের ভেদজ্ঞান হয়। যা বর্তমান তারই অস্তিত্ব আছে, যা অতীত আর ভবিষ্যৎ তার অস্তিত্ব এখন নেই—এমন মনে করব কেন? সমস্তই সিনেমা-শিল্পের রীলের ন্যায় যুগপৎ বিদ্যমান, সমস্তই নিত্য; আমার মনের শক্তি সীমাবদ্ধ তাই কালকে খণ্ড খণ্ড করে উপলব্ধি করি। বহু পণ্ডিতের মতে দেশ ও কাল illusion বা অধ্যাস বা মায়া মাত্র।

একদেশসম্বন্ধ ছিন্ন হলে আবার তা স্থাপিত হতে পারে, সেইরকম এককালসম্বন্ধ কি পুনঃস্থাপিত হতে পাবে না? কালসমুদ্রে বিয়োজিত দুই কাষ্ঠের পুনর্মিলন কি অসম্ভব? যদি অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ সমস্তই একসঙ্গে বিদ্যমান থাকে তবে আপাতদৃষ্টিতে কালব্যবধান যতই থাকুক, এক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে আর এক ঘটনাপ্রবাহের পুনর্বার সংযোগ অসাধ্য নাও হতে পারে।

পনর-বিশ বৎসর পূর্বে J. W. Dunne কয়েকটি গ্রন্থ লেখেন—An Experiment with Time, The New Immortality, The Serial Universe ইত্যাদি। এইসকল গ্রন্থে তিনি কাল এবং সংবিৎ (consciousness) সম্বন্ধে এক নূতন মত প্রচার করেছেন এবং বলেছেন যে চেষ্টা করলে স্বপ্নযোগে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান বিষয় কিছু কিছু জানা যায়, অর্থাৎ অতীত বা ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে বর্তমান ব্যক্তিগত ঘটনাপ্রবাহের সংযোগ করা যায়।

তিনি অনেক যুক্তি দিয়ে এবং অঙ্ক কষে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন যে আমাদের সংবিৎ বা চেতনা চিরস্থায়ী, অর্থাৎ আমরা সকলেই অমর। উক্ত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হলে বিলাতের সুধীসমাজে প্রবল সাড়া পড়েছিল, খ্যাতনামা বহু সাহিত্যিক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, এবং অনেক বিজ্ঞানীও বলেছিলেন যে এই মত উপেক্ষার যোগ্য নয়। কিন্তু সাধারণের আগ্রহ বেশীদিন রইল না, এখন আর Dunne-এর নাম বড় একটা শোনা যায় না। সম্ভবত তাঁর নির্দেশিত উপায়ে যাঁরা পরীক্ষা করেছিলেন তাঁরা সন্তোষজনক ফল পান নি।

দিব্যদৃষ্টি আর ত্রিলোক-ত্রিকাল-দর্শিতার কথা পুরাণে আছে। Clairvoyance, telepathy, medium-এর মধ্যতায় মৃতজনের সঙ্গে আলাপ, ইত্যাদিতে আস্থাবান লোকেরও অভাব নেই। কিন্তু যুক্তিবাদী তত্ত্বান্বেষী মুখের কথায় বিশ্বাস করেন না, অতি সাধু লোকের সাক্ষ্যও অভ্রান্ত মনে করেন না। বাজিকর আর ভণ্ড লোকে অনেক অলৌকিক খেলা দেখাতে পারে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিজ্ঞানী উকিল জজ বা পুলিসের পক্ষেও তার রহস্যভেদ সুসাধ্য নয়। সম্প্রতি আমেরিকায় Rhine এবং ইংলাণ্ডে Soal প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানী অতীন্দ্রিয় সম্বন্ধে অভিনব উপায়ে পরীক্ষা করেছেন যাতে প্রতারণা অসম্ভব। এঁদের গবেষণার উপকরণ—কতকগুলি কার্ড, যাতে নানা রকমের চিহ্ন আঁকা আছে। এই কার্ডগুলি যন্ত্রের সাহায্যে একে একে একজন লোককে দেখানো হয় এবং দূরবর্তী অন্য ঘরে আর একজন লোক আন্দাজে সেই অদেখা কার্ডের বর্ণনা দেয়। অধিকাংশ স্থলে অনুমানে ভুল হয়, কিন্তু বহুবার বহু লোককে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কিছু কিছু মিলে যায়। সব মিলই আকস্মিক এমন বলা যায় না, কারণ, Probability বা সম্ভাবনা-গণিত অনুসারে আকস্মিক মিল যত হতে পারে তার চেয়ে বেশী মিল দেখা গেছে। এই পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে জনকতক লোকের অল্পাধিক মাত্রায় telepathy বা দূরবেদনের ক্ষমতা আছে এবং সম্ভবত সকল লোকেরই ঈষৎ মাত্রায় আছে। মাঝে মাঝে এমনও দেখা গেছে যে দ্বিতীয় লোকটি অন্য ঘরে প্রদর্শিত কার্ডের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কার্ড অনুমান করেছে, অর্থাৎ সে অতীত বা ভবিষ্যৎ দর্শন করেছে।

এইপ্রকার পরীক্ষায় যে ফল পাওয়া গেছে তা বৃহৎ নয়, কিন্তু নিরপেক্ষ পণ্ডিত-দের মতে তার গুরুত্ব আছে। পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে ইহকাল-পরকালের স্পষ্ট সম্বন্ধ কিছু দেখা যায় না, কিন্তু কয়েকজন দার্শনিক আর বিজ্ঞানী এই সামান্য প্রমাণ অবলম্বন করে দেশ-কাল-আত্মা সম্বন্ধে নানারকম সিদ্ধান্ত করেছেন, আবার অন্যে তাঁদের ভুলও দেখিয়েছেন। মানুষ বহুকাল থেকে আকাশে ডানা মেলে ওড়বার স্বপ্ন দেখেছে, চেষ্টা করতে গিয়ে বারবার বিফল হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন অঙ্ক কষে প্রমাণ করেছিলেন যে বাতাসের চেয়ে ভারী যন্ত্রে (অর্থাৎ এয়ারোপ্লেনে) মানুষ কখনও উড়তে পারবে না, কিন্তু তাঁর ভবিষ্যদ্-বাণী মিথ্যা হয়েছে। অতীন্দ্রিয় ব্যাপার নিয়ে সতর্ক গবেষণা সবে আরম্ভ হয়েছে, তা সফল হবে কি বিফল হবে এখনই বলা অসম্ভব। ভবিষ্যতে হয়ত অনেক আশ্চর্য বিষয় আবিষ্কৃত হবে; কিন্তু এখনই উৎফুল্ল হবার কারণ নেই।

১৩৫৫

# কবির জন্মদিনে

আজ যাঁকে জন্মদিন উপলক্ষ্যে স্মরণ করছি তাঁকে আমরা কবিবর বলি না, মহাকবিও বলি না, শুধুই কবি বলি, কারণ, যা যত বড় তার নাম ততই ছোট, যেমন দেশ কাল মন প্রাণ বিদ্যা বুদ্ধি। কবি শব্দের একটি প্রাচীন অর্থ—ক্রান্তদর্শী, অর্থাৎ যাঁর কাছে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্তই প্রকাশ পায়। এই অর্থ মনে রাখলে আর কোনও বিশেষণ যোগ করা দরকার হয় না।

রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে নিজেকে এতই অবিস্মরণীয় করে রেখে গেছেন যে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনার কখনও অন্ত হবে না। লোকে তাঁর কৃতির যে অংশ নিয়ে সাধারণত চর্চা করে তা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য। বাংলা পদ্য আর গদ্য রীতির যে পরিবর্তন মধুসূদন আর বঙ্কিমচন্দ্র আরম্ভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের হাতে তার পূর্ণ পরিণতি হয়েছে ; তাঁর জন্যই আমাদের মাতৃভাষা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠভাষার আসন পেয়েছে ; তিনি জগতের বিদ্বৎসমাজে ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন—এই সব কথাই বার বার আমাদের মনে উদয় হয়। সাহিত্য বললে আমরা যা বুঝি তা অত্যন্ত ব্যাপক এবং তার উপাদান অসংখ্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অসংখ্য উপাদানের মধ্যে একটির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলছি।

যে দেশে যে ধর্ম প্রচলিত তার প্রভাব সে দেশের সাহিত্যের উপর অবশ্যই পড়ে। বাংলা সাহিত্যের বদনাম শোনা যায় যে এ কেবল হিন্দুরই সাহিত্য, সুতরাং অহিন্দু বাঙালীর অনুপযুক্ত। ইংরেজী সাহিত্যের উপর খ্রীষ্টধর্ম ও বাইবেলের প্রভাব প্রচুর, তবুও তা সকল ধর্মাবলম্বী শিক্ষিত জনের প্রিয় হল কেন ? এর কারণ, ইউরোপীয় মধ্যযুগের অন্তে রেনেসাঁসের সময় পণ্ডিতগণ গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সংস্কৃতি আত্মসাৎ করেছিলেন, সমগ্র ইওরোপের ঐতিহ্যকেই তাঁরা নিজের বলে গণ্য করেছিলেন। গোঁড়া খ্রীষ্টান হয়েও তাঁরা অবাধে পেগান দেবদেবীর পুরাণকথাকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন, তাতে তাঁদের ধর্মহানি হয় নি। পিউরিটান হয়েও মিলটন গ্রীক বাগ্‌দেবীর বন্দনা করেছেন। কেবল ধর্মবিশ্বাস দ্বারা সাহিত্য শাসিত হয় না—এই ধারণা হয়তো খুব স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু ইওরোপের গুণী সমাজ বুঝেছিলেন যে জাতীয় সংস্কৃতির কথা সাহিত্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ, প্রাচীন ঐতিহ্য এবং সাহিত্যে তার উল্লেখ থাকলেই ধর্মবিশ্বাসের হানি হয় না। হয়তো অনেকে মনে করতেন যে পেগান ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে তো খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যও আছে, তাতেই প্রথমটির দোষ খণ্ডন হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্ত্য দেশে ধর্মের গোঁড়ামি অনেকটা কমে গেছে, তার ফলে শিক্ষিত সমাজ পেগান ও খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য সমদৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে।

আমাদের দেশে মধুসূদন খ্রীষ্টান হয়েও নির্ভয়ে পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবলম্বন করে কাব্য লিখেছিলেন। তিনি এই কাজ বিনা বাধায় করতে পেরেছিলেন, কারণ ধর্মান্তরিত হলেও পূর্বধর্মের প্রতি বিদ্বেষগ্রস্ত হন নি, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা সকলেই হিন্দু ছিলেন এবং তাঁর স্বধর্মীরা তাঁর রচনার কোন খবরই রাখতেন না। তারপর রবীন্দ্রনাথ এসে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে ভাল হ'ক

বা মন্দ হ'ক দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ফেলবার নয়, জাতীয় সভ্যতার ধারা বজায় রাখবার জন্য সাহিত্যে তাকে যথোচিত স্থান দিতে হবে, এবং স্থান দিলেই তার ফলে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস প্রশ্রয় পাবে এমন নয়। 'গোরা' গল্পের নায়কের মতে সমস্ত প্রাচীন সংস্কারই আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে এবং পানুবাবুর মতে সে সমস্তই বিষতুল্য বর্জনীয়। এই দু রকম গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠে উদার দৃষ্টিতে কি করে সাহিত্য রচনা করা যায় তা রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। তাঁকে বাঁ দিক আর ডান দিক থেকে বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনতে হয়েছে, কারণ সকল পাঠকের সাহিত্যিক উদার দৃষ্টি নেই।

ইউরোপীয় রাজনীতিকদের মুখে এখনও আমরা শুনতে পাই যে Christian ideal বা খ্রীষ্টীয় আদর্শ না মানলে কোন রাষ্ট্রের নিস্তার নেই। খ্রীষ্টধর্ম ছাড়াও যে মহৎ আদর্শ থাকতে পারে তা তাঁরা জানেন না, জানবার চেষ্টাও করেন না। সেই রকম এদেশের অনেকে মনে করেন যে সনাতনী বা ইসলামী আদর্শ নিয়েই সাহিত্য রচনা করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ পুরাণাদি প্রাচীন ঐতিহ্যকে উপযুক্ত স্থান দিয়েও সাহিত্যকে সাম্প্রদায়িক ধর্মের উপর টেনে এনেছেন এবং দেখিয়েছেন যে উৎকৃষ্ট ইউরোপীয় সাহিত্যের ন্যায় বাংলা সাহিত্যকেও সর্বজনীন অসাম্প্রদায়িক করা যায়। এই লক্ষণের ফলেই রবীন্দ্র-সাহিত্য অনেক অহিন্দু পাঠককে তৃপ্তি দিয়েছে। আশা করা যায়, এই পথে অগ্রসর হয়েই ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্য সর্ব সম্প্রদায়ের গ্রহণীয় হতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে আধুনিক ও যুক্তিবাদী, তথাপি তাঁর কাব্য নাটক আর গল্পে এদেশের প্রাচীন চিন্তাধারার সঙ্গে যোগসূত্র পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছেন। তিনি লোকব্যবহারেও যে অনুরূপ যোগসূত্র রেখেছিলেন তাঁর উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করব। রবীন্দ্রনাথ কীর্তি আর আভিজাত্যের গণ্ডি দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখেন নি, কোনও আলাপপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। তাঁর সাহিত্যের যাঁরা চর্চা করেন, দেশের জনসমষ্টির তুলনায় তাদের সংখ্যা খুব কম, তথাপি শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে অগণিত লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। আগন্তুকের সমস্ত সংকোচ একমুহূর্তে দূর করবার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ছিল। কার কোন্ বিষয়ে কতটুকু দৌড় তা বুঝে নিয়ে তিনি আলাপ করতে পারতেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত ছেলে বুড়ো সকলেই তাঁর সঙ্গে অবাধে মিশেছে, অনেক সময় উপদ্রবও করেছে। তাঁর কাছে ঘোমটাবতী পল্লীবধূরও জড়তা দূর হয়েছে, যেমন তীর্থস্থানে হয়। স্থান কাল পাত্র অনুসারে নিজেকে আবশ্যকমত প্রসারিত বা সংকুচিত করবার এই শক্তি তাঁর লোকপ্রিয়তার একটি কারণ। 'হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা'—এই কবিতায় তিনি অজ্ঞাতসারে নিজ স্বভাবের এক দিকের পরিচয় দিয়েছেন।

১৩৫৫

# বিলাতী খ্রীষ্টান ও ভারতীয় হিন্দু

ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর বিতর্কের প্রধান বিষয় ছিল ধর্মমত। রামমোহন বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত অনেক মনিষী পাদরীদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করেছিলেন। তার পর রাজনীতির চাপে ধর্মের সমালোচনা ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু ফ্যাশন ও রুচি নিরন্তর বদলায়, কালক্রমে পুরনো বিষয়ও রুচিকর বা কৌতূহলজনক হতে পারে। এই বিশ্বাসে আধুনিক বিলাতী খ্রীষ্টীয় সমাজের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু-সমাজের কিঞ্চিৎ তুলনা করছি। হিন্দুর সম্বন্ধে যা লিখছি তা প্রধানত বাঙালীর উদ্দেশ্যে হলেও অবাঙালী সম্বন্ধেও খাটে। সম্প্রতি 'হিন্দু' শব্দের অর্থ প্রসারিত হয়েছে—ভারত-জাত-ধর্মাবলম্বী সকলেই হিন্দু। এই প্রবন্ধে কেবল সনাতনপন্থী হিন্দু অর্থে 'হিন্দু' শব্দ প্রয়োগ করেছি।

রিলিজন শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নেই। হিন্দুধর্ম বললে যা বোঝায় তা রিলিজন নয়, কিন্তু বৈষ্ণব বা ব্রাহ্ম ধর্মকে রিলিজন বলা চলে। ক্রীড অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিশ্বাস বা মূলমন্ত্র না থাকলে রিলিজন হয় না। খ্রীষ্টধর্মের ক্রীড আছে, যথা—ট্রিনিটি বা ঈশ্বরের ত্রিত্ব, যিশুর অলৌকিক জন্ম, মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁর ক্রুসারোহণ, মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ, মানুষের পরিত্রাণের নিমিত্ত যিশুশরণের আবশ্যকতা, ইত্যাদিতে বিশ্বাস। ব্রাহ্মধর্মেরও ক্রীড আছে। অনেকে মনে করেন হিন্দুরও আছে, যথা—বেদ, জাতিভেদ, পুনর্জন্ম ও মূর্তিপূজায় আস্থা, খাদ্যাখাদ্য-বিচার, ইত্যাদি। কিন্তু এর একটিও হিন্দুত্বের সুনির্দিষ্ট বা অপরিহার্য লক্ষণ নয়। আমরা 'বেদবাক্য' বলি, কিন্তু তা কেবল কথার কথা। সাধারণ হিন্দু বেদের কোনও খবরই রাখে না, সুতরাং বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে না। আজকাল জাতিভেদ পুনর্জন্ম প্রভৃতি না মানলেও হিন্দুত্বের হানি হয় না। যে নিজেকে হিন্দু বলে, দু-একটি নৈমিত্তিক কর্ম (যেমন শ্রাদ্ধ) সনাতন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে এবং যার সঙ্গে হিন্দু নামে খ্যাত অন্যান্য লোকের অল্পাধিক সামাজিক সম্বন্ধ থাকে সেই হিন্দু। আচার ব্যবহার হিন্দুর লক্ষণ নয়। নিত্য নিষিদ্ধ খাদ্য খেলে, বিজাতীয় পোশাক পরলে, সিভিল বিবাহ বা মেম বিবাহ করলে, এবং সম্পূর্ণ নাস্তিক হলেও হিন্দুত্ব বজায় থাকে।

বিলাতের (ব্রিটেনের) অধিকাংশ লোক খ্রীষ্টধর্মের দুই শাখার অন্তর্ভুক্ত—প্রোটেস্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক। প্রথম শাখার লোকই বেশী, কিন্তু তাঁদের মধ্যেও নানা সম্প্রদায় আছে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র চার্চ বা ধর্মসংঘ আছে। সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী সংঘ চার্চ অভ ইংলাণ্ড। বিভিন্ন প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের ক্রীডের প্রধান অংশ এক হলেও খুঁটিনাটি নিয়ে বিবাদ আছে; সেজন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গির্জা আলাদা, পাদরী-নিয়োগের পদ্ধতিও আলাদা। কিন্তু ধর্মসংঘের অন্তর্গত এবং ধর্মকর্মে পোপের শাসনই চূড়ান্ত বলে মানে॥

ব্রিটিশ রাজ্যে সকল ধর্মাবলম্বী নানা বিষয়ে সমান অধিকার ভোগ করলেও চার্চ অভ ইংলান্ডের প্রতি কিছু পক্ষপাত করা হয়। পূর্বে এই সংঘ যে সরকারী অর্থসাহায্য পেত তা এখন বন্ধ হয়েছে, কিন্তু সংঘের সম্পত্তি নানাপ্রকার কর থেকে মুক্ত। চার্চ অভ ইংলান্ডের অনেক বিশপ হাউস অভ লর্ড্স-এ সদস্যরূপে আসন পান। ব্রিটেনকে লোকায়াত রাষ্ট্র বা secular state বলা চলে না, অন্তত ভারতের সংবিধানে যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্বীকৃত হয়েছে বিলাত তেমন নয়। বিলাতের রাজাই চার্চ অভ ইংলান্ডের প্রধান, তাঁর অন্যতম উপাধি Defender of the Faith। পাকিস্তানী নেতারা যেমন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ইসলামী নীতির প্রতিষ্ঠা চান, ব্রিটিশ নেতারাও তেমনি বলে থাকেন যে Christian ideal না মানলে রাষ্ট্রের মঙ্গল নেই। বিলাতী রেডিওতে প্রত্যহ যে ধর্মকথা প্রচারিত হয় তা প্রধানত প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টধর্ম, ক্যাথলিক প্রভৃতি সম্প্রদায় বিশেষ প্রশ্রয় পান না। কয়েক বৎসর থেকে নাস্তিক, অজ্ঞাবাদী (agnostic) ও যুক্তিবাদী (rationalist) সম্প্রদায় তর্ক করেছেন যে ব্রিটিশ প্রজা কেবল প্রোটেস্টান্ট নয়, কেবল খ্রীষ্টানও নয়। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নানা সম্প্রদায় বিলাতে বাস করে, তারা নিজ নিজ মত প্রচারের অধিকার পাবে না কেন? প্রবল আন্দোলনের ফলে কর্তারা নিতান্ত অনিচ্ছায় অখ্রীষ্টান যুক্তিবাদী সম্প্রদায়কেও কিছু কিছু প্রচারের অধিকার সম্প্রতি দিয়েছেন। পাদরীরা তাতে মোটেই খুশী হন নি।

কয়েক বৎসর পূর্বেও বিলাতে রবিবারে থিয়েটার সিনেমা বল-নাচ ফুটবল ম্যাচ প্রভৃতি নিষিদ্ধ ছিল, পাছে ওই দিনের পবিত্রটা নষ্ট হয়। গত যুদ্ধে সৈন্যদের আবদারের ফলে এই নিয়মের কড়াকড়ি এখন অনেকটা কমেছে। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পাদরী বাহাল থাকেন, সপ্তাহে একদিন উপাসনায় যোগ দেওয়া ও ধর্মকথা শোনা সৈন্যদের অবশ্যকর্তব্য। অবিশ্বাসী সৈন্যরা নিষ্কৃতি পেতে পারে, কিন্তু তাতে অনেক বাধা। সম্প্রতি বিলাতের সমস্ত বিদ্যালয়ে নিয়মিত ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। যে শিক্ষক খ্রীষ্টধর্মে নিষ্ঠাহীন অথবা যিনি নিষ্ঠার ভান করতে পারেন না তাঁর চাকরির আশা অল্প।

বিলাতে খ্রীষ্টধর্ম রক্ষার জন্য যে সুনিয়ন্ত্রিত প্রবল চেষ্টা এবং নিষ্ঠাবান জনসাধারণের উৎসাহ দেখা যায়, ভারতের হিন্দুধর্মের জন্য সেরকম কিছু নেই। এদেশের গুরু ও পুরোহিতের সঙ্গে কতকটা মিল থাকলেও বিলাতী পাদরীদের প্রভাব আরও বেশী ও ব্যাপক। চার্চ অভ ইংলান্ড, স্কটিশ চার্চ এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী। এইসকল ধর্মসংঘের কর্তৃত্বেই পাদরীদের শিক্ষা, নিয়োগ, বদলি, শাসন, পদোন্নতি এবং বেতনের ব্যবস্থা হয়।

এদেশে ব্রাহ্মদের একাধিক সমাজ আছে, প্রত্যেক ব্রাহ্ম বলতে পারেন যে তিনি অমুক সমাজের। এই বিষয়ে ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টানের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সনাতনপন্থী হিন্দুর পৃথক পৃথক সমাজ বা ধর্মসংঘ নেই। মঠ অনেক আছে, মঠের সম্পত্তি এবং উপাসকেরও অভাব নেই, কিন্তু মঠের নাম অনুসারে গৃহস্থ হিন্দুর সাম্প্রদায়িক পরিচয় দেবার রীতি নেই। মঠ ও চার্চ একজাতীয় সংঘ নয়। এদেশের গুরু ও পুরোহিতদের আর্থিক অবস্থা যেমনই হ'ক, তাঁরা স্বাধীন, কোনও সংঘের শাসন তাঁদের মানতে হয় না।

ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে বাঙালী হিন্দুর পক্ষে আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে উদাসীন হওয় সহজ ছিল না। পইতা না-থাকা এবং সন্ধ্যাবন্দনা না-করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত গণ্য হত। অব্রাহ্মণকেও নানা রকমে অনুষ্ঠান পালন করতে হত। প্রকাশ্যে মুরগি খাওয়া চলত না, কিন্তু মদ খাওয়া মার্জনীয় ছিল। কুলগুরু এবং পুরোহিত-দের প্রতিপত্তি এখনকার চেয়ে বেশী ছিল, কিন্তু মঠধারী বা সন্ন্যাসী গুরুর বাহুল্য ছিল না। কালক্রমে হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ক্রিয়াকর্ম ছাড়া হিন্দুকে কোনও কালেই কোন রকম ক্রীড মানতে হয় নি এবং আজকাল অনেক অনুষ্ঠানও বর্জন করা চলে। যিশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের একজাত পুত্র—এ কথা আধুনিক খ্রীষ্টানকেও মানতে হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম বা বিষ্ণুর অংশ, কিংবা শুধুই মানুষ বা কাল্পনিক পুরুষ—আধুনিক হিন্দু যেমন ইচ্ছা বিশ্বাস করতে পারে।

সেকালের তুলনায় একালের হিন্দুর অনেক অন্ধ সংস্কার দূর হয়েছে, কিন্তু এখনও যা আছে তা পর্বতপ্রমাণ। অনেক সুশিক্ষিত হিন্দু ফলিত জ্যোতিষ ও মাদুলি-কবচে বিশ্বাস করে, তার প্রমাণ নিত্য নূতন নূতন রাজজ্যোতিষীর অভ্যুত্থান এবং খবরের কাগজে তাঁদের বড় বড় বিজ্ঞাপন। স্বামী, বাবা, ঠাকুর ইত্যাদি উপাধিধারী অনেক মন্ত্রদাতা গুরুর উদ্ভব হয়েছে, এঁদের শিষ্যও অসংখ্য। এই শিষ্যরা কেবল ধর্মকামনায় বা পারমার্থিক জ্ঞানলাভের জন্য অথবা শোকদুঃখে সান্ত্বনার জন্য গুরুবরণ করেন না ; অনেকে বিশ্বাস করেন যে তাঁদের চাকরির উন্নতি, ভাল জায়গায় বদলি এবং রোগের নিবৃত্তিও গুরুর অলৌকিক শক্তিবলে সাধিত হবে। সব রকম সাংসারিক সংকটে তাঁরা গুরুর উপর নির্ভর করে থাকেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশেও, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কিছু কিছু গুরুর প্রভাব আছে, কিন্তু এখানকার মত ব্যাপক নয়। ব্রিটেন ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে ভাগ্যগণনা ও মাদুলি-কবচের ব্যবসায় প্রতারণারূপে গণ্য এবং আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। কিন্তু আস্থাবান লোক সেখানেও কিছু আছে ; তাদের জন্য গোপনে এই সকল ব্যবসায় চলে। মোটের উপর বলা যেতে পারে যে এদেশের শিক্ষিত সমাজের অন্ধ বিশ্বাস বিলাতী শিক্ষিত সমাজের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু হিন্দুর সৌভাগ্য এই যে, ক্রীডের বন্ধন থেকে সে চিরকাল মুক্ত।

অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে এডোআর্ড গিবন তাঁর বিখ্যাত রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস রচনা করেন। এই গ্রন্থে এক স্থানে তিনি লিখেছেন—

The various modes of worship which prevailed in the Roman world were all considered by the people as equally true, by the philosopher as equally false and by the magistrate as equally useful. And thus toleration produced not only mutual indulgence, but even religious concord.... The philosophers of antiquity...viewing with a smile of pity and indulgence the various errors of the vulgar, prac-tised the ceremonies of their fathers, devoutly frequented the temples of the gods ; and sometimes condescending

to act a part on the theatre of superstition, they concealed the sentiments of an atheist under the sacredotal robes Reasoners of such a temper were scarcely inclined to wrangle about their respective modes of faith or worship. It was indifferent to them what shape the folly of the multitude might choose to assume; and they approached with the same external reverence the altars of the Libyan, the Olympian or the Capitoline Jupiter.

প্রাচীন রোমান ফিলসফারদের ধর্মমত সম্বন্ধে গিবন যা লিখেছেন তা অসংখ্য আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুর সম্বন্ধেও খাটে। এই মিলের কারণ রোমান ও হিন্দু নাগরিক দুইই পেগান ও ক্রীডশূন্য। সাধারণত দেখা যায়, পৌরুষেয় অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের প্রবর্তিত ধর্মই ক্রীডের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ জৈন খ্রীষ্টান মুসলমান ও শিখ ধর্মে ক্রীড আছে। কিন্তু অপৌরুষের ধর্ম, যেমন গ্রীক ও রোমানদের পেগান ধর্ম এবং সনাতন হিন্দুধর্ম ক্রীডবর্জিত। যারা তেত্রিশ বা তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা করে এবং সেই সংগে এক পরমাত্মাকে মানতেও যাদের বাধে না, তারা সহজেই মাঝে মাঝে পুরাতন দেবতা বর্জন এবং নূতন দেবতা গ্রহণ করতে পারে। অন্য ধর্মের প্রতি তাদের আক্রোশও থাকে না। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি এখন আর পূজা পান না, কিন্তু শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ দেবতার আসন পেয়েছেন, ভারতমাতা ও বঙ্গমাতাও দেবতারূপে গণ্য হয়েছেন। রূপকের আশ্রয়ে জন্মভূমিকে দুর্গা কমলা ও বাণীর সঙ্গে একীভূত কল্পনা করা হিন্দুর পক্ষে সহজ, কিন্তু একেশ্বরপূজকের তা ক্রীডবিরুদ্ধ। এই কারণেই 'বন্দে মাতরম' অন্যতম জাতীয়সংগীতরূপে গণ্য হয়নি, লোক ভোলাবার জন্য তাকে সমান মর্যদা দেওয়া হয়েছে। বহু আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু বকরিদের খাসির মাংস অথবা খ্রীষ্টান ইউকারিস্ট সংস্কারে নিবেদিত রুটির টুকরো পেলে বিনা দ্বিধায় খেতে পারেন, কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে এসকল বস্তু খাদ্য মাত্র। কিন্তু খ্রীষ্টান মুসলমান এবং গোঁড়া ব্রাহ্মর পক্ষে হিন্দু দেবতার প্রসাদ খাওয়া সহজ নয়, তাঁরা মনে করেন এ প্রকার খাদ্যে পৌত্তলিক বিষ আছে, খেলে আত্মা ব্যাধিগ্রস্ত হবে।

মধ্যযুগের ইওরোপে দার্শনিক ও প্রাকৃতিক বিষয় সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচলিত ছিল তার ভিত্তি বাইবেল এবং আরিস্টটল প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত। এই অদ্ভুত সমন্বয়ের বিরুদ্ধে কোন খ্রীষ্টান কিছু বললে তার প্রাণ-সংশয় হত। ষোড়শ শতাব্দে ভিয়েনা নগরে সের্ভেটস নামে এক শারীরবিজ্ঞানী ছিলেন। হৃৎপিণ্ডে রক্তের গতি সম্বন্ধে তিনি প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে লেখেন। তাঁর আরও গুরুতর অপরাধ—বাইবেলে জুডিয়া প্রদেশের যে বর্ণনা আছে তার প্রতিবাদে তিনি বলেন, জুডিয়ায় দুগ্ধমধুর স্রোত বয় না, এ স্থান মরুভূমির তুল্য। এ প্রকার শাস্ত্রবিরুদ্ধ উক্তির জন্য তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়। সূর্য ঘোরে না, পৃথিবীই ঘোরে—এই মত প্রকাশের জন্য গ্যালিলিওকে কারাগারে যেতে হয়েছিল, অবশেষে তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় অন্যরকম লিখে অতি কষ্টে মুক্তি পেয়েছিলেন।
আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রে পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, যেমন—সূর্য

পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করে, বাসুকি বা দিগ্‌গজগণের মস্তকের উপর পৃথিবী আছে, ইত্যাদি। ষষ্ঠ শতাব্দে আর্যভট্ট বলেছেন, পৃথিবীই আবর্তন করে। দ্বাদশ শতাব্দে ভাস্করাচার্য বলেছেন, পৃথিবীর যদি কোন মূর্তিবিশিষ্ট আধার থাকত তবে সেই আধারের জন্য অন্য আধার এবং পর পর অসংখ্য আধার আবশ্যক হত; পৃথিবী নিজের শক্তিতেই আকাশে আছে। আর্যভট্ট ও ভাস্করাচার্য ক্রীডহীন হিন্দুসমাজে জন্মেছিলেন তাই শাস্ত্রবিরুদ্ধ উক্তির জন্য তাঁদের পুড়ে মরতে হয় নি।

বাইবেলের মতে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে জগতের সৃষ্টি হয়েছিল এবং ঈশ্বর ছ দিনের মধ্যে আকাশ ভূমি পর্বত এবং সর্বপ্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে ভূবিজ্ঞানী লায়েল তাঁর গ্রন্থে লিখলেন যে পৃথিবীর বয়স বহু কোটি বৎসর। কিছুকাল পরে ডারউইন প্রচার করলেন যে বহুকালব্যাপী ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে পূর্বতন জীব থেকে নব নব জীবের উৎপত্তি হয়েছে। লায়েল ও ডারউইনের উক্তিতে সর্ব শ্রেণীর খ্রীষ্টান (মায় বিলাতের প্রধান মন্ত্রী গ্লাডস্টোন) খেপে উঠলেন। তখন পাষণ্ডদের পোড়াবার রীতি উঠে গিয়েছিল, তাই লায়েল ডারউইন ও তাঁদের শিষ্যরা বেঁচে গেলেন। তার পর বহু বিজ্ঞানীর চেষ্টার ফলে নূতন মত সুপ্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এখনও পাশ্চাত্ত্য দেশে মান্যগণ্য বাইবেল-বিশ্বাসী অনেক আছেন যাঁরা আধুনিক ভূবিদ্যা ও অভিব্যক্তিবাদ মানেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং নিউজিল্যাণ্ডের কয়েকটি স্থানে বিদ্যালয়ে বাইবেল-বিরুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ।

আমাদের শাস্ত্রে জগৎ ও জীবের উৎপত্তি বিষয়ক অনেক কথা আছে। এদেশের কোনও গোঁড়া হিন্দু আবদার করেন নি যে স্কুল-কলেজে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিজ্ঞান শেখানো বন্ধ করতে হবে। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে ব্যবহারে হিন্দু উদারতা দেখায় নি, তার ফলে তাকে অনেক দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু ধর্মের মার্গবিচারে বা পারমার্থিক বিষয়ে তার বুদ্ধি সংকীর্ণ নয়, যত মত তত পথ— এই সত্য তার জানা আছে, সেজন্য বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম-মতের বিরোধ অসম্ভব।

নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টানের সংখ্যা বিলাতে ক্রমশ কমছে। পাদরীরা খেদ করছেন যে গির্জায় পূর্বের মত লোকসমাগম হয় না, প্রতি বৎসরেই উপাসকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বহু শিক্ষিত লোক এখন কেবল নামেই খ্রীষ্টান, তাঁরা খ্রীষ্টীয় ক্রীড এবং বাইবেল-বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাবলীর উপর আস্থা হারিয়েছেন। অনেকে বুঝেছেন যে খ্রীষ্টের উপদেশে এমন কিছু নেই যে তাঁর পূর্বে আর কেউ বলেন নি, এবং যে সদ্‌গুণাবলীকে খ্রীষ্টীয় আদর্শ বলা হয় তা খ্রীষ্টধর্মের একচেটে নয়। অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী দার্শনিক ও সাহিত্যিক স্পষ্টভাবে খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করেছেন। বাইবেল-ব্যাখ্যায় অনেক পাদরী এখন রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। কেউ কেউ সাহস করে বলছেন যে ক্রীডে অলৌকিক ও যুক্তিবিরুদ্ধ যা আছে তা বর্জন না করলে খ্রীষ্টধর্ম রক্ষা পাবে না। কিন্তু সনাতনপন্থী খ্রীষ্টানদের প্রতিপত্তি ক্রমশ কমে এলেও এখনও খুব আছে। সেণ্ট পল ক্যাথিড্রালের ডীন ইংগের উদার মতের জন্য তাঁর অনেক ভক্ত হয়েছে, কিন্তু গোঁড়ার দল তাঁর উপর খুশী নয়। বার্মিংহামের বিশপ বার্নিজ তাঁর গ্রন্থে ক্রীড সম্বন্ধে অনেক তীক্ষ্ন ও অপ্রিয় কথা লিখেছেন। এঁরা প্রতিষ্ঠাশালী লোক, নয়তো চার্চ অভ ইংলাণ্ডের কর্তারা এঁদের পদচ্যুত করতেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি সাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্য আজকাল

বিলাতে প্রবল চেষ্টা হচ্ছে এবং অর্থব্যয়ও প্রচুর হচ্ছে। কিন্তু ফল বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না।

গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অন্যান্য ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ দুটি রাজনীতিক ধর্মের উদ্ভব হয়েছে—কমিউনিজম ও নাৎসিবাদ। এই দুই ধর্মে দেবতার প্রয়োজন নেই, ক্রীডই সর্বস্ব। মধ্যযুগের ধর্মান্ধ খ্রীষ্টান ও মুসলমানের সঙ্গে অনেক কমিউনিস্ট ও নাৎসির সাদৃশ্য দেখা যায়। নাৎসিবাদ এখন মৃতপ্রায়, কিন্তু কমিউনিজম অন্য সকল ধর্মকে কালক্রমে গ্রাস করবে এমন সম্ভাবনা আছে। এর প্রতিকারের জন্য নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায় উঠে পড়ে লেগেছেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশ বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক সভ্যতার শীর্ষে অবস্থিত। আমাদের তুলনায় ব্রিটিশ প্রভৃতি উন্নত জাতির অন্ধ সংস্কার অত্যন্ত অল্প। তথাপি ধর্মের মার্গবিচারে পাশ্চাত্ত্য বুদ্ধি এখনও বাধামুক্ত হয় নি। বিজ্ঞানের সংগে সাধারণ ভারতবাসীর পরিচয় নগণ্য, আমাদের যান্ত্রিক ঐশ্বর্য অতি অল্প, সংস্কারেরও অন্ত নেই। কিন্তু ভারতের ধর্মবুদ্ধি নিগড়বদ্ধ নয়। এদেশের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে যে নৈতিক দার্শনিক পারমার্থিক তত্ত্ব আছে তাতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই, প্রত্যেক হিন্দু নিজের রুচি অনুসারে ধর্মমত গঠন করতে পারে। কোন চার্চ বা সংঘ তার উপর চাপ দিয়ে বলে না—দশ অবতার তোমাকে মানতেই হবে, গায়ত্রী জপতেই হবে, শিবরাত্রিতে উপবাস করতেই হবে, নতুবা তোমার হিন্দুত্ব বজায় থাকবে না।

ধর্মবুদ্ধির এই স্বাধীনতা—যা ক্রীডধারী খ্রীষ্টান প্রভৃতির নেই, এতে হিন্দুর কোন্ উপকার হয়েছে? বিশেষ কিছুই হয় নি। কালিদাস বলেছেন, গুণসন্নিপাতে একটিমাত্র দোষ ঢেকে যায়। এর বিপরীতও সত্য—রাশি রাশি ত্রুটি থাকলে একটি মহৎগুণ নিষ্ফল হয়ে যায়। হিন্দু যদি তার ত্রুটির বোঝা কমাতে পারে তবে তার স্বাধীন উদার ধর্মবুদ্ধি স্ফূর্তিলাভ করবে, তার ফলে একদিন হয়তো সে দ্বন্দ্বহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উপায় খুঁজে পাবে—অনুদার ক্রীডশ্রয়ী ধর্ম বা ক্রীডসর্বস্ব রাজনীতিক ধর্মের পক্ষে যা অসম্ভব।

১৩৫৭

# ভেজাল ও নকল

নন্দ গোয়ালা দুধে খুব জল দিচ্ছে। আপত্তি জানালে আকাশ থেকে পড়ে উত্তর দিলে, বলেন কি বাবু, আপনি পুরনো খদ্দের, আপনাকে কি ঠকাতে পারি? পাপ হবে যে।

বললাম, দেখ নন্দ, দুধে অল্প স্বল্প জল থাকলে আমি কিছুই বলি না, কিন্তু এখন বাড়াবাড়ি হচ্ছে। তোমার সঙ্গে আমার বহু কালের সম্পর্ক। সত্যি কথা বলে ফেল।

নন্দ লোকটি সজ্জন। মাথা চুলকে বললে, আজ্ঞে, সের পিছু মোটে আধ পো জল দিই, পরিষ্কার কলের জল। আমার কাছে তঞ্চকতা পাবেন না।

—নন্দ, আর একটু সত্যি করে বল।

—আজ্ঞে এক পোর বেশী জল কোন দিন দিই না, আমার এই গলার কণ্ঠির দিব্যি।

এবারে বোধ হল নন্দ সত্য কথা বলেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, একেবারে খাঁটী দুধ কি দরে দিতে পার?

—আজ্ঞে, টাকায় তিন পো দিতে পারি।

—বরাবর খাঁটী দেবে তো? হাত সুড়সুড় করবে না?

—তা কি বলা যায় হুজুর? মাঝে মাঝে একটু জল না দিলে চলবে কেন, গরীব লোক।

—আচ্ছা, যদি সরকার আইন করে দেয় যে দুধের দাম যত খুশি বাড়াতে পার কিন্তু জল একদম দিতে পাবে না, দিলে মোটা জরিমানা বা জেল হবে, তা হলে কি করবে?

—তা হলে ভালই হবে বাবু। টাকায় আধ সের বেচব, আমাদের লাভ বাড়বে।

—কিন্তু নামজাদা ডেয়ারীর খাঁটী দুধ তো টাকায় এক সের পাওয়া যায়।

অবজ্ঞার হাসি হেসে নন্দ বললে, খাঁটী কোথায়, মোষের দুধ জল মিশিয়ে দেয়।

—আচ্ছা, টাকায় আধ সের হলে তুমি আর জল মেশাবে না তো?

নন্দ ঘাড় নীচু করে হাসতে লাগল।

—মনের কথা বলে ফেল নন্দ।

—তবে বলি শুনুন বাবু। সুবিধে মতন জল দিতেই হবে, এ হল ব্যবসার দস্তুর। আবার ইনস্পেক্টারকে খাওয়াতে হবে, মাঝে মাঝে জরিমানাও দিতে হবে। ছা-পোষা গরীব মানুষ, এ সব খরচ যোগাতে হবে তো?

এইবারে ব্যাপারটি বোধগম্য হল। ব্যবসার দস্তুর অনুসারে গোয়ালা সনাতন প্রথায় যথাসম্ভব জল দেবেই। যতই ইনস্পেক্টার থাকুক, শহরের সমস্ত দুধ পরীক্ষা করা অসাধ্য। অবশ্য মাঝে মাঝে ভেজাল ধরা পড়বে, তখন ইনস্পেক্টারকে খুশী করতে হবে, সে বিমুখ হলে জরিমানাও দিতে হবে। অতএব এইসব সম্ভাব্য ক্ষতি-

প‍ূরণের জন্যে আরও জল দিতে হবে। দাম বাড়ালে বা আইন করলে বা অনেক ইনস্পেক্টার রাখলেও সর্বদা নির্জল দ‍ুধ মিলবে না। কয়েকজন ভাগ্যবান যাঁরা নিজের চোখের সামনে দ‍ুইয়ে নিতে পারেন তাঁদের কথা আলাদা।

শিউরাম পাঁড়ে এক কালে আমার বাড়িতে রাঁধত, এখন স্বাধীন ব্যবসা করে। একদিন একটা টিন এনে বললে, বাব‍ু, বঢ়িয়া ভ‍ঁইসা ঘিউ আনিয়েসি, সস্তা আছে, ছ টাকা সের, লিয়ে লিন।

ঘি খ‍ুব সাদা, শক্ত, একট‍ু গন্ধও আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, ভেজাল কতটা দিয়েছ?

—বনস্পতি? আরে রাম রাম।

—দেখ পাঁড়ে, তোমার টিকি আছে, জনেউ আছে, গলায় র‍ুদ্রাক্ষের মালা আর কপালে তিলকও আছে। মিথ্যা ব'লো না, পাপ হবে।

শিউরাম সহাস্যে বললে, গাঁওসে আনিয়েসি, গোয়ালা কি করিয়েসে সে তো মাল‍ুম নহি। বাকী সে ভালা আদমী, সেরে আধ পোয়ার বেশী মিশাবে না।

—তার পর তুমি কত মিশিয়েছ?

—সচ বাত বলছি বাব‍ু, হামি সেরে এক পোয়া মিশিয়েছি।

—চেহারা আর গন্ধ দেখে মনে হচ্ছে সেরে সাড়ে তিন পোয়ার বেশী ভেজাল আছে। এ রকম ঘি আমি নিজেই বানিয়ে নিতে পারি, তাতে সওয়া তিন টাকায় এক সের হবে।

—এ ছিয়া ছিয়া! আপনে ভেজাল ঘি বানাবেন?

—দোষ কি, বেচব না তো। সজ্ঞানে নিজেরাই খাব।

দুধ-ঘিএর কালোবাজার নেই, ভেজাল দিয়েই লাভ করতে হয়। নকল দ‍ুধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি তাই যথাসম্ভব জল মেশানো হয়। ঘিএর নকল আছে, কিন্তু শিউরাম পাঁড়ের বিদ্যা কম, তার ভেজাল সহজেই বোঝা যায়, স্বাভাবিক ঘিএর মতন রং নয়, বেশী জমাট, গন্ধ অতি কম। সেকালে যখন চর্বির ভেজাল চলত তখন চেহারা আর গন্ধ খাঁটী ভ‍ঁইসা ঘিএর সঙ্গে অনেকটা মিলত। আজকাল ওস্তাদ ঘি-ব্যবসায়ীরা একট‍ু নরম ঘনতেল (hydrogenated oil) কিনে তাতে ঈষৎ হলদে রং এবং রাসায়নিক গন্ধ মিশিয়ে বেচে। ঘিএর এসেন্স বাজারে খোঁজ করলেই পাওয়া যায়। তার গন্ধ অতি তীব্র, একট‍ু পচা ঘিএর মতন, এক সেরে কয়েক ফোঁটা দিলেই সাধারণ ক্রেতাকে ঠকানো যায়। সরষের তেলের এসেন্স আরও ভাল, রাই সরষের মতন প্রচণ্ড ঝাঁজ। চীনাবাদাম তিল তিসি—যে তেল যখন সস্তা, তাতে অতি অল্প এসেন্স দিলেই কাজ চলে। যাদের সাহস বেশী আরও সস্তায় সারে, অপাচ্য প্যারাফিন বা মিনারল অয়েলে অল্প গন্ধ দিয়ে বেচে। সরষের সঙ্গে শেয়ালকাঁটা বীজের মিশ্রণ সম্ভবত ইচ্ছাকৃত নয়।

মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখা যায় ভেজাল ঘি তেল বেচার জন্য আদালতে অম‍ুক অম‍ুক লোকের জরিমানা হয়েছে। যাদের নাম ছাপা হয় তারা প্রায় অখ্যাত দোকানদার। যারা বড় কারবারী তারা কদাচিৎ দণ্ড পেলেও তাদের নাম প্রকাশিত

হয় না, রিপোর্টারদের ঠাণ্ডা করতে তারা জানে। যদি সমস্ত দণ্ডিত লোকের নাম সরকারী বিজ্ঞাপনে নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করা হয়, তবে বদনাম আর খরিদ্দার হারাবার ভয়ে ভেজাল-কারবারীরা কতকটা শাসিত হতে পারে। সরকারী কর্তারা যদি এইটুকু ব্যবস্থাও না করতে পারেন তবে লোকে তাদেরও সন্দেহ করবে।

রেশনে* যে বিদেশী ময়দা পাওয়া যায় তা আমাদের চিরপরিচিত ময়দার সঙ্গে মেলে না, লুচি বেলবার সময় রবারের মতন টান হয়। এই স্থিতিস্থাপকতা কি কানাডা-অস্ট্রেলিয়ার ময়দার স্বাভাবিক ধর্ম, না কিছু মেশানোর জন্য? সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করা কর্তাদের উচিত। আটা কি শুধু গম যবের মিশ্র থেকে তৈরী হয়, না অন্য শস্যও তাতে থাকে? রেশনের আটায় ভুসির পরিমাণ অত্যধিক। কোথা থেকে তা আসে? চালের সঙ্গে অনেক সময় এত পাথরকুচি আর ভুসি পাওয়া যায় যে তাকে স্বাভাবিক বলা চলে না। এই ভেজাল কোথায় দেওয়া হয় তার খবর সরকারী কর্তারা নিশ্চয় রাখেন। তাঁরা কি প্রতিকারে অসমর্থ, না ওজন বাড়াবার জন্যই ভেজালে আপত্তি করেন না? অনেক রেশনের দোকানে ভাল চালের বস্তা আড়ালে থাকে, বাছা বাছা খদ্দেরকে দেওয়া হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও আটার কলে বিস্তর সোপ-স্টোন পাওয়া গিয়েছিল, কয়েক গাড়ি তেঁতুলবিচিও একবার আটক করা হয়েছিল। এই সব খবর সাড়ম্বরে খবরের কাগজে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তার পরেই চুপ। অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করলে কি ক্ষতি হয়? গুজবের উপর জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস। ছেলে-ধরা, শিল-নোড়ার বসন্ত রোগ, কেরোসিন তেলে জল, কলের জলে সাপ, প্রভৃতি নানারকম গুজবে লোকে খেপে ওঠে। খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণকে নিশ্চিন্ত করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

নিত্য ব্যবহার্য বহু জিনিসের ভেজাল বা নকল দেখা যায়। অসময়ে বাজারে স্তূপাকার সবুজ মটরের দানা বিক্রি হয়। শুখনো মটর সবুজ রঙে চুবিয়ে বস্তা-বন্দী করা হয়। পাইকাররা সেই রঙিন মটর আড়ত থেকে কেনে এবং দরকার মতন জলে ভিজিয়ে বিক্রি করে। অজ্ঞ লোকে তা কাঁচা মটরশুঁটির দানা মনে করে কেনে। যে রং দেওয়া হয় তা বিষ কি অবিষ কেউ ভাবে না। মিউনিসিপালিটি উদাসীন, মার্কেটে অধ্যক্ষদের সামনেই এই অপবস্তু বিক্রি হয়। মিষ্টান্নেও নানা-রকম রং থাকে, তা নির্দোষ কিনা দেখা হয় না। ময়রাকে যদি বলা হয়—রং দাও কেন? সে উত্তর দেয়—খদ্দের যে রং না থাকলে কেনে না। কথাটা সত্য নয়। রঙের প্রচলন ময়রার বুদ্ধিতেই হয়েছে। নির্বোধ খদ্দের মনে করে রং থাকাটাই দস্তুর বা ফ্যাশন-সংগত। পাশ্চাত্ত্য দেশে খাদ্যের জন্য বিশেষ বিশেষ নির্দোষ রঙের বিধান আছে, অন্য রং দিলে দণ্ড হয়। এদেশে যত দিন তেমন ব্যবস্থা না হয় তত দিন খাবারে রং দেওয়া একেবারে বন্ধ করা কর্তব্য। সরকারী আর মিউনিসিপাল কর্তাদের উচিত বার বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে সাধারণকে সতর্ক করা।

চায়ের দোকানে এবং হোটেলে যে চায়ের ছিবড়ে জমা হয় তা শুখিয়ে অন্য চায়ের সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হয়। এলাচ লবঙ্গ দারচিনি থেকে অল্পাধিক আরক

* রেশন ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার সময় লিখিত।

(essential oil) বার করে নেবার পর বাজারে ছাড়া হয়। সব চেয়ে বেশী ভেজাল আর নকল চলছে ঔষধে। কুইনিন এমেটিন অ্যাড্রেনালিন প্রভৃতির লেবেল দেওয়া জাল ঔষধে বাজার ছেয়ে গেছে। শিশি-বোতল-ওয়ালারা বিখ্যাত দেশী ও বিলাতী ঔষধ এবং প্রসাধন দ্রব্যের খালি শিশি ও টিন বেশী দাম দিয়ে গৃহস্থের বাড়ি থেকে কেনে, জালকারী তাতেই ছাইভস্ম পুরে বিক্রি করে। অনেক গৃহস্থ জেনে শুনে এই পাপ ব্যবসায়ে সাহায্য করে। পাকিস্তানেও এই কারবার অবাধে চলছে।

ভেজাল ও নকল এ দেশে নূতন নয়। দেশী বিক্রেতার সাধুতায় আমাদের এতই অনাস্থা যে অনেক ক্ষেত্রে খাঁটী জিনিসের জন্য 'সাহেব-বাড়ি'র দ্বারস্থ হতে হয়। এই জাতিগত নীচতায় আমরা গ্লানি বোধ করি না। যুদ্ধের পর এবং স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশে যে মহাকলিযুগের আরম্ভ হয়েছে তাতে সর্ব-প্রকার দুষ্ক্রিয়া বেড়ে গেছে। সম্পূর্ণ প্রতিকার সরকারের সাধ্য নয়। জনসাধারণের অধিকাংশেরই সামাজিক কর্তব্যবোধ কম, একজোট হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার উৎসাহ নেই। সম্প্রতি আমাদের দেশে অনেক বীরপুরুষের উদ্ভব হয়েছে। এরা ট্রাম বাস পোড়ায়, বোমা ফেলে, পুলিসকে মারে, মান্যগণ্য লোককে আক্রমণ করে, শ্রমিক ও স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের খেপায়, কিন্তু ভেজাল নকল কালোবাজার প্রভৃতি দুষ্কর্ম সম্বন্ধে নির্বিকার। শুধু অশান্তির প্রসারই এদের কাম্য।

কোনও অনাচার যখন দেশব্যাপী হয় এবং সাধারণে নির্বিবাদে তা মেনে নেয় তখন অল্প কয়েকজন সমাজহিতৈষীর উদ্‌যোগেই তার প্রতিকার আরম্ভ হতে পারে। সতীদাহ-নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্তন, পরাধীনতার বিলোপ প্রভৃতি এই প্রকারে হয়েছে। ভেজাল ও নকল নিবারণের জন্য কয়েকজন নিঃস্বার্থ উৎসাহী লোকের প্রয়োজন। তাঁরা যদি প্রচার দ্বারা সাধারণকে উদ্‌বোধিত করেন এবং বিশুদ্ধ জিনিস বেচার জন্য সমবায়-ভাণ্ডার খোলেন তবে দাম বেশী নিলেও ক্রমশ সাধারণের আনুকূল্য পাবেন। তাঁদের প্রভাবে অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও তাদের দস্তুর বদলাতে বাধ্য হবে।

দুর্ভিক্ষের সময় বিশ্বামিত্র প্রাণরক্ষার জন্য কুকুরের মাংস খেতে গিয়েছিলেন। আমাদের অভ্যস্ত অন্নের অভাব হলে অনুকল্প খুঁজতেই হবে, নিকৃষ্ট খাদ্যে তুষ্ট হতে হবে। জনসাধারণ অবুঝ, অনভ্যস্ত খাদ্যে সহজে তাদের প্রবৃত্তি হয় না। যাঁরা ধনী ও জ্ঞানী তাঁদের কর্তব্য নূতন বা নিকৃষ্ট খাদ্য নিজে খেয়ে সাধারণকে উৎসাহ দেওয়া। সরকার এইরূপ খাদ্যের উপযোগিতা প্রচার করবেন, কিন্তু অত্যুক্তি আর মিথ্যা উক্তি করবেন না, তাতে বিপরীত ফল হবে। মিথ্যা প্রিয় বাক্যের চাইতে অপ্রিয় সত্য ভাল। কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও খাদ্যবিশারদ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে শীঘ্রই ঘাস থেকে সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত হবে। সরকার যদি এ রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রচারের প্রশ্রয় দেন তবে সাধারণের শ্রদ্ধা হারাবেন। চাল আটা দুর্লভ হলে লাল-আলু টাপিওকা প্রভৃতির উপযোগিতা প্রচার করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে যে চাল-আটার সমান পুষ্টিকর না হলেও এইসব খাদ্যে জীবন-

রক্ষা হয়, স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কাও বিশেষ কিছু নেই; খরচ বেশী পড়তে পারে, কিন্তু এই দুঃসময়ে গত্যন্তর নেই।

সম্প্রতি সরকারী খবর প্রকাশিত হয়েছে যে কোন এক ল্যাবরেটরিতে ভুট্টা টাপিওকা ইত্যাদি থেকে সিন্থেটিক চাল তৈরীর চেষ্টা সফল হয়েছে। আজকাল অনেক রাসায়নিক দ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হচ্ছে, যেমন নীল (ইণ্ডিগো), কর্পূর, মেন্থল। কিন্তু রাসায়নিক বা অন্যবিধ প্রক্রিয়ায় কোনও শস্য ফল বা প্রাণী প্রস্তুত করা কখনও বিজ্ঞানের অসাধ্য। আমড়া থেকে আম, অথবা ব্যাং থেকে মাছ তৈরি যেমন অসম্ভব, ভুট্টা-টাপিওকা থেকে চাল তৈরি সেইরকম। সরকার যে বস্তুর কথা বলেছেন, তাকে সিন্থেটিক রাইস বললে সত্যের অপলাপ হয়, তা ইমিটেশন রাইস বা নকল চাল, যেমন সোনার নকল কেমিক্যাল সোনা। টাপিওকা থেকে যেমন সাগুদানা তৈরি হয়, সম্ভবত সেইরকম পদ্ধতিতে চালের মতন দানা তৈরি হচ্ছে, হয়তো প্রোটিনের মাত্রা সমান করবার জন্য কিছু চীনাবাদামের গুঁড়োও মেশানো হয়েছে। দেখতে চালের মতন হলে হয়তো দরিদ্র লোককে ভোলানো যেতে পারবে, খেলে পেটও ভরবে, কিন্তু এই জিনিসের গুণ চালের সমান হবে না। সরকারী প্রচারে অসতর্ক উক্তি একবারে বর্জন করতে হবে। সত্যমেব জয়তে—এই রাষ্ট্রীয় মন্ত্রের মর্যাদাহানি যেন কদাপি না হয়।

১৩৪৭

# ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার

সকল লোকেরই কথায় ও আচরণে নানাপ্রকার ভঙ্গী থাকে। এই ভঙ্গী যদি ব্যক্তিগত লক্ষণ হয় এবং অনর্থক বার বার দেখা যায় তবে তাকে মুদ্রাদোষ বলা হয়। যেমন লোকবিশেষের তেমনই জাতি বা শ্রেণী বিশেষেরও মুদ্রাদোষ আছে। দক্ষিণ ভারতের পুরুষ লজ্জা জানাবার জন্য হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। সকৌতুক বিস্ময় প্রকাশের জন্য ইংরেজ শিস দেয়। অনেক বাঙালী নবযুবক পথ দিয়ে চলবার সময় কেবলই মাথায় হাত বুলোয়—চুল ঠিক রাখবার জন্য। অনেক বাঙালী মেয়ে নিম্নমুখী হয়ে এবং ঘাড় ফিরিয়ে নিজের দেহ নিরীক্ষণ করতে করতে চলে—সাজ ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য। বাঙালী বৃদ্ধদেরও সাধারণ মুদ্রাদোষ আছে, অবৃদ্ধরা তা বলতে পারবেন।

জাতি বা শ্রেণী বিশেষের অঙ্গভঙ্গী বা বাক্যভঙ্গী এই প্রবন্ধের বিষয় নয়। আমাদের ভাষায় সম্প্রতি যে সকল মুদ্রাদোষ ও বিকার বিস্তারিত হচ্ছে তার সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করছি।

বাংলা ভাষার একটি প্রধান লক্ষণ জোড়া শব্দ, রবীন্দ্রনাথ যার নাম দিয়েছেন শব্দদ্বৈত। 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে বাংলায় শব্দদ্বৈতের প্রাদুর্ভাব যত বেশী, অন্য আর্য ভাষায় তত নহে।' তিনি সংস্কৃত থেকেও উদাহরণ দিয়েছেন—গদ্‌গদ্‌, বর্বর, জন্মজন্মনি, উত্তরোত্তর, পুনঃপুনঃ ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা শব্দদ্বৈত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা—মধ্যে মধ্যে, বারে বারে, হাড়ে হাড়ে—এগুলি পুনরাবৃত্তি বাচক। বুকে বুকে, কাঠে কাঠে—পরস্পর সংযোগ বাচক। সঙ্গে সঙ্গে, পাশে পাশে—নিয়তবর্তিতা বাচক। চলিতে চলিতে, হাসিয়া হাসিয়া—দীর্ঘকালীনতা বাচক। অন্য অন্য, লাল লাল, যারা যারা, ঝুড়ি ঝুড়ি—বিভক্ত বহুলতা বাচক। টাটকা টাটকা, গরম গরম, নিজে নিজে—প্রকর্ষ বাচক। যাব যাব, শীত শীত, মানে মানে—ঈষদূনতা মৃদুতা বা অসম্পূর্ণতা বাচক। পয়সা টয়সা, বোঁচকা বুঁচকি, গোলা গুলি, কাপড় চোপড়—অনির্দিষ্ট প্রভৃতি বাচক।

হিন্দী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও অল্পাধিক শব্দদ্বৈত আছে। বিদেশীর দৃষ্টিতে এই রীতি ভারতবাসীর মুদ্রাদোষ। শুনেছি, সেকালে চীনাবাদামের দোকানদার সাহেব ক্রেতাকে বলত, টেক টেক নো টেক নো টেক, একবার তো সী। একজন ইংরেজ পর্যটক লিখেছেন, মাদ্রাজ প্রদেশে কোনও এক হোটেলে হুইস্কির দাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর পেয়েছিলেন—টেন টেন আনা ওআন ওআন পেগ। বিদেশীর কাছে যতই অদ্ভুত মনে হ'ক শব্দদ্বৈত আমাদের ভাষার প্রকৃতিগত এবং

অর্থপ্রকাশের সহায়ক, অতএব তাকে মুদ্রাদোষ বলা যায় না। কিন্তু যদি অনাবশ্যক স্থলে দুই শব্দ জুড়ে দিয়ে বার বার প্রয়োগ করা হয় তবে তা মুদ্রাদোষ। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'অনির্দিষ্ট প্রভৃতি বাচক' বলেছেন সেই শ্রেণীর অনেক জোড়া শব্দ সম্প্রতি অকারণে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। এগুলির বিশেষ লক্ষণ—জোড়ার শব্দদুটি অসমান কিন্তু প্রায় অনুপ্রাসযুক্ত এবং প্রত্যেকটিরই অর্থ হয়। এই প্রকার বহুপ্রচলিত এবং নির্দোষ জোড়া শব্দও অনেক আছে, যেমন—মণি-মুক্তা, ধ্যান-ধারণা, জল-স্থল, খেত-খামার, নদী-নালা।

দুঃখ-দুর্দশা, ক্ষয়-ক্ষতি, সুখ সুবিধা, উদ্‌যোগ-আয়োজন, প্রভৃতি জোড়া শব্দ আজকাল খবরের কাগজে খুব দেখা যায়। স্থলবিশেষে এই প্রকার প্রয়োগের সার্থকতা থাকতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি শব্দই যথেষ্ট। কেবল দুঃখ বা কেবল দুর্দশা, কেবল ক্ষয় বা কেবল ক্ষতি, ইত্যাদি লিখলেই উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ পায়। এই রকম শব্দ যদি সর্বদাই জোড়া লেগে থাকে এবং অনর্থক বার বার প্রয়োগ করা হয় তবে তা মুদ্রাদোষ।

দুজন সুস্থ সবল লোক যদি সর্বদা পরস্পরের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটা অভ্যাস করে তবে দুজনেরই চলনশক্তির হানি হয়, একের অভাবে অন্য জন স্বচ্ছন্দে চলতে পারে না। প্রত্যেক শব্দেরই স্বাভাবিক অর্থপ্রকাশ শক্তি আছে যার নাম অভিধা। এই স্বাভাবিক অর্থ আরও স্পষ্ট হবে মনে করে যদি সর্বদা আর একটি শব্দ জুড়ে দেওয়া হয় তবে দুই শব্দেরই শক্তি কমে যায়। যেখানে একটিতেই কাজ চলতে পারত সেখানে দুটিই না লিখলে আর চলে না। আজকাল জনসাধারণের ভাষা শিক্ষার একটি প্রধান উপায় সংবাদপত্র। শুদ্ধ বা অশুদ্ধ, ভাল বা মন্দ, যে প্রয়োগ লোক বার বার দেখে তাই শিষ্ট রীতি মনে করে আত্মসাৎ করে। শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু লোকের মুখে 'পরিস্থিতি, বাধ্যতামূলক, অংশগ্রহণ, কার্যকরী উপায়', ইত্যাদি শোনা যায়।

সংবাদপত্রে sports অর্থে খেলাধুলা চলছে। শিশুর খেলাকে এই নাম দিলে বেমানান হয় না, কিন্তু ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতিকে খেলাধুলা বললে খেলোয়াড়ের পৌরুষ ধূলিসাৎ হয়। লোকে বলে—মাঠে খেলা দেখতে যাচ্ছি। খেলাধুলা দেখতে যাচ্ছি বলে না। শুধু খেলা শব্দে যখন কাজ চলে তখন অনুপ্রাসের মোহে খেলার সঙ্গে অনর্থক ধুলা যোগ করবার দরকার কি?

**শ**ব্দবাহুল্য বাঙালীর একটি রোগ। ক্লাইভ স্ট্রীটের নাম এখন নেতাজী সুভাষ রোড করা হয়েছে। শুধু নেতাজী রোড বা সুভাষ রোড করলে কিছুমাত্র অসম্মান হত না অথচ সাধারণের বলতে আর লিখতে সুবিধা হত। সম্প্রতি ক্যাম্বেল মেডিকেল কলেজের নাম নীলরতন সরকার মেডিকেল করা হয়েছে। শুধু নীলরতন কলেজ করলে কি দোষ হত? বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বদলে বঙ্কিমচন্দ্র বা বঙ্কিম স্ট্রীট করলে অমর্যাদা হত না। যাঁরা খ্যাতির শীর্ষে উঠেছেন তাঁদের পদবীর দরকার হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র, রাজনারায়ণ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি স্বনামধন্য পুরুষ। কৌলিক পদবীর বোঝা থেকে সাধারণে তাঁহাদের অনেকটা নিষ্কৃতি দিয়েছে, কিন্তু ভক্তজন তাঁদের স্কন্ধে নূতন উপসর্গ চাপিয়েছে। অনেকে মনে করেন প্রত্যেকবার নামোল্লেখের

সময় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, ঋষি রাজনারায়ণ, অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, দেশগৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্র না লিখলে তাঁদের অসম্মান হয়। রবীন্দ্রনাথ মহাভাগ্যবান, তাই সুকবি, কবিবর, মহাকবি, কবিসম্রাট প্রভৃতি তুচ্ছ বিশেষণের ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন, দরকার হলে নামের পরিবর্তে তাঁকে শুধু কবি বা কবিগুরু আখ্যা দিলেই যথেষ্ট হয়।

যেখানে কোনও লোকের স্বমহিমা পর্যাপ্ত মনে হয় না সেখানেই আড়ম্বর আসে। দরোয়ানের চোগোঁপ্পা, পাগড়ি আর জমকালো পোশাক, ফিল্ড-মার্শালের ভালুকের চামড়ার প্রকাণ্ড টুপি, সন্ন্যাসী বাবাজীর দাড়ি জটা গেরুয়া আর সাতনরী রুদ্রাক্ষের মালা—এ সমস্তই মহিমা বাড়াবার কৃত্রিম উপায়। আধুনিক শংকারাচার্যদের নামের পূর্বে এক শ আট শ্রী না দিলে তাঁদের মান থাকে না, কিন্তু আদি শংকারাচার্যের শ্রীর প্রয়োজন নেই, এবং হরি দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবতা দু-একটি শ্রীতেই তুষ্ট।

বাণ গৌড়ী রীতির লক্ষণ বলেছেন, অক্ষরডম্বর। এই আড়ম্বরের প্রবৃত্তি এখনও আছে। [illegible]ক বাক্যে অকারণে শব্দবাহুল্য এসে পড়েছে, লেখকরা গতানুগতিক ভাবে এই সব সাড়ম্বর বাক্য প্রয়োগ করেন। 'সন্দেহ নাই'—এই এই সরল প্রয়োগ প্রায় উঠে গেছে, তার বদলে চলছে—'সন্দেহের অবকাশ নাই'। 'চা পান' বা 'চা খাওয়া' চলে না, 'চা পর্ব' লেখা হয়। 'মিষ্টান্ন খাইলাম' স্থানে 'মিষ্টান্নের সদ্-ব্যবহার করা গেল'। মাঝে মাঝে অলংকার হিসাবে এরকম প্রয়োগ সার্থক হতে পারে, কিন্তু যদি বার বার দেখা যায় তবে তা মুদ্রাদোষ।

শব্দের অপচয় করলে ভাষা সমৃদ্ধ হয় না, দুর্বল হয়। যেখানে 'ব্যর্থ হইবে' লিখলে চলে সেখানে দেখা যায় 'ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে'। অনেকে 'দিলেন' স্থানে 'প্রদান করিলেন', 'যোগ দিলেন' স্থানে 'অংশগ্রহণ করিলেন' বা 'যোগদান করিলেন', 'গেলেন' স্থানে 'গমন করিলেন' লেখেন। 'হিন্দীভাষী' লিখলেই অর্থ প্রকাশ পায়, অথচ লেখা হয় 'হিন্দীভাষাভাষী', 'কাজের জন্য (বা কর্মসূত্রে) বিদেশ গিয়েছেন'—এই সরল বাক্যের স্থানে দুরূহ অশুদ্ধ প্রয়োগ দেখা যায়—'কর্মব্যপদেশে বিদেশে গিয়াছেন'। ব্যপদেশের মানে ছল বা ছুতা। 'পূর্বেই ভাবা উচিত ছিল' স্থানে লেখা হয়—'পূর্বাহ্ণেই...'। পূর্বাহ্ণের একমাত্র অর্থ সকালবেলা।

বাংলা একটা স্বাধীন ভাষা, তার নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি আছে, সংস্কৃতের বশে চলবার কোনও দরকার নেই—এই কথা অনেকে বলে থাকেন। অথচ তাঁদের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন বিকৃত সংস্কৃতপ্রীতি দেখা যায়। বাংলা 'চলন্ত' শব্দ আছে, তবু তাঁরা সংস্কৃত মনে করে অশুদ্ধ 'চলমান' লেখেন, বাংলা 'আগুয়ান' স্থানে অশুদ্ধ 'অগ্রসরমান' লেখেন, সুপ্রচলিত 'পাহারা' স্থানে 'প্রহরা' লেখেন। বাকীর সংস্কৃত বক্রী নয়, পাঠার সংস্কৃত পণ্টক নয়, পাহারার সংস্কৃতও প্রহরা নয়।

অনেক লেখকের শব্দবিশেষের উপর ঝোঁক দেখা যায়, তাঁরা তাঁদের প্রিয় শব্দ বার বার প্রয়োগ করেন। একজন গল্পকারের লেখায় চার পৃষ্ঠায় পঁচিশ বার 'রীতিমত' দেখেছি। অনেকে বার বার 'বৈদিক' লিখতে ভালবাসেন। কেউ কেউ অনেক প্যারাগ্রাফের আরম্ভে 'হাঁ' বসান। আধুনিক লেখকরা 'যুবক যুবতী' বর্জন করেছেন, 'তরুণ তরুণী' লেখেন। বোধ হয় এঁরা মনে করেন এতে বয়স কম দেখায় এবং লালিত্য বাড়ে। অনেকে দাঁড়ির বদলে অকারণে বিস্ময়চিহ্ন (!) দেন। অনেকে

দেবার বিন্দু (…) দিয়ে লেখা ফাঁপিয়ে তোলেন। অনাবশ্যক হস্‌-চিহ্ন দিয়ে লেখা কণ্টকিত করা বহু লেখকের মুদ্রাদোষ। ভেজিটেবল ঘি-এর বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যে খাবার তৈরির বিধি দেওয়া থাকে তাতে দেখেছি—'তিন্‌টি ডিম্‌ ভেঙ্গে নিন্‌, তাতে একটু নুন্‌ দিন।'

আর একটি বিজাতীয় মোহ আমাদের ভাষাকে আচ্ছন্ন করেছে। একে মুদ্রা-দোষ বললে ছোট করা হবে, বিকার বলাই ঠিক। ব্রিটিশ শাসন গেছে, কিন্তু ব্রিটিশ কর্তার ভূত আমাদের আচার-ব্যবহারে আর ভাষায় অধিষ্ঠান করে আছে। বিদেশীর কাছ থেকে আমরা বিস্তর ভাল জিনিস পেয়েছি। দু শ বৎসরের সংসর্গের ফলে আমাদের কথায় ও লেখায় কিছু কিছু ইংরেজী রীতি আসবে তা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কি বর্জনীয়, কি উপেক্ষণীয় এবং কি রক্ষণীয় তা ভাববার সময় এসেছে।

পাঁচ বছরের মেয়েকে নাম জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয়—কুমারী দীপ্তি চ্যাটার্জি। সুশিক্ষিত লোকেও অম্লানবদনে বলে—মিস্টার বাসু (বা বাসিউ), মিসেস রয়, মিস ডাট। মেয়েদের নামে ডলি লিলি রুবি ইভা প্রভৃতির বাহুল্য দেখা যায়। যার নাম শৈল বা শীলা সে ইংরেজীতে লেখে Sheila। অনিল হয়ে যায় O'neil, বরেন হয় Warren। এরা স্বনামের ধন্য হতে চায় না, নাম বিকৃত করে ইংরেজের নকল করে। এই নকল যে কতটা হাস্যকর ও হীনতাসূচক তা খেয়াল হয় না। সংক্ষেপের জন্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যানার্জি না করে বন্দ্য করলে দোষ কি? সেই রকম মুখ্য চট্ট গঙ্গ্য ভট্টও চলতে পারে। সম্প্রতি অনেকে নামের মধ্যপদ লোপ করেছেন, নাথ চন্দ্র কুমার মোহন ইত্যাদি বাদ দিয়েছেন। ভালই করেছেন। দিব্যেন্দ্র-নারায়ণ প্রভৃতি প্রকাণ্ড নাম এখন ফ্যাশন নয়। পদবীও সংক্ষিপ্ত করলে ক্ষতি কি? মিস্‌-এর অনুকরণে কুমারী লিখলে কি লাভ হয়? কয়েক বৎসর পূর্বেও কুমারী সধবা বিধবা সকলেই শ্রীমতী ছিলেন। এখন কুমারীকে বিশেষ করার কি দরকার হয়েছে? পুরুষের কৌমার্য তো ঘোষণা করা হয় না।

প্রতিষ্ঠানকে স্মরণ করে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের নাম আর. জি. কর কলেজ করা হয়েছে। ইংরেজী অক্ষর না দিয়ে রাধাগোবিন্দ কলেজ করলেই কালোচিত হত। একটি সমিতির বিজ্ঞাপন মাঝে মাঝে দেখতে পাই—Better Bengal Society. বাংলা দেশ এবং বাঙালীর উন্নতি করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে ইংরেজী নাম আর ইংরেজী বিজ্ঞাপন কেন? এখনও কি ইংরেজী মুরব্বীর প্রশংসা পাবার আশা আছে?

মেরুদণ্ডহীন অলস সুকুমার কমলবিলাসী হবার প্রবৃত্তি অনেকের আছে, সন্তানের নামকরণে তা প্রকাশ পায়। দোকানদারেরও স্বপনপসারী তরুণকুমার হবার সাধ হয়েছে। আমাদের পাড়ার একটি দরজীর দোকানের নাম—দি ড্রিমল্যাণ্ড স্টিচার্স। অন্যত্র স্বপন লণ্ড্রিও দেখেছি। তরুণ হোটেল, তরুণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, এবং ইয়ং গ্র্যাজুয়েট নামধারী দোকান বিস্তর আছে। পাঁচ-ছ বৎসর আগে বউবাজারে একটি দোকান ছিল—ইয়ং মোসলেম গ্র্যাজুয়েট ফ্রেণ্ড্‌স। এক সঙ্গে তারুণ্য ইসলাম আর পাশ করা বিদ্যার আবেদন।

# বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি

যার দ্বারা নিশ্চয় জ্ঞান হয় অর্থাৎ বিশ্বাস উৎপন্ন হয় তার নাম প্রমাণ। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে নানাপ্রকার প্রমাণের উল্লেখ আছে। চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য প্রমাণ অগ্রাহ্য। সাংখ্যে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য (বা শব্দ) এই তিন প্রকার প্রমাণই গ্রাহ্য। অন্যান্য দর্শনে আরও কয়েক প্রকার প্রমাণ মানা হয়।

প্রত্যক্ষ (perception), অনুমান (inference) এবং আপ্তবাক্য (authority)—এই ত্রিবিধ প্রমাণই আজকাল সকল দেশের বুদ্ধিজীবীরা মেনে থাকেন। আপ্তবাক্যের অর্থ—বেদাদিতে যা আছে, অথবা অভ্রান্ত বিশ্বস্ত বাক্য। অবশ্য শেষোক্ত অর্থই বিজ্ঞানী ও যুক্তিবাদীর গ্রহণীয়।

বিজ্ঞানী যখন পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ ক'রে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তথ্য নির্ণয় করেন তখন তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবলম্বন করেন। যখন পূর্বনির্ণীত তথ্যের ভিত্তিতে অন্য তথ্য নির্ধারণ করেন তখন অনুমানের আশ্রয় নেন; যেমন, চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবীর গতির নিয়ম হতে গ্রহণ বা জোয়ার-ভাটা গণনা। বিজ্ঞানী প্রধানত প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর নির্ভর করেন, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে তাঁকে আপ্ত-বাক্য অর্থাৎ অন্য বিজ্ঞানীর সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তও মেনে নিতে হয়।

আদালতের বিচারকের কাছে বাদী-প্রতিবাদীর রেজিস্টারী দলিল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তিনি যখন সাক্ষীদের জেরা শুনে সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন তখন অনুমানের সাহায্য নেন। যখন কোনও সন্দিগ্ধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মত নেন, যেমন রাসায়নিক পরীক্ষকের সিদ্ধান্ত, তখন তিনি আপ্তবাক্য আশ্রয় করেন।

Scientific mentality—এই বহু প্রচলিত ইংরেজী সংজ্ঞাটিকে বাংলায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বলা যেতে পারে। এর অর্থ, গবেষণার সময় বিজ্ঞানী যেমন অত্যন্ত সতর্ক হয়ে এবং সংস্কার ও পক্ষপাত দমন ক'রে সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন, সকল ক্ষেত্রেই সেই প্রকার বিচারের চেষ্টা। বিজ্ঞানী জানেন যে তিনি যা স্বচক্ষে দেখেন বা স্বকর্ণে শোনেন তাও ভ্রমশূন্য না হতে পারে, তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ এবং অপরাপর বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষে পার্থক্য থাকতে পারে। তিনি কেবল নিজের প্রত্যক্ষ চূড়ান্ত মনে করেন না, অন্য বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষও বিচার করেন। তিনি এও জানেন যে অনুমান দ্বারা, বিশেষত আরোহ (induction) পদ্ধতি অনুসারে যে সিদ্ধান্ত করা যায় তার নিশ্চয় (certainty) সকল ক্ষেত্রে সমান নয়। বলা বাহুল্য, যাঁরা বিজ্ঞানের চর্চা করেন তাঁরা সকলেই সমান সতর্ক বা সূক্ষ্মদর্শী নন।

পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যতটা ধ্রুব ও অভ্রান্ত গণ্য হত এখন আর তত হয় না। বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন যে অতি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকল্প (hypothesis) ও ছিদ্রহীন না হতে পারে এবং ভবিষ্যতে তার পরিবর্তন আবশ্যক হতে পারে। তাঁরা স্বীকার করেন যে সকল সিদ্ধান্তই সম্ভাবনা (probabi-

lity)র অধীন। অমুক দিন অমুক সময়ে গ্রহণ হবে—জ্যোতিষীর এই নির্ধারণ ধ্রুব সত্যের তুল্য, কিন্তু কাল ঝড় বৃষ্টি হবেই এমন কথা আবহবিৎ নিঃসংশয়ে বলতে পারেন না।

চার-পাঁচ শ বৎসর পূর্বে যখন মানুষের জ্ঞানের সীমা এখনকার তুলনায় সংকীর্ণ ছিল তখন কেউ কেউ সর্ববিদ্যাবিশারদ গণ্য হতেন। কিন্তু এখন তা অসম্ভব। যিনি খুব শিক্ষিত তিনি শুধু দু-একটি বিষয় উত্তমরূপে জানেন, কয়েকটি বিষয় অল্প জানেন, এবং অনেক বিষয় কিছুই জানেন না। যিনি জ্ঞানী ও সজ্জন তিনি নিজের জ্ঞানের সীমা সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত থাকেন, এবং তার বহির্ভূত কিছু বলে অপরকে বিভ্রান্ত করেন না।

বিজ্ঞানী এবং সর্ব শ্রেণীর বিশেষজ্ঞের উপর জনসাধারণের প্রচুর আস্থা দেখা যায়। অনেকে মনে করে, অধ্যাপক ডাক্তার উকিল এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি নিজ নিজ বিষয়ে সর্বজ্ঞ। কোনও প্রশ্নের উত্তরে যদি বিশেষজ্ঞ 'জানি না' বলেন তবে প্রশ্ন-কারী ক্ষুণ্ণ হয়, কেউ কেউ স্থির করে এঁর বিদ্যা বিশেষ কিছু নেই। সাধারণে যেসব বিষয়ের জন্য বিশেযজ্ঞকে প্রশ্ন করে তার অধিকাংশ স্বাস্থ্যবিষয়ক, কিন্তু জ্যোতিষ পদার্থবিদ্যা রসায়ন জীববিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেকের কৌতূহল দেখা যায়।

তুচ্ছ অতুচ্ছ সরল বা দুরূহ যেসকল বিষয় সাধারণে জানতে চায় তার কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি।—ধূমপানে দাঁতের গোড়া শক্ত হয় কি না? পাতি বা কাগজি নেবু কোন্‌টায় ভাইটামিন বেশী? মিছরির ফুড-ভ্যালু কি চিনির চাইতে বেশী? রবারের জুতো পরলে কি চোখ খারাপ হয়? নূতন সিমেণ্টের মেঝে ঘামে কেন? উদয়-অস্তের সময় চন্দ্র সূর্য বড় দেখায় কেন? সাপ নাকি শুনতে পায় না? কেঁচো আর পিঁপড়ের বুদ্ধি আছে কি না? দাবা খেললে আর অঙ্ক কষলে বুদ্ধি বাড়ে কি না? বাসন মাজার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে গা শিউরে ওঠে কেন?

যে প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সমাধান এখনও হয় নি তার উত্তর দেওয়া অবশ্য অসম্ভব। অনেক প্রশ্নের উত্তব দেওয়া সম্ভবপর হলেও তা অল্পশিক্ষিত লোককে বোঝানো যায় না. সরল প্রশ্নের উত্তবও অতি দুর্বোধ হতে পারে। যাঁকে প্রশ্ন করা হয় তিনি সবগুলির উত্তর নাও জানতে পারেন। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই প্রশ্নকারীকে যা তা বলে ভোলানো উচিত নয়। যদি উপযুক্ত উত্তর দেওয়ায় বাধা থাকে তবে সরলভাবে বলা উচিত, 'তোমার প্রশ্নের উত্তর এখনও নির্ণীত হয নি'. অথবা 'প্রশ্নটির উত্তর বোঝানো কঠিন', অথবা 'উত্তর আমার জানা নেই।' দুঃখের বিষয়, অনেকে মনে করেন, যা হয় একটা উত্তর না দিলে মান থাকবে না। উত্তরদাতার এই দুর্বলতা বা সত্যনিষ্ঠার অভাবেব ফলে জিজ্ঞাসুর মনে অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন হয়। আমেরিকান লেখক William Beebe তাঁর 'Jungle Peace' নামক গ্রন্থে একটি অমূল্য উপদেশ দিয়েছেন—These words should be ready for instant use by every honest scientist—'I don't know.'

প্রত্যেক বিষয়ে মত স্থির করবার আগে যদি তন্ন তন্ন বিচার করতে হয তবে জীবনযাত্রা দুর্বহ হয়ে পড়ে। সর্বক্ষণ সতর্ক ও যুক্তি-পরায়ণ হয়ে থাকা সহজ নয়। বিজ্ঞানী অবিজ্ঞানী সকলেই নিত্য নৈমিত্তিক সাংসারিক কার্যে অনেক সময় অপ্রমাণিত সংস্কারের বশে বা চিরাচরিত অভ্যাস অনুসারে চলেন। এতে বিশেষ

দোষ হয় না যদি তাঁরা উপযুক্ত প্রমাণ পেলেই সংস্কার ও অভ্যাস বদলাতে প্রস্তুত থাকেন।

তীক্ষ্মবুদ্ধি বিজ্ঞানী যখন তাঁর গবেষণাক্ষেত্রের বাইরে আসেন তখন তিনিও সাধারণ লোকের মতন অসাবধান হয়ে পড়েন। বিজ্ঞানী অবিজ্ঞানী সকলেই অনেক সময় কুযুক্তি বা হেত্বাভাস আশ্রয় করেন। আবার সময়ে সময়ে অশিক্ষিত লোকের স্বভাবলব্ধ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দেখা যায় এবং চেষ্টা করলে অনেকেই তা আয়ত্ত করতে পারেন। অল্পদর্শিতা অসতর্কতা ও অন্ধ সংস্কারের ফলে সাধারণ লোকের বিচারে যেরকম ভুল হয় তার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

যদুবাদু সুশিক্ষিত লোক। তিনি ব্ল্যাক আর্ট নামক ম্যাজিক দেখে এসে বললেন, 'কি আশ্চর্য কাণ্ড! জাদুকর শূন্য থেকে ফুলদানি টেবিল চেয়ার খরগোশ বার করছে, নিজের মুণ্ড উপড়ে ফেলে দু হাত দিয়ে লুফছে, একটা নরকঙ্কালের সঙ্গে নাচতে নাচতে পলকের মধ্যে সেটাকে সুন্দরী নারীতে রূপান্তরিত করছে। শত শত লোক স্বচক্ষে দেখেছে। এর চেয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি হতে পারে? অলৌকিক শক্তি ভিন্ন এমন ব্যাপার অসম্ভব।' যদুবাবু এবং অন্যান্য দর্শকরা প্রত্যক্ষ করেছেন বটে, কিন্তু সমস্ত প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি। রঙ্গমঞ্চের ভিতরটা আগাগোড়া কাল কাপড়ে মোড়া। ভিতরে আলো নেই, কিন্তু মঞ্চের ঠিক বাইরে চারি ধারে উজ্জ্বল আলো, তাতে দর্শকের চোখে ধাঁধা লাগে। ভিতরের কোন বস্তু বা মানুষ কাল কাপড়ে ঢাকা থাকলে অদৃশ্য হয়, ঢাকা খুললেই দৃশ্য হয়। জাদুকর কাল ঘোমটা পরলে তাঁর মুণ্ড অন্তর্হিত হয়, তখন তিনি একটা কৃত্রিম মুণ্ড নিয়ে লোফালুফি করেন। তাঁর সঙ্গিনী কাল বোরখা পরে নাচে, বোরখার উপর সাদা কঙ্কাল আঁকা থাকে। বোরখা ফেলে দিলেই রূপান্তর ঘটে।

মহাপুরুষদের অলৌকিক ক্রিয়ার কথা অনেক শোনা যায়। বিশ্বাসী ভক্তরা বলেন, 'অমুক বাবার দৈবশক্তি মানতেই হবে, শূন্য থেকে নানারকম গন্ধ সৃষ্টি করতে পারেন। আমার কথা না মানতে পার, কিন্তু বড় বড় প্রোফেসররা পর্যন্ত দেখে অবাক হয়ে গেছেন, তাঁদের সাক্ষ্য তো অবিশ্বাস করতে পার না।' এইরকম সিদ্ধান্ত যাঁরা করেন তাঁরা বোঝেন না যে প্রোফেসর বা উকিল জজ পুলিস অফিসার ইত্যাদি নিজের ক্ষেত্রে তীক্ষ্মবুদ্ধি হতে পারেন, কিন্তু 'অলৌকিক' রহস্যের ভেদ তাঁদের কর্ম নয়। জড় পদার্থ ঠকায় না, সেজন্য বিজ্ঞানী তাঁর পরীক্ষাগারে যা প্রত্যক্ষ করেন তা বিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু যদি ঠকাবার সম্ভাবনা থাকে তবে চোখে ধুলো দেওয়া বিদ্যায় যাঁরা বিশারদ (যেমন জাদুকর), কেবল তাঁদের সাক্ষ্যই গ্রাহ্য হতে পারে। রামায়ণে সীতা বলেছেন, 'অহিরেব অহেঃ পাদান্ বিজানাতি ন সংশয়ঃ'—সাপের পা সাপেই চিনতে পারে তাতে সংশয় নেই। কিন্তু বিচক্ষণ ওস্তাদের পক্ষেও বাবা স্বামী ঠাকুর প্রভৃতিকে পরীক্ষা করা সাধ্য নয়, কারণ তাঁদের কাপড়-চোপড় বা শরীর তল্লাশ করতে চাইলে ভক্তরা মারতে আসবেন। বৈজ্ঞানিক বিচারের একটি নিয়ম—কোনও ব্যাপারের ব্যাখ্যা যদি সরল বা পরিচিত উপায়ে সম্ভবপর হয় তবে জটিল বা অজ্ঞাত বা অলৌকিক কারণ কল্পনা করা অন্যায়।

রামবাবু স্থির করেছেন যে বেলিণ্ডা জেলার লোকে চোর হয়, কারণ, তাঁর এক চাকর ওই জেলার লোক, সে ঘড়ি চুরি ক'রে পালিয়েছে। তার ভাগনে শ্যামবাবুর বাড়ির কাজ করে, সেও রোজ বাজারের পয়সা থেকে কিছু কিছু সরায়। শ্যামবাবু

বলেছেন, বোলিন্ডা জেলার লোককে বিশ্বাস করা উচিত নয়। এই অল্প কয়েকটি ঘটনা বা খবর থেকে রামবাবু আরোহ (induction) পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত করেছেন যে ওই জেলার সকলেই চোর।

তারাদাস জ্যোতিষার্ণব বলেছেন যে এই বৎসরে গণেশবাবুর আর্থিক উন্নতি এবং মহাগুরুনিপাত হবে। গণেশবাবুর মাইনে বেড়েছে, তাঁর আশি বছরের পিতামহীও মরেছেন। এই দুই আশ্চর্য মিল দেখে ফলিত জ্যোতিষের উপর গণেশবাবুর অগাধ বিশ্বাস জন্মেছে। জ্যোতিষ গণনা কত বার নিষ্ফল হয় তার হিসাব করা গণেশবাবু দরকার মনে করেন না।

রত্নের সঙ্গে আকাশের গ্রহের সম্বন্ধ আছে, রত্নধারণে ভালমন্দ ফল হয়, অমাবস্যা পূর্ণিমায় বাত প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধি হয়, অম্বুবাচীতে অন্যদিনের তুলনায় বেশী বৃষ্টি হবেই, অশ্লেষা মঘায় যাত্রা করলে বিপদ হয়, ইত্যাদি ধারণা বহু শিক্ষিত লোকেরও আছে। কিন্তু সত্যাসত্য নির্ণয়ের যা যথার্থ উপায়—পরিসংখ্যান (statistics), তা এ পর্যন্ত কেউ অবলম্বন করেন নি।

বিপিনবাবু স্বজাতির উপর চটা। তিনি এক সভায় বললেন, বাঙালী অতি দুশ্চরিত্র। তার ফলে তাঁকে খুব মার খেতে হল। বিপিনবাবু এরকম আশঙ্কা করেন নি। পূর্বে তিনি আলাদা আলাদা কয়েকজনকে ওই কথা বলেছিলেন। কেউ তাঁকে ধমক দিয়েছিল, কেউ তর্ক করেছিল, কেউ পাগল ভেবে হেসেছিল, কেউ বা বলেছিল, হাঁ মশায়, আপনার কথা খুব ঠিক। বিপিনবাবু ভাবতে পারেন নি, পৃথক পৃথক লোকের উপর তাঁর উক্তির প্রতিক্রিয়া যেমন হবে, সমবেত জনতার উপর তেমন না হতে পারে। তিনি বিজ্ঞানের চর্চা করলে জানতে পারতেন, বস্তুর এক-একটি উপাদানের গুণ ও ক্রিয়া যে প্রকার, বস্তুসম্ভারের গুণ ও ক্রিয়া সে প্রকার না হতে পারে।

সাধারণ লোকের বিচারে যে ভুল হয় তার একটি কারণ, প্রচুর প্রমাণ না পেয়েই একটা সাধারণ নিয়ম স্থির করা। এককালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে স্তন্যপায়ী প্রাণী মাত্রেই জরায়ুজ। কিন্তু পরে ব্যতিক্রম দেখা গেল যে duck-bill (ornithorhyncus) নামক জন্তু স্তন্যপায়ী অথচ অণ্ডজ। অতএব, শুধু এই কথাই বলা চলে যে অধিকাংশ বা প্রায় সমস্ত স্তন্যপায়ী জীব জরায়ুজ। ডারউইন লক্ষ্য করেছিলেন, সাদা বেরালের নীল চোখ থাকলে সে কালা হয়। এখন পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি, কিন্তু সাদা লোম, নীল চোখ আর শ্রবণশক্তির মধ্যে কোনও কার্যকারণসম্বন্ধও আবিষ্কৃত হয় নি। অতএব শুধু বলা চলে, যার লোম সাদা আর চোখ নীল সে বেরাল খুব সম্ভবত কালা।

মিত্র আর মুখুজ্জে কুটিল, দত্ত আর চট্ট বজ্জাত, কাল বামুন কটা শূদ্র বেঁটে মুসলমান সমান মন্দ হয়—ইত্যাদি প্রবাদের মূলে লেশমাত্র প্রমাণ নেই, তথাপি অনেক লোকে বিশ্বাস করে।

এদেশের অতি উচ্চশিক্ষিত লোকের মধ্যেও ফলিত জ্যোতিষ আর মাদুলি-কবচে অগাধ বিশ্বাস দেখা যায়। খবরের কাগজে 'রাজজ্যোতিষী'রা যেরকম বড় বড় বিজ্ঞাপন দেন তাতে বোঝা যায় যে তাঁরা প্রচুর রোজগার করেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বিজ্ঞান ও দর্শনে অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল, তিনি

শাস্ত্রজ্ঞ নিষ্ঠাবান হিন্দুও ছিলেন। তাঁর 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'ফলিত জ্যোতিষ' নামক প্রবন্ধটি সকল শিক্ষিত লোকেরই পড়া উচিত। তা থেকে কিছু কিছু তুলে দিচ্ছি।—

'কোনও একটা ঘটনার খবর পাইলে সেই খবরটা প্রকৃত কিনা এবং ঘটনাটা প্রকৃত কিনা তাহা...জানিবার অধিকার বিজ্ঞানবিদের প্রচুর পরিমাণে আছে। এই অনুসন্ধান কার্যই বোধ করি তাঁর প্রধান কার্য। প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের জন্য তাঁহাকে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয়।...অবৈজ্ঞানিকের সঙ্গে বিজ্ঞানবিদের এইখানে পার্থক্য। ...তিনি অতি সহজে অত্যন্ত ভদ্র ও সুশীল ব্যক্তিকেও বলিয়া বসেন, তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিলাম না।...নিজের উপরেও তাঁর বিশ্বাস অল্প।...কোথায় কোন্ ইন্দ্রিয় তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া ফেলিবে...এই ভয়ে তিনি সর্বদা আকুল। ফলিত জ্যোতিষে যাঁহারা অবিশ্বাসী তাঁহাদিগের সংশয়ের মূল এই। তাঁহারা যতটুকু প্রমাণ চান ততটুকু পান না। তাহার বদলে বিস্তর কুযুক্তি পান।...একটা ঘটনার সহিত মিলিলেই দুন্দুভি বাজাইব, আর সহস্র ঘটনায় যাহা না মিলিবে তাহা চাপিয়া যাইব অথবা গণকঠাকুরের অজ্ঞতার দোহাই দিয়া উড়াইয়া দিব এরূপ ব্যবসায়ও প্রশংসনীয় নহে।

'একটা সোজা কথা বলি। ফলিত জ্যোতিষকে যাঁহারা বিজ্ঞানবিদ্যার পদে উন্নীত দেখিতে চাহেন তাঁহারা এইরূপ করুন। প্রথমে তাঁহাদের প্রতিপাদ্য নিয়মটা খুলিয়া বলুন। মানুষের জন্মকালে গ্রহনক্ষত্রের স্থিতি দেখিয়া কোন্ নিয়মে গণনা হইতেছে তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে হইবে।...ধরি মাছ না ছুঁই পানি হইলে চলিবে না। তাহার পর হাজার খানেক শিশুর জন্মকাল ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়া প্রকাশ করিতে হইবে; এবং পূর্বের প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে গণনা করিয়া তাহার ফলাফল স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিতে হইবে।...পূর্বে প্রচারিত ফলাফলের সহিত প্রত্যক্ষ ফলাফল মিলিয়া গেলেই ঘোর অবিশ্বাসীও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসে বাধ্য হইবে। যতটুকু মিলিবে ততটুকু বাধ্য হইবে। হাজারখানা কোষ্ঠীর মধ্যে যদি নয় শ মিলিয়া যায় তবে মনে করিতে হইবে যে ফলিত জ্যোতিষে অবশ্য কিছু আছে। যদি পঞ্চাশখানা মাত্র মেলে তবে মনে করিতে হইবে, তেমন কিছুই নাই। হাজারের বদলে যদি লক্ষটা মিলাইতে পার, আরও ভাল। সহস্র পরীক্ষাগারে ও মানমন্দিরে বৈজ্ঞানিকেরা যে রীতিতে ফলাফল গণনা ও প্রকাশ করিতেছেন সেই রীতি আশ্রয় করিতে হইবে। কেবল নেপোলিয়নের ও বিদ্যাসাগরের কোষ্ঠী বাহির করিলে অবিশ্বাসীর বিশ্বাস জন্মিবে না। চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়, তবে রাম-কান্তের জজিয়তি কেন হইবে না, এরূপ যুক্তিও চলিবে না।'

এক শ্রেণীর কুযুক্তির ইংরেজী নাম begging the question, অর্থাৎ যা তাই একটু ঘুরিয়ে উত্তর রূপে বলা। প্রশ্ন—কাঠ পোড়ে কেন! উত্তর—কারণ, কাঠ দাহ্য পদার্থ। দাহ্য মানে যা পুড়তে পারে। অতএব উত্তরটি এই দাঁড়ায় —কাঠ পুড়তে পারে সেইজন্যই পোড়ে। প্রশ্নটিকেই উত্তরের আকারে সাজিয়ে বলা হয়েছে। প্রশ্ন—ডাক্তারবাবু, নিশ্বাস নিতে আমার কষ্ট হচ্ছে কেন? উত্তর—তোমার dyspnoea হয়েছে। রোগের নাম শুনে রোগীর হয়তো ডাক্তারের উপর আস্থা

বেড়ে গেল, কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধি হল না; নামটির মানেই কণ্ঠশ্বাস। আরও উদাহরণ —গাঁজা খেলে নেশা হয় কেন? কারণ, গাঁজা মাদক দ্রব্য। রবার টানলে বাড়ে কেন? কারণ, রবার স্থিতিস্থাপক। ডি-ডি-টিতে পোকা মরে কেন? কারণ জিনিসটি কীটঘ্ন। খবরের কাগজে এবং রাজনীতিক বক্তৃতায় এইপ্রকার যুক্তি অনেক পাওয়া যায়। যথা—'প্রজা যদি নিজের মতামত অবাধে ব্যক্ত করতে না পারে তবে রাষ্ট্রের অমঙ্গল হয়, কারণ, রুদ্ধ জনমত অশেষ অনিষ্টের মূল।'

অনেক সময় পূর্বের ঘটনাকে পরবর্তী ঘটনার কারণ মনে করা হয়। এরূপ যুক্তিই কাকতালীয় ন্যায় বা post hoc, propter hoc। আমার ফিক ব্যথা হয়েছে, একটা বড়ি খেয়ে আধঘণ্টার মধ্যে সেরে গেল। এতে ঔষধের গুণ প্রমাণিত হয় না, ব্যথা আপনিও সারতে পারে। একটা নারকেল গাছ পুঁতেছিলাম, বার বৎসরেও তাতে ফল ধরল না। বন্ধুর উপদেশে এক বোতল সমুদ্রের জল গাছের গোড়ায় দিলাম। এক বৎসরের মধ্যে ফল দেখা গেল। এও প্রমাণ নয়, হয়তো যথাকালে আপনি ফল ধরেছে। বার বার মিল না ঘটলে কার্যকারণ-সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় না।

ফলিত জ্যোতিষে যাঁদের আস্থা আছে তাঁরা প্রায়ই বলেন, যদি গণনা ঠিক হয় তবে মিলতেই হবে। হোমিওপ্যাথি-ভক্তরাও ব'লে থাকেন, যদি ঔষধ-নির্বাচন ঠিক হয় তবে রোগ সারতেই হবে। যদি শতবার অভীষ্ট ফল না পাওয়া যায় তাতেও তাঁরা হতাশ হন না; বলেন, গণনা (বা ঔষধ) ঠিক হয় নি। যদি একবার ফললাভ হয় তবে উৎফুল্ল হয়ে বলেন, এই দেখ, বলেছিলাম কি না? যথার্থ গণনার (বা ঔষধের) কি অব্যর্থ ফল।

সকলেরই জ্ঞান সীমাবদ্ধ সেজন্য অসংখ্য ক্ষেত্রে আপ্তবাক্য মেনে নিতে হয়। কার উপদেশ গ্রহণীয় তা লোকে নিজের শিক্ষা আর সংস্কার অনুসারে স্থির করে। পাড়ায় বসন্ত রোগ হচ্ছে। সরকার বলেছেন টিকা নাও, ভটচাজ্যি মশায় বলছেন শীতলা মাতার পূজা কর। যারা মতি স্থির করতে পারে না বা ডবল গ্যারাণ্টি চায় তারা টিকাও নেয় পূজার চাঁদাও দেয়। বাড়িতে অসুখ হলে লোকে নিজের সংস্কার অনুসারে চিকিৎসার পদ্ধতি ও চিকিৎসক নির্বাচন করে। রেসে বাজি রাখবার সময় কেউ বন্ধুর উপদেশে চলে, কেউ গণৎকারের কথায় নির্ভর করে।

গত এক শ দেড় শ বৎসরের মধ্যে এক নূতন রকম আপ্তবাক্য সকল দেশের জনসাধারণকে অভিভূত করেছে—বিজ্ঞাপন। অশিক্ষিত লোকে মনে করে যা ছাপার অক্ষরে আছে তা মিথ্যা হতে পারে না। বিজ্ঞাপন এখন একটি চারুকলা হয়ে উঠেছে, সুরচিত হলে নৃত্যপরা অপ্সরার মতন পরম জ্ঞানী লোককেও মুগ্ধ করতে পারে। একই বস্তু-মহিমা প্রত্যহ নানা স্থানে নানা ভাষায় নানা ভঙ্গীতে পড়তে পড়তে লোকের বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। চতুর বিজ্ঞাপক স্পষ্ট মিথ্যা বলে না; আইন বাঁচিয়ে সুনাম রক্ষা ক'রে, মনোজ্ঞ ভাষা ও চিত্রের প্রভাবে সাধারণের চিত্ত জয় করে। যে জিনিসের কোনও দরকার নেই অথবা যা অপদার্থ তাও লোকে অপরিহার্য মনে করে। অতি বিচক্ষণ চিকিৎসকও বিজ্ঞাপনের কবল থেকে মুক্ত হতে পারেন না, সাধারণের তো কথাই নেই। বিজ্ঞাপন দেখে লোকের দৃঢ় ধারণা হয়, অমুক স্নো মাখলে রং ফরসা হয়, অমুক তেলে ব্রেন ঠাণ্ডা হয়, অমুক সুধায়

স্নার্ভ চাঙ্গা হয়, অমুক ফাউন্টেন পেন না হলে চলবে না, অমুক কাপড়ের শার্ট বা শাড়ি না পরলে আধুনিক হওয়া যাবে না। এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী ঘোষণা করেছেন—Beware of night starvation, খবরদার, রাত্রে যেন জঠরানলে দগ্ধ হয়ো না, শোবার আগে এক কাপ আমাদের এই বিখ্যাত পথ্য পান করবে। যিনি গাণ্ডেপিণ্ডে নৈশভোজন করেছেন তিনিও ভাবেন, তাই তো, রাত্রে পুষ্টির অভাবে মরা ঠিক হবে না, অতএব এক কাপ খেয়েই শোয়া ভাল। চায়ের বিজ্ঞাপনে প্রচার করা হয়—এমন উপকারী পানীয় আর নেই, সকালে দুপুরে সন্ধ্যায়, কাজের আগে মাঝে ও পরে, শীত করলে, গরম বোধ হলে, সর্বাবস্থায় চা-পান হিতকর।

বিজ্ঞাপন কেমন পরোক্ষভাবে মানুষের বিচারশক্তি নষ্ট করে তার একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বহুকাল পূর্বের কথা, তখন আমি পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। আমার পাশের টেবিলে একজন ষষ্ঠ বার্ষিকের ছাত্র একটা লাল রঙের তরল পদার্থ নিয়ে তার সঙ্গে নানা রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে পরীক্ষা করছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ও কি হচ্ছে।' উত্তর দিলেন, 'এই কেশতৈলে মারকিউরি আর লেড আছে কিনা দেখছি?' প্রশ্ন—'কেশতৈলে ওসব থাকবে কেন?' উত্তর—'এরা বিজ্ঞাপনে লিখছে, এই কেশতৈল পারদ সীসক প্রভৃতি বিষ হইতে মুক্ত। তাই পরীক্ষা ক'রে দেখছি কথাটা সত্য কিনা।' এই ছাত্রটি যা করছিলেন ন্যায়শাস্ত্রে তার নাম কাকদন্তগবেষণ, অর্থাৎ কাকের কটা দাঁত আছে তাই খোঁজ করা। পরে ইনি এক সরকারী কলেজের রসায়ন-অধ্যাপক হয়েছিলেন।

যেমন সন্দেশ রসগোল্লায়, তেমনি কেশতৈলে পারা বা সীসে থাকবার কিছুমাত্র কারণ নেই। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য, ভয় দেখিয়ে খদ্দের যোগাড় করা। অজ্ঞ লোকে ভাববে, কি সর্বনাশ, তবে তো অন্য তেলে এই সব থাকে! দরকার কি, এই গ্যারাণ্টি দেওয়া নিরাপদ তেলটিই মাখা যাবে।

ধর্মমত আর রাজনীতিক মতের সত্যতা প্রমাণ করা প্রায় অসাধ্য। প্রমাণের অভাবে উত্তেজনা আর আক্রোশ আসে, মত-বিরোধের ফলে শত্রুতা হয়, তার পরিণাম অনেক ক্ষেত্রে মারাত্মক হয়ে ওঠে। কিন্তু অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক মত সহজেই সর্বগ্রাহ্য হতে পারে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ হলেও শত্রুতা হয় না। সোভিয়েট বিজ্ঞানী লাইসেংকোর প্রজনন বিষয়ক মত নিয়ে পাশ্চাত্ত্য দেশে যে উগ্র বিতর্ক হয়েছে তার কারণ প্রধানত রাজনীতিক।

যিনি বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক তিনি ধীরভাবে ভ্রমপ্রমাদ যথাসাধ্য পরিহার ক'রে সত্যের সন্ধান করেন, প্রবাদকে প্রমাণ মনে করেন না, প্রচুর প্রমাণ না পেলে কোনও নূতন সিদ্ধান্ত মানেন না, অন্য বিজ্ঞানীর ভিন্ন মত থাকলে অসহিষ্ণু হন না, এবং সুপ্রচলিত মতও অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকেন না, উপযুক্ত প্রমাণ পেলেই বিনা দ্বিধায় মত বদলাতে পারেন। জগতের শিক্ষিত জন যদি সকল ক্ষেত্রে এই প্রকার উদার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রয়োগ করতে শেখেন তবে কেবল সাধারণ ভ্রান্ত সংস্কার দূর হবে না, ধর্মান্ধতা ও রাজনীতিক সংঘর্ষেরও অবসান হবে।

১৩৫৮

# বাঙালীর হিন্দীচর্চা

পনর বৎসর পরে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হবে এই সংকল্প ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত হওয়ায় অনেকে রাগ করেছেন, আরও অনেকে ভয় পেয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী উদাসীন হয়ে আছেন। পনর বৎসর দেখতে দেখতে কেটে যাবে, অতএব রাগের বশে হিন্দীকে বয়কট করা, ভয় পেয়ে নিরাশ হওয়া, অথবা পরে দেখা যাবে এই ভেবে নিশ্চেষ্ট থাকা—কোনটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কেউ কেউ মনে করেন, পনর বৎসর পরেও সরকারী সকল কার্য হিন্দী ভাষায় নির্বাহ করা যাবে না, তখন ইংরেজীর মেয়াদ আরও বাড়াতে হবে, হয়তো কোনও কালেই ইংরেজী-বর্জন চলবে না। এই রকম ধারণার বশে নিরুদ্যম হয়ে থাকাও হানিকর। অচির ভবিষ্যতে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হবেই—এই সম্ভাবনা মেনে নিয়ে এখন থেকে আমাদের প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য।

এ পর্যন্ত আমরা মাতৃভাষা ছাড়া প্রধানত শুধু একটি ভাষা শেখবার চেষ্টা করেছি—ইংরেজী। যাঁরা অধিকন্তু সংস্কৃত ফারসী ফ্রেঞ্চ জার্মান প্রভৃতি শেখেন তাঁদের সংখ্যা অল্প। ইংরেজী শেখার উদ্দেশ্য তিনটি—জীবিকানির্বাহ, ভিন্ন-দেশ-বাসীর সঙ্গে কথাবার্তা, এবং নানা বিদ্যায় প্রবেশ লাভ। হিন্দী যখন রাষ্ট্রভাষা-রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন কেবল ইংরাজীর সাহায্যে জীবিকানির্বাহ চলবে না, সরকারী চাকরি, ওকালতি প্রভৃতি বৃত্তি, এবং সামরিক ও রাজনীতিক কার্যে হিন্দী অপরিহার্য হবে। ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে প্রধানত হিন্দীতেই আলাপ করতে হবে। কিন্তু যাঁরা উচ্চশিক্ষা চান অথবা পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে যোগ রাখতে চান তাঁদের অধিকন্তু ইংরেজীও শিখতে হবে। মোট কথা, এখন যেমন ইতর ভদ্র অনেক লোক ইংরেজী না শিখেও কৃষি শিল্প কারবার বা কায়িক শ্রম দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে, ভবিষ্যতে হিন্দী না শিখেও তা পারবে। কিন্তু শিক্ষিত শ্রেণীর অধিকাংশ লোক যেসব বৃত্তিতে অভ্যস্ত তা বজায় রাখার জন্য হিন্দী শিখতেই হবে। তা ছাড়া অল্পাধিক ইংরেজীও চাই। অর্থাৎ, এক শ্রেণীর শুধু মাতৃভাষা আর এখনকার মতন নামমাত্র বাজারী হিন্দী জানলেই চলবে ; আর এক শ্রেণীর মাতৃভাষা ছাড়া ভালরকম হিন্দী এবং একটু ইংরেজী জানলেই চলবে ; এবং উচ্চশিক্ষার্থীর অধিকন্তু ইংরেজী উত্তমরূপে আয়ত্ত করতে হবে।

দুটির জায়গায় তিনটি ভাষা শিখতে হবে এতে ভয় পাবার কিছু নেই। গণিত বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি বিদ্যা আয়ত্ত করতে যে যত্ন নিতে হয় তার চেয়ে অনেক কম যত্নে ভাষা শেখা যায়। হিন্দী আর বাংলার সম্পর্ক অতি নিকট, সে কারণে বাঙালীর পক্ষে হিন্দী শেখা সহজ। ইওরোপ আমেরিকা ও জাপানে বহু লোক তিন-চারটি বা ততোধিক ভাষা শেখে। যাঁরা রাজনীতিক বা বাণিজ্যিক দূত হয়ে অন্য রাষ্ট্রে যান তাঁদের বিভিন্ন ভাষায় দখল না থাকলে চলে না। যে বাঙালী এইপ্রকার পদের প্রার্থী তাঁকে বহু ভাষা শিখতেই হবে।

হিন্দীর আধিপত্যে আমাদের মাতৃভাষার ক্ষতি হবে এই ভয় একেবারে ভিত্তি-হীন। ইংরেজীর প্রভাবে বাংলা ভাষার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, ভাল মন্দ অনেক বাক্যরীতি বা ইডিয়ম বাংলায় এসে পড়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য ইংরেজী ভাব ও পদ্ধতি আত্মসাৎ করেই পুষ্ট হয়েছে, কিন্তু নিজের বিশিষ্টতা হারায় নি। হিন্দী দ্বারাও বাংলাভাষা কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হবে, কিন্তু অভিভূত হবে না। অনেককাল থেকেই কিছু কিছু হিন্দী শব্দ বাংলায় আসছে, ভবিষ্যতে আরও আসবে, কিন্তু তাতে বাংলার জাত যাবে না। বাংলা থেকেও বিস্তর শব্দ হিন্দীতে যাচ্ছে। বাংলার তুলনায় ইংরেজী ভাষার সমৃদ্ধি খুব বেশী, সেই কারণেই বাংলার উপর তার অসামান্য প্রভাব। হিন্দীর সে সমৃদ্ধি নেই, সেজন্য তার প্রভাব কখনও বেশী হবে না—রাজনীতিক মর্যাদা যতই থাকুক।

পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব পর্যন্ত এদেশে কেবল পাঠশালায় আর স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে বাংলা পড়ানো হ'ত। তখনকার শিক্ষাবিধাতারা মনে করতেন, বাংলা তো আপনিই শেখা যায়, তার জন্য বেশী কিছু করতে হবে কেন। এই উপেক্ষা সত্ত্বেও সেকালের বাঙালী লেখক মাতৃভাষার উন্নতি করেছেন, উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁদের কীর্তির জন্যই পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্য কলেজেও শিক্ষণীয় হয়েছে। এখন বাংলা চর্চা করেই এম. এ., পি-এইচ· ডি· উপাধি পাওয়া যেতে পারে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে স্থান পাওয়ায় বাংলা ভাষা জাতে উঠেছে, তার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য পাঠ্যরূপে সমাদর পেয়েছে। কিন্তু কলেজী শিক্ষার গুণে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টার ফলে প্রত্যক্ষভাবে বাংলা ভাষার বা সাহিত্যের কোনও উন্নতি হয়েছে এমন বলা যায় না। সেকালের লেখকরা পাঠশালায় বা স্কুলের নিম্নশ্রেণীতেই বাংলা শিখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা শীর্ষস্থানীয় তাঁরা ভাষায় শুদ্ধি ও সৌষ্ঠবের উপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখতেন এবং নূতন লেখকদের নিয়ন্ত্রিত করতেন। এখন অসংখ্য লেখক, তাঁদের অনেকে কলেজে বাংলা পড়েছেন। এখন রচনার বৈচিত্র্য ও পরিমাণ বেড়ে গেছে, আধুনিক প্রয়োজনে ভাষা নব নব ভাবের ধারক হয়েছে, তার প্রকাশশক্তিও প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু সেকালে যে সতর্কতা ছিল, ইংলাণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ভাষার উপর যে শাসন আছে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তার একান্ত অভাব দেখা যায়।

সেকালের উপেক্ষা, একালের অসতর্কতা, এবং ইংরেজীর প্রবল প্রভাব—এই তিন বাধা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এতে সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্ব নেই, বাঙালী লেখকের সহজাত সাহিত্যপ্রীতি ও নৈপুণ্যের জন্য বাংলা ভাষা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা রূপে গণ্য হয়েছে। হিন্দীর প্রতিপত্তি যতই হ'ক তাতে বাংলা ভাষার অনিষ্ট হবে না।

যেসব সরকারী কর্মচারীর কর্মকাল শেষ হয়েছে বা শীঘ্র হবে তাঁদের হিন্দী না শিখলেও চলবে। যাঁরা যুবক, এখনও বহুকাল কর্মরত থাকবেন, তাঁদের অনেক-কেই হিন্দী শিখতে হবে, নতুবা তাঁদের উন্নতি ব্যাহত হবে। আর, যারা অল্পবয়স্ক তাদের সযত্নে হিন্দী শেখাতেই হবে, যাতে তারা ভবিষ্যৎ প্রতিযোগে পরাস্ত না হয়। ব্রিটিশ রাজত্বের আরম্ভকালে মুসলমানরা বাদশাহী জমানা আর ফারসী ভাষার অভিমানে ইংরেজীকে উপেক্ষা করেছিল। তার জটিল পরিণাম কি হয়েছে তা

সকলেই জানেন। অন্ধ বিদ্বেষ বা অদূরদর্শিতার বশে হিন্দীকে উপেক্ষা করলে বাঙালীর অশেষ দুর্গতি হবে।

ভাগ্যক্রমে হিন্দুস্থানী অর্থাৎ উর্দু রাষ্ট্রভাষা রূপে নির্বাচিত হয় নি। সংবিধান সভায় যারা হিন্দীর পক্ষে লড়েছিলেন তাঁরা এখন 'শুদ্ধ হিন্দী' অর্থাৎ সংস্কৃত-শব্দবহুল হিন্দীর প্রতিষ্ঠার জন্য সোৎসাহে চেষ্টা করছেন। ভারতের প্রধান ভাষা-গুলির যোগসূত্র সংস্কৃত শব্দাবলী। হিন্দী ভাষায় যদি আরবী-ফারসী শব্দ কমানো হয় এবং সংস্কৃত শব্দ বাড়ানো হয় তবে দু-তিন কোটি উর্দুভাষীর অসুবিধা হলেও অবশিষ্ট বহু কোটি ভারতবাসীর সুবিধা হবে। হিন্দী ভাষার যদি 'ইম্‌তহান, দরখ্‌ত, পৈদাইশ, বনিস্‌বত, মহব্বত, স্যাহী' ইত্যাদির পরিবর্তে পরীক্ষা, বৃক্ষ, উৎপত্তি, অপেক্ষা, প্রীতি, মসি' ইত্যাদি লেখা হয় তবে বাঙালী আসামী ওড়িয়া গুজরাটী মারাঠী ও দক্ষিণ-ভারতবাসী সকলেরই বুঝতে সুবিধা হবে। ভারত সংবিধানের ৩৫১ অনুচ্ছেদে আছে হিন্দী ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য মুখ্যত সংস্কৃত থেকে এবং গৌণত অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করা হবে।

হিন্দী ভাষা একটা বোঝা হয়ে হঠাৎ আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে এই ভেবে উদ্‌বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এর একটা লাভের দিকও আছে, তা বাঙালী লেখকদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। ব্যবসায় বুদ্ধির যতই অভাব থাকুক একটি বিষয়ে বাঙালী এখনও এগিয়ে আছে। বাংলা সাহিত্য হিন্দী প্রভৃতির চেয়ে সমৃদ্ধ, পরিমাণে না হলেও গুণে শ্রেষ্ঠ। বাংলা কাব্য ইতিহাস দর্শন ইত্যাদির মর্যাদা যতই থাকুক, পাঠক বেশী নয়। কিন্তু পণ্য হিসাবে বাংলা গল্পগ্রন্থের আদর আছে। অনেক বাংলা গল্পের হিন্দী গুজরাটী তামিল প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, অনেক অবাঙালী সাগ্রহে মূল বাংলা গ্রন্থ পড়ে থাকেন। উদারস্বভাব অবাঙালী পাঠক বাংলা গল্পের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করতে দ্বিধা করেন না।

ভাষা ভাবের বাহন মাত্র। বাংলা সাহিত্যের বা বাংলা গল্পের উৎকর্ষ বাংলা ভাষার জন্য নয়, বাঙালী লেখকের স্বাভাবিক পটুতার জন্য। বাঙালী সাহিত্যিক যদি হিন্দী ভাষা আয়ত্ত ক'রে হিন্দীতে লেখেন তবে তাঁর পুস্তক সর্বভারতে প্রচারিত হবে, ক্রেতা বহু গুণ বেড়ে যাবে। যারা অল্প বয়স থেকে হিন্দী শিখছেন তাঁদের যদি ভবিষ্যতে শখ হয় তবে অনায়াসে হিন্দীতে গল্প লিখতে পারবেন। এর জন্য অপর প্রদেশের সমাজে মিশতে হবে, তাঁদের আচার ব্যবহার জানতে হবে। প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে তা সুসাধ্য। যদি কেবল বাঙালী সমাজ নিয়ে হিন্দীতে গল্প লেখা হয় তা হলেও তার ভারতব্যাপী কাটতি হবে। লেখকের ক্ষমতা আর পাঠকের রুচির সামঞ্জস্য করে বলা যেতে পারে যে, গল্পের পাত্র-পাত্রী যদি কতক বাঙালী আর কতক অন্যপ্রদেশবাসী হয় তবেই সব চেয়ে ভাল ফল হবে। যারা বাংলা গল্প লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন এবং বিহারী উত্তরপ্রদেশী প্রভৃতি সমাজের সঙ্গে পরিচিত, স্থবির না হলে তাঁরা হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করে এই কাজে নামতে পারেন। ফরাসী জার্মান চেক হাঙ্গেরীয় পোল প্রভৃতি অনেক বিদেশী ইংরেজীতে লিখে যশস্বী হয়েছেন। তাঁদের ভাষায় সময়ে সময়ে ভুল হয়, তার জন্য একটু-আধটু উপহাসও সইতে হয়। কিন্তু রচনার গুণাধিক্যে তাঁদের ছোট ছোট ত্রুটি চাপা পড়ে যায়।

বাঙালী সাহিত্যিকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এঁদের জনকতক যদি হিন্দীতে মন দেন তা হলে বাংলা সাহিত্য নিঃস্ব হবে না। এঁদের প্রভাবে হিন্দী ভাষাও ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষার নিকটতর হবে। নগেন্দ্র গুপ্ত, প্রভাত মুখো এবং চারু বন্দ্যো তাঁদের অনেক গল্পে বিহারী ও উত্তরপ্রদেশী পাত্র-পাত্রীর অবতারণা করেছেন। এইসকল গল্প হিন্দীতে লেখা হলে ভারতব্যাপী সমাদর পেত। উপেন্দ্র গঙ্গো, শরদিন্দু বন্দ্যো, বিভূতি মুখো এবং বনফুলের অনেক গল্পে অবাঙালী নরনারীর মনোজ্ঞ চিত্র আছে। এঁরা বহুকাল বাংলা দেশের বাইরে বাস করেছেন, সেখানকার সমাজের খবর রাখেন, অল্পাধিক হিন্দী জানেন, এবং সকলেই ভূরিলেখক। মাতৃভাষা চর্চায় ক্ষান্ত না হয়েও এঁরা মাঝে মাঝে মাতৃষ্বসার ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

১৩৫৮

# সাহিত্যিকের ব্রত

সাহিত্যের স্থূল অর্থ একজনের চিন্তা অনেককে জানানো। বিষয় অনুসারে সাহিত্য মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণী তথ্যমূলক, তার উদ্দেশ্য বিভিন্ন বিদ্যার আলোচনা, স্থান কাল ঘটনা বা পদার্থের বিবরণ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনচরিত ইত্যাদি। দ্বিতীয় শ্রেণী প্রচারমূলক, তার উদ্দেশ্য ধর্ম সমাজ রাজনীতি প্রভৃতি সংক্রান্ত মতের অথবা পণ্যদ্রব্যের মহিমা খ্যাপন। তৃতীয় শ্রেণী ভাবমূলক, রসোৎপাদন বা চিত্তবিনোদনই মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু তার সঙ্গে অল্পাধিক তথ্য আর প্রচারও থাকতে পারে। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের বিষয় ও ক্ষেত্র নিরূপিত, তাতে অবান্তর বিষয় আলোচনার স্থান নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীরও প্রতিপাদ্য ও ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, কিন্তু পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য অবান্তর প্রসঙ্গেরও সাহায্য নেওয়া হয়। তৃতীয় শ্রেণীর উদ্দেশ্য রসোৎপাদন, কিন্তু ক্ষেত্র সুবিস্তৃত, উপজীব্য অসংখ্য, সাধনের উপায়ও নানাপ্রকার। কাব্য নাটক গল্প এবং belles letters জাতীয় সন্দর্ভ এই শ্রেণীতে পড়ে। সেকালে কাব্য বা সাহিত্য বললে এইসব রচনাই বোঝাত। আজকাল কাব্যের অর্থ সংকুচিত হয়েছে, সাহিত্যের অর্থ প্রসারিত হয়েছে। এখনও সাহিত্য-শব্দ প্রধানত পুরাতন অর্থে চলে, তথাপি শেষোক্ত শ্রেণীর একটি নূতন দ্ব্যর্থহীন সংজ্ঞা হলে ভাল হয়। বোধ হয় 'ললিত সাহিত্য' চলতে পারে।

সাধারণত রচনার প্রকৃতি বা বিষয় অনুসারে রচয়িতার পরিচয় দেওয়া হয়, যেমন কবি, নাট্যকার, গল্প লেখক, ইতিহাস লেখক, শিশুসাহিত্য লেখক ইত্যাদি। এককালে কদাচিৎ জাতি অনুসারে লেখককে বিশেষিত করা হ'ত, যেমন মহিলা কবি, মুসলমান কবি ; কিন্তু এখন আর তা শোনা যায় না। জীবিকা অনুসারেও লেখককে চিহ্নিত করার রীতি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র অন্নদাশংকর আর অচিন্ত্যকুমারকে হাকিম-সাহিত্যিকের শ্রেণীতে এবং তারক গঙ্গোপাধ্যায় কোনান ডয়েল আর বনফুলকে ডাক্তার-সাহিত্যিকের শ্রেণীতে ফেলা হয় না।

যিনি ললিত সাহিত্য লেখেন তাঁর বিশেষ মতামত থাকতে পারে, কিন্তু তার জন্য তাঁকে কোন মার্কা-মারা দলভুক্ত মনে করার কারণ নেই। লেখক নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী বা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসী হতে পারেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে যোগবলের প্রভাব মানতে পারেন, বিলাতী সভ্যতার পরম ভক্ত বা সোভিএট তন্ত্রের একান্ত অনুরাগী হতে পারেন, কিন্তু এই সব লক্ষণ অনুসারে ললিত সাহিত্যের উৎকর্ষ মাপা হয় না। লেখকের রচনায় তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উল্লেখ থাকতে পারে, কিন্তু রসবিচারের সময় তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

সেকালের তুলনায় একালের ললিত সাহিত্যের উপজীব্য অনেক বেড়ে গেছে। স্বদেশী, রাজদ্রোহ, অসহযোগ, আগস্ট-বিপ্লব, পঞ্চাশের মন্বন্তর, স্বাধীনতা লাভ ও দেশভাগের আনুষঙ্গিক হত্যাকাণ্ড, বাস্তুত্যাগীর দুর্দশা, দেশব্যাপী অসাধুতা—

সমস্তই কাব্য গল্প ও প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। সহৃদয় লেখক নরনারীর সাহস ও বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, অন্যায় দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, নির্যাতন দেখে কাতর হয়েছেন, এবং বিগত ও বর্তমান ঘটনাবলী থেকে বীর করুণ বীভৎস ও ভয়ানক রসের উপাদান নিয়ে নিজের উপলব্ধিকে সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। এ প্রকার রচনার সঙ্গে লেখকদের রাজনীতিক মনের কোনও সম্বন্ধ নেই।

ললিত সাহিত্যের এই নিরপেক্ষতা সম্প্রতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। প্রায় দশ বৎসর পূর্বে ফাসিস্ট-বিরোধী লেখক-সংঘের উদ্ভব হয়েছিল। তার কিছুকাল পরে কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘ গঠিত হয়। কমিউনিস্ট লেখক ও শিল্পীদেরও সংঘ আছে। হিন্দু-মহাসভা, সমাজতন্ত্রী দল এবং প্রজা-পার্টি থেকে লেখক-সংঘ গঠনের চেষ্টা হচ্ছে কিনা জানি না।

কাব্য নাটক বা গল্প অবলম্বন করে মতপ্রচারের রীতি নূতন নয়। এদেশের অনেক প্রাচীন কাব্যে দেবতা বিশেষের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। টমকাকার কুটীর এবং নীলদর্পণ একাধারে ললিত সাহিত্য ও প্রচারগ্রন্থ। বসন্তের টিকা না নেওয়ার পরিণাম কি ভয়ানক হতে পারে তা রাইডার হ্যাগার্ড ব্রিটিশ সরকারের ফরমাশে লেখা একটি উপন্যাসে দেখিয়েছেন। এমিল ব্রিও যৌন ব্যাধি সম্বন্ধে নাটক লিখেছেন। ইওরোপ আমেরিকার অনেক গল্প আর নাটকে সামাজিক ও রাজনীতিক মতের প্রচার আছে।

কোনও কাব্য নাটক বা গল্পে যদি মতবিশেষের সমর্থন থাকে তাতে আপত্তি করবার কিছু নেই। ললিত সাহিত্যের লেখক অবসরকালে চা সিগারেট বা কেশ-তৈলের বিজ্ঞাপন লিখতে পারেন, কিংবা তাঁর গল্পের মধ্যেই অহিংসা কংগ্রেসনিষ্ঠা হিন্দুজাতীয়তা বা কমিউনিস্ট আদর্শের প্রশংসা করতে পারেন। লেখক অলেখক নির্বিশেষে রাজনীতিক সংঘ, গোষ্ঠী বা ক্লাব গঠনের অধিকারও সকলের আছে। কিন্তু যাঁরা মতের লেবেল দিয়ে লেখক-সংঘ গঠন করেন, সাধারণে তাঁদের একটু সন্দিগ্ধভাবে দেখে, মনে করে এঁদের চোখে রাজনীতির ধুলো লেগেছে, এঁরা সত্য-সন্ধানী নিরপেক্ষ দৃষ্টি হারিয়েছেন।

রাজনীতিক নাম দিয়ে সাহিত্য-সংঘ গঠনের উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা না গেলেও কিছু কিছু অনুমান করা যায়। সাহিত্যসেবীর দলবদ্ধ হয়ে রাজনীতিক লেবেল ধারণ একরকম ব্রত। এই ব্রতধারীদের সংকল্প—এঁরা নিজ নিজ রচনার দ্বারা যথাসম্ভব দলীয় মতের প্রচার এবং বিপক্ষ মতের খণ্ডন করবেন। দল না বেঁধেও এঁরা এই কাজ করতে পারতেন, কিন্তু সংঘের অনুশাসন না থাকলে একনিষ্ঠ সমক্রিয়তা আসে না।

এই দলবন্ধনের ফলে প্রচারের সুবিধা হতে পারে। কিন্তু ললিত সাহিত্যের রচয়িতা পাঠক ও বিচারকের পক্ষে যে নিরপেক্ষতা অত্যন্ত আবশ্যক তা লেবেলের জন্য ব্যাহত হয়। সাহিত্যে বিজ্ঞাপনের গন্ধ এসে পড়ে, মনে হয় লেখকের স্বাধীনতা নেই, তিনি দলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন। যে পাঠক কমিউনিস্ট তন্ত্রের অনুরাগী তিনি কংগ্রেসী লেখকের রচনায় বুর্জোআ স্বার্থবুদ্ধি দেখতে পান। যিনি কংগ্রেসী পন্থায় বিশ্বাসী তাঁর কাছে মার্কা-মারা কমিউনিস্ট লেখকের রচনা অবোধ্য বা দুষ্ট অভিসন্ধি যুক্ত মনে হয়। যে লেখক দলভুক্ত না হয়ে স্বতন্ত্রভাবে নিজের মত প্রকাশ করেন তিনি পাঠকবর্গের কাছে অধিকতর সুবিচার পেয়ে থাকেন।

রাজনীতি ছাড়াও অনেক বিষয় আছে যাতে দলগত বিবাদ নেই, যার সঙ্গে দেশের মঙ্গলামঙ্গল অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, যার গুরুত্ব অন্য সমস্ত বিষয়ের চেয়েও বেশী। কালোবাজার, প্রতারণা, অমানুষিক স্বার্থপরতা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক লেখা হয়েছে, কিন্তু তা ছাড়াও ছোট বড় যেসব পাপ আমাদের বর্তমান সমাজে মহামারীর মতন ব্যাপ্ত হচ্ছে তার প্রতিবিধানের জন্য সকল সাহিত্যিকই চেষ্টা করতে পারেন।

পূর্বে শোনা যেত যে আমাদের জাতিগত যত দোষ তার মূল হচ্ছে পরাধীনতা, দেশ স্বাধীন হলেই সকল দোষ ক্রমশ দূর হবে। স্বাধীনতা এসেছে কিন্তু দোষ আগের চেয়ে বেড়েই চলেছে, যা পূর্বে ছিল না তাও দেখা দিয়েছে। এই দোষ-বৃদ্ধির এক কারণ আমাদের রাষ্ট্রশাসনে অভিজ্ঞতার অভাব, তার চেয়ে বড় কারণ যুদ্ধজনিত জগদ্‌ব্যাপী বিপর্যয়। যে সব পাশ্চাত্ত্য জাতি বহুকাল স্বাধীনতায় অভ্যস্ত তাদেরও নৈতিক অধোগতি হয়েছে, কিন্তু আমাদের মতন হয় নি। আসল কথা, আমরা যতই ধর্মপ্রাণ জাতি বলে গর্ব করি, আমাদের ধর্মবোধ অর্থাৎ সামাজিক কর্তব্যবোধ বহুকাল থেকেই ক্ষীণ, যেটুকু ছিল যুদ্ধের ধাক্কায় তাও নষ্ট হয়েছে, অনভ্যস্ত প্রভুশক্তি আর নব নব ব্যবস্থার সুযোগ পেয়ে দেশের অনেকে নিরঙ্কুশ স্বার্থ-সর্বস্ব হয়েছে, সাধু লোকও অভাবের তাড়নায় বা অপরের দৃষ্টান্তে অসাধু হয়েছে।

সকলের চোখের সামনে নিত্য যে সব অন্যায় ঘটছে তার প্রতিরোধের প্রয়োজন আজ সমস্ত রাজনীতিক বিবাদের উপরে। কংগ্রেস রাজত্বের বদলে সমাজতন্ত্রী হিন্দুমহাসভা কিষান-মজদুর-প্রজা বা কমিউনিস্ট শাসন এলেই আমাদের চরিত্র শুধরে যাবে এমন মনে করবার কোনও কারণ নেই। আমাদের বর্তমান দুর্দশার অনেকটার জন্য আমরা দায়ী নই তা ঠিক, কিন্তু যে দোষ আমাদের প্রকৃতিগত তার প্রতিকার আমাদেরই হাতে, কোনও সরকারের তা দূর করার শক্তি নেই।

ধর্মের অর্থ সমাজহিতকর বিধি, ধর্মপালনের অর্থ সামাজিক কর্তব্যপালন। এই ধর্মবোধ লুপ্ত হওয়ায় সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছে, অসংখ্য বীভৎস লক্ষণ সমাজদেহে ফুটে উঠেছে। ধনপতির তোষণ, দরিদ্রের শোষণ, কালোবাজারের প্রসার, সরকারী অর্থের অপব্যয়, উচ্চস্তরের কলঙ্ক চেপে রাখা, ইত্যাদি বড় বড় অপকীর্তির কথা অনেক পত্রিকায় থাকে, লোকের মুখে মুখেও রটনা হয়। কিন্তু যে সব অনাচার জন-সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে তার দিকে বিশেষ মন দেওয়া হয় না। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। অনেকে সজ্ঞানে এবং আরও অনেকে ভেড়ার পালের মতন অজ্ঞানে দুষ্ট লোককে ভোট দেয়। যে লোক দুষ্কর্ম ক'রে ধনী হয়েছে তার সঙ্গে কুটুম্বিতা করবার জন্য সাধু লোকেও লালায়িত। অমুক অমুক দুষ্কর্ম ক'রে বড়লোক হয়েছে, তুমিই বা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে থাকবে কেন—এই রকম প্ররোচনা অনেক গৃহস্থ তাঁর পরিবারবর্গের নিকট পেয়ে থাকেন। ঘুষ দেওয়া আর নেওয়া চিরকালই ছিল কিন্তু এখন সহস্রগুণ বেড়ে গেছে। ছাত্রেরা না পড়েই পাস করতে এবং গায়ের জোরে ডিক্‌টেটার হতে চায়। সরস্বতী পূজা আর দোলের সময় যে কদর্য উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায় তাতে মনে হয় আমরা বন্য জাতির সগোত্র। শহরের অনেক রাস্তা নৈশ পায়খানায় পরিণত হয়েছে। বাড়ির উপরতলা থেকে কাগজে মোড়া ময়লা অকস্মাৎ পথচারীর গায়ে এসে পড়ে। বোম্বাই আর মাদ্রাজের সঙ্গে কলকাতার রাস্তা বাজার খাবারের দোকান ইত্যাদি মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় আমাদের পৌর নিগম কত

অক্ষম, শহরবাসীর পরিচ্ছন্নতা বোধ কত অল্প। যে সব খ্যাতনামা পুরুষের মূর্তি দেশবাসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিজ্ঞাপনের কাগজ এঁটে তার অপমান করা হয়, আমরা তাতে দৃক্‌পাত করি না ; অবশেষে যখন স্টেট্‌সম্যান কাগজে এই অনাচারের খবর ছাপা হয় তখন আমাদের হুঁশ হয়। ভদ্র গৃহস্থ ঔষধ আর প্রসাধন দ্রব্যের আধার অতি সাবধানে লেবেল নষ্ট না করে তুলে রাখে এবং জালিয়াতের প্রতিনিধি ফেরিওয়ালার কাছে তা বেশী দামে বেচে। জাল ভেজাল আর নকল দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। গুরুতর অপকীর্তির তুলনায় উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হয়তো তুচ্ছ, কিন্তু এইসব সামান্য লক্ষণ থেকেই বোঝা যায় যে সমাজের আপাদমস্তক ব্যাধিত হয়েছে।

আমরা এখনও নিজের অক্ষমতার জন্য ইংরেজ, কেন্দ্রীয় সরকার আর অন্যপ্রদেশ-বাসীকে গাল দিয়ে মনে করি আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গেল। ছেলেবেলায় একটি দেশপ্রেমের কবিতা পড়েছিলাম, তার কেবল প্রথম লাইনটি মনে আছে—মহাপাপী সাবুদ্দিন রাহু-গ্রাসে যেই দিন। তারপর যা আছে তার ভাবার্থ—সেই রাহুগ্রাসের পরেই ভারতের সুখসূর্য অস্তমিত হল। সাবুদ্দিন মহাপাপী হতে পারে, কিন্তু আত্মরক্ষায় অসমর্থ সংহতিহীন ভারতবাসীর পাপ কত বড় লেখক তা বলেন নি। কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত আমাদের রক্ষার ভার বিদেশীর হাতে ছিল, এখন আমরা ভারত সরকারের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। আত্মরক্ষা সকলেরই শিখতে হবে, আমাদের জোরেই সরকারের জোর—এই সত্য এখনও দেশবাসীর বোধগম্য হয় নি। আমাদের যে খ্যাতি আছে তা প্রতিঘাতসমর্থ শান্ত অহিংস বীরের খ্যাতি নয়, কাপুরুষের খ্যাতি। হিন্দু অতি নিরীহ, মার খেতেই জানে, বাঙালী কাঁদতেই জানে —তর্ক করে এইসব অপবাদ দূর করা যায় না, আচরণ দ্বারা খণ্ডন করতে হবে।

ব্যক্তিগত রাজনীতিক মত যাই থাকুক, আমাদের সকল লেখকই তাঁদের রচনা দ্বারা দেশব্যাপী মোহ আলস্য আর দুষ্প্রবৃত্তি দূর করার চেষ্টা করতে পারেন। এর চেয়ে বড় ব্রত এখন আর কিছু নেই। জনকতক রাজনীতি নিয়ে বিতণ্ডা করুন, কিন্তু রাজনীতির চেয়ে মনুষ্যত্ব আর সমাজধর্ম বড়। দেশের সাহিত্যিকরা সামাজিক কর্তব্য-বুদ্ধি জাগরিত করবার চেষ্টা করুন। আমাদের প্রয়োজন—হ্যারিয়েট বীচার স্টো এবং দীনবন্ধু মিত্রের ন্যায় শক্তিশালী বহু লেখক—যাঁরা সামাজিক পাপের বিরুদ্ধে জন-সাধারণকে উত্তেজিত করতে পারবেন। দু-তিন বৎসর পূর্বে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ছোট প্রবন্ধে বিলাসী বাঙালীকে কিছু কড়া কথা শুনিয়েছিলেন। মনে হয় প্রমথনাথ বিশীরও এই ধরনের লেখা পড়েছি। সম্প্রতি কবিশেখর কালিদাস রায় বর্তমান অবিনয় অসংযম আর অসামাজিকতা সম্বন্ধে একটি সার্থক প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধ প্রধানত ছাত্র আর অল্পবয়স্কের উদ্দেশ্যে লেখা, কিন্তু তাঁর মৃদু বেত্রাঘাত আবালবৃদ্ধবনিতা আমাদের সকলেরই পিঠে পড়েছে।

১৩৫৮

# ভারতীয় সাজাত্য

ভারতবাসী মুসলমানের বিরুদ্ধে এই নালিশ মাঝে মাঝে শোনা যায় যে যদিও তাদের উৎপত্তি ও নিবাস এই দেশে এবং হিন্দুদের সঙ্গেই রক্তের যোগ বেশী তথাপি তারা আরব-ইরান-তুর্কিকে পিতৃভূমি এবং ওইসব দেশের লোককে নিকটতর আত্মীয় মনে করে। তাদের দৃষ্টিতে ধর্মের ঐক্যই মিলনের প্রধান সেতু। মাতৃভূমি ভারতের সঙ্গে তারা সম্বন্ধ গণনা করে গজনির সুলতানদের আক্রমণকাল থেকে, তার আগেকার ভারতকে তারা স্বদেশ মনে করে না। এদেশের অন্যধর্মী লোকের সঙ্গে তাদের শুধু রাজনীতির সম্পর্ক আছে, সাজাত্যবোধ এবং সংস্কৃতির যোগ নেই।

উক্ত নালিশের বিরুদ্ধে মুসলমানরা হিন্দুদের বলতে পারে—তোমাদের আলাদা পিতৃভূমি নেই তথাপি তোমরা একটা কাল্পনিক পিতৃলোক বানিয়েছ এবং তা থেকেই ধর্ম আর সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করেছ। ভারতের যারা অতিপ্রাচীন অধিবাসী তাদের তোমরা অসভ্য অস্পৃশ্য বলে উপেক্ষা করেছ। তোমরা প্রচার করে থাক যে ভারতীয় মুসলমান হিন্দুরই স্বজাতি, অথচ তাদের ম্লেচ্ছ বলে দূরে ঠেলে রেখেছ, অপমানও করেছ। যাদের সঙ্গে তোমাদের বংশগত সম্পর্ক নগণ্য সেই আর্য জাতি এবং বেদ-পুরাণোক্ত ঋষিগণকেই তোমরা আপন জন মনে কর। কোনও ভারতীয় মুসলমান যদি নিজেকে সৈয়দ অর্থাৎ পয়গম্বরের বংশধর বলে তবে তোমরা মনে মনে হাস, অথচ তোমাদের ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যরা অম্লান বদনে বলে থাকে যে তারা কশ্যপ ভরদ্বাজ শক্তি প্রভৃতি আর্য ঋষিদের গোত্রজাত, তোমাদের ক্ষত্রিয়রা মনে করে তারা চন্দ্র-সূর্যবংশের সন্তান। আসল কথা, আমাদের ধর্ম ঐতিহ্য সংস্কার রুচি আদর্শ ও রীতিনীতি যেমন বহু অংশে বিজাতীয় তোমাদেরও তেমনি। তফাত এই যে আমাদের ইতিহাসের একটা সুনির্দিষ্ট আরম্ভ আছে—ইসলামের অভ্যুদয়, কিন্তু তোমাদের তা নেই। সেজন্য পুরাকালে পিছিয়ে গিয়ে বেদ-পুরাণের উপকথার মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে তোমরা নিজেদের ইতিহাস খুঁজছ।

কোনও জাতি যদি চিরকাল অভেদ্য প্রাচীরের মধ্যে বাস করে তবেই তার ধর্ম সমাজব্যবস্থা সংস্কৃতি ইত্যাদি স্বতন্ত্র ও অনন্যভাবে গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সাধারণত তা দেখা যায় না, এক জাতির উপর অন্যান্য জাতির প্রভাব নানাভাবে এসে পড়ে। রক্তের মিশ্রণ, বিজাতির অধীনতা বা বিধর্ম গ্রহণ যদি নাও হয় তথাপি পরিবর্তন আসতে পারে। আরবজাতি মুসলমান হবার পরেও প্রাচীন গ্রীসের দর্শন-বিজ্ঞান বিনা দ্বিধায় আত্মসাৎ করেছিল এবং মধ্যযুগের ইওরোপ আরবদের কাছ থেকেই গ্রীক বিদ্যা লাভ করেছিল। বর্তমান ইওরোপীয় ও আমেরিকান জাতিসকল প্রধানত খ্রীষ্টান, পেগান গ্রীক ও রোমানদের সঙ্গে তাদের ধর্মগত যোগ নেই, বংশগত যোগও বিশেষ কিছু নেই, তথাপি তাদের সংস্কৃতির উপর প্রাচীন গ্রীক ও রোমান জাতির অপরিসীম প্রভাব এসে পড়েছে। ইওরোপ আমেরিকার শিক্ষিত জন সকলেই স্বীকার করেন যে অতিপ্রাচীন বিভিন্ন জাতি থেকে তাদের উৎপত্তি

হয়েছে, পশ্চিম এশিয়া থেকে তাঁরা খ্রীষ্টধর্ম পেয়েছেন, গ্রীস রোম থেকে সভ্যতার বীজ স্বরূপ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্য স্থাপত্য প্রভৃতি বিদ্যা পেয়েছেন. তাঁদের সংস্কৃতির অবশিষ্ট অংশ তাঁরা নিজের যত্নে এবং প্রতিবেশী জাতিদের সহায়তায় গড়ে তুলেছেন।

সেকালের ভারতবাসী পুরাণোক্ত সৃষ্টতত্ত্বে ও জাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করত। ষাট-সত্তর বৎসর আগেকার বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায় ম্যাক্সমূলার প্রভৃতির লেখা পড়ে স্থির করেছিলেন যে আর্যাবর্তের অন্যান্য অধিবাসীর ন্যায় বাঙালী (বিশেষত ভদ্র বাঙালী) আর্যজাতি-সম্ভূত। ইংরেজ জার্মান তাঁদেরই প্রাচীন জ্ঞাতি, কিন্তু তারা ভ্রষ্ট আর্য. বৈদিক আর্যই আদি আর্য।

আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুর আর্যতার মোহ দূর হয়েছে। জাতিবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে অনেকে এখন বুঝেছেন যে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সকলেই সংকর, অতিপ্রাচীন অস্ট্রাল মোংগল ভূমধ্য প্রভৃতি জাতি থেকে তাদের উৎপত্তি, কিঞ্চিৎ নর্ডিক রক্তও কারও কারও দেহে আছে। এই সংকরত্ব সর্বত্র সমান নয়, বিভিন্ন মিশ্রণের ফলে এবং বংশগতির নিয়মে ভারতবাসী নানাপ্রকার দেহলক্ষণ পেয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন নরজাতির থেকে তারা শুধু দৈহিক উপাদান পায় নি তাদের সংস্কার অর্থাৎ জাতকর্ম বিবাহ অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি রীতি. নানাপ্রকার সামাজিক বিধি-নিষেধ. ভারতীয় লিপি, জ্যোতিষ. দার্শনিক মত. কৃষিপদ্ধতি. বাস্তুকর্ম. মাটি পুড়িয়ে ইট তৈরি. লোহাপাথর থেকে লোহা তৈরি. বন্য ঘোড়া বশ করে তার পিঠে চড়া আর রথে জোতা. কাপড় সেলাই করে জামা-ইজার তৈরি প্রভৃতি অসংখ্য প্রথা বিদ্যা আর কৌশল লাভ করেছে।

ভারতীয় হিন্দুর পৃথক পিতৃভূমি নেই. অর্থাৎ ভারতের বাইরে এমন কোনও দেশ নেই যেখানে হিন্দুধর্ম প্রথমে উদ্‌ভূত হয়েছিল এবং যেখানে এখনও হিন্দু আছে। বৈদিক আর্যগণের আদিভূমি উত্তর মেরুর কাছে বা চীন-তুর্কিস্থানে বা উত্তর-পারস্যে হতে পারে. কিন্তু এখন সেখানে হিন্দু নেই। মুসলমানের যেমন আরব ইরান তুর্কি আছে হিন্দুর সেরকম কিছু নেই. তার ফলে হিন্দুর সাজাত্যবোধ এবং সমস্ত ঐতিহ্য ভারতেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। হিন্দুর ধর্ম ভারতেই উৎপন্ন হয়েছে তার উপাদান শুধু বেদ আর তন্ত্র নয়. বৌদ্ধ জৈন মুসলমান খ্রীষ্টান এবং আদিম জাতির ধর্মও তাকে প্রভাবিত করেছে। হিন্দুর রক্ত, সংস্কার. ধর্ম কিছুই অবিমিশ্র নয়। ভারতে উদ্‌ভূত অতি জটিল হিন্দু সংস্কৃতির সংগে গত দেড় শ বৎসরে ইওরোপীয় সংস্কৃতিরও যোগ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে।

স্বধর্মনিষ্ঠার সংগে অনেক ক্ষেত্রে স্বধর্মচ্যুতির অকারণ আশংকা জড়িত থাকে। গোঁড়া হিন্দু ভক্ষ্য-অভক্ষ্য, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, কৃত্য-অকৃত্য, কাল-অকাল প্রভৃতি বিচার করে সাবধানে জীবনযাপন করে। মিথ্যা কথা. প্রতারণা বা পরস্বাপহরণে ধর্ম-চ্যুতি হয় না. কিন্তু গ্রহণের সময় খেলে বা বিধবাকে গহনা পরতে দিলে হয়। সাধুতার চেয়ে লোকাচার বড় এই ধারণা সকল ধর্মের গোঁড়া লোকের মধ্যে আছে। যারা স্মরণীয় কালের মধ্যে ধর্মান্তর নিয়েছে অথবা সমাজের এক স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উঠেছে তাদের মধ্যে পূর্বধর্মের ছোঁয়াচ লাগবার প্রবল আশংকা দেখা যায়। পৌত্তলিকতা প্রতিরোধের জন্য মুসলমান ধর্মে যত কঠিন বিধি আছে খ্রীষ্টধর্মের কোনও শাখায় ততটা দেখা যায় না। এই সব বিধিনিষেধের আদি কারণ মুসলমান সমাজবিজ্ঞানীরা বলতে পারেন। এর মূলে এই আশঙ্কা থাকতে পারে যে পূর্ব-

পুরুষদের উৎসববহুল সরস ধর্মের প্রতি লোকের একটা প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ আছে, একটু অসতর্ক হলেই পতন হবে। হিন্দুর অনেক নিয়মের মূলেও হয়তো এই ধারণা আছে যে লংঘন করলেই অনার্যতার মোহময় পঙ্কে পড়তে হবে। শিক্ষিত বাঙালী খ্রীষ্টানদের মধ্যেই এই শুচিবাতিক দেখা যেত, কিন্তু এখন বোধ হয় কমে গেছে। এককালে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের উপর অনেক সামাজিক নির্যাতন হয়েছে। দেশী খ্রীষ্টান-দের উপর তেমন কিছু হয় নি, কারণ তাঁরা সাহেব পাদরীর আশ্রিত। অসহায় ব্রাহ্মরা আত্মরক্ষার জন্য গোঁড়া হিন্দুদের সংশ্রব যথাসম্ভব পরিহার করতেন এবং স্বধর্মচ্যুতির ভয়ে পৌত্তলিকতার সকল চিহ্ন এড়িয়ে চলতেন। সুখের বিষয়, শিক্ষিত হিন্দুর গোঁড়ামি আর অনুদারতা আজকাল অনেক কমে গেছে, ব্রাহ্মদেরও স্বতন্ত্রভাব এবং ধর্মচ্যুতির আতঙ্ক পূর্বের মতন নেই।

রবীন্দ্রনাথ 'সমাজ' পুস্তকে 'আত্মপরিচয়' নামক প্রবন্ধে হিন্দুত্বের এই অর্থ দিয়েছেন—

হিন্দু সমাজে যে-সম্প্রদায় কিছুদিন ধরিয়া যে ধর্ম, এবং যে আচারকেই হিন্দু বলিয়া মানিয়া আসিয়াছে তাহাই তাহার পক্ষে হিন্দুত্ব এবং তাহার ব্যতিক্রম তাহার পক্ষেই হিন্দুত্বের ব্যতিক্রম।

রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন—

আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি—ইচ্ছা করিলে আমি অন্য সম্প্রদায়ে যাইতে পারি, কিন্তু অন্য সমাজে যাইব কি করিয়া। সে সমাজের ইতিহাস তো আমার নয়। গাছের ফল ঝাঁকা হইতে অন্য ঝাঁকায় যাইতে পারে, কিন্তু এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ফলিবে কি করিয়া! তবে কি মুসলমান বা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পারো? নিশ্চয়ই পারি।... বাংলা দেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজেদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দুমুসলমান। কোনো হিন্দু পরি-বারে এক ভাই খ্রীষ্টান, আর এক ভাই মুসলমান, ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতা-মাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে এই কথা কল্পনা করা কখনই দুঃসাধ্য নহে... কারণ ইহাই যথার্থ সত্য, সুতরাং মঙ্গল ও সুন্দর।...মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোনও বিশেষ ধর্ম নহে।

রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাপক অর্থে হিন্দু শব্দ প্রয়োগ করেছেন সে অর্থ এখন চলবার কোনও সম্ভাবনা নেই। হিন্দু শব্দের আধুনিক অর্থ দাঁড়িয়েছে—ভারতজাত ধর্মা-বলম্বী। বৌদ্ধ জৈন শিখ ব্রাহ্ম সনাতনী—এরা হিন্দু, কিন্তু মুসলমান খ্রীষ্টান হিন্দু নয়। যদি এই সংকীর্ণ সংজ্ঞার্থের প্রচলন নাও হত তথাপি কোনও মুসলমান হিন্দু নামের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইত না। রবীন্দ্রনাথ যে সাজাত্যবোধ কামনা করে-ছিলেন তা এখন 'ভারতীয়' নামের উপর গড়ে উঠতে পারে।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতে nationality বা সাজাত্যের কারণ—নিবাস, উৎপত্তি (origin), ভাষা, ধর্ম, ঐতিহ্য (tradition), সংস্কৃতি, স্বার্থের ঐক্য। কোনও রাষ্ট্রে ঐক্য পুরোপুরি না থাকলেও সাজাত্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারে। মার্কিন রাষ্ট্রে উৎপত্তি আর ঐতিহ্যের ঐক্য নেই, ধর্মও সমান নয় (প্রোটেস্টান্ট, ক্যাথলিক, ইহুদী),

ভাষার ঐক্য প্রয়োজনের বশে হয়েছে। কানাডারও ওই অবস্থা, সেখানে ভাষারও ঐক্য নাই। সুইজারল্যাণ্ডেও উৎপত্তি ভাষা আর ধর্ম সমান নয়। সোভিএট রাষ্ট্রে নিবাস আর স্বার্থ ছাড়া আর কিছুর ঐক্য নেই, ধর্ম সেখানে দুর্বল সেজন্য গণ্য নয়। তথাপি এই সব রাষ্ট্রের অধিবাসীরা সাজাত্য লাভ করেছে। সমগ্র ভারত-রাষ্ট্রে উৎপত্তি আর ভাষার যতই ভেদ থাকুক, প্রদেশের (রাজ্যের বা স্টেটের) মধ্যে ভেদ সর্বত্র নেই, পশ্চিমবঙ্গে মোটেই নেই, স্বার্থও সকলের সমান।

ভারত-পাকিস্থান বিরোধ মিটতে হয়তো অনেক সময় লাগবে, কিন্তু ভারতীয় প্রজার মধ্যে প্রীতি ও সাজাত্যবোধ প্রতিষ্ঠায় দেরি করা চলবে না। হিন্দু আর মুসলমান পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখে এ কথা চাপা দিয়ে লাভ নেই। এই অপ্রীতির কারণ নিয়ে দুই পক্ষের অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। কার দোষ কত তার আলোচনা না করে এখন মিলনের উপায় খোঁজাই দরকার। পরিবার গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র সর্বত্রই মিলনের সূত্র প্রধানত মানসিক বা ভাবগত—সমান মন্ত্র, সমান উদ্দেশ্য, সমান মন, সমান আকূতি। যদি ধর্ম সমান হয় এবং নিষ্ঠা মোহমুক্ত হয় তবে মিলন সহজেই হতে পারে। কিন্তু যেখানে ধর্ম পৃথক এবং নিষ্ঠা মোহগ্রস্ত সেখানে বিরোধ আনে। মধ্যযুগের ইওরোপে প্রায় সমস্ত বিরোধের মূলে ধর্মান্ধতা। সেই ধর্মান্ধতা এখন নেই, তার স্থানে এসেছে স্বার্থান্ধতা।

বেদ স্মৃতি কোরান শরিয়ত প্রভৃতিতে যা লেখা আছে তাই ধর্ম—এ কথা সত্য নয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে লোকে যেমন আচরণ করে তাই তার ধর্ম। মূঢ় হিন্দুর ধর্মে বলে, মুসলমানেরা দেশের কণ্টক, তাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রেখো না; ভগবান কল্কী যথাকালে অবতীর্ণ হয়ে ধূমকেতুর ন্যায় করাল করবাল দিয়ে ম্লেচ্ছ-নিবহ সংহার করবেন। মূঢ় মুসলমানের ধর্মে বলে, কাফেরকে বধ করলে বা জোর করে কলমা পড়ালে বা তাদের মেয়ে কেড়ে নিলে পাপ হয় না, পুণ্যই হয়। শিক্ষা-বিস্তারের ফলে হিন্দুর ধর্মান্ধতা অনেক কমেছে, মুসলমানেরও ক্রমশ কমবে। সংস্কারমুক্ত হিন্দু মুসলমান যদি পুরোহিত আর মোল্লার আসন অধিকার ক'রে উদার ধর্মমত প্রচার করেন তবে শীঘ্রই সুফল দেখা দিতে পারে।

সাজাত্যের যে সকল কারণ পূর্বে বলা হয়েছে তার মধ্যে দুটি প্রধান কারণ ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি। এই দুটির দ্বারা ধর্ম বিশেষরূপে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের সংস্কৃতির অনেক ঐক্য আছে, অনৈক্য যা দেখা যায় তার মূলে আছে ঐতিহ্যের ভিন্নতা। ঐতিহ্যের যদি সমন্বয় ও প্রসার হয় তবে সংস্কৃতির ভেদ কমে যাবে, ধর্মের নামে যে অপধর্ম চলছে তার সংস্কার হবে।

ভারতের পরম্পরাগত যে ঐতিহ্য তাতে হিন্দু আর মুসলমানের সমান অধিকার। ভ্রান্তির বশে মুসলমান তার পূর্বপুরুষদের এই ঋক্‌থ বর্জন করেছে। এই ভ্রান্তি দূর করতে হবে। প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যায় আর সাহিত্যে শুধু হিন্দুর ওয়ারিসী স্বত্ব নেই, তাতে শুধু বহুদেববাদ আর পৌত্তলিকতা আছে একথাও সত্য নয়। মিশ্রণ থাকলেই তা পরিত্যাজ্য হতে পারে না। নিষ্ঠাবান পাশ্চাত্ত্য খ্রীষ্টানও সাগ্রহে গ্রীক রোমান ঐতিহ্য চর্চা করেন, এমন মনে করেন না যে পেগান শাস্ত্র পড়লে বা পেগান সংস্কৃতির চর্চা করলে তাঁর ধর্মনাশ হবে। মিশর ও ইরান দেশের পণ্ডিতরা তাঁদের অমুসলমান পূর্বপুরুষদের কীর্তি ও ঐতিহ্য আলোচনা করে গৌরব বোধ করেন, এ ভয় তাঁদের নেই যে এতে ইসলামের হানি হবে। বলা যেতে পারে যে পেগান গ্রীক আর রোমান এখন নেই, মিশরের বহুদেববাদীরাও লোপ

পেয়েছে, ইরানের অতি প্রাচীন ধর্মের লেশমাত্র নেই, সেখানে জরথুস্ত্রপন্থী যারা আছে তারা সংখ্যায় নগণ্য; সুতরাং এই সব দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের চর্চা করলে মুসলমানের আদর্শনাশের ভয় নেই। কিন্তু ভারত? এখানে যে হিন্দুরা জলজীয়ন্ত হয়ে বর্তমান রয়েছে, পুরাকালের সমস্ত বিষয় আঁকড়ে ধরে আছে। মুসলমান যদি তার পূর্বপুরুষদের সম্পদে হাত দিতে চায় তবে মাছির মতন মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়বে।

এই যুক্তিহীন আতঙ্ক শিক্ষিত মুসলমানরা দূর করতে পারেন। হিন্দু যখন ভারতীয় বিদ্যার বা কলার চর্চা করে তখন নির্বিচারে করে না, তার আধুনিক রুচি আর শিক্ষা অনুসারেই করে। মুসলমানও তাই করবে। হিন্দুর দৃষ্টিতে যা অনবদ্য মুসলমান তা অবদ্য মনে করতে পারে। হিন্দুর বিশ্বাস থাকতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তাঁর চার হাত ছিল, তিনি অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। মুসলমানের কাছে এসব কথা অশ্রদ্ধেয় হতে পারে, কিন্তু তার জন্য গীতা পড়া চলবে না কেন? আরব্য উপন্যাস আর ওমর খৈয়াম পড়ে হিন্দু আনন্দ পায়, সুফী সাহিত্য তার ভাল লাগে; প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য পড়েও মুসলমান আনন্দ পেতে পারে।

কয়েকজন উদারস্বভাব বাঙালী মুসলমান তাঁদের রচনার দ্বারা হিন্দুর চিত্ত জয় করেছেন। কবি কাইকোবাদ তাঁর একটি কাব্যে হিন্দু নায়িকার মুখে কালীর স্তব দিয়েছেন, তাতে কবির ধর্মনাশ হয় নি, উদারতাই প্রকাশ পেয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সর্বজনপ্রিয় কবিতায় হিন্দু আর ইসলামী ভাবের সমন্বয় করে যশস্বী হয়েছেন। সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর লেখার নূতন ভঙ্গীর জন্য অল্পকালের মধ্যে অসংখ্য পাঠকের প্রিয় হয়েছেন। তিনি নিজে যেমন সংস্কারমুক্ত বিশ্বনাগরিক তাঁর রচনাও সেই রকম; সংস্কৃত ফারসী আরবী ইংরেজী জার্মান প্রভৃতি নানা ভাষা থেকে শব্দ আর বাক্য চয়ন করে স্বচ্ছন্দে নিপুণতায় তাঁর লেখায় সন্নিবিষ্ট করেছেন।

মুসলমান এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের চর্চা করলেই যথেষ্ট হবে না। ভারতের বাইরে থেকে মুসলমান যে ঐতিহ্য নিয়েছে যার ফলে তার সংস্কৃতি বিশেষ রূপ পেয়েছে, হিন্দুকে তা অবশ্যই জানতে হবে, নতুবা ব্যবধান দূর হবে না। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের পক্ষেই এইপ্রকার পরস্পর পরিচয় আবশ্যক। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এই বিষয়ে উদ্যোগী হতে পারেন।

১৩৫৮

# বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান

যাদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখা হয় তাদের মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম, যারা ইংরেজী জানে না বা অতি অল্প জানে। অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে এবং অল্পশিক্ষিত বয়স্ক লোক এই শ্রেণীতে পড়ে। দ্বিতীয়, যারা ইংরেজী জানে এবং ইংরেজী ভাষায় অল্পাধিক বিজ্ঞান পড়েছে।

প্রথম শ্রেণীর পাঠকদের বিজ্ঞানের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় নেই। গুটিকতক ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ হয়তো তারা শিখেছে, যেমন টাইফয়েড, আয়োডিন, মোটার, ক্রোটন, জেব্রা। অনেক রকম স্থূল তথ্যও তাদের জানা থাকতে পারে, যেমন জল আর কর্পূর উবে যায়, পিতলের চাইতে আলিউমিনিয়ম হালকা, লাউ কুমড়ো জাতীয় গাছে দুরকম ফুল হয়। এই রকম সামান্য জ্ঞান থাকলেও সুশৃঙ্খল আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য তারা কিছুই জানে না। এই শ্রেণীর পাঠক ইংরেজী ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত, সেজন্য বাংল পরিভাষা আয়ত্ত করে বাংলায় বিজ্ঞান-শেখা তাদের সংস্কারের বিরোধী নয়। ছেলেবেলায় আমাকে ব্রহ্মমোহন মল্লিকের বাংলা জ্যামিতি পড়তে হয়েছিল। 'এক নির্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট সরল রেখার উপর এক সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত করিতে হইবে'—এর মানে বুঝতে বাধা হয় নি, কারণ ভাষাগত বিরোধী সংস্কার ছিল না। কিন্তু যারা ইংরেজী জিওমেট্রি পড়েছে তাদের কাছে উক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যটি সুশ্রাব্য ঠেকবে না, তার মানেও স্পষ্ট হবে না। যে লোক আজন্ম ইজার পরেছে তার পক্ষে হঠাৎ ধুতি পরা অভ্যাস করা একটু শক্ত। আমাদের সরকার ক্রমে ক্রমে রাজ কার্যে দেশী পরিভাষা চালাচ্ছেন, তাতে অনেকে মুশকিলে পড়েছেন, কারণ তাঁদের নূতন করে শিখতে হচ্ছে।

পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর পাঠক যখন বাংলায় বিজ্ঞান শেখে তখন ভাষার জন্য তার বাধা হয় না, শুধু বিষয়টি যত্ন করে বুঝতে হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশের শিক্ষার্থীর চেয়ে তাকে বেশী চেষ্টা করতে হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠক যখন বাংলা ভাষায় লেখা বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ পড়ে তখন তাকে পূর্ব সংস্কার দমন করে (অর্থাৎ ইংরেজীর প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাত বর্জন করে) প্রীতির সহিত মাতৃভাষার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হয়। এই কারণে পাশ্চাত্ত্য পাঠকের তুলনায় তার পক্ষে একটু বেশী চেষ্টা আবশ্যক।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় এখনও নানা রকম বাধা আছে। বাংলা পারিভাষিক শব্দ প্রচুর নেই। অনেক বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী লেখক নানা বিষয়ের পরিভাষা রচনা করেছিলেন। তাঁদের উদ্‌যোগের এই ত্রুটি ছিল যে তাঁরা একযোগে কাজ না করে স্বতন্ত্রভাবে করেছিলেন, তার ফলে সংকলিত পরিভাষার সাম্য হয় নি, একই ইংরেজী সংজ্ঞায় বিভিন্ন প্রতিশব্দ রচিত হয়েছে। ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে পরিভাষা-সমিতি নিযুক্ত করেছিলেন তাতে বিভিন্ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্বজ্ঞ, সংস্কৃতজ্ঞ

পণ্ডিত এবং কয়েকজন লেখক একযোগে কাজ করেছিলেন, তার ফলে তাঁদের চেষ্টা অধিকতর সফল হয়েছে।

পরিভাষা রচনা একজনের কাজ নয়, সমবেত ভাবে না করলে নানা ত্রুটি হতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলন খুব বড় নয়, আরও শব্দের প্রয়োজন আছে এবং তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কিন্তু দরকার মতন বাংলা শব্দ পাওয়া না গেলেও বৈজ্ঞানিক রচনা চলতে পারে। যত দিন উপযুক্ত ও প্রামাণিক বাংলা শব্দ রচিত না হয় তত দিন ইংরেজী শব্দই বাংলা বানানে চালানো ভাল। বিশ্ববিদ্যালয়-নিযুক্ত সমিতি বিস্তর ইংরেজী শব্দ বজায় রেখেছেন। তাঁরা বিধান দিয়েছেন যে নবাগত রাসায়নিক বস্তুর ইংরেজী নামই বাংলা বানানে চলবে, যেমন অক্সিজেন, প্যারাডাই-ক্লোরোবেনজিন। উদ্‌ভিদ ও প্রাণীর জাতিবাচক বা পরিচয়বাচক অধিকাংশ ইংরেজী (বা সার্বজাতিক, international) নামও বাংলায় চালানো যেতে পারে, যেমন ম্যালভাসী, ফার্ন, আরথ্রোপোডা ইনসেক্টা।

পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় এদেশের জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নগণ্য। প্রাথমিক বিজ্ঞানের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় না থাকলে কোনও বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ বোঝা কঠিন। ইওরোপ আমেরিকায় পপুলার সায়েন্স লেখা সুসাধ্য এবং সাধারণে তা সহজেই বোঝে। কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা তেমন নয়, বয়স্থদের জন্য যা লেখা হয় তাও প্রাথমিক বিজ্ঞানের মতন গোড়া থেকে না লিখলে বোধগম্য হয় না। জনসাধারণের জন্য যাঁরা বাংলায় বিজ্ঞান লেখেন তাঁরা এ বিষয়ে অবহিত না হলে তাঁদের লেখা জনপ্রিয় হবে না। অবশ্য কালক্রমে এ দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার হলে এই অসুবিধা দূর হবে, তখন বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনা সুসাধ্য হবে।

বিজ্ঞান আলোচনার জন্য যে রচনাপদ্ধতি আবশ্যক তা অনেক লেখক এখনও আয়ত্ত করতে পারেন নি, অনেক স্থলে তাঁদের ভাষা আড়ষ্ট এবং ইংরেজীর আক্ষরিক অনুবাদ হয়ে পড়ে। এই দোষ থেকে মুক্ত না হলে বাংলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না। অনেক লেখক মনে করেন, ইংরেজী শব্দের যে অর্থব্যাপ্তি বা connotation, বাংলা প্রতিশব্দেরও ঠিক তাই হওয়া চাই, এজন্য অনেক সময় তাঁরা অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ প্রয়োগ করেন। ইংরেজী sensitive শব্দ নানা অর্থে চলে, যেমন sensitive person, wound, plant, balance, photographic paper, ইত্যাদি। বাংলায় অর্থভেদে বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করাই উচিত, যেমন অভিমানী, ব্যথাপ্রবণ, উত্তেজী, সুবেদী, সুগ্রাহী। Sensitized paper এর অনুবাদ স্পর্শকাতর কাগজ অতি উৎকট, কিন্তু তাও কেউ কেউ লিখে থাকেন। সুগ্রাহী কাগজ লিখলে ঠিক হয়।

অনেক লেখক তাঁদের বক্তব্য ইংরেজীতে ভাবেন এবং যথাযথ বাংলা অনুবাদে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। এতে রচনা উৎকট হয়। The atomic engine has not even reached the blue print stage,—'পরমাণু এঞ্জিন নীল চিত্রের অবস্থাতেও পেঁছায় নি।' এ রকম বর্ণনা বাংলা ভাষায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ। একটু ঘুরিয়ে লিখলে অর্থ সরল হয়—পরমাণু এঞ্জিনের নকশা পর্যন্ত এখনও প্রস্তুত হয় নি। When sulphur burns in air the nitrogen does not take part in the reaction—'যখন গন্ধক হাওয়ায় পোড়ে তখন নাইট্রোজেন প্রতিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না'। এ রকম মাছিমারা নকল না করে 'নাইট্রোজেনের কোনও পরিবর্তন হয় না' লিখলে বাংলা ভাষা বজায় থাকে।

অনেকে মনে করেন পারিভাষিক শব্দ বাদ দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করলে রচনা সহজ হয়। এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। স্থান বিশেষে পারিভাষিক শব্দ বাদ দেওয়া চলে, যেমন 'অমেরুদণ্ডী'র বদলে লেখা যেতে পারে, যেসব জন্তুর শিরদাঁড়া নেই। কিন্তু 'আলোক-তরঙ্গ' এর বদলে আলোর কাঁপন বা নাচন লিখলে কিছু মাত্র সহজ হয় না। পরিভাষার উদ্দেশ্য ভাষার সংক্ষেপ এবং অর্থ সুনির্দিষ্ট করা। যদি বার বার কোনও বিষয়ের বর্ণনা দিতে হয় তবে অনর্থক কথা বেড়ে যায়, তাতে পাঠকের অসুবিধা হয়। সাধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ লেখা হয় তাতে অল্প পরিচিত পারিভাষিক শব্দের প্রথমবার প্রয়োগের সময় তার ব্যাখ্যা (এবং স্থলবিশেষে ইংরেজী নাম) দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু পরে শুধু বাংলা পারিভাষিক শব্দটি দিলেই চলে।

আমাদের আলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ কথা বলেছেন—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। প্রথমটি শুধু আভিধানিক অর্থ প্রকাশ করে, যেমন 'দেশ'-এর অর্থ ভারত ইত্যাদি, অথবা স্থান। কিন্তু 'দেশের লজ্জা'—এখানে লক্ষণায় দেশের অর্থ দেশবাসীর। 'অরণ্য'-এর আভিধানিক অর্থ বন, কিন্তু 'অরণ্যে রোদন' বললে ব্যঞ্জনার অর্থ হয় নিষ্ফল খেদ। সাধারণ সাহিত্যে লক্ষণা বা ব্যঞ্জনা, এবং উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অলংকারের সার্থক প্রয়োগ হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে যত কম থাকে ততই ভাল। উপমার কিছু প্রয়োজন হয়, রূপকও স্থলবিশেষে চলতে পারে, কিন্তু অন্যান্য অলংকার বর্জন করাই উচিত। 'হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড'—কালিদাসের এই উক্তি কাব্যেরই উপযুক্ত, ভূগোলের নয়। বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের ভাষা অত্যন্ত সরল ও স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক—এই কথাটি সকল লেখকেরই মনে রাখা উচিত।

বাংলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিতে আর একটি দোষ প্রায় নজরে পড়ে। অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী এই প্রবাদটি যে কত ঠিক তার প্রমাণ আমাদের সাময়িক প্রশ্নাদিতে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে একটি পত্রিকায় দেখেছি—'অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন স্বাস্থ্যকর বলে বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। তারা জীবের বেঁচে থাকবার পক্ষে অপরিহার্য অঙ্গ মাত্র। তবে ওজন গ্যাস স্বাস্থ্যকর।' এই রকম ভুল লেখা সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনিষ্টকর। সম্পাদকের উচিত অবিখ্যাত লেখকের বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশের আগে অভিজ্ঞ লোককে দিয়ে যাচাই করে নেওয়া।

১৩৫৮

# জীবনযাত্রা

সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা, plain living and high thinking—এই বাক্যটি এক কালে খুব শোনা যেত। এখন তার বদলে শোনা যায়—জীবনযাত্রার মান বা standard of living বাড়াতে হবে। এই দুই আপাতবিরোধী বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কি? উচ্চ চিন্তার ব্যাঘাত না করে জীবনযাত্রা কতটা সরল করা যায়? তার নিম্নতম মান কি?

গ্রীক সন্ন্যাসী ডায়োজিনিস একটা পিপার মধ্যে রাত্রিযাপন করতেন, দিনের বেলা বাইরে এসে রোদ পোয়াতেন। বোধ হয় তাঁর পরিধেয় কিছু ছিল না এবং লোকে দয়া বা ভক্তি করে যা দিত তাতেই তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি হত। এই রিক্ত জীবনযাত্রা তাঁর উচ্চ চিন্তার বাধা হয় নি। বাংলায় 'উঞ্ছ' শব্দ হীন নীচু বা তুচ্ছ অর্থে চলে। কিন্তু এর মূল অর্থ—ক্ষেত্রে পতিত ধান্যাদি খুঁটে নেওয়া, অর্থাৎ অত্যল্প উপকরণে জীবিকানির্বাহ। মহাভারতে উঞ্ছবৃত্তিব্রতধারীর অনেক প্রশংসা পাওয়া যায়। শান্তি-পর্বে আছে—এক উঞ্ছব্রতী সমাধিনিষ্ঠ অনাসক্ত ব্রাহ্মণ ফলমূল জীর্ণপত্র ও বায়ু ভক্ষণ করে সর্বভূতের হিতসাধনে রত থাকতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'প্রবল নৈয়ায়িক' বুনো রামনাথের কথা লিখেছেন, যিনি বনের ভিতর ছাত্র পড়াতেন এবং সস্ত্রীক শুধু ভাত আর তেঁতুলপাতার ঝোল খেয়ে প্রাণধারণ করতেন। মহারাজ শিবচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ইনি জানিয়েছিলেন যে তাঁর কোনও অনুপপত্তি (অভাব) নেই।

যাঁরা নিস্পৃহ সন্ন্যাসী এবং যাঁদের পোষ্য কেউ নেই, অথবা যাঁদের পোষ্যবর্গ অত্যল্পে তুষ্ট, তাঁদেরও জীবনযাত্রার জন্য কয়েকটি বিষয় আবশ্যক। সর্বাগ্রে চাই সুস্থ সবল শরীর যা ধর্মের আদ্য সাধন, যা না হলে উচ্চ চিন্তা জ্ঞানচর্চা বা সৎকর্ম কিছুই চলে না। আবার স্বাস্থ্যের জন্য যথোচিত খাদ্য বস্ত্র ও আশ্রয় চাই। যে স্বভাবত স্বাস্থ্যবান ও সবল সে যত অল্প উপকরণে জীবনধারণ করতে পারে রুগ্ন বা দুর্বল লোকে তা পারে না।

উচ্চ চিন্তা বা জ্ঞানচর্চা এবং সর্বভূতের হিতসাধন বা লোকসেবা—এই দুইএর অর্থ সেকালে যা ছিল এখন ঠিক তা নেই। একালের আদর্শ অনুসরণের জন্য যে অল্পতম জীবনোপায় বা necessaries of life আবশ্যক তাও বদলে গেছে, সেকালের উঞ্ছব্রত এখন অসাধ্য। যথোচিত খাদ্য বস্ত্র ও আশ্রয় ছাড়াও কতকগুলি বিষয়ের ব্যবস্থা না হলে জীবনযাত্রা চলে না।

অত্যল্পে তুষ্ট লোকের সংখ্যা চিরকালই কম, সাধারণ মানুষ ভোগবিলাস চায়। অনেক বিলাসী লোকেও জ্ঞানচর্চা ও লোকসেবা করে, অনেক অবিলাসী লোকেরও উচ্চ চিন্তা ও সৎকর্মের প্রবৃত্তি থাকে না। তথাপি দেখা যায়, ভোগী অপেক্ষা ত্যাগী লোকই অধিকতর লোকহিতৈষী হয়। এই কারণে সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা সর্ব দেশে সর্বকালে মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গণ্য হয়েছে।

অধিকাংশ ভারতবাসীর জীবনোপায় পর্যাপ্ত নয়। আদর্শের অনুসরণ দূরের কথা,

বেঁচে থাকাই অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য, অন্নচিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তার অবসর নেই। কোনও লোক জ্ঞানচর্চা ও লোকসেবা করুক বা না করুক, সে রাজপুরুষ ব্যবসায়ী বিজ্ঞানী শিক্ষক কলাবিৎ কৃষক বা মজুর যাই হ'ক, মনুষ্যোচিত জীবনযাত্রার জন্য কতকগুলি বিষয় তার অবশ্যই চাই, এ সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। কিন্তু মনুষ্যোচিত জীবনযাত্রার নিম্নতম মান কি? দেশভেদে শীতাতপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে জীবনোপায়ের ভেদ হবে। বৃত্তিভেদেও কিছু কিছু পরিবর্তন হবে, শ্রমিকের আহার অশ্রমিকের সমান হলে চলবে না। এই রকম বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মেনে নিয়েও সর্বসাধারণের জন্য জীবনযাত্রার নিম্নতম মান নির্ধারণ করা যেতে পারে কি? ফর্দ করে বা অঙ্কপাত করে দেখানো বোধ হয় অসম্ভব, কিন্তু জীবনযাত্রার যা প্রধান মাপকাঠি—স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ, তার দ্বারা একটা স্থূল ধারণা করা যেতে পারে।

যে ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তের বা ধনী-দরিদ্রের মাঝামাঝি লোকের (যাদের আধুনিক নাম বুর্জোআ) স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ কোনও রকমে বজায় থাকে তাকেই আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রার নিম্নতম মান ধরা যেতে পারে। আমার জন্ম মধ্যবিত্ত সমাজে। বিগত ষাট-সত্তর বৎসরে এই সমাজে জীবনযাত্রার এবং তার সঙ্গে স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধের যে পরিবর্তন দেখছি তা বিচার করলে হয়তো মান নির্ধারণের সূত্র পাওয়া যাবে। এই দীর্ঘকালের গোড়ার দিকে উত্তর বিহারের একটা মাঝারি শহরে ছিলাম। বিহারীর তুলনায় সমশ্রেণীর বাঙালীর জীবনযাত্রায় আড়ম্বর বেশী ছিল। যে ভদ্র বাঙালী মাসে কুড়ি-পঁচিশ টাকা রোজগার করতেন তাঁরও অন্নবস্ত্র আর বাসস্থানের অভাব হ'ত না। আমাদের বাড়িতে আধুনিক আসবাব ছিল না, শুধু অনেকগুলো তক্তাপোশ আর গোটাকতক বেঢপ টেবিল চেয়ার আলমারি ছিল। জলের কল বিজলী বাতি ছিল না। পায়খানা অনেক দূরে, বর্ষায় ছাতা মাথায় দিয়ে যেতে হ'ত। লোকে কদাচিৎ ঔষধার্থে চা খেত। সিগারেট তখন নূতন উঠেছে, গুটিকতক বড়লোকের ছেলে লুকিয়ে খেত, বয়স্থরা প্রায় সকলেই তামাক খেত। সুগন্ধ মাথার তেল দাঁতের মাজন প্রভৃতি প্রসাধন দ্রব্যের চলন ছিল না। বাইসিকেল ফাউণ্টেন পেন হাতঘড়ি ছিল না যারা ভাল চাকরি করত কেবল তাদেরই পকেটঘড়ি থাকত। ফুটবল আর ক্রিকেট শুধু নামেই জানা ছিল। আমাদের ব্যবস্থা—কালীপূজোর সময় শখের থিয়েটার, কালে-ভদ্রে যাত্রা, আর কয়েকটি বাড়িতে গান গল্প তাস পাশা দাবার আড্ডা। সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীতে দেশবিদেশের যে খবর থাকত তাতেই সাধারণ ভদ্রলোকের কৌতূহল নিবৃত্ত হত। বাংলা গল্প প্রবন্ধ আর কবিতার বই খুব কম ছিল, পাওয়া গেলে নিকৃষ্ট বইও লোকে সাগ্রহে পড়ত। তখনকার প্রধান বিলাসিতা ছিল ভাল জিনিস খাওয়া।

এই মধ্যবিত্ত সমাজের যাঁরা আজকাল কলকাতায় বা অন্য শহরে বাস করেন তাঁদের জীবনযাত্রা অনেক বদলে গেছে। এঁরা সকলের তুলনায় বেশী রোজগার করেন, কিন্তু এঁদের অভাববোধ বেড়েছে। তার কারণ, টাকার মূল্য কমেছে, গ্রাসাচ্ছাদন দুর্মূল্য হয়েছে এবং এঁরা অনেক বিষয়ে জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে ফেলেছেন। আহার নিকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু সজ্জা নেশা শখ আর আমোদের মাত্রা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। এখনকার যুবক আর কিশোর ধুতি পাঞ্জাবিতে তুষ্ট নয়, দামী প্যাণ্ট আর নানা রকম শৌখিন জামা চাই। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই প্রসাধন দ্রব্য দরকার। মেয়েদের যেমন অন্তত এক গাছা চুড়ি পরতে হয় ছেলেদের তেমন হাতঘড়ি আর ফাউণ্টেন পেন পরতে হয়। যুবা বৃদ্ধ সকলেরই দিনের মধ্যে কয়েকবার চা চাই।

সস্তা গুড়ুক তামাক প্রায় উঠে গেছে, এখন অনেকে দিনে ত্রিশ-চল্লিশটা বা অবিরাম সিগারেট খায়। ঘন ঘন সিনেমা আর ফুটবল ক্রিকেট ম্যাচ না দেখলে চলে না। গ্রামফোন আর রেডিও না থাকলে বাড়িতে সময় কাটে না। মনের খোরাক হিসাবে গল্পের বই কিনতে হয়, অনেক বই ছ-সাত টাকার কমে পাওয়া যায় না। জগতের হালচাল জানবার জন্য রোজ একাধিক খবরের কাগজ পড়তে হয়।

নিজের এবং সমকালীন আত্মীয়-বন্ধুদের অনুভূতি থেকে বলতে পারি—একালের তুলনায় সেকালে মধ্যবিত্তের স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ কিছুমাত্র কম ছিল না। তার কারণ—যে ভোগ অজ্ঞাত বা অনভ্যস্ত তার জন্য অভাব বোধ হয় না। ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁর বাপের কাছে তপোবনে বেশ সুখে ছিলেন। কিন্তু যেমন তিনি লোমপাদ রাজার দূতীদের দেখলেন এবং তাদের দেওয়া ভাল ভাল লাড্ডু আর পানীয় খেলেন অমনি তাঁর মনে হ'ল যে এত দিন বৃথাই কেটেছে।

সেকালের কোনও মধ্যবিত্ত লোককে যদি মন্ত্রবলে হঠাৎ একালের কলকাতায় আনা হয় তবে তিনি কি রকম বোধ করবেন? খাওয়া-পরা, বাড়িভাড়া আর চাকর রাখার খরচ দেখে তিনি আঁতকে উঠবেন, ছেলেমেয়েদের চালচলন দেখে খুব চটবেন, কিন্তু নানা রকম আধুনিক সুবিধা ও আরামভোগ করে খুশীও হবেন। একালের কোনও লোককে যদি কলকাতা থেকে সেকালের মফস্বলে এনে ফেলা হয় তবে তিনি বোধ হয় খুশী হবেন না। ভাল ভাল জিনিস খেয়ে বাঁচবেন তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু কলের জল, ড্রেন-পায়খানা, বিজলী আলো আর পাখা, দৈনিক পত্রিকা, সেফটি ক্ষুর, কামাবার সাবান, অজস্র চা এবং ট্রাম বাস প্রভৃতির অভাবে তিনি কষ্ট পাবেন। যদি তাঁর বয়স কম হয় তবে সিনেমা, রেডিও, রেস্তোরাঁর খাবার, ফুটবল-ক্রিকেট ম্যাচ, নাচ-গানের জলসা, দেবী সরস্বতীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, সর্বজনীন হুল্লোড়, আর টাটকা রাজনীতিক খবরের অভাবে ছটফট করবেন।

পঞ্চাশ বৎসর আগে কলকাতায় মোটরকার দু-একটি দেখা যেত, সাধারণের জন্য টেলিফোন ছিল না। তাতে বড় কর্মচারী, উকিল, ডাক্তার বা ব্যবসাদার কোনও অসুবিধা বোধ করতেন না। কিন্তু প্রচলন হবার পর কিছুকালের মধ্যেই মোটর আর টেলিফোন অপরিহার্য হয়ে পড়ল। অমুক অমুক রেখেছে অতএব অপরকেও রাখতে হবে, নতুবা কর্মক্ষেত্রে পরাভব অবশ্যম্ভাবী। যেমন, রাশিয়া বিস্তর সামরিক বিমান করেছে অতএব আমেরিকাকেও করতে হবে। আমেরিকা অ্যাটম বোমা করেছে অতএব রাশিয়া ব্রিটেনকেও করতে হবে। রেলগাড়িতে গেলেই সেকালের লোকের কাজ চলত, এখন এয়ারোপ্লেনে না গেলে অনেকের চলে না। আজ যদি জনকতক ধনী হেলিকোপ্টার রেখে এক বাড়ির ছাত থেকে অন্য বাড়ির ছাতে যাতায়াত আরম্ভ করে তবে আরও অনেককে তা করতে হবে।

শুধু কাজের সুবিধা, আরাম বা বিলাসিতার জন্য অথবা ব্যবসায়ের প্রতিযোগের জন্যই যে নূতন নূতন জিনিস অপরিহার্য হয়েছে এমন নয়, অনুকরণ বা ফ্যাশনের জন্যও হয়েছে। খাদ্যশস্যের অভাবের জন্য সরকার আইন করে ভূরিভোজ নিষিদ্ধ করেছেন। আইন মানলে চক্ষুলজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, খরচ বাঁচে, একটা সামাজিক কুপ্রথা দূর হয়। কিন্তু যেহেতু অমুক অমুক আত্মীয় বা বন্ধু আইন না মেনে হাজার লোক খাইয়েছে অতএব আমাকেও তা করতে হবে নতুবা মান থাকবে না। সরকার মদ বন্ধ করবার চেষ্টা করেছেন, মদের দামও খুব বেড়ে গেছে কিন্তু উচ্চ সমাজের পার্টিতে বা আড্ডায় স্ত্রী-পুরুষের অল্পাধিক মদ খাওয়া এখন প্রগতির

লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে পয়সা খরচ করে বলনাচ শিখছে। ভারতবাসী যখন স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল তখন বিদেশী জিনিস ব্যবহারে যে সংকোচ এবং বিলাসিতায় যে সংযম ছিল তা এখন একেবারে লোপ পেয়েছে। পূর্বে যা ছিল না বা থাকলেও যা আবশ্যক গণ্য হত না এখন তা অনেকের কাছে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। দেশের লোক 'কুইট ইন্ডিয়া' বলে বিদেশী সরকারকে বিদায় করেছে, কিন্তু বিদেশী বিলাস আর ব্যসন সাদরে বরণ করে নিয়েছে।

আধুনিক সমস্ত কৃত্রিম অভ্যাস (বা ব্যসন) যদি অনাবশ্যক গণ্য করা হয় তবে জীবনযাত্রার ন্যূনতম উপকরণ বা জীবনোপায় দাঁড়ায়—যথোচিত (অর্থাৎ বাহুল্য-বর্জিত) খাদ্য বস্ত্র আবাস, এবং পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা চিকিৎসা ব্যায়াম আর পরিমিত মাত্রায় চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা—

> অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
> চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
> সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।...

আমেরিকায় এবং ইওরোপের অনেক দেশে জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু। এদেশের জনসাধারণের দৃষ্টিতে এখনও যা বড়মানুষি বা বাড়াবাড়িই পাশ্চাত্ত্য দেশে তা necessary, যেমন, মোটরকার, রেফ্রিজারেটার, বিজলী-উনন, ধুলোঝাড়া কল, কাপড়-কাচা কল, মদ, টিনে রাখা খাবার, নানা রকম পোশাক, মুখ ঠোঁট আর নখের রং, নাচঘর, নাইট ক্লাব, ইত্যাদি। জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হবে—এই উপদেশ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা আমাদের দিয়ে থাকেন। তাঁরা বোধ হয় নিজেদের সমৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের দুর্দশার তুলনা করে কৃপাবশে এই কথা বলেন। জীবনযাত্রার মান বাড়লে বিলাসিতা বাড়বে, বিদেশী পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হবে, এদেশের শ্রমিক অল্প বেতনে কাজ করে বিদেশী শ্রমিকের সঙ্গে প্রতিযোগ করবে না—এই স্বার্থবুদ্ধিও উপদেশের পিছনে থাকতে পারে।

ভোগবিলাসের প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তা যদি পরিমিত হয়, জনসাধারণের সামর্থ্যের অনধিক হয়, সমাজের হানিকর না হয়, তবে আপত্তির কারণ নেই। ইওরোপের অনেক দেশের এবং উত্তর আমেরিকার তুলনায় এদেশের ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বেশী, দরিদ্রের সংখ্যাও বেশী। ব্রিটেনে নানা রকম করের ফলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমশ কমেছে, ধনীর জীবনযাত্রার মান নামছে। এদেশের সরকারও আয়কর ইত্যাদির দ্বারা এবং বিদেশী বিলাস-সামগ্রীর উপর শুল্ক বাড়িয়ে সেই চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোন্ বস্তু বিলাসের উপকরণ এবং কোন্ বস্তু জীবনযাত্রার জন্য একান্ত আবশ্যক তার যথোচিত বিচার হয় নি, এবং তদনুসারে দেশবাসীকে সংযম শেখাবার চেষ্টাও হয় নি।

সম্প্রতি এদেশে ধনীর সংখ্যা কিছু বেড়েছে, অনেকে সৎ বা অসৎ উপায়ে প্রচুর উপার্জন করে অত্যন্ত বিলাসী হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখনও ধনীর সংখ্যা দরিদ্রের তুলনায় মুষ্টিমেয়। বলা যেতে পারে, ধনীরা বিলাস ব্যসনে মগ্ন থেকে অধঃপাতে যাক না, তাতে কার কি ক্ষতি। তাদের ঐশ্বর্য কেড়ে নিয়ে সমস্ত প্রজার মধ্যে ভাগ করে দিলেও দরিদ্রের বিশেষ কিছু উপকার হবে না। কিন্তু দুর্নীতি যেমন সংক্রামক, বিলাসিতাও সেই রকম, সেই কারণে উপেক্ষণীয়ও নয়। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে চুরি আর ঘুষের যে দেশব্যাপী প্রসার হয়েছে তার একটি প্রধান কারণ বিলাসিতার লোভ। এদেশের ভদ্রসন্তান শ্রমসাধ্য জীবিকা চায় না সেজন্য তাদের

মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেশী। তাদের বিলাস-বাসনা আছে কিন্তু সদুপায়ে তা তৃপ্ত করতে পারে না, সেজন্য তাদের অসন্তোষ বেড়ে যাচ্ছে। কমিউনিস্ট ডিকটেটারি রাষ্ট্রে জীবিকা বেছে নেবার বিশেষ সুবিধা নেই, ইতরভদ্র নির্বিশেষে প্রায় সকলকেই প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। লৌহযবনিকার একটা উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে দরিদ্র সোভিএট প্রজা বিদেশী ধনী রাষ্ট্রের বিলাসিতা জানতে পেরে যেন নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট না হয়।

পাশ্চাত্ত্য অর্থনীতি বলে—want more, work more, earn more, অর্থাৎ আরও কামনা কর, আরও পরিশ্রম কর, আরও রোজগার কর ; কামনার তাড়নায় খেটে যাও, আয় বাড়াও, তা হলে নব নব কামনা পূর্ণ হবে, ক্রমশ জীবনযাত্রার উৎকর্ষ হবে। ভারতের শাস্ত্র উলটো কথা বলে—ঘি ঢাললে যেমন আগুন বেড়ে যায় তেমনি কাম্যবস্তুর উপভোগে কামনা কেবলই বাড়তে থাকে, শান্তি আসে না, পৃথিবীতে যত ভোগ্য বিষয় আছে তা একজনের পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়। কামনা সংযত না করলে মানুষের মঙ্গল নেই।

অমুক দেশে শতকরা পঁচিশ জনের মোটর গাড়ি আছে প্রতি পাঁচ হাজার জনের জন্য একটা সিনেমা আছে, সকলেরই রেডিও আছে, লোক পিছু বৎসরে এত মাত্রা তড়িৎ, এত পাউন্ড মাখন, এত পাউন্ড সাবান, এত গ্যালন পেট্রোলিয়ম খরচ হয়, প্রত্যেক লোকের অন্তত এত ঘন ফুট শোবার জায়গা আছে, অতএব এদেশের আদর্শও তাই হওয়া উচিত—এই প্রকার অন্ধ আকাঙ্ক্ষায় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়। রাষ্ট্রের আয় আর উৎপাদন সামর্থ্য বুঝেই জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যা অত্যাবশ্যক তার সংস্থানের জন্য অনেক বিলাস অনেক সুবিধা এখন স্থগিত রাখতে হবে।

শ্রমিককে তুষ্ট রাখা দরকার তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ধনিকের লাভ বজায় রেখে যদি মজুরি বাড়ানো হয় তবে অনেক অত্যাবশ্যক বস্তুর (যেমন বস্ত্রের) দাম বেড়ে যায়, তার ফলে সকলেরই খরচ বাড়ে, অন্যান্য পণ্যও দুর্মূল্য হয়, সুতরাং আবার মজুরি বাড়াবার দরকার হয়। এই দুষ্টচক্রের ফল দেশবাসী হাড়ে হাড়ে ভোগ করছে।

আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি, ইহসর্বস্ব নই, জনক-কৃষ্ণ-বুদ্ধাদির শিক্ষা আমরা হৃদয়ংগম করেছি—এইসব কথা আত্মপ্রতারণা মাত্র। জাতীয় চরিত্রের সংশোধন না হলে আমাদের নিস্তার নেই। সরকার বিস্তর খরচ করে অনেক রকম পরিকল্পনা করছেন যার সুফল পেতে বিলম্ব হবে। মাটির জমি আবাদের চেয়ে মানব-জমি আবাদ কম দরকারী নয়। এখন যারা অল্পবয়স্ক ভবিষ্যতে তারাই রাষ্ট্র চালাবে, তাদের শিক্ষা আর চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা সর্বাগ্রে আবশ্যক। তার জন্য এমন শিক্ষক চাই যাঁর যোগ্যতা আছে এবং যিনি নিজের অবস্থায় তুষ্ট। শুধু বিদ্যা নয়, ছাত্রকে বাল্যকাল থেকে তিনি আচার ও বিনয় (discipline) শেখাবেন, মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় সদভ্যাস ও সৎকর্মের প্রেরণা দেবেন। আমাদের সরকার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শ্রমিকের অনেক আবদার মঞ্জুর করেন, তাঁদের দৃষ্টিতে শিক্ষকের চেয়ে শ্রমিকের মর্যাদা বেশী, কারণ তাদের কাজের ফল প্রত্যক্ষ। শিক্ষক যদি উপযুক্ত হন তবে তাঁর কাজের ফল পেতে বিলম্ব হলেও তার গুরুত্ব কত বেশী তা বোঝবার মত দূরদৃষ্টি সরকার বা জন-সাধারণের হয় নি, তাই শিক্ষকশ্রেণী সর্বাপেক্ষা অবজ্ঞাত হয়ে আছেন।

১৩৫৯

# জন্মশাসন ও প্রজাপালন

পুরাণে আছে, মানব ও দানবের পীড়নে বিপন্না বসুন্ধরা যখন ত্রাহি ত্রাহি রব করতে থাকেন তখন নারায়ণ কৃপাবিষ্ট হয়ে ভূভার হরণ করেন। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই পুরাণোক্তির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—কোনও প্রাণিসংঘ যদি পরিবর্তিত প্রতিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে চলতে না পারে অথবা নিজের সমাজগত বিকারের প্রতিবিধান করতে না পারে তবে তার ধ্বংস হয়। এই প্রাকৃতিক নিয়মে পুরাকালের অনেক জীব এবং সমৃদ্ধ মানবসমাজ ধ্বংস হয়ে গেছে।

পৃথিবী এখন একসত্ত্বা, তার একটি অঙ্গ রুগ্ন হলে সর্ব দেহের অল্পাধিক বিকারের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সেকালে এক দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের যোগ অল্পই ছিল। নেপোলিয়নের আমলে প্রায় সমস্ত ইওরোপ যুদ্ধে লিপ্ত হলেও এশিয়া তাতে জড়িয়ে পড়ে নি। চল্লিশ বৎসর পূর্বে মার্কিন রাষ্ট্র ইওরোপীয় রাজনীতি থেকে তফাতে থাকত। চীন দেশে বা ভারতে দুর্ভিক্ষ হলে বিলাতের বণিক সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হত, কিন্তু জনসাধারণ তার জন্য উৎকণ্ঠিত হত না। বিগত প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয় প্রজার বিশেষ অনিষ্ট হয় নি। কিন্তু বিভিন্ন দেশের এই পৃথগ্‌ভাব এখন লোপ পেতে বসেছে। জার্মানি আর জাপানে স্থানাভাব, জীবনযাত্রা ও শিল্পের উপাদানও যথেষ্ট নেই, তার ফলে বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হল। ভারত আর এশিয়ার অন্যান্য স্থানের দারিদ্র্য দেখে আমেরিকা ব্রিটেন ফ্রান্স প্রভৃতি এখন চিন্তিত হয়ে পড়েছে, পাছে সমস্ত প্রাচ্য দেশ কমিউনিস্টদের কবলে যায়।

বহু দেশের লোকসংখ্যা দ্রুতবেগে বেড়ে যাচ্ছে। কবি হেমচন্দ্রের ভারতভূমি ছিল 'বিংশতি কোটি মানবের বাস', এখন খণ্ডিত ভারতেরই লোক সংখ্যা ৩৬ কোটি এবং প্রতি বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ বাড়ছে। পৃথিবীর লোকসংখ্যা ২০ বৎসর আগে প্রায় ১৮৫ কোটি ছিল, এখন ২০০ কোটির বেশী হয়েছে। সমৃদ্ধ দেশের তুলনায় দরিদ্র ও অনুন্নত দেশের প্রজাবৃদ্ধির হার অনেক বেশী, কিন্তু এক দেশে অন্নাভাব আর স্থানাভাব হলে সকল দেশের পক্ষে তা শঙ্কাজনক। পৃথিবীতে বাসযোগ্য ও কৃষিযোগ্য ভূমি এবং খনিজ উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ সম্পদ যা আছে তার যথোচিত বিভাগ হলে সমস্ত মানবজাতির উপস্থিত প্রয়োজন মিটতে পারে, কিন্তু রাজনীতিক ও অন্যান্য কারণে তা অসম্ভব। ভারতের নানা স্থানে বাঙালী পঞ্জাবী ও সিন্ধী উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বাসিত করা হচ্ছে। ব্রিটেন জার্মানি ও ইটালির বাড়তি প্রজাও অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ও কানাডায় আশ্রয় পাচ্ছে, কিন্তু সেসব দেশে ভারতী বা জাপানী প্রজার বসতি নিষিদ্ধ। যেখানে প্রচুর তেল কয়লা প্রভৃতি খনিজ বস্তু বা খাদ্যসামগ্রী আছে সেখান থেকে মাল পাঠিয়ে অন্য দেশের অভাব অবাধে পূরণ করা যায় না। পৃথিবী একসত্ত্বা হলেও একাত্মা হয় নি।

প্রায় দেড়শ বৎসর পূর্বে মালথস বলেছিলেন, খাদ্যের উৎপাদন যে হারে বাড়ানো

যেতে পারে তার তুলনায় জনসংখ্যা বেশী গুণ বেড়ে যাবে, অতএব জন্মশাসন আবশ্যক, নতুবা খাদ্যাভাব হবে। এদেশের অনেকে মনে করেন, লোকসংখ্যা যতই বাড়ুক তার জন্য আতঙ্কের কারণ নেই, যিনি জীব দিয়েছেন তিনিই আহার যোগাবেন। ভারতে ভূমির অভাব নেই, একটু চেষ্টা করলেই চাষবাসের যোগ্য বিস্তর নূতন জমি পাওয়া যাবে, জলসেচ আর সারের ভাল ব্যবস্থা হলে ফসল বহু গুণ বেড়ে যাবে। আর জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি ভাল নয় বটে, কিন্তু তার প্রতিকার সংযমের দ্বারাই করা উচিত, কৃত্রিম উপায়ের প্রচলন হলে ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রশ্রয় পাবে। এ'রা মনে করেন উপদেশ দিয়েই জনসাধারণকে সংযমী করা যেতে পারে।

যাঁরা দূরদর্শী জ্ঞানী তাঁরা এই যদ্‌ভবিষ্য নীতি মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। খুব চেষ্টা করলে কৃষিযোগ্য ও বাসযোগ্য জমি বাড়বে এবং খাদ্য বস্ত্র ও শিল্পসামগ্রীর অভাব মিটবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু খাদ্যবস্ত্রাদি বৃদ্ধির একটা সীমা আছে। যদি বর্তমান হারে লোকসংখ্যা বেড়ে যায় তবে এমন দিন আসবে যখন এই বিপুল পৃথিবী মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারবে না, বিজ্ঞানের চূড়ান্ত চেষ্টাতেও ফল হবে না। অ্যাটম বা হাইড্রোজেন বোমায় নয়, ভাবী মহাযুদ্ধে নয়, গ্রহনক্ষত্রের সংঘর্ষেও নয় ; বর্তমান সভ্যসমাজের রীতি-নীতিতেই এমন বিকারের বীজ নিহিত আছে যার ফলে অচির ভবিষ্যতে মানব-জাতি সংকটে পড়বে।

পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র যদি স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করে সর্ব মানবের হিতার্থে একযোগে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে তবে সংকট নিবারিত হতে পারে। কিন্তু তার আশা নেই, সুতরাং প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই যথাসাধ্য স্বয়ম্ভর হতে হবে, প্রজাসংখ্যা আর জীবনোপায় (necessities of life)-এর সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। সংকট যে বহুদূরবর্তী নয় সে বিষয়ে দূরদর্শী পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ নেই, কিন্তু তার স্বরূপ আর প্রতিবিধানের উপায় সম্বন্ধে তাঁরা এখনও বিশদ ধারণা করতে পারেন নি। সংকটের যেমন লক্ষণ ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে এবং তার প্রতিকারের সদুপায় বা কদুপায় যা হতে পারে তার একটা স্থূল আভাস দেবার জন্য দুটি কাল্পনিক দেশের বিবরণ দিচ্ছি—মনুজরাজ্য ও দনুজরাজ্য। মনে করা যাক দুই দেশেরই জনসংখ্যা পর্যাপ্ত, কৃষি ও বাসের যোগ্য ভূমি এবং জীবনযাত্রার জন্য আবশ্যক দ্রব্যও যথেষ্ট আছে, যদি আরও কিঞ্চিৎ প্রজাবৃদ্ধি হয় তাতেও অনটন হবে না।

মনুজরাজ্যে ধনী মধ্যবিত্ত দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর প্রজাই আছে। রোগপ্রতিষেধ চিকিৎসা শিক্ষাপ্রসার ও শিল্পপ্রসার, জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নয়ন ইত্যাদি প্রজাকল্যাণের সকল চেষ্টাই করা হয়। কালক্রমে দেখা গেল প্রজাবৃদ্ধি অত্যধিক হচ্ছে। দেশের শাসকবর্গ কৃষি ও শিল্পবৃদ্ধির ব্যবস্থা করলেন,—জন্মনিয়ন্ত্রণের যেসব নিশ্চিত উপায় আছে তাও জনসাধারণকে শেখাতে লাগলেন। শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে শীঘ্রই তা বহুপ্রচলিত হল, কিন্তু অশিক্ষিত ও দরিদ্র নিম্নশ্রেণী শিখতে চাইল না। শিক্ষিত জনের তুল্য তাদের চিত্তবিনোদনের নানা উপায় নেই, ইন্দ্রিয়সেবাই সর্বাপেক্ষা সুলভ বিলাস, তাতে কিছুমাত্র বাধা তারা সইতে পারে না। দশ-বিশ বৎসর পরেই দেখা গেল পূর্বের তুলনায় ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে জন্মের হার কমে আসছে এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পূর্ববৎ বাড়ছে। শাসকবর্গ এর জন্য উৎকণ্ঠিত হলেন না, মনে করলেন নিম্নশ্রেণীও কালক্রমে শিক্ষিত হয়ে ভদ্রজনের আচরণ অনুসরণ

করবে। ভদ্রের সংখ্যা কমে গেলেও ক্ষতি নেই, কারণ বুদ্ধি ও প্রতিভা বংশগত নয়, শিক্ষার ফলে ইতর জনও ভদ্রত্ব ও তদুচিত গুণাবলী লাভ করবে। একটা আশঙ্কা এই আছে যে সর্বসাধারণের মধ্যে জন্মনিরোধ প্রচলিত হলে ভবিষ্যতে প্রজা-সংখ্যা অত্যন্ত কমে যেতে পারে। কিন্তু তার প্রতিকার সুসাধ্য, উপযুক্ত প্রচারের ফলে এবং বহু সন্তানবতীকে পুরস্কার দিলে জন্মের হার বেড়ে যাবে। ভবিষ্যৎ সৈন্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে হিটলার আর মুসোলিনি সেই চেষ্টা করেছিলেন।

মনুজরাজ্যে যথোচিত খাদ্য আশ্বাস আর চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকায় অকালমৃত্যু কমে গেল, লোকের আয়ু বাড়তে লাগল। জন্মশাসনের ফলে জনসংখ্যা যত কমবে আশা করা গিয়েছিল তা হল না। তা ছাড়া যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ম্যালেরিয়া কলেরা যক্ষ্মা প্রভৃতিতে এখন বেশী লোক মরছে না, শিশুমৃত্যু খুব কমে গেছে, লোক অনেক কাল বাঁচছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ায় বৃদ্ধরা আগের তুলনায় বেশী দিন খাটতে পারছে বটে, তথাপি বিস্তর অকর্মণ্য বৃদ্ধ সমাজের ভারবৃদ্ধি করছে। যারা জন্মাবধি পঙ্গু বা দুর্বল, যারা অসাধ্য রোগে আক্রান্ত, সুচিকিৎসার ফলে তারাও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকছে এবং তাদের অল্প কয়েকজন কাজের যোগ্য হলেও অধিকাংশই সমাজের গলগ্রহ হয়ে আছে। সকল ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বেড়ে যাচ্ছে, জন্মশাসনে অভীষ্ট ফল হচ্ছে না, অকর্মণ্য বৃদ্ধ আর পঙ্গুও পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী হয়েছে। অবশেষে অতিপ্রজতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্থানা-ভাব খাদ্যাভাব বস্ত্রাভাব প্রভৃতি নানা অভাব প্রকট হয়ে উঠল, মনুজরাজ্যে মৎস্য-ন্যায়ের লক্ষণ দেখা গেল। বিজ্ঞজন ভাবতে লাগলেন, এ যে হিত করতে গিয়ে অহিত হল! সেকালের অব্যবস্থাই ভাল ছিল, যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ মহামারী অচিকিৎসা শিশুমৃত্যু ইত্যাদির ফলে প্রজার অতিবৃদ্ধি হতে পারত না।

কিছুদিন পূর্বে বোম্বাইএ সার্বজাতিক জন্মশাসন-সম্মেলনের অধিবেশনে শ্রীরাধাকৃষ্ণন বলেছেন, মানবের হিতার্থে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণই সভ্যতা। প্রাণিজগতে কারা বেঁচে থাকবে তা প্রাকৃতিক প্রতিবেশ দ্বারাই নির্ধারিত হয়। ব্যাধি বন্যা দুর্ভিক্ষাদি নিবারিত করে আমরা প্রজার আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছি, প্রাকৃতিক ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছি, তার ফলে সংকট দেখা দিয়েছে। জন্মশাসন ভিন্ন এই সংকটের প্রতিকার হবে না। সম্প্রতি British Association for the advancement of Science-এর সভাপতি প্রোফেসর এ· ভি· হিল তাঁর ভাষণে বলেছেন—All the impulses of decent humanity...religion and traditions of medicine insist that suffering should be relieved. তার পর তিনি বলেছেন—In many parts of the world improved sanitation and fighting of insect borne diseases lowered infantile death rates and prolonged span of life and led to vast increase of population...There is much discussion on human rights. Do they extend to unlimited reproduction, with a consequent obligation falling on those more careful ? সমস্যা এই দাঁড়াচ্ছে—যদি যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ শিশুমৃত্যু রোগ নিবারিত হয়, প্রজার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা হয় এবং যথেষ্ট জন্ম নিরোধ না হয় তবে জনসংখ্যা ভয়াবহ রূপে বাড়বে, প্রজার অভাব মেটানো অসম্ভব হবে। প্রোফেসর হিল অবশেষে হতাশ হয়ে বলেছেন—

If ethical principles deny our right to do evil in order that good may come, are we justified in doing good when the foreseeable consequence is evil ? অর্থাৎ হিতচেষ্টার পরিণাম যদি সমাজের পক্ষে অনর্থকর হয় তবে সে চেষ্টা কি আমাদের করা উচিত ? মনুজ-রাজের কর্ণধারগণ এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি।

দনুজরাজ্যের শাসকবর্গ সমাজহিতৈষী কিন্তু নির্মম। অল্প স্থানে যদি অনেক চারা গাছ উৎপন্ন হয় তবে ক্ষেত্রপাল বিনা দ্বিধায় অতিরিক্ত গাছ উপড়ে ফেলে দেয় যাতে বাকী গাছগুলির উপযুক্ত পুষ্টি ও বৃদ্ধি হতে পারে। পাশ্চাত্ত্য দেশের লোক ঘোড়া গরু কুকুর ইত্যাদি সযত্নে পালন করে, কিন্তু অসাধ্য রোগ হলে অতি প্রিয় জন্তুকেও প্রায় মেরে ফেলে। ভারতবাসী গৃহপালিত জন্তুর তেমন যত্ন নেয় না, কিন্তু অকর্মণ্য রুগ্ন জন্তুকে মারতে তার সংস্কারে বাধে, যদিও কসাইকে গরু, বাছুর বেচতে তার আপত্তি নেই। বহু বৎসর পূর্বে মহাত্মা গান্ধীর আজ্ঞায় তাঁর আশ্রমের একটি রোগার্ত বাছুরকে ইনজেকশন দিয়ে মারা হয়েছিল। বিপিনচন্দ্র পাল তার তীব্র নিন্দা করে লিখেছিলেন—গান্ধীজী বাছুরের কষ্টনাশের জন্য তাকে মারেন নি, নিজের কষ্টের জন্যই মেরেছেন। কৃষিচর্যায় বিকল জন্তু সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য দেশে যে রীতি আছে, দনুজরাজ্যে সকল দেশেই যা করা হয়, পীড়িত ও জরাগ্রস্ত মানুষের বেলাতেও তাই করা হয়। চিররুগ্ন পঙ্গু অক্ষম অসাধ্য-রোগাতুর জরাগ্রস্ত এবং কুকর্মা লোককে সেখানে মেরে ফেলা হয়। বয়স বেশী হলেই যেমন কর্মচারীকে অবসর নিতে হয়, দনুজরাজ্যের বৃদ্ধদের তেমনি ইহলোক ত্যাগ করতে হয়। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। অল্পসংখ্যক হতভাগ্যদের সেখানে বাঁচতে দেওয়া হয়, যাতে ভাগ্যবান প্রজারা কিঞ্চিৎ করুণাচর্চার সুযোগ পায়। বহু দেশে যেমন মহাস্থবির হলেও রাজ্যপাল আর মন্ত্রীরা চাকরিতে বাহাল থাকেন, তেমনি দনুজরাজ্যে বাছা বাছা গুণী বৃদ্ধরা বেঁচে থাকবার লাইসেন্স পান। সেখানকার প্রজানিয়মন-পর্ষদ অর্থাৎ Board of Population Control জনসংখ্যার উপর কড়া নজর রাখেন। যদি তাঁরা দেখেন যে জন্মনিরোধের বহু প্রচলন সত্ত্বেও অভীষ্ট ফল হচ্ছে না, অথবা কোনও কারণে খাদ্যবস্ত্রাদির অত্যন্ত অভাব হয়েছে, তবে তাঁরা নির্মমভাবে প্রজা-সংক্ষেপের যথোচিত ব্যবস্থা করেন। মোট কথা দনুরাজ্যের একমাত্র লক্ষ্য—পরিমিতসংখ্যক প্রজার কল্যাণ ও উৎকর্ষ সাধন, মমতা বা অনুকম্পা সেখানে প্রশ্রয় পায় না।

দনুজরাজ্যের প্রজারা তাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট, কারণ তাতেই তারা অভ্যস্ত। তারা মনে করে, মনুজরাজ্যের শাসনপ্রণালী অতি সেকেলে আর অবৈজ্ঞানিক। সেখানে অযোগ্য জনকে বাঁচাতে গিয়ে সমগ্র সমাজকে ভারাক্রান্ত করা হয়েছে, সুস্থ কর্মঠ প্রজার ন্যায্য প্রাপ্যর একটা বড় অংশ রুগ্ন অক্ষম অবাঞ্ছিত প্রজাকে দেওয়া হচ্ছে। পরিমিতসংখ্যক প্রজার পক্ষে যে জীবনোপায় পর্যাপ্ত হত, অপরিমিত প্রজার অভাব তা দিয়ে পূরণ করা যাচ্ছে না। ভ্রান্ত নীতির ফলে সেখানে সমাজের সর্বাঙ্গীণ ও পরিপূর্ণ উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়েছে। পক্ষান্তরে মনুজরাজ্যের লোকে মনে করে, দনুজরাজ্যের শাসকবর্গ ধর্মভ্রষ্ট ইহসর্বস্ব নরপিশাচ, সেখানকার প্রজারা মানুষাকৃতি পিপীলিকা।

চণ্ডীদাস বলেছেন, সবার উপরে মানুষ সত্য। মহাভারতে হংসরূপী প্রজাপতির উক্তি আছে—গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি, ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ—এই মহৎ গুহ্য তত্ত্ব তোমাদের বলছি, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। ভারতের এই প্রাচীন মানুষবাদ এবং আধুনিক পাশ্চাত্য humanism কি একই? মানুষ কারা? কার দাবি আগে, আমার প্রিয়জনের, না আদর্শরূপে কল্পিত প্রবাহক্রমে নিত্য মানব-সমাজের? মহাভারতে সনৎকুমারের বাক্য আছে—যদ্ ভূতহিতমত্যন্তমেতং সত্যং মতো মম—যাতে জীবগণের অত্যন্ত হিত হয় তাই আমার মতে সত্য (অবলম্বনীয়)। এই জীবগণ কারা? Greatest good of the greatest number—বেন্থামের এই উক্তি আর সনৎকুমারের এই উক্তি কি সমার্থক? মহাভারতে কৃষ্ণ বলেছেন—ধারণাদ্ধর্ম-মিত্যাহু ধর্মো ধারয়তে প্রজাং—ধারণ (রক্ষণ বা পালন) করে এই জন্যই ধর্ম বলা হয়, ধর্ম প্রজাগণকে ধারণ করে। প্রজা যদি অত্যধিক হয় তবে কোন্ ধর্ম তাদের ধারণ করবে? যারা সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত এবং পরিমিত মাত্রায় বংশ-রক্ষা করে তারা আগাছার মত উৎপন্ন অপরিমিত প্রজার ভার কত কাল বইবে? ভাগবতে রন্তিদেব বলেছেন—কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্—এই কামনা করি যেন দুঃখতপ্ত প্রাণিগণের কষ্ট দূর হয়। প্রজার অতিবৃদ্ধি হলে দুঃখতপ্তের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তাদের কষ্টলাঘবের জন্য সুস্থ প্রজা কতটা স্বার্থত্যাগ করবে?

প্রাচীন ধর্মজ্ঞগণ যা চাইতেন আধুনিক সমাজহিতৈষীরাও তাই চান—মানুষের অত্যন্ত হিত হ'ক, দুঃখার্তদের কষ্ট দূর হ'ক। কিন্তু সমস্যা এই—অবাধ প্রজা-বৃদ্ধি এবং অযোগ্য প্রজার বাহুল্য হলে সমগ্র সমাজ ভারক্রান্ত ও ব্যাধিত হয়। সকলের হিত করতে গেলে প্রত্যেকের ভাগে অল্পই পড়ে, অগণিত হতভাগ্যে প্রতি দয়া করতে গেলে সুস্থ সবল ও সুযোগ্য প্রজারা তাদের ন্যায্য ভাগ পায় না। অতএব জন্মশাসন অবশ্যই চাই। সংযম অথবা স্বাভাবিক বন্ধ্যকাল (safe period) পালনের উপদেশ দিলে কিছুই হবে না, কারণ অধিকাংশ মানুষ পশুর তুলনায় অত্যধিক অসংযমী। গর্ভাধান রোধের যেসব সুপরীক্ষিত নিশ্চিত ও নিরাপদ উপায় আছে তাই শেখাতে হবে। কিন্তু যদি জন্মশাসনেও অভীষ্ট ফল না হয় তবে সমাজরক্ষার জন্য ভবিষ্যতে কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন হতে পারে।

সমাজের সংকট ধীরে ধীরে প্রকট হচ্ছে, মামুলী ব্যবস্থায় তা বেশী দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। অশুভস্য কালহরণম্ নীতি গ্রহণ করে, নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে অশুভ দ্রুতবেগে এগিয়ে আসবে। যে ধর্ম সমাজকে ধারণ করে, প্রজাবর্গের অত্যন্ত হিত করে, এবং দুঃখতপ্তগণের আর্তিনাশ করে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের উপযোগী সেই সামঞ্জস্য ধর্মের তত্ত্ব অতিশয় দুরূহ, কিন্তু তার অন্বেষণ উপেক্ষা করা চলবে না।

১৩৬০

# বাংলা ভাষার গতি

বাংলা ভাষার বয়স অনেক, কিন্তু তার যৌবনারম্ভ হয়েছিল মোটে দেড় শ বৎসর আগে, গদ্য রচনার প্রবর্তনকালে। তার পূর্বে বাংলা সাহিত্য ছিল পদ্যময়, তাতে নবরসের প্রকাশ হতে পারলেও সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হ'ত না। গদ্য বিনা পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

বিলাতী ইতিহাসে যেমন এলিজাবেথীয় ভিক্‌টোরীয় ইত্যাদি যুগ, সেই রকম বাংলা সাহিত্যিক ইতিহাসের কাল বিভাগের জন্য বলা হয় ভারতচন্দ্র, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের যুগ। রবীন্দ্রনাথের পরে কোনও প্রবল লেখকের আবির্ভাব হয় নি, তাই ধরা হয় এখনও রবীন্দ্রযুগ চলছে। কথটা পুরো-পুরি ঠিক নয়। যুগপ্রবর্তকের শাসন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভাব যত দিন বলবৎ থাকে তত দিনই তাঁর যুগ। বঙ্কিমচন্দ্র একচ্ছত্র সাহিত্য শাসক ছিলেন, তাঁর আমলে লেখকরা মুষ্টিমেয় ছিলেন, সেজন্য তৎকালীন সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যধিক প্রভাব দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের রচনা ও সংসর্গ অগণিত লেখককে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু তাঁর উদার শাসনে কোনও রচয়িতার ব্যক্তিত্ব বিকাশের হানি হয় নি। তাঁর তিরো-ধানের পর বাংলা সাহিত্যে ভাবগত ও ভাষাগত নানা পরিবর্তন স্পষ্টতর হয়ে দেখা দিয়েছে। এই পরিবর্তনের যে অংশ বহিরঙ্গ বা ভাষার আকৃতিগত তারই কিছু আলোচনা করছি।

### চলিতভাষার প্রসার

চলিতভাষায় লিখিত প্রথম গ্রন্থ বোধ হয়, হুতোম পেঁচার নক্‌শা। অনেকে বলেন, আলালের ঘরের দুলালও চলিতভাষায় লেখা। কথা ঠিক নয়, কারণ এই বইএ প্রচুর গ্রাম্য আর ফরাসী শব্দ থাকলেও সর্বনাম আর ক্রিয়াপদের সাধুরূপই দেখা যায়। রেনল্ড্‌স-এর গল্প অবলম্বনে লিখিত হরিদাসের গুপ্তকথা নামক একটি বই পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগে খুব চলত। এই বই চলিতভাষায় লেখা কিন্তু তাতে সাধুর মিশ্রণ ছিল। বঙ্কিমযুগের গল্পের নরনারী সাধুভাষায় কথা বলত। তারপর রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বহু লেখক তাঁদের পাত্র-পাত্রীদের মুখে চলিতভাষা দিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁরা নিজের বক্তব্য সাধুভাষাতেই লিখতেন। আরও পরে প্রমথ চৌধুরীর প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রায় সমস্ত গদ্য রচনা চলিতভাষাতেই লিখতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ আর প্রমথ চৌধুরী যে রীতির প্রবর্তন করেছেন তাই এখন চলিতভাষার প্রামাণিক বা স্ট্যাণ্ডার্ড রীতি রূপে গণ্য হয়।

আজকাল বাংলায় যা কিছু লেখা হয় তার বোধ হয় অর্ধেক চলিতভাষায়। সাধুভাষা এখন প্রধানত খবরের কাগজে, সরকারী বিজ্ঞাপনে, দলিলে আর স্কুলপাঠ্য পুস্তকে দেখা যায়। অধিকাংশ গল্প এখন চলিতভাষাতেই লেখা হয়। কিন্তু

সকলে এ ভাষা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেন নি, তার ফলে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে। সাধুভাষা এখনও টিকে আছে, তার কারণ চলিতভাষায় যথেচ্ছাচার দেখে বহু লেখক তা পরিহার করে চলেন। 'বল্ল, দিলো, কোচ্ছে' প্রভৃতি অদ্ভুত বানান এবং 'কারুরকে, তাদেরকে, ঘরের থেকে' প্রভৃতি গ্রাম্য প্রয়োগ বর্জন না করলে চলিতভাষা সাধুর সমান দৃঢ়তা ও স্থিরতা পাবে না। লেখকদের মনে রাখা আবশ্যক যে চলিতভাষা কলকাতা বা অন্য কোনও অঞ্চলের মৌখিক ভাষা নয়, সাহিত্যের প্রয়োজনে উদ্ভূত ব্যবহারসিদ্ধ বা conventional ভাষা। এই ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে নির্দিষ্ট ধাতুরূপ ও শব্দরূপ মানতে হবে এবং সাধুভাষার সঙ্গে বিস্তর রফা করতে হবে।

## বানানের অসাম্য

বাংলা বানানের উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে বিস্তর অভিযোগ পত্রিকাদিতে ছাপা হয়েছে। সকলেই বলেন, নিয়মবন্ধন দরকার। ঠিক কথা, কিন্তু কে নিয়মবন্ধন করলে লেখকরা তা মেনে নেবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়? বিশ্বভারতী? বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ? প্রায় ষোল বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতকগুলি নিয়ম রচনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র সেই নিয়মাবলীতে স্বাক্ষর করে তাঁদের সম্মতি জানিয়েছিলেন। তারপর থেকে রবীন্দ্র-রচনাবলী মোটামুটি সেই বানানে ছাপা হচ্ছে, অনেক লেখকও তার কিছু কিছু অনুসরণ করে থাকেন; কিন্তু অধিকাংশ লেখক এই নিয়মগুলির কোন খবরই রাখেন না, রাখলেও তাঁরা চিরকালের অভ্যাস বদলাতে চান না। আসল কথা, নিয়ম রচনা যিনিই করুন, সকলের তা পছন্দ হবে না, লেখকরা নিজের মতেই চলবেন। বাঙালীর নিয়মনিষ্ঠার অভাব আছে। রাজনীতিক নেতা বা ধর্মগুরুর আজ্ঞা বাঙালী ভাবের আবেগে সংঘবদ্ধ হয়ে অন্ধভাবে পালন করতে পারে, কিন্তু কোনও যুক্তিসিদ্ধ বিধান সে মেনে নিতে চায় না।

বাংলা বানানে সামঞ্জস্য শীঘ্র দেখা দেবে এমন সম্ভাবনা নেই। অ্যা, য়্যা, এ্যা প্রভৃতি বিচিত্র বানান চলতে থাকবে, যাঁরা নূতনত্ব চায় তাঁরা 'বংগ, আকাংখা, উচিৎ, কোরিলো, বিশেষতো' লিখবেন এবং দেদার ও-কার আর হস্-চিহ্ন অনর্থক যোগ করবেন।। হিন্দীভাষী সোজাসুজি বানান করে লখনউ, কিন্তু বাঙালী তাতে তুষ্ট নয়, লেখে লক্ষ্ণৌ। অকারণ য-ফলা দিয়ে লেখে স্যার, অকারণ ও-কার দিয়ে লেখে পেলো। নিয়মবন্ধনে ফল হবে না। যত রকম বানান এখন চলেছে তার কতকগুলি কালক্রমে বহুসম্মত ও প্রামাণিক গণ্য হয়ে স্থায়িত্ব পাবে, বাকীগুলি লোপ পাবে।

## পূর্ববঙ্গের প্রভাব

সেকালে যখন সাধুভাষাই সাহিত্যের একমাত্র বাহন ছিল তখন সুপ্রতিষ্ঠ লেখকদের রচনা পড়ে বোঝা যেত না তাঁরা কোন জেলার লোক। কলকাতার রমেশচন্দ্র দত্ত, ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চাটগাঁয়ের নবীনচন্দ্র সেন, মহারাষ্ট্রের সখারাম গণেশ দেউস্কর একই ভাষায় লিখেছেন। তাঁদের রচনায় গ্রাম্য বা প্রাদেশিক শব্দ না থাকায় ভাষার ভেদ হ'ত না। কিন্তু আজকাল চলিতভাষায় যা লেখা হয় তা পড়লে প্রায় বোঝা যায় লেখক পূর্ববঙ্গীয় কিংবা পশ্চিমবঙ্গীয়। 'আপ্রাণ, সাথে, কিছুটা,

-কেমন জানি (কেমন যেন), সুন্দর মতো' ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গে চলে না। কিন্তু এসব প্রয়োগ অশুদ্ধ নয়, অতএব বর্জনীয় বলা যায় না। পূর্ববঙ্গবাসী অতিরিক্ত-গুলি আর টা প্রয়োগ করেন, অকারণে 'নাকি' লেখেন, অচেতন পদার্থেও মাঝে মাঝে-রা যোগ করেন। ('আকাশ হতে জলেরা ঝরে পড়ছে'), কর্মকারকে অনেক সময় অনর্থক -কে বিভক্তি লাগান ('বইগুলিকে গুছিয়ে রাখ')। তাঁরা নিজের উচ্চারণ অনুসারে 'দেওয়া নেওয়া সওয়া' (১১) স্থানে 'দেয়া নেয়া সোয়া' লেখেন, মোমবাতি অর্থে 'মোম', টেলিগ্রাম অর্থে 'টেলি', লেখেন। এই সব প্রয়োগও নিষিদ্ধ করা যাবে না। বিলাত আর মার্কিন দেশের ভাষা ইংরেজী কিন্তু অনেক নামজাদা লেখকের রচনায় ওয়েল্‌স স্কচ বা আইরিশ ভাষার ছাপ দেখা যায়, মার্কিন ইংরেজী অনেক সময় খাস ইংরেজের অবোধ্য ঠেকে। পূর্ববঙ্গীয় অনেক বৈশিষ্ট্য সাহিত্যিক বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে, তাতে আপত্তি করলে চলবে না।

তথাপি মানতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গের মৌখিকভাষার সঙ্গেই সাহিত্যিক চলিত-ভাষার সাদৃশ্য বেশী। সকল লেখকই তাঁদের প্রাদেশিক সংস্কার পরিহার করে পশ্চিমবঙ্গীয় রীতি অনুসরণের চেষ্টা করেন। এতে কোনও জেলার গৌরব বা হীনতার প্রশ্ন ওঠে না, বিশেষত দৈববিপাকে ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গ এখন সমস্ত বাঙালী হিন্দুর আশ্রয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু অনেক সময় অজ্ঞতার ফলে পূর্ববঙ্গবাসীর (এবং পশ্চিমবঙ্গেরও কয়েকটি জেলাবাসীর) লেখায় অপ্রামাণিক বানান এসে পড়ে, যেমন অস্থানে চন্দ্রবিন্দু বা যথাস্থানে চন্দ্রবিন্দুর অভাব, ড় আর র-এর বিপর্যয়। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের মুখে শুনেছি, তাঁর এক বন্ধু তাঁকে লিখেছিলেন —ঘাঁড়ে ফোঁড়া হওয়ায় বড় কষ্ট পাইতেছি। যোগেশচন্দ্র উত্তরে লেখেন—আপনার ঘাড় আর ফোড়ার চন্দ্রবিন্দু দেখিয়া আমি আরও কষ্ট পাইলাম। অনেকে 'চেইন, ট্রেইন, মেরেইজ (marriage)' লেখেন। এঁদের একজনের কাছে শুনেছি, 'চেন' লিখলে 'চ্যান' পড়বার আশঙ্কা আছে, তার প্রতিষেধের জন্য ই দেওয়া দরকার। আরও কয়েকজন যুক্তি দিয়েছেন, খাস ইংরেজের উচ্চারণে ই-ধ্বনি আছে। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার বানানে সকল ক্ষেত্রে যথাযথ প্রকাশ করা যায় না, অতএব কাছাকাছি বানানেই কাজ চালাতে হবে। 'চেইন' লিখলে সাধারণ পাঠকের মুখে ই-কার অত্যধিক প্রকট হয়ে পড়ে, সেজন্য 'চেন' লেখাই উচিত। লেখকের মুখের ভাষায় প্রাদেশিক টান থাকলে ক্ষতি হয় না, কিন্তু লেখবার সময় সকলেরই সতর্ক হয়ে প্রামাণিক বানান অনুসরণ করা উচিত।

## শব্দ ও অর্থের শুদ্ধি

ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগের তুলনায় এখনকার লেখকরা বেশী ভুল করেন, যাঁরা বাংলায় এম. এ. পাস করেছেন তাঁরাও বাদ যান না। সেকালে লেখকের সংখ্যা অল্প ছিল, তাঁদের মধ্যে যাঁরা শীর্ষস্থানীয় তাঁরা ভাষার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন এবং অন্য লেখকদের নিয়ন্ত্রিত করতেন। একালে লেখকদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসতর্কতাও বেড়েছে। অশুদ্ধির একটি প্রধান কারণ শিক্ষিত লোকের মধ্যে সংস্কৃত-চর্চা পূর্বের তুলনায় খুব কমে গেছে।

অনেকে বলে থাকেন, ভাষা ব্যাকরণের অধীন নয়, বাংলা ভাষায় সংস্কৃত নিয়ম চালাবার দরকার নাই। এ কথা সত্য যে জীবিত ভাষা কোনও নির্দিষ্ট ব্যাকরণের শাসন

পুরোপুরি মানে না, স্বাধীনভাবে এগিয়ে চলে, সেজন্য কালে তার ব্যাকরণ বদলাতে হয়। শুধু ব্যাকরণ নয়, শব্দাবলী শব্দার্থ আর বাক্যরচনার রীতিও বদলায়। কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার যে সম্বন্ধ আছে তা অস্বীকার করা চলে না। ল্যাটিন গ্রীক যে অর্থে মৃতভাষা সংস্কৃত সে অর্থে মৃত নয়। অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে, প্রয়োজন হলে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আরও শব্দ নেওয়া হয় এবং ব্যাকরণের বিধি অনুসারে নূতন শব্দ তৈরি করা হয়। শুধু বাংলা ভাষা নয়, আসামী ওড়িয়া হিন্দী মারাঠী গুজরাটী ভাষাও সংস্কৃত থেকে শব্দ নেয়। সংস্কৃতের বিপুল শব্দভাণ্ডার এবং শব্দরচনার চিরাগত সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অবহেলা করলে বাংলা ভাষার অপূরণীয় ক্ষতি হবে। অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার যোগসূত্র সংস্কৃত শব্দাবলী, শব্দের বানান আর অর্থ বিকৃত করলে সেই যোগসূত্র ছিন্ন হবে, অন্য প্রদেশবাসীর পক্ষে বাংলা ভাষা দুর্বোধ হবে।

সজ্ঞানে শব্দের অপপ্রয়োগ করতে কেউ চায় না, কিন্তু মহামহা-পণ্ডিতেরও ভুল হতে পারে। প্রখ্যাতনামা নমস্য লেখকের ভুল হলে খাতির করে বলা হয় আর্ষ-প্রয়োগ, কিন্তু সেই প্রয়োগ প্রামাণিক বলে গণ্য হয় না। ভুল জানতে পারলে অনেকে তা শুধরে নেন, কিন্তু যাঁর অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে তিনি ছাড়তে চান না। ভুল প্রয়োগের সমর্থনে অনেক সময় কুযুক্তি শোনা যায়। বাংলা 'চলন্ত' আর 'পাহারা' আছে কিন্তু অনেকে তাতে তুষ্ট নন, সংস্কৃত মনে করে 'চলমান' আর 'প্রহরা' লেখেন। যখন শোনেন যে সংস্কৃত নয় তখন বলেন, বাংলা স্বাধীন ভাষা, সংস্কৃতের দাসী নয়; চলমান আর প্রহরা শ্রুতিমধুর, অতএব চলবে। 'কার্যকরী' স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু বোধ হয় সুমিষ্ট, তাই 'কার্যকরী উপায়, কার্যকরী প্রস্তাব' ইত্যাদি অপপ্রয়োগ আজকাল খবরের কাগজে খুব দেখা যায়।

'কর্মসূত্রে' স্থানে 'কর্মব্যপদেশে', 'ধূমজাল' স্থানে 'ধূম্রজাল', 'শয়িত' বা শয়ান স্থানে 'শায়িত', 'প্রসার' স্থানে 'প্রসারতা', 'কৌশল' বা পদ্ধতি অর্থে 'আঙ্গিক', 'প্রামাণিক' অর্থে 'প্রামাণ্য', 'ক্ষীণ' বা মিটমিটে অর্থে 'স্তিমিত' ইত্যাদি অশুদ্ধ প্রয়োগ আধুনিক রচনায় প্রচুর দেখা যায়। এই সব শব্দের বদলে শুদ্ধ শব্দ লিখলে রচনার মিষ্টত্বের লেশমাত্র হানি হয় না। ভাষার শুদ্ধিরক্ষার জন্য সতর্কতা আবশ্যক —এ কথা শুনলে নিরঙ্কুশ লেখকরা খুশী হন না। এঁদের মনোভাব বোধ হয় এই—যা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে এবং আর পাঁচজনেও যা লিখছে তা অশুদ্ধ হলেও মেনে নিতে হবে। আমি যদি গলা-ধাক্কা অর্থে গলাধঃকরণ লিখে ফেলি এবং আমার দেখাদেখি অন্যেও তা লিখতে আরম্ভ করে তবে সেই নূতন অর্থই মানতে হবে।

## ইংরেজীর প্রভাব

ইংরেজী অতি সমৃদ্ধ ভাষা। মাতৃভাষার অভাব পূরণের জন্য সাবধানে ইংরেজী থেকে শব্দ আর ভাব আহরণ করলে কোনও অনিষ্ট হবে না। কিন্তু যা আমাদের আছে তাকে অবহেলা করে যদি বিদেশী শব্দ বা বাক্যের নকল চালানো হয়, তবে অনর্থক দৈন্য প্রকাশ পাবে এবং মাতৃভাষা বিকৃত হবে। medium-এর প্রতিশব্দ 'মাধ্যম'-এর প্রয়োজন আছে, যথাস্থানে তার প্রয়োগ সার্থক। কিন্তু ইংরেজী বাক্য-রীতির অনুকরণে লেখা হয়—'বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা।' 'বাংলায় বিজ্ঞান-

'শিক্ষা' লিখলে হানি কি? সম্প্রতি দেখেছি—'এই সভায় অনেক ব্যক্তিত্বর সমাগম হয়েছিল'। ইংরেজী personality-এর আক্ষরিক অনুবাদ না করে 'বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম' লিখলে কি চলত না? Promise আর signature-এর বিশেষ অর্থে 'প্রতিশ্রুতি' আর 'স্বাক্ষর'-র অপপ্রয়োগ আজকাল খুব দেখা যায়। 'নারীমাত্রেই মাতৃত্বের প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন।' 'এই গ্রন্থে তাঁর প্রতিভার সাক্ষর রেখে গেছেন।' একজনের লেখায় দেখেছি—'সে এই অপমানের বিজ্ঞপ্তি নিল না' (অর্থাৎ took no notice)। এই রকম অন্ধ অনুকরণ যদি চলতে থাকে তবে বাংলা শীঘ্রই একটা উৎকট ভাষায় পরিণত হবে।

## উচ্ছ্বাস ও আড়ম্বর

নীরদ চৌধুরীর বহু বিতর্কিত ইংরেজী বইএ এই রকম একটা কথা আছে—বাঙালী বিনা আড়ম্বরে কিছু লিখতে পারে না। যুদ্ধ বেধেছে, এই সোজা কথার বদলে লিখবে—রুদ্র তাঁর প্রলয়নাচন নাচতে আরম্ভ করেছেন। চৌধুরী মহাশয় কিছু অত্যুক্তি করেছেন, কিন্তু তাঁর অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। বাংলা কাগজে আগুন লাগা বা অগ্নিকাণ্ডর খবর লেখা হয়—বৈশ্বানরের তাণ্ডবলীলা। জলে ডুবি বা জলমজ্জনকে বলা হয় সলিল সমাধি। 'ব্যর্থ হইল' লিখলে যথেষ্ট হয় না, লেখা হয়—'ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।' বাংলাভাষী স্থানে লেখা হয় 'বাংলা-ভাষাভাষী।' সরল ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করতে অনেকে পারেন না।

বিজ্ঞানদর্শনাদির আলোচনায় উচ্ছ্বসিত ভাষা অনর্থকর। বক্তব্য সহজে বোঝা যাবে মনে করে অনেকে অতিরিক্ত রূপক বা কাব্যিক ভাষা প্রয়োগ করেন।—'কোষ্ঠ-কাঠিন্য জীবাণুর পক্ষে বন্ধুর কাজ করে।' 'যে অণুর মধ্যে যত প্রকারের স্বাভাবিক কাঁপন, তত রকম ভাবে এক একটা আলো কণার থেকে কাঁপন চুরি যেতে পারে।' যাঁরা বাংলায় বিজ্ঞান লিখবেন তাঁদের বাগাড়ম্বর পরিহার করে স্পষ্টতা আর শৃংখলিত যুক্তির তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখতে হবে। বিজ্ঞান-দর্শনের প্রসঙ্গে কবিত্বের ঈষৎ স্পর্শ একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনায় সার্থক হয়েছে। যাঁরা স্কুল কলেজের জন্য বিজ্ঞানের বই লিখবেন তাঁদের সেরকম চেষ্টা না করাই ভাল।

# জাতিচরিত্র

ভাইকাউন্ট স্যামুএল একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও রাজনীতিক। এককালে সার হারবার্ট স্যামুএল নামে ইনি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার একজন সদস্য ছিলেন। সম্প্রতি তিরাশি বৎসরে পদার্পণ করে ইনি পার্লামেণ্টে হাউস অভ লর্ডসে নিজ দেশের নৈতিক অবস্থা (The State of Britain's Morals) সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়েছেন। তার ভাবার্থ এই—

ব্রিটেনের রাজনীতিক অর্থনীতিক আন্তর্জাতিক প্রভৃতি নানা সমস্যা আছে, কিন্তু সবচেয়ে চিন্তার বিষয়—আমাদের জাতীয় চরিত্র। যাঁরা এসম্বন্ধে খবর রাখেন তাঁদের অনেকে উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। ব্রিটিশ জাতির সাহস ও দেশপ্রেম পূর্ণ-মাত্রায় আছে। আমাদের নির্বাচক মণ্ডলে যে তিন কোটি ভোটদাতা আছে তাদের বুদ্ধি ও কর্তব্যনিষ্ঠা পূর্বের তুলনায় বেড়েছে ছাড়া কমেনি। কিন্তু দেশবাসীর এক অংশের যে চারিত্রিক অবনতি দেখা যাচ্ছে তা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। আমাদের বড় বড় শহরে যেসব দুষ্ক্রিয়ার আড্ডা আছে তা ব্রিটিশ সভ্যতার কলঙ্ক। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে কিছুকাল এদেশে অপরাধীর সংখ্যা এত কমে গিয়েছিল যে অর্ধেক জেলখানা বন্ধ রাখলেও চলত। কিন্তু এখন তার উলটো হয়েছে, বিশেষত অল্প-বয়স্ক অপরাধীর সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। খবরের কাগজের প্রতিদিন যেসব নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ ছাপা হয় তা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়। পূর্বের তুলনায় লাম্পট্য খুব বেড়ে গেছে, ব্যভিচার তুচ্ছ পরিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিবাহভঙ্গ এখন একটা নিত্যনৈমিত্তিক সামান্য ঘটনা বলে গণ্য হয়। আরও ভয়ানক কথা—the vices of Sodom and Gomorrah appear to be rife among us। বাইবেলে আছে, ভূমিকম্প আর অগ্ন্যুৎপাতে এর প্রায়শ্চিত্ত হয়েছিল। এখন তা হবার নয়, কিন্তু বর্তমান সমাজে এই পাপের পরিণাম আরও মারাত্মক ভাবে দেখা দেবে, আমাদের ধর্মবুদ্ধি বিষাক্রান্ত হবে। অনেকে মনে করেন এসব কথা সাধারণের আলোচ্য নয়। কিন্তু ধর্মনীতি যদি ক্ষুণ্ণ হয় তবে সমগ্র জাতিকে তার ফলভোগ করতে হবে। স্বর্গ নরক সম্বন্ধে জনসাধারণের পূর্বে যে ধারণা ছিল তা এখন নেই, দুই মহাযুদ্ধের ফলে বিধাতার মঙ্গলময় বিধানেও লোকের আর আস্থা নেই। শারীরবিদ্যা আর মনোবিদ্যার নূতন নূতন মতবাদের ফলে আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ কমে গেছে। এখন শোনা যায়, প্রত্যেক মানুষের আচরণ তার জন্মগত gene সমূহের (আদিম জন্মকোষের কতক-গুলি অতি সূক্ষ্ম উপাদানের) ফল, অতএব বেশী দোষ ধরা ঠিক নয়, মানুষের ব্যক্তিগত ত্রুটি উদার ভাবে বিচার করাই উচিত।

পরিশেষে স্যামুএল বলেছেন, আমাদের সদাচার বা কদাচারের মূলে আছে ব্যক্তিগত আদিম জন্মকোষের বৈশিষ্ট্য—এইটেই সব কথা নয়। যে সামাজিক পরি-বেশে আমরা জন্মগ্রহণ করি তার রীতিনীতি এবং লোকমত অনুসারেই আমাদের

চরিত্র প্রধানত গঠিত হয়। সকল দেশের মানবসমাজের বহু যুগের চিন্তার ফলে যা উদ্ভূত হয়েছে সেই সর্বজনীন ধর্মনীতি অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর—এই সহজ বুদ্ধি আমাদের ফিরে আসা আবশ্যক।

ফরাসী আর মার্কিন জাতির দোষও অনেক পত্রিকায় আলোচিত হয়। ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা স্থায়ী হয় না তার কারণ ফরাসী জাতি অব্যবস্থিতচিত্ত। শাসকবর্গের অসাধুতা লাম্পট্য আর অকর্মণ্যতার জন্যেই গত যুদ্ধে পরাজয় ঘটেছিল। সম্প্রতি Ernest Raynaud নামক একজন ফরাসী সম্পাদক New York Times পত্রিকায় লিখেছেন—সুরাসক্তিতে ফরাসী জাতি অদ্বিতীয়, মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো মিলে প্রতি বৎসরে যা উদরস্থ করে তাতে খাঁটি অ্যালকোহলের পরিমাণ দাঁড়ায় জন পিছু গড়ে সাত গ্যালন (প্রায় ৮৪ বোতল ব্রাণ্ডি বা হুইস্কির সমান)। ফ্রান্সের এক পঞ্চমাংশ লোক মদ তৈরি বা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এই দেশ-ব্যাপী সুরাপ্লাবন রোধ করবার চেষ্টা মাঝে মাঝে হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রপরিষদে শৌণ্ডিকরাই সর্বেসর্বা, তাদের অমতে কিছু করা সরকারের অসাধ্য। খবরের কাগজ নীরব, কারণ অপ্রিয় সত্য লিখলেই বিজ্ঞাপনের আয় বন্ধ হবে। সম্প্রতি একজন মন্ত্রী মদ্যপতিদের দমন করতে গিয়ে পদচ্যুত হয়েছেন।

কয়েক মাস পূর্বে Times Literary Supplement-এ আমেরিকার নাগরিক জীবনের কঠোর সমালোচনা ছাপা হয়েছে। জুয়া জুলুম আর ধনবাহুল্য —এই হচ্ছে মার্কিন সভ্যতার অঙ্গ। ধনীরা আত্মরক্ষার জন্য গ্যাংস্টার বা গুণ্ডা-দের টাকা দিয়ে ঠাণ্ডা রাখে। রাষ্ট্রচালনার সকল ক্ষেত্রে ঘুষ চলে, সেনেটার জজ মেয়র শেরিফ সেনাপতি কেউ বাদ যায় না। ধনী অপরাধীরা অনায়াসে আইনকে ফাঁকি দিতে পারে।...ইত্যাদি।

বড় বড় পাশ্চাত্ত্য জাতির দোষের ফর্দ শুনে আমাদের উৎফুল্ল হবার কারণ নেই। আমরা শান্ত শিষ্ট সোনার চাঁদ, নৃশংসতা ব্যভিচার লাম্পট্য সুরাসক্তি আমা-দের মধ্যে কম, অতএব আমাদের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল—এমন মনে করা ঘোর মূর্খতা। বৃহৎ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের জন্য জওহরলাল আছেন, বিধান রায় আছেন, তাঁদের শায়েস্তা রাখার জন্য কমিউনিস্ট প্রজা-সোশালিস্ট প্রভৃতি দল আছে, দুর্মুখ খবরের কাগজ আছে, অতএব আমরা রাম-শ্যাম-যদুর দল নিশ্চিন্ত হয়ে যা পারি রোজগার করব আর অবসর কালে সিনেমা ফুটবল নাচ গান গল্প উপন্যাস সর্বজনীন পুজো প্রভৃতি সংস্কৃতিচর্চায় মেতে থাকব—এই মনোবৃত্তি অনর্থকর। যে স্বাধীনতা আমরা সাত শ বছর পরে অতি কষ্টে পেয়েছি তা বজায় রাখতে পারব কিনা, ব্রিটিশ ভারতের চাইতে সমৃদ্ধতর ভারত গড়তে পারব কিনা—এসব প্রশ্নের উত্তর এখন দেওয়া যায় না। আমরা, অর্থাৎ দেশের জনসাধারণ যদি নিজের অসংখ্য ত্রুটি শোধনের চেষ্টা না করি এবং প্রজার কর্তব্যে অবহেলা করি তবে কোনও রাষ্ট্রনেতা বা রাজনীতিক দল আমাদের রক্ষা করতে পারবেন না।

ভারতবাসী মোটের উপর শান্তিপ্রিয় অহিংস। এ দেশেও নেশাখোর, জুয়াড়ী, সাধারণ আর অসাধারণ লম্পট আছে, চোর ডাকাত খুনে ঘুষখোর আছে, যুদ্ধের পর তাদের উপদ্রব বেড়েও গেছে, কিন্তু জনসংখ্যায় এইসব অপরাধীর অনুপাত

বেশী নয়। ব্যভিচার খুব কম, ভবিষ্যতে হয়তো কিছু বাড়বে, কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে তা সইতে হবে। কয়েকটি বিষয়ে আমরা পাশ্চাত্ত্য জাতির তুলনায় ভাল, কিন্তু অন্যান্য বহু বিষয়ে অতি মন্দ। সমগ্র ভারতের অবস্থা আলোচনা না করে শুধু বাংলা দেশের (পশ্চিম বাংলার) কথাই ধরা যাক।

স্যামুএল বলেছেন, ব্রিটিশ জাতির সাহস ও দেশপ্রেম পূর্ণমাত্রায় আছে। দেশ-রক্ষার জন্য অপরিহার্য এই দুই গুণ আমাদের কতটা আছে? অনেক বাঙালী ছেলে-মেয়ে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে তা সত্য, কিন্তু যে পদ্ধতিতে এদেশের বিপ্লবীরা বহু বৎসরে ব্রিটিশ সরকারকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, সে পদ্ধতিতে আক্রামক শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা চলবে না। বর্তমান সরকারকে জব্দ করবার উদ্দেশ্যে পুলিসের সঙ্গে লড়াই, ট্রাম-বাস পোড়ানো, বোমা ছোড়া, দোকান লুঠ. ইত্যাদি কর্মের জন্য বীরপুরুষ ঢের আছে তা ঠিক। কিন্তু আজ যদি কোন বক্তিয়ার খিলজি সতরো বা সাত হাজার সৈন্য নিয়ে দেশ আক্রমণ করে তবে ক জন বাঙালী তাদের বাধা দেবে? যাদের প্ররোচনায় আমাদের ছেলেরা 'চলবে না চলবে না, মানতে হবে মানতে হবে' বলে গর্জন করে, সেই অন্তরালস্থ নেতারা তখন কি করবে? শত্রুর দলে যোগ দেবে না তো? তখন কি শুধুই গোর্খা-শিখ-গাড়োআলী পল্টন আমাদের হয়ে লড়বে আর আমরা ঘরের দরজা বন্ধ করে দুর্গানাম জপ করব?

হুজুগে মেতে বা দেশদ্রোহীর প্ররোচনায় গুণ্ডামি করা আর দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা এক নয়। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য শুধু সাহস নয়, শিক্ষাও আবশ্যক। দেশরক্ষার জন্য যে সৈন্যবাহিনী গঠিত হচ্ছে তাতে যদি দলে দলে বাঙালীর ছেলে সাগ্রহে যোগ দেয় তবেই তাদের এবং তাদের পিতামাতার সাহস আর দেশপ্রেম প্রমাণিত হবে। এককালে ইংরেজ আমাদের রক্ষা করত, এখন অবাঙালী ভারতবাসী রক্ষা করবে—এ কথা ভাবতেও লজ্জা হওয়া উচিত।

দেশের উপর একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্কের জাল জড়িয়ে আছে, প্রজা বা শাসক কেউ তা থেকে মুক্ত নয়। শিক্ষকরা ছাত্রদের ভয় করেন, পরীক্ষার সময় যারা নকল করে তাদের বাধা দিলে প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে। পিতামাতা সন্তানকে শাসন করতে সাহস করেন না, পাছে সে আত্মহত্যা করে অথবা তার সঙ্গীরা সদলে এসে প্রতিশোধ নেয়। ব্রিটিশ আমলে পুলিস বেপরোয়া ছিল, তার এই ভরসা ছিল যে প্রবল প্রতাপ মনিব পিছনে আছেন। কিন্তু এখন পুলিস দ্বিধায় পড়েছে, কোন্ ক্ষেত্রে কতটা বলপ্রয়োগ চলবে তা তার বর্তমান মনিবরা স্থির করতে পারেন না। চোর ডাকাত প্রভৃতি মামুলী অপরাধীদের বেলায় ঝঞ্ঝাট নেই, কিন্তু আজকাল যেসব নূতন বেআইনী ব্যাপার হচ্ছে তার বেলায় নির্ভয়ে কর্তব্য পালন অসম্ভব। অফিস ও কারখানার কর্মীরা মনিবদের আটকে রাখে, ধর্মঘটীরা রাজপথে লোকের যাতায়াতে বাধা দেয়, স্কুল কলেজ বা অফিস প্রভৃতি কর্মস্থল অবরোধ করে, গুণ্ডারা ট্রাম-বাস পোড়ায়। এসব ক্ষেত্রে পুলিস উভয় সংকটে পড়ে। নিষ্ক্রিয় থাকলে তাকে অকর্মণ্য বলা হবে, কর্তব্য পালন করলে নিষ্ঠুর অত্যাচারী বলা হবে। অধিকাংশ খবরের কাগজ অপক্ষপাতে কিছু লিখতে সাহস করে না, পাছে কোনও দল চটে। তারা দুই দিক বজায় রাখার চেষ্টা করে, ফলে পাঠকরা বিভ্রান্ত হয়। দশ-বারো বছরের ছেলে যখন বলে, নেমে যান মশাইরা, এ গাড়ি পোড়ানো হবে, তখন যাত্রীরা সুবোধ শিশুর মতন আজ্ঞা পালন করে। নাগরিক কর্তব্যবুদ্ধি এবং অন্যায় কর্মে বাধা দেবার বিন্দুমাত্র সাহস কারও নেই। ঝঞ্ঝাটে দরকার কি বাপু—এই হচ্ছে জন-

সাধারণের নীতি। পাশ্চাত্ত্য পানদোষ আর ইন্দ্রিয়দোষের তুলনায় এই ক্লীবতা আর কর্তব্যবিমুখতা অনেক বড় অপরাধ।

শাসকবর্গ যদি ঘোর অত্যাচারী হয় এবং প্রতিকারের অন্য উপায় না থাকে তবে রাষ্ট্রবিপ্লব ছাড়া গতি নেই। কিন্তু কোনও দলের অসন্তোষের কারণ ঘটলেই যদি সেই দল উপদ্রব করে তবে অরাজকতা উপস্থিত হয় এবং তার ফলে জনসাধারণ সংকটে পড়ে। লোকে শান্তি চায়, অধিকাংশ লোকের এ বুদ্ধিও আছে যে দুষ্ট-দমনের জন্য বলপ্রয়োগ আবশ্যক এবং মাঝে মাঝে তা মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে, তার ফলে নির্দোষেরও অপঘাত হতে পারে, যেমন যুদ্ধকালে অনেক অযোদ্ধাও মারা যায়। আমাদের শাসকবর্গ এবং তাঁদের সমর্থকগণও তা বোঝেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কর্তব্যপালনে ভয় পান। বোধ হয় ভবিষ্যৎ নির্বাচনের কথা ভেবেই তাঁরা মতি স্থির করতে পারেন না। জনসাধারণের যদি ধারণা হয় যে কংগ্রেসী সরকার অত্যাচারী তবে তাঁদের ভোট দেবে কে? যে ছোকরার দল আজ হইহই করে উপদ্রব করছে, নির্বাচনের সময় তাদেরই তো সাহায্য নিতে হবে, তারাই তো 'ভোট ফর অমুক' বলে চেঁচাবে। অতএব তাদের চটানো ঠিক নয়। খবরের কাগজকেও উপেক্ষা করা চলবে না, তারা জনসাধারণকে খেপিয়ে দিতে পারে। শাসকবর্গ এবং তাঁদের সমর্থকগণ যদি নিজ দলের লাভ-অলাভ জয়-পরাজয় সমজ্ঞান করে নির্ভয়ে কর্তব্যপালন করেন তবেই বর্তমান অবস্থার প্রতিকার হবে। জনকতক নেতা না হয় নির্বাচনে পরাস্ত হবেন কিন্তু জনসাধারণ যদি সুশাসনের ফল উপলব্ধি করে ভবিষ্যতে তারা উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনে ভুল করবে না।

যেমন অন্য দেশে তেমনি এদেশেও অধিকাংশ লোকের কোনও নির্দিষ্ট রাজনীতিক মত নেই। রাস্তার পোস্টার, প্রচারকদের বুলি, আর দলীয় খবরের কাগজের দ্বারাই তারা সাময়িক ভাবে প্রভাবিত হয়। বাঁধাধরা রাজনীতিক মত না থাকলে কোনও ক্ষতি হয় না, রাজনীতির চাইতে ঢের বেশী দরকার প্রজার যথার্থ স্বার্থবুদ্ধি এবং বিভিন্ন দলের উক্তি-প্রত্যুক্তি বিচার করবার ক্ষমতা। যে কিষান-মজদুর-রাজের কথা অনেক নেতা বলে থাকেন তার মানে কি? কিষান-মজদুর সেক্রেটারিয়েটে বসে রাজ্য চালাবে, না জনকতক নেতা তাদের প্রতিনিধি সেজে কর্তৃত্ব করবেন? সাম্যবাদের জয় হলেও তো দেশে মূর্খ অকর্মণ্য ধূর্ত আর স্বার্থপর লোক থাকবে, রাজ্য-চালানোর ভার কারা নেবে তা স্থির করবে কে? বিদেশী গুরুর আজ্ঞাবহ শিষ্যরা? কমিউনিস্টরা ব্রিটেন-আমেরিকার বিস্তর দোষ ধরে, কিন্তু রাশিয়ার তিলমাত্র দোষের কথা বলে না কেন? কংগ্রেসের পন্থা কি? বার বার গান্ধীজীর নাম নিলে আর মাঝে মাঝে খাদি পরলেই কি কংগ্রেসী হওয়া যায়?

সাত বৎসর আগেও কংগ্রেসের প্রবল প্রতিপত্তি ছিল, জনসাধারণ কিছু বুঝুক না বুঝুক কংগ্রেসের বশে চলত। কিন্তু এখন অন্তত পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কমে গেছে, লোক মনে করে কংগ্রেসী সরকার রাজস্বের অপব্যয় করেন, স্বজন পোষণ করেন, ধনপতিদের বশে চলেন। এই ধারণার উচ্ছেদ না হলে কংগ্রেসী সরকারের শীঘ্রই পতন হবে।

প্রবাদ আছে—প্রজা যেমন তার ভাগ্যে শাসনও তেমনি জোটে। আমাদের জন-সাধারণের কর্তব্যজ্ঞান না বাড়লে শাসনের উৎকর্ষ হবে না। দেশে শিক্ষিত জনের সংখ্যা যতই অল্প হ'ক, তাঁরাই উদ্‌যোগী হয়ে জনসাধারণকে সুবুদ্ধি দিতে পারেন, যাতে তারা প্রজার অধিকার আর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়। কিন্তু শিক্ষিত

সম্প্রদায় উদাসীন, তাঁদের অধিকাংশ নিজের ধান্দা বা শখ নিয়ে ব্যস্ত। যারা অল্প-বয়স্ক তারা নিত্য নব নব বর্বরতায় মেতে আছে—ব্যগ্রদেবীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, হোলির উন্মত্ত হুল্লোড়, যে-কোন পর্ব উপলক্ষ্যে লাউড স্পীকারের অপপ্রয়োগ আর পটকার আওয়াজ। এদের সুরুচি আর সংযম শেখাবার গরজ কারও নেই।

আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশের মত নেশাখোর নই, কিন্তু একটা প্রবল মানসিক মাদক এদেশের জনসাধারণকে অভিভূত করে রেখেছে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ও তার কবল থেকে মুক্ত নয়। আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি বলে গর্ব করি, কিন্তু আমাদের ধর্মের অর্থ প্রধানত বাহ্য অনুষ্ঠান, নানা রকম অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস, এবং ভক্তির চর্চা। অর্থাৎ পুরোহিত মারফত পূজা, কবচ-মাদুলি, আর যদি ভক্তি থাকে তবে ইষ্টদেবের আরাধনা। পৃথিবীর অনেক দেশেই ধর্মচর্চা এই রকম। কিন্তু যদি সাধারণ জীবন-যাত্রাও অন্ধ সংস্কারের বশে চলে তবে জাতির অধোগতি অবশ্যম্ভাবী।

নানা বিষয়ে এদেশের লোকের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয়ে আছে। নেপালবাবার দৈব ঔষধের লোভে অসংখ্য লোকের কষ্টভোগ আর কুম্ভস্নানপুণ্যের দুর্বার আকর্ষণে বহু লোকের প্রাণহানি এই মোহের ফল। ফলিত জ্যোতিষ একটি প্রাচীন সংস্কার, যেমন মারণ উচ্চাটন বশীকরণ। কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই তবুও লোক মনে করে এ একটা বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যা। ভাগ্যগণনা কত ক্ষেত্রে সফল হয় আর কত ক্ষেত্রে বিফল হয় কেউ তা বিচার করেন না। অনেক খবরের কাগজে সপ্তাহে জ্যোতিষিক ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করে সাধারণের অন্ধবিশ্বাসে ইন্ধন যোগানো হয়। আমাদের যেটুকু পুরুষকার আছে দৈবের উপর নির্ভর করে তাও বিনষ্ট হচ্ছে।

মহাভারতের কৃষ্ণ ধর্মের এই অর্থ বলেছেন—ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহু ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ—ধারণ (রক্ষণ বা পালন) করে এজন্যই ধর্ম বলা হয়, ধর্ম প্রজাগণকে ধারণ করে। অর্থাৎ সমাজহিতকর বিধি-সমূহই ধর্ম। প্রজার যা সর্বাঙ্গীণ হিত তাই সমাজের হিত। প্রজা বলবান বিদ্যাবান্ বুদ্ধিবান নীতিমান বিনয়ী (disciplined) হবে, আত্মরক্ষায় ও দেশরক্ষায় প্রস্তুত থাকবে, দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করবে, সর্বপ্রকারে জনহিত চেষ্টা করবে—এই হল ধর্ম, এতেই লোকের কর্ম প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়। অধিকন্তু যে লোক ঈশ্বরপরায়ণ হয়, অর্থাৎ বিশ্ববিধানের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে পারে, মানুষের স্বাভাবিক ভাববৃত্তি বা emotion তৃপ্ত করতে পারে, তার ধর্মাচরণ সর্বতোভাবে সার্থক হয়। যিনি কর্ম-বিমুখ হয়ে শুধু ভক্তিরসে ডুবে থাকেন তিনি ধর্মাত্মা বা মুক্তপুরুষ হলেও একদেশ-দর্শী, তাঁর ধর্মসাধনা পূর্ণাঙ্গ নয়, সাধারণের পক্ষে আদর্শস্বরূপও নয়। যিনি শুধু দেহচর্চা বা বিদ্যাচর্চা নিয়ে থাকেন তিনিও ধর্মের অংশমাত্র চর্চা করেন। বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সকলের জন্য নয়, প্রত্যেকে নিজের রুচি আর প্রবৃত্তি অনুসারেই ধর্মাচরণ করতে পারে এবং তাতেই সিদ্ধিলাভ করে ধন্য হতে পারে। কিন্তু জন-সাধারণ যদি কেবল বাহ্য চর্চা করে, তবে তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে 'অনুশীলন' প্রসঙ্গে সর্বাঙ্গীণ ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর পরেও বহু মনীষী অনুরূপ উপদেশ দিয়েছেন। আধুনিক যুগে বোধ হয় বিবেকানন্দই একমাত্র সন্ন্যাসী যিনি সর্ব ভারতে কালোপযোগী বলিষ্ঠ ধর্মের প্রচার করেছেন। এদেশে সম্প্রতি বহু ধর্মোপদেষ্টা সাধুর আবির্ভাব হয়েছে, তাঁদের ভক্তও অসংখ্য। তাঁরা প্রধানত ভক্তিতত্ত্ব এবং ভগবানের লীলাই প্রচার করেন। বহু ভক্ত তাঁদের কথায় শোকে শান্তি পায়, দয়া ক্ষমা অলোভ প্রভৃতি সদ্গুণের প্রেরণা পায়।

কিন্তু তাঁদের ধর্মব্যাখ্যান এমন নয় যাতে আমাদের জাতিচরিত্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হতে পারে। ভক্তগণের মতে তাঁদের কেউ কেউ অলৌকিক শক্তির প্রভাবে অনুগত জনের আর্থিক উন্নতি করতে পারেন, রোগ সারাতে পারেন, মকদ্দমা জেতাতে পারেন, নানা রকম ভেলকি দেখাতেও পারেন। কয়েক জনের শিষ্যরা প্রচার করে থাকেন যে তাঁদের ইষ্টগুরু ভগবানের অবতার বা পূর্ণ ভগবান। গুরু তা অস্বীকার করেন না, blasphemy-র জন্য শিষ্যকে ধমকও দেন না। আমাদের অন্য অভাব যতই থাকুক অবতারের অভাব নেই। সাধুদের পরিত্রাণ আর দুষ্কৃতদের বিনাশ—এই হল অবতারের আসল কাজ। তার দিকে এঁরা একটু দৃষ্টি দেন না কেন?

বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত—এ কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। যে ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের হিতকর এবং জাতিচরিত্রের উন্নতিসাধক, সেই সর্বসম্মত সর্বাঙ্গীণ ধর্মই আমাদের লোকায়ত (secular) রাষ্ট্রের বিদ্যালয়ে শেখানো যেতে পারে। শিক্ষকরাই এই ভার নেবেন, ছাত্রের বাল্যকাল থেকেই তাকে বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আর রাষ্ট্রীক কর্তব্য শেখাবেন। এখন যারা অল্পবয়স্ক, ভবিষ্যতে তারাই রাষ্ট্র চালাবে, তাদের শিক্ষা আর চরিত্রগঠনের ব্যবস্থায় বিলম্ব করা চলবে না। যখন শ্রমিকের দল ধর্মঘট করে তখন উপস্থিত সংকট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সরকার বা কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে রফা করেন, অনিচ্ছায় বহু অর্থ ব্যয় করেন। এই অর্থের হয়তো আরও সৎপ্রয়োগ হতে পারত। কিন্তু শিক্ষকদের কর্মের ফল সদ্য দেখা যায় না, সে কারণে সরকার বোঝেন না যে রাষ্ট্রের অন্যান্য বহু শাখাকে বঞ্চিত করেও শিক্ষককে তুষ্ট রাখতে হবে, যাতে তাঁর অভাব না থাকে এবং শিক্ষার কার্যে তিনি পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে পারেন।

১৩৬০

# সমদৃষ্টি

ইস্কুলের পড়া মুখস্থ করছি, বাবা প্রশ্ন করলেন, কি বই পড়ছ?

উত্তর দিলাম, ভারতবর্ষের ইতিহাস।

—কোন্‌খানটা?

—মোগল সম্রাটদের বংশ। বাবরের পুত্র হুমায়ুন, তাঁর পুত্র আকবর, তারপর জাহানগির শাজাহান আরংজিব—

—হয়েছে হয়েছে। নিজের পিতামহর নাম জান?

শুনেছিলাম আমার ঠাকুন্দা নেপোলিয়ন আর রণজিৎ সিংহের অমলের লোক, কিন্তু তাঁর নামটা কিছুতেই মনে পড়ল না। বললাম, ভুলে গেছি।

—লিখে নাও। তোমার পিতামহ কালিদাস বসু, প্রপিতামহ গুরুদাস, বৃদ্ধ প্রপিতামহ রত্নেশ্বর, অতিবৃদ্ধ রামসন্তোষ, অতি অতিবৃদ্ধ রামভদ্র।

গড়গড় করে ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত নাম করে বাবা বললেন, মুখস্থ করবে, ভুলে যেয়ো না যেন। এঁরা মোগল বাদশাহের চাইতে তোমার ঢের বেশী আপন জন।

আপন জন হতে পারেন, কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিতে নগণ্য পেটি বুর্জোআ। একটু আধটু ভাল মন্দ কাজ করে থাকবেন, কিন্তু এঁদের ভাগ্যে সুকীর্তি বা কুকীর্তি কিছুই লাভ হয় নি। এঁরা অশ্বমেধ যজ্ঞ বা দিগ্‌বিজয় করেন নি, ধর্মসংস্থাপন বা রাজ্যশাসন করেন নি, তাজমহল গড়েন নি, ব্যাপক কয়েদ আর ভাইদের খুন করেন নি। এই পিতৃপুরুষদের সম্বন্ধে আমার কৌতূহল ছিল না, শুধু বাবার আজ্ঞায় নাম মুখস্থ করতে হল। কিন্তু তাতে নিস্তার নেই। বাবার বংশপ্রীতি অসাধারণ ছিল। ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত বংশ-বিবরণ ছাপিয়েছিলেন। সেই চটি বই একখানা আমাকে দিয়ে বললেন, মাঝে মাঝে পড়বে, হিস্টরির চাইতে কম দরকারী নয়।

বড় হয়ে শুনলাম, সাত পুরুষ পর্যন্ত সপিণ্ড, তার পরে আরও সাত পুরুষ পর্যন্ত সমানোদক। অর্থাৎ পরলোকস্থ ঊর্ধ্বতন সাত পুরুষের অন্তর্গত সকলকে মাঝে মাঝে পিণ্ড দিতে হয়, আরও সাতপুরুষকে শুধু জল দিয়ে তর্পণ করলেই চলে। আরও আগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কিছু না দিলেও দোষ হয় না।

যাঁদের চোখে দেখেছি, স্নেহ পেয়েছি, এবং তাঁদের মুখে যাঁদের বিবরণ শুনেছি তাঁরাই আমার সপ্তম পুরুষান্তর্গত জ্ঞাতি। তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আমার জ্ঞাত শ্রদ্ধাভাজন আপন জন, সেজন্য সপিণ্ড। পূর্বে যে সাত পুরুষ ছিলেন তাঁদের নাম ছাড়া হয়তো কিছুই জানা নেই, তাঁরা আমার সমানোদক। তাঁদের ঊর্ধ্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা শুধুই জ্ঞাতি। আমাদের ধর্মশাস্ত্রে এইভাবে আত্মবর্গের বিভাগ করা হয়েছে। পিতৃকুল মাতৃকুল দুই থেকে মানুষের উৎপত্তি, কিন্তু অধিকাংশ সমাজে মানুষ পিতৃকুলে বাস করে, সেজন্য বংশগণনায় পিতৃকুলই ধরা হয়। আধুনিক

বিজ্ঞানীরা পুংসম্পর্ক বাদ দিয়েও কোনও কোনও স্ত্রীপ্রাণীর গর্ভাধান করতে পেরেছেন। হয়তো ভবিষ্যতে মানুষের পক্ষেও মাতাই মুখ্য এবং পিতা গৌণ ও ক্ষেত্রবিশেষে অনাবশ্যক গণ্য হবেন।

উৎপত্তিকালে আমরা পিতা মাতা থেকে যেসব দৈহিক উপাদান পাই তার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা ক্রোমোসোম, জীন, বা যাই হক, চলিত কথায় তাকেই রক্তের সম্পর্ক বলা হয়। পিতা মাতা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা রক্ত-সম্পর্কের অর্ধেক অংশ পাই। সিকি অংশ পিতামহ-মহী মাতামহ-মহী প্রত্যেকের কাছ থেকে পাই। ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ থেকে ১/৬৪ অংশ এবং চতুর্দশ পুরুষ থেকে ১/৮১৯২ অংশ পাই। একবিংশতিতম পুরুষ থেকে যা পাই তা দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগের চাইতেও কম। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ডাইলিউশনের মতন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর সূত্রে আমাদের বংশধারা বজায় থাকে এবং তাতেই আত্মীয়তাবোধ তৃপ্ত হয়।

যোগসূত্র যেমনই হক, সম্পর্ক যত নিকট, আত্মীয়তাবোধ তত বেশী। কিন্তু স্থলবিশেষে এই বোধ আরও প্রসারিত হয়। বিলাতের অভিজাতবর্গ উইলিয়ম-দি-কংকরার, রবার্ট ব্রুস ইত্যাদি থেকে বংশ গণনা করতে পারলে অত্যন্ত গৌরব বোধ করেন। আমাদের দেশেও অদ্বৈত মহাপ্রভু, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায় প্রভৃতির বংশধর নিজকে ধন্য মনে করেন। গল্প আছে, কোনও এক বড়লাটের মুখে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ শুনে একজন রাজপুত নৃপতি বলেছিলেন, আমার বংশমর্যাদা আপনার চাইতে ঢের বেশী; আমি সূর্যবংশজাত আর আপনি বানরের বংশধর।

সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আত্মীয়রাই সবচেয়ে আপন জন। তার পর যথাক্রমে সগোত্র, সবর্ণ, স্বজাতি, স্বদেশবাসী বা সধর্মী। সামাজিক সংস্কার, শিক্ষা, চর্চা বা হুজুগের ফলেও আত্মীয়তাবোধের তারতম্য হয়। গোঁড়া বাঙালী ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে বাঙালী শূদ্রের তুলনায় অবাঙালী ব্রাহ্মণ বেশী আত্মীয়। এ দেশের অনেক মুসলমান মনে করে ভারতীয় হিন্দুর চাইতে ইরাণী আরবী তুর্কী মুসলমানদের সঙ্গে তার সম্পর্ক বেশী। রাজনীতিক কারণে বা প্রাদেশিক বিরোধের ফলে এইপ্রকার ধারণার পরিবর্তন হতে পারে।

ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে শিক্ষিত ভদ্র বাঙালীর আর্যতার মোহ ছিল। তাঁরা মনে করতেন তাঁদের পূর্বপুরুষরা দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ নীলচক্ষু পিঙ্গলকেশ খাঁটি আর্য অর্থাৎ ইংরেজ জার্মানের স্বজাতি ছিলেন, এই সুজলা সুফলা বাংলাদেশের রোদ বৃষ্টিতে আধুনিক বাঙালীর চেহারা বদলে গেছে। আর্যতা বজায় রাখবার জন্য এবং উচ্চতর বর্ণে প্রমোশন পাবার জন্য অনেকের উৎকট আগ্রহ ছিল। অব্রাহ্মণরা পইতে নিয়ে ধন্য হতেন, কেউ কেউ অগ্নিহোত্রীও হতেন। আমরা শুনতাম, ব্রহ্মার কায় থেকে কায়স্থ, হাড় থেকে হাড়ী, বাক্ থেকে বাগ্দী, চামড়া থেকে চামার হয়েছে। এখনও অনেকে কৌলিক পদবীতে তুষ্ট নন, নামের শেষে শর্মা বর্মা জুড়ে দিয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন।

ইতিহাস আর নৃবিদ্যার গবেষণার ফলে আমাদের আর্যতার অভিমান দূর হয়েছে, আমরা এখন বুঝেছি যে বাঙালী (এবং অধিকাংশ ভারতীয়) অতিমিশ্র সংকর জাতি, সভ্য অর্ধসভ্য অসভ্য নানা নৃজাতির রক্ত ও সংস্কৃতি আমাদের দেহে মনে ও সংস্কারে বিদ্যমান আছে। আমাদের সকলের সাংকর্য এবং বংশগত (inherited)

দেহলক্ষণ সমান নয়, সেজন্য আকৃতির বিলক্ষণ প্রভেদ দেখা যায়। কালো বামুন, কটা শূদ্র, নর্ডিক, মঙ্গোলীয়, সাঁওতালী, হাবশী, সব রকম চেহারাই আমাদের ইতর ভদ্রের মধ্যে অল্পাধিক আছে। রবীন্দ্রনাথের গোরা নিজেকে ইওরোপীয় জানতে পেরে প্রথমে স্তম্ভিত তার পর নিশ্চিন্ত হয়েছিল। আমরাও সেই আবিষ্কারের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলছি, যাক বাঁচা গেল, কর্তার ভূত আমাদের কাঁধ থেকে নেমে গেছেন, এখন আমরা আত্মপরিচয় মোটামুটি জেনেছি। দ্রাবিড়, কিরাত (মঙ্গোলয়েড), নিষাদ (অস্ট্রিক), অল্পীয় প্রভৃতি নানা জাতির রক্ত আমাদের দেহে আছে, নর্ডিক রক্তেরও ছিটেফোঁটা আছে। যাঁরা সবিশেষ জানতে চান তাঁরা কেন্দ্রীয় নৃবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয়ের 'ভারতীয় জাতি পরিচয়' পুস্তিকা পড়ে দেখবেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে আমাদের কুলগর্ব খর্ব হয়েছে কিন্তু এই আশ্বাসও পেয়েছি যে, উৎপত্তি যেমনই হক, কৃতিত্বের সম্ভাবনা সব জাতিরই সমান, শুধু জন্মের ফলে কেউ herren volk হয় না। কর্ণের মতন আমরা সকলেই বলতে পারি—দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষম্।

এচ. জি. ওয়েল্স তাঁর First and Last Things গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন—যত পিছনে যাওয়া যায় ততই আমাদের পূর্বপুরুষ (ও তৎস্ত্রী)-দের সংখ্যা বেড়ে যায়। আমার পিতা মাতা দুজন, পিতামহ-মহী মাতামহ-মহী চারজন, প্রপিতামহ প্রভৃতি আটজন। এই রকম দ্বিগুণোত্তর হিসাব করলে দেখা যাবে—পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা ২০০ কোটির চাইতে আমার শততম পূর্বস্ত্রীপুরুষ-দের সংখ্যা অনেক বেশী। এই হিসাবে অতিগণনা আছে, কারণ পূর্বজগণের মধ্যে অন্তর্বিবাহ বিস্তর হয়েছিল। তথাপি বলা যেতে পারে—যাঁরা আমার শততম পূর্বজ, এবং তাঁদের মধ্যে যাঁদের বংশধর এখনও জীবিত আছে, তাঁরা শুধু আমার নয়, বর্তমান সমস্ত মানবের পূর্বজনকজননী। ওয়েল্সের এই সিদ্ধান্তে ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু সমস্ত মানবজাতির মধ্যে যে বংশগত সম্বন্ধ এবং রক্তের যোগ আছে তাতে সন্দেহ নেই। জগতের সমস্ত লোকই আমার জ্ঞাতি, সপিণ্ড বা সমানোদক না হলেও সমপ্রভব বলা যেতে পারে।

বিজ্ঞানীরা বর্তমান মানবজাতির নাম দিয়েছেন হোমো সাপিয়েন্স অর্থাৎ বিজ্ঞ-মানব। এই জাতির বয়স অনেকের মতে লক্ষ বৎসরের কাছাকাছি। আমাদের চতুঃসহস্রতম পূর্বপুরুষরা হয়তো অবিজ্ঞ অবমানব ছিলেন, সাধারণ লোকে যাকে মিসিং লিংক বলে। আরও পিছিয়ে গেলে বনমানুষ বানর এবং নিম্নতর অসংখ্য প্রকার জীব দেখা দেবে। শাস্ত্রে ব্রহ্মা থেকে জীবোৎপত্তি ধরা হয়েছে, সে হিসাবে আব্রহ্মস্তম্ব মায় ব্যাকটিরিয়া পর্যন্ত আমরা জ্ঞাতি। বহু কোটি বৎসর পূর্বে যে সমুদ্রজলে আদিম জীবের উৎপত্তি হয়েছিল তাতে লবণের পরিমাণ এখনকার চেয়ে কম ছিল। সেই অল্পলবণাক্ত কারণ বারি আজ পর্যন্ত প্রাণিদেহের রক্তরসে বা প্লাজমায় বিদ্যমান থেকে সর্বপ্রাণীর বংশগত সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

মানুষ এবং ইতর প্রাণীর যে সন্তানস্নেহ ও স্বজাতিপ্রীতি দেখা যায় তা স্বভাবজাত, বংশপর্যায় গণনা না করেই উদ্ভূত হয়েছে। আদিম মানুষের পরপ্রীতি

বা পরার্থপরতা বেশী ছিল না, সমাজের অভিব্যক্তির ফলে ক্রমে ক্রমে স্বজনপ্রীতি, মানবপ্রীতি আর ইতরজীবপ্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক সভ্য মানুষ যুদ্ধ করে, মৃগয়া খেলা বিলাস খাদ্য ও অন্য নানা উদ্দেশ্যে প্রাণিহত্যা করে। তথাপি এই ধারণা ধীরে ধীরে উদ্ভূত হচ্ছে—সর্বমানবপ্রীতি ও সর্বজীবপ্রীতিই আদর্শ ধর্ম।

আদর্শ আর আচরণ সমান হয় না সেইজন্য বলা হয়েছে—জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ। গোঁড়া খ্রীষ্টানরা মনে করেন খ্রীষ্টের দশ অনুশাসনই শ্রেষ্ঠ ধর্মনীতি, কিন্তু কার্যত তাঁরা অনেক অনুশাসন মানেন না। গোঁড়া হিন্দু মুখে বলেন গোমাতা, কিন্তু গোখাদক পাশ্চাত্ত্য জাতির তুল্য গোসেবা এদেশে দেখা যায় না। আদর্শ আর আচরণের প্রভেদ সব সমাজেই আছে, তথাপি বলা যায় আদর্শ যত উন্নত ততই আচরণের উৎকর্ষের সম্ভাবনা আছে।

আত্মীয়তাবোধের যখন চরম প্রসার হয় তখন সর্বভূতে সমদৃষ্টি আসে। এই সাম্যের উপলব্ধি ভারতীয় জ্ঞানী ও সাধকদের মধ্যে যেমন হয়েছে অন্য দেশে তেমন হয়নি। অভিব্যক্তিবাদ আর সর্বজীবের বংশগত সম্বন্ধ না জেনেও এদেশের আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষরা বলেছেন—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ (গীতা)

—বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালকে পণ্ডিতরা সমভাবে দেখেন।

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥ (মনু)

—যে সর্বভূতে নিজেকে এবং নিজের ভিতর সর্বভূতকে দেখতে পায় সেই আত্মযাজী স্বারাজ্য লাভ করে।

যদ্ ভূতহিতমত্যন্তমেতৎ সত্যং মতো মম॥ (মহাভারত)

—যাতে জীবগণের অত্যন্ত হিত হয় তাই আমার মতে সত্য (অবলম্বনীয়)।

ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্॥ (ভাগবত)

—আমি রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, পুনর্জন্মনিবৃত্তিও চাই না, দুঃখতপ্ত প্রাণি-গণের আর্তিনাশই চাই।

যেন কেন প্রকারেণ যস্য কস্যাপি জন্তুনঃ।
সন্তোষং জনয়েদ্ধীমান্ তদেবেশ্বরপূজনম্॥ (ভাগবত)

—যিনি ধীমান তিনি যে কোনও প্রকারে যে কোনও জন্তুর সন্তোষ উৎপাদন করবেন, তাই ঈশ্বরপূজা।

এদেশে সর্বভূতে সমদৃষ্টি ও অহিংসার বাণী বহু ভাবে বহু মুখে প্রচারিত হয়েছে, তার ফলে ভারতবাসীর (বিশেষত হিন্দু জৈন প্রভৃতির) চরিত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য এসেছে। পাশ্চাত্ত্য জাতিদের তুলনায় আমরা অপেক্ষাকৃত অহিংস্র মৃদু-স্বভাব ও পরমতসহিষ্ণু। প্রাচীন মিশরীয়গণ যেমন কয়েকটি প্রাণীকে দেবতুল্য গণ্য করত, হিন্দুও গরুকে সেইরকম মর্যাদা দেয়। পাশ্চাত্ত্য দেশে অকর্মণ্য ও মরণাপন্ন পালিত জন্তুকে মেরে ফেলা হয়, এদেশে সে প্রথা নেই। হিন্দুর মৃগয়া-প্রবৃত্তিও কম। এখনকার তুলনায় প্রাচীন ভারতে আমিষাহার বেশী প্রচলিত ছিল, কিন্তু বৌদ্ধ আর জৈন ধর্মের প্রভাবে তা কমে গেছে। মহাভারতে মনুর উক্তি

আছে—যজ্ঞাদি কর্মে এবং শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশে যে মন্ত্রপূত সংস্কৃত মাংস নিবেদিত হয় তা পবিত্র হবিঃস্বরূপ, তা ভিন্ন অন্য মাংস বৃথামাংস এবং অভক্ষ্য। সম্রাট অশোক প্রাণিহত্যা নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। বর্তমান কালে ভারতবর্ষে যত নিরামিষাশী আছে অন্য দেশে তত নেই, তবে স্বাধীনতা লাভের পর এদেশে যে পাশ্চাত্ত্য বিলাসিতার স্রোত এসেছে তার ফলে নিরামিষাশী সম্প্রদায়ের মধ্যেও আমিষাহার প্রচলিত হচ্ছে।

উক্ত বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বলা চলে না যে অন্যদেশবাসীর তুলনায় ভারতবাসী অধিকতর সমদর্শী। এদেশে অস্পৃশ্যতা আছে, উচ্চ বর্ণের অভিমান এবং নীচ বর্ণের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা আছে। যার ধর্ম ভাষা আকৃতি পরিচ্ছদ খাদ্য ইত্যাদি ভিন্নপ্রকার তাকে আমরা আপন জন মনে করতে পারি না। ইংরেজীতে একটি ব্যঙ্গোক্তি আছে —সব মানুষ সমান, কিন্তু কেউ কেউ বেশী সমান। আমাদের সমদর্শিতা সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে।

ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচারক সাধু অনেক ছিলেন, এখনও আছেন, কিন্তু ভক্তি আর অধ্যাত্মবিদ্যার প্রচার যত হয়েছে জনহিতব্রত আর সমদর্শিতার প্রচার তেমন হয়নি। আশার কথা, ভারত সরকার এদিকে মন দিয়েছেন এবং শিক্ষিত লোকের মধ্যে এ বিষয়ে উৎসাহ দেখা দিয়েছে।

সকল সভ্য সমাজেই সমদর্শিতা আদর্শরূপে অল্পাধিক স্বীকৃতি পেয়েছে, আদর্শ আচরণের প্রভেদও সর্বত্র আছে। শ্বেত আর অশ্বেত জাতির মর্যাদা সমান নয় এই ধারণা পাশ্চাত্ত্য দেশে খুবই প্রবল। তথাপি পাশ্চাত্ত্য আদর্শ ধীরে ধীরে উদার হচ্ছে এবং ইতরপ্রাণীর প্রতিও যে মানুষের কর্তব্য আছে এই ধারণা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বহু বৎসর পূর্বে টমাস হেনরি হাক্সলি লিখেছিলেন—মানব-জাতির দুরকম নীতি বা আদর্শ আছে এবং এই দুইএর দ্বন্দ্ব চিরকাল চলছে। একটি হচ্ছে ধর্ম-নীতি বা সাধারণ মরালিটি, মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। অহিংসা দয়া সত্য অলোভ সমদর্শিতা পরোপকার প্রভৃতি এর অঙ্গ এবং প্রধান সকল ধর্মেই এই সকল বৃত্তি প্রশংসিত হয়েছে. অপর নীতিটি অত্যন্ত প্রাচীন, জীবোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সহজাত সংস্কাররূপে উদ্ভূত হয়েছে। হাক্সলি এই নীতির বিশেষণ দিয়েছেন কস্‌মিক, অর্থাৎ নৈসর্গিক। এই নীতির লক্ষ্য স্বার্থসাধন এবং তার জন্য যে পরিমাণ পরপ্রীতি আবশ্যক শুধু তারই চর্চা। এই নিসর্গনীতি অনুসারে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ইতর জীবের গোষ্ঠীবন্ধন এবং আদিম মানব সমাজের উদ্ভব হয়েছে। কৌটিল্য আর মেকিয়াভেলি এই নীতিই বিবৃত করেছেন এবং নেপোলিয়ন হিটলার মুসোলিনি প্রভৃতি তা অবলম্বন করে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। অধিকাংশ রাষ্ট্রের ব্যবহারে যে কুটিলতা দেখা যায় তাও এই নীতির ফল।

ধর্মনীতি বলে—পরের অনিষ্ট ক'রো না। নিসর্গনীতি বলে—স্বার্থসিদ্ধির জন্য করতে পার। শেষোক্ত নীতি অনুসারেই সেকালে এদেশের রাজারা দিগ্‌বিজয় করতেন। পরাক্রান্ত জাতি দুর্বলের উপর এখনও আধিপত্য করে, প্রবল ব্যবসায়ী দুর্বল প্রতিযোগীর জীবিকা নষ্ট করে। রাজনীতিক উদ্দেশ্যে এবং পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়

বুদ্ধির জন্য সংবাদপত্রাদির সাহায্যে অজস্র অসত্য প্রচার করা হয়। যুদ্ধকালে বিপক্ষের গ্রামনগরাদি ধ্বংস এবং নিরপরাধ অসংখ্য প্রজার সর্বনাশ করা হয়। সমাজ রক্ষার জন্য অপরাধী দণ্ড পায় কিন্তু তার পরিবারের যে দুর্দশা হয় তার প্রতিকার হয় না।

আদিম যুগ থেকে মানুষ নানা উদ্দেশ্যে প্রাণিপীড়ন করে আসছে। আত্মরক্ষার জন্য অনেক প্রাণী হত্যা করা হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক আমিষাহারী। মাছ ধরা, পাখি হরিণ ইত্যাদি মারা অনেকের বিচারে নির্দোষ আমোদ। রেশম তসর গরদ ইত্যাদির জন্য অসংখ্য কীট হত্যায় আমাদের আপত্তি নেই, হিন্দুর বিচারে কোষের বস্ত্র আর মৃগচর্ম অতি পবিত্র। বলদকে নপুংসক করে নাকে দাঁড় দিয়ে খাটাতে আমাদের বাধে না। মধুর লোভে আমরা মৌমাছির কষ্টসঞ্চিত ভাণ্ডার লুঠ করি, অনেক ক্ষেত্রে বুভুক্ষু বাছুরকে বঞ্চিত করে দুধ খাই। তুচ্ছ শখের জন্য আকাশচারী পাখিকে বন্দী করি। আধুনিক সভ্য সমাজে অনর্থক প্রাণিপীড়ন গর্হিত গণ্য হয়, কিন্তু আত্মরক্ষা, খাদ্য, মৃগয়া, বিলাস, আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য জীবহিংসায় দোষ ধরা হয় না।

সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে পূর্ণ অহিংসা এবং সর্বভূতে সমদৃষ্টি সম্ভব হতে পারে, হাক্সলি-কথিত নিসর্গনীতি বর্জন করে উচ্চতম ধর্মনীতি অনুসারে জীবনযাপন করা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে তা অসম্ভব। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈরভাব এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা শীঘ্র দূর হবে না, জনসাধারণের পক্ষেও নিঃস্বার্থ নির্দ্বন্দ্ব জীবনযাত্রা দুঃসাধ্য। এমন অবস্থায় ধর্মনীতি আর নিসর্গনীতির মধ্যে রফা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আধুনিক হিউম্যানিজম বা মানবধর্মে এই রফার চেষ্টা আছে। এই ধর্মে জ্ঞান ও ভক্তির চর্চায় বাধা নেই, কিন্তু প্রধান লক্ষ্য—সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের অবিরোধে ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থসাধন এবং সেই স্বার্থের অবিরোধে যথাসম্ভব জীবে দয়া। মহাভারতে হংসরূপী প্রজাপতি বলেছেন—ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ। চণ্ডীদাস বলেছেন—সবার উপরে মানুষ সত্য। এই দুই উক্তির গূঢ় অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু সরল অর্থ ধরলে আধুনিক হিউম্যানিজমের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। এই ধর্ম এখন পর্যন্ত একটি সমস্যাসংকুল অতি অস্পষ্ট আদর্শ মাত্র। এর নির্বাচন বা enunciation হয় নি, চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ও হয় নি। তথাপি আশা হয় এই ধর্মের ক্রমবিকাশের ফলে সাধারণ মানুষ যথাসম্ভব সমদর্শিতা লাভের উপায় আবিষ্কার করবে।

১৩৬১

# অশ্রেণিক সমাজ

'ক্লাসলেস সোসাইটি' বা অশ্রেণিক সমাজের কথা এদেশের ও বিদেশের অনেকে বলে থাকেন, কিন্তু তার লক্ষণ কেউ স্পষ্ট করে বলেছেন বলে মনে হয় না। শ্রেণী অনেক রকম আছে, ভারতীয় আর পাশ্চাত্ত্য সমাজের শ্রেণীভেদ সমান নয়। সব রকম ভেদের লোপ অথবা কয়েক রকমের লোপ যাই কাম্য হ'ক, উপায় নির্ধারণের আগে বিভিন্ন ভেদের স্বরূপ বোঝা দরকার।

এমন আদিম জাতি থাকতে পারে যাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ মোটেই নেই অথবা খুব কম। সভ্য সমাজ যদি পুরোপুরি অশ্রেণিক হয় তবে তার অবস্থা কেমন হবে তা কল্পনা করা যেতে পারে। জীবনযাত্রার মান সকলের সমান হবে, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য থাকবে না, কারও যদি অধিক অর্থাগম হয় তবে অতিরিক্ত অর্থ সাধারণের হিতার্থে বাজেয়াপ্ত হবে। সকলেই সমান পরিচ্ছন্ন বা অপরিচ্ছন্ন হবে, বিবাহ ও সামাজিক মিলনক্ষেত্রে সুন্দর-কুৎসিত বা পণ্ডিত-মূর্খের ব্যবধান থাকবে না। সকলেই শিক্ষা, জীবিকা, বিবাহ আর চিকিৎসার সমান সুযোগ পাবে। অবশ্য বিদ্যা বুদ্ধি আর বলের বৈষম্য থাকবেই, কিন্তু তার জন্য আর্থিক অবস্থা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার তারতম্য হবে না। দুঃসাধ্য রোগ বা বার্ধক্যের ফলে যারা অকর্মণ্য তাদের রক্ষা বা অরক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

ইতিহাসে দেখা যায়, অল্পসংখ্যক-লোক যদি অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হয় বা নির্যাতন ভোগ করে তবে তারা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করে সমভোগী সংঘ গঠন করে। রোমান সাম্রাজ্যে অত্যাচারিত খ্রীষ্টানদের সমাজ প্রায় অশ্রেণিক ছিল। নাৎসি-বিতাড়িত অনেক ইহুদি-পরিবারও নির্বাসনে এসে শ্রেণীভেদ পরিহার করে-ছিল। কিন্তু অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভেদবুদ্ধি আবার পূর্ববৎ হয়।

বর্তমান হিন্দুসমাজে একই ভেদ বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়। অব্রাহ্মণের বাড়িতে প্রাচীনপন্থী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ অন্নগ্রহণ করেন না। যাঁরা অল্প গোঁড়া তাঁরা বৈদ্য-কায়স্থাদি ভদ্রশ্রেণীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন, কিন্তু পৃথক পঙ্‌ক্তিতে বসেন। যাঁরা আর একটু উদার তাঁরা বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির ভোজে পঙ্‌ক্তি-বিচার করেন কিন্তু অন্যত্র করেন না। যারা আরও সংস্কারমুক্ত তাঁরা কোনও ক্ষেত্রেই করেন না। ভোজন ব্যাপারে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত, তবে এই ভেদ ক্রমশ কমে আসছে।

আমার এক ব্রাহ্মণ বন্ধু স্বজাতিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। সর্বনিম্ন বা চতুর্থ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পরিচিত অব্রাহ্মণকে দেখলে আগেই নমস্কার করেন। কেউ কেউ এতই পতিত যে শূদ্রকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেও তাঁদের বাধে না। যাঁরা তৃতীয় শ্রেণীর তাঁরা নমস্কার পাবার পর প্রতিনমস্কার করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ প্রতিনমস্কার করেন না, বড়জোর একটু হাত বা মাথা নাড়েন। প্রথম শ্রেণীর বিপ্র অতিবদান্য. প্রণাম পেয়েই পদধূলি দেবার জন্য পা বাড়িয়ে দেন।

উচ্চবর্ণের বা আভিজাত্যের অভিমান অসংখ্য লোকের আছে। যাঁরা অতি সজ্জন, অপরকে ক্ষুণ্ণ করার অভিপ্রায় যাঁদের কিছুমাত্র নেই, এমন লোকেরও আছে। এঁরা শাস্ত্রবিধি বা নিজ সমাজের চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করতে চান না.

মনে করেন তাতে পাপ বা জাতিপাত বা মর্যাদাহানি হয়। অনেকে নির্বিচারে কেবল সংস্কার বা অভ্যাসের বশেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন। যাঁরা অল্পাধিক সংস্কারমুক্ত তাঁদের প্রত্যবায়ের ভয় না থাকলেও নিজ সমাজের ভয় আছে, সেজন্য অবস্থা বুঝে নিয়ম পালন বা লঙ্ঘন করেন। যাঁরা আরও উদার ও সাহসী তাঁরা বর্ণানুসারে শ্রেণীবিচার করেন না, শুধু দেখেন পঙ্‌ক্তির লোকের বেশ ও আচরণ সভ্যজনোচিত কিনা। যাঁরা পূর্ণমাত্রার সমদর্শী তাঁরা কিছুই বিচার করেন না, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অতি অল্প।

ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজের জাতিভেদ দূর করার চেষ্টা মাঝে মাঝে হয়েছে, কিন্তু তার ফলে ধর্মগত ভেদের উৎপত্তি হয়েছে। বৌদ্ধ, শিখ, বৈরাগী, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সম্প্রদায় স্বতন্ত্র সমাজের সৃষ্টি করেছেন। অনেকে বলে থাকেন, চৈতন্যদেব ও রামকৃষ্ণদেব সংস্কারমুক্ত ছিলেন, বর্ণভেদের কঠোরতা মানতেন না। একথা যে মিথ্যা তা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন। সম্প্রতি সংবাদপত্রে বহু নিবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ অব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করতেন না। এঁরা উচ্চনীচ সকলের জন্য ভক্তিবাদ প্রচার করেছেন, ধর্মমতের সংকীর্ণতা নিরসনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সমাজব্যবস্থা বা লোকাচারে হস্তক্ষেপ করেননি। রামমোহন রায় ও তাঁর অনুবর্তীরাই এদেশে সমাজসংস্কারের প্রবর্তক। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রচার বিবেকানন্দ আরম্ভ করে গেছেন। আজকাল প্রতিপত্তিশালী ধর্মোপদেষ্টা গুরুর অভাব নেই, কিন্তু তাঁরা কেউ বিবেকানন্দর তুল্য সাহসী জনহিতব্রতী নন, সামাজিক দোষ শোধনের কোনও চেষ্টাই করেন না।

এককালে এদেশের ভদ্রশ্রেণীই উচ্চশিক্ষা আর ভদ্রোচিত জীবিকার সুযোগ পেত। দারিদ্র্যের জন্য এবং ক্ষমতাবান আত্মীয়-বন্ধুর অভাবে ভদ্রেতর শ্রেণী এই সুযোগ পেত না। শিক্ষা ও জীবিকার ক্ষেত্রে বৈষম্য এখন ক্রমশ কমে আসছে, কালক্রমে একেবারে লোপ পাবার সম্ভাবনা আছে।

শিক্ষা আর প্রচারের ফলে জাতিগত বর্ণগত ও বংশগত ভেদবুদ্ধি দূর হতে পারে, কিন্তু অপরিচ্ছন্নতা আর অমার্জিত আচরণের প্রতি বিদ্বেষ ত্যাগ করা দুঃসাধ্য। শুচিতার ধারণা সকলের সমান নয়। এদেশের লোক আহারেব পব আচমন করে, মলত্যাগের পর জলশৌচ করে, অতি দরিদ্রও প্রত্যহ স্নান করে। এই সব বিষয়ে অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য জাতি অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছন্ন। অনেক ইওরোপীয় নারী তার সন্তানের মুখ থুতু দিয়ে পরিষ্কার করে দেয়, বিড়াল যেমন করে।

কয়েকটি বিষয়ে শুচিতায় শ্রেষ্ঠ হলেও ভারতবাসীর বদভ্যাস অনেক আছে। যে অপরিচ্ছন্নতা দারিদ্র্যের ফল তা ধরছি না, কিন্তু যারা অর্থবান ও ভদ্রশ্রেণীভুক্ত তাঁদেরও অনেক বিষয়ে শুচিতার অভাব দেখা যায়। বড় সওদাগরী আপিসে সাহেব আর দেশী কর্মচারীর জন্য আলাদা সিঁড়ি আছে। এখনকার দেশী সাহেবরাও বোধ হয় এই ব্যবস্থা বজায় রেখেছেন। পার্থক্যের কারণ কি তা সিঁড়ি দেখলেই বোঝা যায়। ভারতবাসীর বিচারে নিষ্ঠীবনের স্পর্শই ঘৃণ্য, দৃশ্য নয়, যত্র তত্র থুতু ফেলার অভ্যাস বহু লোকের অছে, দেশী সিঁড়ির স্থানে স্থানে আধার আছে, কিন্তু তাতে অভীষ্ট ফল হয় না ,আধার ছাপিয়ে দেওয়ালে পর্যন্ত পানের পিকের দাগ লাগে। সাহেবী সিঁড়ির এই বীভৎস কলঙ্ক নেই। যারা পরিচ্ছন্নতা চায় তাদের পৃথক সমাজ না হলে চলে না।

ক্লাব বা আড্ডায় সমশ্রেণীর লোকেই স্থান পায়। বিলাতী ক্লাবে প্রবেশের নিয়ম খুব কড়া, যে-কেউ ইচ্ছা করলেই সদস্য হতে পারে না। বাঙালীর আড্ডায় সাধারণতঃ নির্দিষ্ট কয়েক জনকেই দেখা যায়, কিন্তু নূতন লোকও স্থান পায় যদি তার আচার-ব্যবহার বিসদৃশ না হয়। ক্লাব বা আড্ডায় যে রীতি, দেবমন্দির বা উপাসনাগৃহেরও তাই। যিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তিনি সাধারণত নিজ শ্রেণীর জন্যই করেন, এই কারণে নিম্ন জাতি মন্দিরপ্রবেশে বাধা পায়। কালক্রমে যদি প্রতিষ্ঠাতার উত্তরাধিকারীদের স্বত্বের প্রমাণ লোপ পায় তবে সরকারী আদেশে আপামর সকলেই প্রবেশাধিকার পেতে পারে। ভারতের অনেক বিখ্যাত মন্দিরে তাই হয়েছে। কিন্তু যত দিন সে ব্যবস্থা না হয় তত দিন শ্রেণীবিচার বজায় থাকে। চণ্ডী-মণ্ডপ, ভাগবত-সভা, ব্রাহ্মসমাজ বা গির্জায় যদি কোন অপরিচ্ছন্ন ও কুৎসিতবেশ লোক আসতে চায় তবে তার উদ্দেশ্য ভাল হলেও সে বাধা পায়।

জাতিবিচার বা অপরিচ্ছন্নতায় আপত্তি না থাকলেও নানা কারণে ভেদজ্ঞান আসে। আকৃতি, পরিচ্ছদ, ভাষা, খাদ্য, সংস্কৃতি, বিত্ত, সমাজ, ধর্ম, দেশ, রাজনীতি প্রভৃতির জন্যও শ্রেণীভেদ হয়। যেখানে অস্পৃশ্যতা নেই (যেমন মুসলমান ও ইওরোপীয় সমাজে) সেখানেও সৈয়দ ও মোমিন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্র, মলিনবেশ শ্রমজীবী আর white collar মসীজীবীর সমাজ পৃথক। পাশ্চাত্ত্য দেশের অনেক হোটেলে এশিয়া-আফ্রিকার লোক স্থান পায় না। কোনও কোনও রাষ্ট্রে আইন করে এই পার্থক্য নিবারণের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু লোকমতের পরিবর্তন হয় নি। চণ্ডাল যদি শিক্ষিত সজ্জন ধনী ও ভদ্রবেশী হয় তথাপি সে নিষ্ঠাবান উচ্চবর্ণ হিন্দুর বিচারে অপাঙ্‌ক্তেয়। এশিয়া-আফ্রিকার লোকের উপরেও পাশ্চাত্ত্য জাতির অনুরূপ ঘৃণা আছে।

এদেশে ধনী ও বিলাসী সমাজ সমশ্রেণী ভিন্ন বৈবাহিক সম্বন্ধ করতে চান না, পাছে শ্বশুরালয়ে মোটা চালচলনে কন্যার কষ্ট হয় বা ঘরের মর্যাদাহানি হয়। অল্পবিত্ত হিন্দু যৌথ পরিবারে অসবর্ণ বিবাহ খুব কম দেখা যায়, কিন্তু যেখানে দম্পতির নিজের আত্মীয়বর্গ থেকে পৃথক হয়ে বাস করবার সামর্থ্য আছে সেখানে অসবর্ণ বিবাহ ক্রমশ প্রচলিত হচ্ছে।

ভারতের তুলনায় ইউরোপ-আমেরিকার ভদ্রসমাজে আচারগত ভেদ কম। তথাপি রাজনীতিক কারণে বিদ্বেষ দেখা যায়। ব্রিটিশ ও জার্মান জাতির উৎপত্তি ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য বেশী নয়, কিন্তু যুদ্ধ বাধলেই জার্মানরা হূন আখ্যা পায়। গত যুদ্ধে 'মিত্র'-পক্ষে থাকার সময় রাশিয়া জাতে উঠেছিল, কিন্তু এখন আবার অর্ধসভ্য এশিয়াটিক হয়ে গেছে, তাদের শায়েস্তা করবার জন্য বিজ্ঞানবলী জার্মান বীর জাতির প্রয়োজন হয়েছে।

লোকে কেবল যুক্তি আর ন্যায়বুদ্ধির বশে চলে না, বহুকাল থেকে বংশপরম্পরায় যে সংস্কার বদ্ধমূল হয় তা দূর করা সহজ নয়। কালক্রমে শিক্ষা আর প্রচারের ফলে অনেক বিষয়ে ভেদজ্ঞান কমে যাবে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে শ্রেণীলোপের সম্ভাবনা অত্যল্প। বর্তমান সমাজে যেসব পরিবর্তন হচ্ছে তা থেকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই অনুমান করা যেতে পারে—

(১) বিদ্যা, বিচারশক্তি, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি অর্জনের সামর্থ্য সকলের সমান নয়, কিন্তু জাতি বর্ণ বা শ্রেণী অনুসারে কোনও তারতম্য হয় না, প্রতিবেশ (environment) এবং শিক্ষার সুযোগ হলে সকল শ্রেণীর লোকই তুল্য সামর্থ্য দেখাতে

পারে। শ্রেণী বিশেষের সহজাত মানসিক উৎকর্ষ বা বংশগত আভিজাত্য থাকতে পারে না—এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ক্রমক্রমে শিক্ষিত জন মেনে নেবে। যাদের দৃঢ়বদ্ধ অন্ধ সংস্কার আছে (যেমন হিটলারের সহকারিগণ, দক্ষিণ আফ্রিকার ডচ-বংশীয় আফ্রিকান্ডার জাতি, মার্কিন দেশের নিগ্রো বিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় এবং এদেশের অনেক উচ্চ বর্ণের লোক) তাদের ধারণার পরিবর্তন হতে বিলম্ব হবে।

(২) অনুকূল লোকমত এবং সরকারী চেষ্টার ফলে এ দেশে অস্পৃশ্যতা শীঘ্রই দূর হবে।

(৩) যৌথ পরিবার লোপের ফলে অসবর্ণ বিবাহ ক্রমশ বহুপ্রচলিত হবে, ভিন্ন-প্রদেশবাসীর মধ্যেও বিবাহ বৃদ্ধি পাবে।

(৪) আকৃতি, পরিচ্ছদ, ভাষা, সংস্কৃতি আর ধর্মের পার্থক্যের জন্য অপরেব প্রতি যে বিরাগ দেখা যায় তা শিক্ষার বিস্তার এবং অধিকতর সংসর্গের ফলে ক্রমশ কমে যাবে।

(৫) যাদের বিদ্যা রুচি বৃত্তি বা রাজনীতি সমান তারা এখনকার মত ভবিষ্যতেও সংঘ ক্লাব বা ইউনিয়ন গঠন করবে, কিন্তু এইপ্রকার দলবন্ধনের ফলে বর্ণভেদের তুল্য সামাজিক ভেদের উদ্ভব হবে না।

(৬) অনেক রাষ্ট্র সমাজতন্ত্র অনুসারে ধনী-দরিদ্রের ভেদ কমাবার চেষ্টা করছে। তার ফলে দারিদ্র্যজনিত হীনতা যথা অশিক্ষা, অসংস্কৃতি, অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি ক্রমশ দূর হবে এবং সামাজিক বৈষম্য কমবে। কিন্তু ধনবৈষম্য একেবারে দূর হবে না, সোভিয়েট রাষ্ট্রেও হয়নি।

(৭) যে অপরিচ্ছন্নতা বহু দিনের কদভ্যাসের ফল তা দূর করার জন্য প্রবল প্রচার আবশ্যক, যেমন অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য হয়েছে। যারা রাজনীতিক প্রচারকার্যে নিযুক্ত আছেন তাঁরা জনসাধারণের কদভ্যাস নিবারণের জন্য কিছু সময় দিলে সমাজের মঙ্গল হবে। সংবাদপত্রেরও এ বিষয়ে কর্তব্য আছে।

(৮) পূর্বের তুলনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জাতির মধ্যে বিবাহ বেড়েছে, কিন্তু বহুপ্রচলিত হবার সম্ভাবনা কম। এইরূপ বিবাহের ফলে নূতন ইউরেশীয় সমাজের সৃষ্টি হচ্ছে না, সন্তানরা পিতা বা মাতার সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি দৈহিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। রূপবিচারের সময় লোকে সাধারণত সেই সব বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে। কটা চোখ আর কটা চুল অধিকাংশ ভারতবাসীর পছন্দ নয়। এই প্রকার রুচিভেদের জন্য বিবাহের ক্ষেত্রে শ্রেণীভেদ মোটের উপর বজায় থাকবে। তবে কালক্রমে রুচির পরিবর্তন হতে পারে। শুনতে পাই, পাশ্চাত্ত্য সমাজে নিগ্রো জাজ-সংগীতের মত নিগ্রো দেহসৌষ্ঠবেরও সমঝদার বাড়ছে।

মোট কথা, অচির ভবিষ্যতে পূর্ণমাত্রায় অশ্রেণিক সমাজ হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এই আশা করা যেতে পারে—মানুষের ন্যায়-বুদ্ধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে, তার ফলে শ্রেণীগত বৈষম্য কমবে। যে ক্ষেত্রে জনসাধারণ উদাসীন সেখানে রাষ্ট্রীয় চেষ্টায় সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকার হবে, তার ফলেও শ্রেণীভেদ কমবে। মানব-স্বভাবের যে বৃহৎ অংশ জন্মগত নয়, শিক্ষা চর্যা আর পরিবেশের ফল, সেই অংশের গঠনে সম্ভবত ভবিষ্যতে সকলেই সমান সুযোগ পাবে, তবে এই সামাজিক পরিবর্তন সকল রাষ্ট্রে সমান ভাবে ঘটবে না।

১৩৬১

# নিসর্গচর্চা

কালিদাস যদি বাঙালী হতেন তবে বোধ হয় মেঘদূতের পূর্বমেঘ লিখতেন না কিংবা সংক্ষেপে সারতেন, কিন্তু উত্তরমেঘ সবিস্তারে লিখতেন এবং তাতে বিস্তর 'মনস্তত্ত্ব' জুড়ে দিতেন। প্রাকৃতিক বিষয় সম্বন্ধে বাঙালী অনেকটা উদাসীন, প্রাচীন ভারতীয় এবং পাশ্চাত্ত্য লেখকের মতন নিসর্গপ্রীতি আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে বেশী দেখা যায় না।

কলকাতা ইট কাঠ লোহা কংক্রীটের শহর, কর্জন পার্ক আর ইডেন গার্ডেন ধ্বংস করতে আমাদের কষ্ট হয় নি। কিন্তু জনসাধারণের উপেক্ষা সত্ত্বেও অনেক রাস্তার ধারে আর পার্কে এখনও গাছপালা আছে, তাতে বিভিন্ন ঋতুতে বিচিত্র সমারোহ এখনও দেখা যায়। ইংরেজী স্টেট্স্‌ম্যান কাগজে মাঝে মাঝে তার বর্ণনা থাকে। বর্ষাকালে কলকাতার উপকণ্ঠে যে ভেক সমাগম হয় আর অষ্টপ্রহরব্যাপী মকমক আলাপ শোনা যায় তার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ কয়েক বৎসর আগে উক্ত পত্রে পড়েছিলাম।

দেশী সংবাদপত্রে এসব বিবরণ থাকে না। বাঙালীর মনে সাপ ব্যাঙ শেয়াল পোকামাকড় প্রভৃতির কথা রসের সঞ্চার করে না, অথচ প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে এই সব প্রাণী প্রচুর সমাদর পেয়েছে এবং পাশ্চাত্ত্য লেখকরাও এদের উপেক্ষা করেন না। প্রতিদিন বিকালে আমাদের মাথার উপর দিয়ে আকাশপথে এক দিক থেকে আর এক দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যায়, আমরা তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করি না। বাড়ির কাছে গাছপালা থাকলে চৈত্র বৈশাখ মাসে কাক শালিক তাতে বাসা বাঁধে, বর্ষা আর শীতের শেষে নানারকম প্রজাপতি আসে, আমরা তাদের গ্রাহ্য করি না। সেদিন এক ইংরেজী পত্রিকায় পড়েছি, এক শৌখিন ভদ্রলোক তাঁর বাড়ির সামনে বাগান তৈরী করে একটি সাইন বোর্ড টাঙিয়েছিলেন—butterflies are welcome। বাঙালী এমন ছেলেমানুষী রসিকতা করে না।

অনেক বৎসর পূর্বে কোনও এক বাংলা সংবাদপত্রে একজন অনুযোগ করেছিলেন—দেশ এখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিপন্ন, কিন্তু আমাদের কবি আবৃত্তি করেছেন—হৃদয় আমার নাচে রে, ময়ূরের মত নাচে রে! এই কি নাচবার সময়? কবি এর সমুচিত উত্তর দিয়েছিলেন। সংবাদপত্রের অনেক বিজ্ঞ পাঠক বলবেন, জগদ্‌-ব্যাপী অশান্তির জন্য আমরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে আছি, এখন শুধু দেশের আর বিদেশের রাজনীতিক সংবাদ চাই, পুলিসের গুলিতে কজন মরল জানতে চাই, রেশনের চাল কবে বাড়ানো হবে তার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি চাই; এই দুর্দিনে তুচ্ছ বিষয়ে আমাদের আগ্রহ থাকতে পারে না। কিন্তু তবুও দেখতে পাই কুৎসিত মকদ্দমার বিবরণ লোক নিবিষ্ট হয়ে পড়ে। সাপের দুই পা, ছাগলীর গর্ভে মর্কটের জন্ম, অমুক স্বামীজীর অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি যজ্ঞে এক শ মন ঘৃতাহুতি, অমুক অবতারের জন্মোৎসবে বত্রিশটা স্পেশাল ট্রেনে ভক্তসমাগম—এইসব খবরও অনেক পাঠকের চিত্তা-

কর্ষণ করে। কিন্তু কবে কোথায় অশথগাছ হঠাৎ তামা-রঙের ঝকঝকে পাতায় ছেয়ে গেল, গুলমোর সোঁদাল বা জারুলের ফুল ফুটল, কোথায় ব্যাঙ ডাকল, আকাশে বক না হাঁস কিসের ঝাঁক উড়ে গেল—এসব তুচ্ছ খবরে লেখক বা পাঠকের আগ্রহ হবে কেন? আমাদের অধিকাংশ গল্পলেখক মিস্টার বাসু মিসেস চ্যাটার্জি বা কলেজের ছেলেমেয়ের প্রেমলীলা নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কেউ প্রাচীন বিপ্লবীদের জের এখনও টানছেন, কেউ কেউ নব বিপ্লবীদের আসরে নামাবার চেষ্টা করছেন। এঁদের ছ-সাত শ পাতার গল্পে টমাস হার্ডির মতন নিসর্গবর্ণনার স্থান হয় না।

ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। এ যুগের অনেক কবি, বিশেষত যাঁরা অত্যাধুনিক নন, এখন নিসর্গচর্চা করেন। এমন গল্পকারও আছেন যাঁরা শুধু মানুষ-মানুষীর কথা লেখেন না, বৃক্ষ লতা ইতরপ্রাণী নদী প্রান্তর ইত্যাদিকেও গ্রন্থে সাদরে স্থান দিয়েছেন। তথাপি বলা যায়, ইংরেজ ও প্রাচীন সংস্কৃত লেখকদের তুলনায় আধুনিক বাঙালী লেখক নিসর্গচর্চায় বিমুখ।

উপনিষদের ঋষি সমগ্র নিসর্গে ব্রহ্মোপলব্ধি করে বলেছেন—

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।

—তুমি নীল পতঙ্গ, হরিদ্‌বর্ণ লোহিতাক্ষ তড়িদ্‌গর্ভ মেঘ, ঋতুসকল, সমুদ্রসকল।

প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের মধ্যে অকৃত্রিম নিসর্গচিত্রণে বোধ হয় বাল্মীকি শ্রেষ্ঠ। বর্ষাবর্ণনায় তিনি লিখেছেন,

স্বনৈর্ঘনানাং প্লবগাঃ প্রবুদ্ধা
বিহায় নিদ্রাং চিরসন্নিরুদ্ধাম্।
অনেকরূপাকৃতিবর্ণনাদা
নাবাম্বুধারাভিহতা নদন্তি ॥

—নানা আকারের নানা বর্ণের ভেক অবরুদ্ধ স্থানে দীর্ঘকাল নিদ্রিত ছিল, এখন তারা মেঘের শব্দে জাগরিত এবং নবজলধারায় সিক্ত হয়ে নানাপ্রকার রব করছে।

কীট্‌স তাঁর The Realm of Fancy কবিতায় লিখেছেন,

Thou shall see the field-mouse peep
Meagre from its celled sleep
  And the snake all winter thin
  Cast on sunny bank its skin.

কালিদাস বোধ হয় স্বচক্ষে তিমি দেখেছিলেন তাই রঘুবংশে লিখেছেন,

অমী শিরোভিস্তিময়ঃ সরন্ধ্রৈ-
রূর্ধ্বং বিতন্বন্তি জলপ্রবাহান্

—ওই তিমিকুল মস্তকের রন্ধ্র দিয়ে উপর দিকে জলপ্রবাহ ক্ষেপণ করছে।

কিপলিং নেকড়ে বাঘের গান লিখেছেন,

As the dawn was breaking the
Sambhur belled

Once, twice, and again!
And a doe leaped up, and a doe
leaped up
From the pond in the wood
where the wild deer sup.
This I, scouting alone, beheld
Once, twice and again!

এই প্রকার বর্ণনার অনুরক্ত পাঠক এককালে অনেক ছিল, কিন্তু এখন বড় একটা দেখা যায় না। লোকের রুচি কি বদলে গেছে? বোধ হয় যায় নি, অবহেলায় চাপা পড়ে আছে।

খাবারওয়ালাকে যদি প্রশ্ন করি—মিষ্টান্নে রং দাও কেন, বিকট বিলিতী গন্ধ দাও কেন, সে উত্তর দেয়, খদ্দের এইরকম রং আর গন্ধ চায় যে। কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। তীব্র কৃত্রিম গন্ধযুক্ত সবুজ রঙের গ্রীন ম্যাংগো সন্দেশ পছন্দ করে এমন লোক হয়তো আছে। কিন্তু আসল কথা, খাবারওয়ালা নিজের রুচি আর বুদ্ধি অনুসারে যে রং দেয়, গন্ধ দেয়, অদ্ভুত অদ্ভুত নাম দেয়, ক্রেতা তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, মনে করে, এই হচ্ছে আধুনিক ফ্যাশন। খাদ্যের স্বাভাবিক বর্ণ গন্ধ স্বাদ অনেকেরই ভাল লাগে, কিন্তু মিষ্টান্নকার তা বোঝে না। অনেক গল্পকারও পাঠকসাধারণের স্বাভাবিক সুস্থ রুচির দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক মনে করেন না। লোকে বিকৃত প্রেম আর লালসার চিত্র চায়, রোমাঞ্চ চায়, সেজন্য আমাদের কথাগ্রন্থে তাই থাকে—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। গল্পকার নিজের রুচি অনুসারেই লেখেন এবং তিনি যদি শক্তিমান হন তবে পাঠকবর্গের মনেও তাঁর রুচি সঞ্চারিত হয়। পাঠক ফরমাশ করে না, লেখকের কাছ থেকে যা পায় তাই হাল ফ্যাশন বলে মেনে নেয়।

রাজনীতিক সামাজিক আর্থিক প্রভৃতি নানা সমস্যা আমাদের আছে। সাময়িক পত্রে এবং অন্যান্য সাহিত্যে তার বহু আলোচনা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পাঠকের মন শুধু সমস্যা আর তত্ত্বকথার আলোচনায় তৃপ্ত হয় না, নানাবিধ রসের কামনা করে। বাংলা সাহিত্য উন্নতির পথে চলেছে, দেশ স্বাধীন হওয়ায় লোকের কর্মক্ষেত্র বেড়ে গেছে, গল্পের পাত্ররা এখন শুধু জমিদারপুত্র কেরানী লেখক চিত্রকর নয়, পাত্রীরা শুধু গৃহপালিতা অল্পশিক্ষিতা কন্যা বা কুলবধূ নয়। বাঙালী অনেক রকম বিজ্ঞান শিখছে, দেশবিদেশে বেড়াচ্ছে, কেউ কেউ নৈসর্গিক তথ্যের সন্ধানে অভিযানও করছে। কিন্তু এখনও আমাদের কথাসাহিত্যের প্রধান অবলম্বন প্রেম। পরিবর্তন এই হয়েছে—প্রেমের আর স্বাভাবিক রূপ নেই, 'আবেদন' বৃদ্ধির জন্য তাতে বিলিতী রং আর গন্ধ যোগ করা হয়। অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য গল্পও প্রেম-মূলক, কিন্তু প্রেমবর্জিত গল্প আর গল্পতুল্য সুখপাঠ্য লঘু সাহিত্যও প্রচুর আছে এবং পাঠকরা তা আগ্রহের সঙ্গেই পড়ে। বাংলা শিশুপাঠ্য গল্প আর বিলিতীর নকল ডিটেকটিভ কাহিনী অনেক আছে, অল্প স্বল্প ভ্রমণকথাও আছে, কিন্তু আমাদের সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্যের মতন বৈচিত্র্য এখনও দেখা যায় না।

শুধু কৌতূহলনিবৃত্তি বা উত্তেজনার জন্য লোকে খবরের কাগজ আর কথাগ্রন্থ পড়ে না, শান্তরসও অসংখ্য পাঠকের প্রিয়। শান্তরস অর্থে শুধু নামে রুচি বা

ভক্তিরস নয়। কিন্তু বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ আজকাল এই রসে ডুবে আছে, তার বৃদ্ধির জন্য সাহিত্যিকদের চেষ্টা অনাবশ্যক। নামে রুচি ছাড়া জীবে দয়াও চর্চার যোগ্য। কিন্তু জীব শুধু দয়ার ভিখারী নয়, প্রীতি বিস্ময় আর কৌতূহলেরও পাত্র।

মানুষ জীবজগতের অংশ, উদ্ভিদ-প্রাণীর সঙ্গে তার আদিম আত্মীয় সম্পর্ক। আমাদের স্বজাতির মধ্যে শত্রুমিত্র আছে, উদ্ভিদ-প্রাণীর মধ্যেও মানুষের উপকারী অপকারী আছে, কিন্তু তার জন্য সমগ্র জীবজগতের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতার হানি হয় নি।

অরণ্য জনপদ নগর যেখানেই বাস করুক, আবালবৃদ্ধবনিতা সুস্থচিত্ত মানুষ মাত্রেরই সহজাত নিসর্গপ্রীতি আছে। নাগরিক জীবনযাত্রায় তা অবদমিত হতে পারে কিন্তু লুপ্ত হয় না। প্রাকৃতিক প্রতিবেশের সঙ্গে আমাদের এই চিরন্তন সম্বন্ধ এবং প্রতিবেশী বৃক্ষ লতা গুল্ম পশুপক্ষী পতঙ্গাদির প্রতি স্নেহ বিস্ময় আর কৌতূহলের ভাব প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অনাবিল শান্তরসের উপাদান যুগিয়েছে। পাশ্চাত্ত্য লেখক আর পাঠকরাও এই রসের পরম ভক্ত। কালিদাসের শকুন্তলা আর মেঘদূত প্রধানত নিসর্গচিত্রের জন্যই ইওরোপীয় পাঠকের মনোহরণ করেছে। আধুনিক বাঙালী লেখকরা যদি শান্তরসের এই হৃদ্য চিরন্তন উপাদান উপেক্ষা করেন তবে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বঞ্চিত হবে।

১৩৬১

# বিজ্ঞানের বিভীষিকা

অনেক বৎসর আগেকার ঘটনা। দুটি ছেলে ভ্রূকুটি করে ঠোঁট কামড়ে হাতে ইট নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। বয়স দশ-এগারো, সম্পর্কে মাসতুতো ভাই। এরা প্রচণ্ড ঝগড়া করেছে, এখন পরস্পর ভয় দেখাচ্ছে, হয়তো একটু পরেই ইট ছুড়বে। তার পরিণাম কি সাংঘাতিক হবে তা এরা মোটামুটি বোঝে, তবু মারতে প্রস্তুত আছে। এদের মায়েরা দূর থেকে দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। দুজনেই আমার ভাগনে, একটু খাতিরও করে, সুতরাং এদের নিরস্ত্র করতে আমাকে বেগ পেতে হয় নি।

মার্কিন আর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কর্তাদের বর্তমান অবস্থা প্রায় ওই রকম, কিন্তু ওদের মামা নেই। এই দুই পরাক্রান্ত রাষ্ট্র পরমাণুবোমা উদ্যত করে পরস্পর বিভীষিকা দেখাচ্ছে, মানবজাতি ত্রস্ত হয়ে আছে। রফার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু তা সফল হবে কিনা বলা যায় না। বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দুই মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে, আর একটা মহত্তর প্রলয়ংকর যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অনেকে বলছেন, এই পৃথিবীব্যাপী আতঙ্ক আর অশান্তির মূল হচ্ছে বিজ্ঞানের অতিবৃদ্ধি। এদের যুক্তি এই রকম।

পরমাণুবোমা আবিষ্কারের পূর্বে যুদ্ধ এত ভয়াবহ ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধে আকাশযানের সংখ্যা কম ছিল, সেজন্য বোমা-বর্ষণে ব্যাপক ভাবে জনপদ ধ্বংস হয় নি। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রান্স-প্রুশিয়া যুদ্ধ, তার পর ব্রিটিশ-বোঅর আর রুশ-জাপান যুদ্ধ প্রধানত দুই পক্ষের সেনাদের মধ্যেই হয়েছিল, জনসাধারণের আর্থিক ক্ষতি হলেও লোকক্ষয় বেশী হয় নি। মেশিন-গন, দূরক্ষেপী কামান, টরপিডো, সবমেরীন, বোমা-বর্ষী বিমান, এবং পরিশেষে পরমাণুবোমা উদ্ভাবনের ফলে মানুষের নাশিকা-শক্তি উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে। ভবিষ্যতে হয়তো অন্যান্য উৎকট মারাত্মক উপায় প্রযুক্ত হবে, মহামারীর বীজ ছড়িয়ে বিপক্ষের দেশ নির্মনুষ্য করা হবে, অথবা এমন গ্যাস বা তেজষ্ক্রিয় পদার্থ বা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ উদ্ভাবিত হবে যার স্পর্শে দেশের সমস্ত লোক জড়বুদ্ধি হয়ে ভেড়ার পালের মতন আত্মসমর্পণ করবে। মোট কথা, মানুষ বিজ্ঞান শিখেছে কিন্তু শ্রেয়স্কর জ্ঞান লাভ করে নি, বহিঃ-প্রকৃতিকে কতকটা বশে আনলেও অন্তঃপ্রকৃতিকে সংযত করতে পারে নি। তার স্বার্থবুদ্ধি প্রাচীন কালে যেমন সংকীর্ণ ছিল এখনও তাই আছে। বানরের হাতে যেমন তলোয়ার, শিশুর হাতে যেমন জ্বলন্ত মশাল, অদূরদর্শী অপরিণতবুদ্ধি মানুষের হাতে বিজ্ঞানও তেমনি ভয়ংকর। অতএব বিজ্ঞানচর্চা কিছুকাল স্থগিত থাকুক—বিশেষ করে রসায়ন আর পদার্থবিদ্যা, কারণ এই দুটোই যত অনিষ্টের মূল। চন্দ্রলোকে যাবার বিমান, রেডিও-টেলিভিশন মারফত বিদেশবাসীর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ, রেশমের চাইতে মজবুত কাচের সুতোর কাপড়, ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক অবদানের

জন্য আমরা দশ-বিশ বৎসর সবুর করতে রাজী আছি। মানুষের ধর্মবুদ্ধি যাতে বাড়ে সেই চেষ্টাই এখন সর্বতোভাবে করা হক।

এই অভিযোগের প্রতিবাদে বিজ্ঞানচর্চার সমর্থকগণ বলতে পারেন—সেকালে যখন বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয় নি তখন কি মানুষের সংকট কম ছিল? নেপোলিয়নের আমলে যে সব যুদ্ধ হয়েছিল, তার আগে থার্টি ইয়ার্স ওঅর, ক্যাথলিক-প্রোটেস্টান্ট-দের ধর্মযুদ্ধ, তুর্ক কর্তৃক ভারত অধিকার, খ্রীষ্টান-মুসলমানদের ক্রুজেড ও জেহাদ, সম্রাট অশোক আর আলেকজান্ডারের দিগ্‌বিজয়, ইত্যাদিতেও বিস্তর প্রাণহানি আর বহু দেশের ক্ষতি হয়েছিল। সেকালে লোকসংখ্যার অনুপাতে যে লোকক্ষয় হ'ত তা একালের তুলনায় কম নয়।

প্রতিবাদীরা আরও বলতে পারেন—বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে কি অনিষ্ট হয়েছে শুধু তা দেখলে চলবে কেন, সুপ্রয়োগে কত উপকার হয়েছে তাও দেখতে হবে। খাদ্যোৎ-পাদন বেড়েছে, দুর্ভিক্ষ কমেছে, চিকিৎসার উন্নতির ফলে শিশুমৃত্যু কমেছে, লোকের পরমায়ু বেড়েছে। রেলগাড়ি টেলিগ্রাফ টেলিফোন মোটর গাড়ি এয়ারোপ্লেন সিনেমা রেডিও প্রভৃতির প্রচলনে মানুষের সুখ কত বেড়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। অতএব বিজ্ঞানের চর্চা নিষিদ্ধ করা ঘোর মূর্খতা।

উক্ত বাদ-প্রতিবাদের বিচার করতে হলে দুটি বিষয় পরিষ্কার করে বোঝা দরকার —বিজ্ঞান শব্দের অর্থ, এবং মানবস্বভাবের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ।

সায়েন্স বা বিজ্ঞান বললে দুই শ্রেণীর বিদ্যা বোঝায়। দুই বিদ্যাই পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষার ফলে লব্ধ, কিন্তু একটি নিষ্কাম, অপরটি সকাম অর্থাৎ অভীষ্ট-সিদ্ধির উপায় নির্ধারণ। প্রথমটি শুধুই জ্ঞান, দ্বিতীয়টি প্রকৃতপক্ষে শিল্পসাধনা। মানুষের আদিম অবস্থা থেকে বিজ্ঞানের এই দুই ধারার চর্চা হয়ে আসছে। রবীন্দ্র-নাথের একটি প্রাচীন গানে আছে—মহাবিশ্বে মহাকালে মহাকাল-মাঝে, আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে ভ্রমি বিস্ময়ে। যারা বিস্ময় বোধ করে না এমন প্রাকৃত জনের সংখ্যাই জগতে বেশী। যাঁরা বিস্ময়ের ফলে রসাবিষ্ট বা ভাবসমন্বিত হন তাঁরা কবি বা ভক্ত। আর, বিস্ময়ের মূলে যে রহস্য আছে তার সমাধানের চেষ্টা যাঁরা করেন তাঁরা বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীদের এক দল জ্ঞানলাভেই তৃপ্ত হন, এ'রা নিষ্কাম শুদ্ধবিজ্ঞানী। আর এক দল নিজেদের বা পরের লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগান, এরা সকাম ফলিতবিজ্ঞানী। সংখ্যায় এ'রাই বেশী।

জ্যোতিষের অধিকাংশ তত্ত্বই নিষ্কাম বিদ্যা। হেলির ধূমকেতু প্রায় ছেয়াত্তর বৎসর অন্তর দেখা দেয়, মঙ্গল গ্রহের দুই উপগ্রহ আছে, ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশ ফেঁপে উঠছে —এই সব জেনে আমাদের আনন্দ হতে পারে কিন্তু অন্য লাভের সম্ভাবনা নেই, অন্তত আপাতত নেই। সেগুন আর ঘেঁটু একই বর্গের গাছ, চামচিকার দেহে রাডারের মতন যন্ত্র আছে, তারই সাহায্যে অন্ধকারে বাধা এড়িয়ে উড়ে বেড়াতে পারে —ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এখনও কোনও সৎ বা অসৎ উদ্দেশ্যে লাগানো যায় নি। চুম্বক লোহা টানে, তার এক প্রান্ত উত্তরে আর এক প্রান্ত দক্ষিণে আকৃষ্ট হয়—এই আবিষ্কার প্রথমে শুধু জ্ঞানমাত্র বা কৌতূহলের বিষয় ছিল কিন্তু পরে মানুষের কাজে লেগেছে। তপ্ত বা সিদ্ধ করলে মাংস সুস্বাদু হয়—এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে রন্ধনকলার উৎপত্তি হয়েছে।

ভাল মন্দ নানা রকম অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য মানুষ চিরকাল অন্ধভাবে বা সতর্ক হয়ে চেষ্টা করে আসছে। মোটামুটি কার্যসিদ্ধি হলেই সাধারণ লোকে তুষ্ট হয়,

কিন্তু জনকতক কুতুহলী আছেন যাঁরা কার্য আর কারণের সম্বন্ধ ভাল করে জানতে চান। তাঁরাই বিজ্ঞানী। আদিম মানুষ আবিষ্কার করেছিল যে আগুনের উপর জল বসালে ক্রমশ গরম হতে থাকে, তার পর ফোটে। বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে জানলেন —আঁচ যতই বাড়ানো হক, ফুটতে আরম্ভ করলে জলের উষ্ণতা আর বাড়ে না। আমাদের দেশের অনেক পাচিকা এই তত্ত্ব জানে না, জানলে ইন্ধনের খরচ হয়তো একটু কমত।

কাণ্ডজ্ঞান (common sense), সাধারণ অভিজ্ঞতা, আর বিজ্ঞান—এই তিনের মধ্যে আকাশ পাতাল গুণগত ব্যবধান নেই। স্থূল সূক্ষ্ম সব রকম জ্ঞানই পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ অনুমান ইত্যাদি দ্বারা লব্ধ, কিন্তু বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই যে তা সাবধানে অর্জিত, বহু প্রমাণিত, এবং তাতে কার্যকারণতা যথাসম্ভব নিরূপিত। বিজ্ঞান শব্দের অপপ্রয়োগও খুব হয়। চিরাগত ভিত্তিহীন সংস্কার, শিল্পকলা, এমনকি খেলার নিয়মও বিজ্ঞান নামে চলে। ফলিত জ্যোতিষ আর সামুদ্রিককে বিজ্ঞান বলা হয়, দরজীবিজ্ঞান শতরঞ্জবিজ্ঞানও শোনা যায়।

যাঁরা নিষ্কাম জিজ্ঞাসু, লাভালাভের চিন্তা যাঁদের নেই, এমন জ্ঞানযোগী শুদ্ধ-বিজ্ঞানী অনেক আছেন। কিন্তু তাঁদের চাইতে অনেক বেশী আছেন যাঁরা ফলকামী, বিজ্ঞানের সাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধি করতে চান। নিউটন, ফ্যারাডে, কুরী-দম্পতি ও কন্যা, আইনস্টাইন প্রভৃতি প্রধানত শুদ্ধবিজ্ঞানী, যদিও তাঁদের আবিষ্কার অন্য লোকে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু এঞ্জিন টেলিফোন ফোনোগ্রাফ রেডিও রাডার প্রভৃতি যন্ত্রের, সালভার্সান স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতি ঔষধের, এবং বন্দুক কামান টর্পিডো আর অ্যাটম-হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি মারণাস্ত্রের উদ্ভাবকগণ ফললাভের জন্যই বিজ্ঞানচর্চা করেন। এঁদের কাছে বিজ্ঞান মুখ্যত কার্যসিদ্ধির উপায়, উকিলের কাছে আইনের জ্ঞান যেমন মকদ্দমা জেতবার উপায়। নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার এবং তত্ত্বের প্রয়োগ—এই দুই বিদ্যাই বিজ্ঞান, কিন্তু বিদ্যার যদি অপপ্রয়োগ হয় তবেই তা ভয়ংকরী।

ইতর প্রাণীর যেটুকু জ্ঞান আছে তার প্রায় সমস্তই সহজাত, কিন্তু মানুষ নূতন জ্ঞান অর্জন করে, কাজে লাগায়, এবং অপরকে শেখায়। মানবস্বভাবের এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই শিল্পকলা আর বিজ্ঞানের প্রসার হয়েছে। মানুষ নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে বিদ্যার সুপ্রয়োগ বা কুপ্রয়োগ করে। দুষ্ট লোকে দলিল জাল করে, অনিষ্টকর পুস্তক প্রচার করে, কিন্তু সেজন্য লেখাপড়া নিষিদ্ধ করতে বলে না। চোরের জন্য সিঁধকাঠি আর গুণ্ডার জন্য ছোরা তৈরী হয়, বিষ-ঔষধ দিয়ে মানুষ খুন করা হয়, কিন্তু কেউ চায় না যে কামারের কাজ আর ঔষধ তৈরী স্থগিত থাকুক।

কূটবুদ্ধি নিষ্ঠুর লোকে বিজ্ঞানের অত্যন্ত অপপ্রয়োগ করেছে, অতএব সর্ব-সম্মতিক্রমে সকল রাষ্ট্রে বিজ্ঞানচর্চা স্থগিত থাকুক—এই আবদার করা বৃথা। হবু-চন্দ্রের রাজ্যে সে রকম ব্যবস্থা হতে পারত, কিন্তু এখনকার কোনও রাষ্ট্র এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করবে না। যুদ্ধবিরোধী অহিংস ভারতরাষ্ট্র সর্বপ্রকার উৎকট মারণাস্ত্রের লোপ চায়, কিন্তু ভাল কাজে লাগতে পারে এই আশায় পারমাণবিক গবেষণাও চালাচ্ছে।

বিজ্ঞানচর্চা স্থগিত রাখলে এবং পরমাণুবোমা নিষিদ্ধ করলেও সংকট দূর হবে

না। আরও নানারকম নৃশংস যুদ্ধাস্ত্র আছে—টি-এন-টি আর ফসফরাস বোমা, চালক-হীন বিমান, শব্দভেদী টরপিডো ইত্যাদি। যখন কামান বন্দুক ছিল না তখনও মানুষ ধনুর্বাণ তলোয়ার বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করেছে। দোষ বিজ্ঞানের নয়, মানুষের স্বভাবেই দোষ।

অরণ্যবাসকালে শস্ত্রপাণি রামকে সীতা বলেছিলেন—কদর্যকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ—শস্ত্রের সংসর্গে বুদ্ধি কদর্য ও কলুষিত হয়। এই বাক্য সকল যুগেই সত্য। পরম মারণাস্ত্র যদি হাতে থাকে তবে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে সংযম অবলম্বন করা কঠিন। কিন্তু সকল দেশের জনমত যদি প্রবল হয় তবে অতি পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকেও অস্ত্রসংবরণ করতে হবে। প্রথম মহাযুদ্ধে বিষ-গ্যাস ছাড়া হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হয় নি, আয়োজন থাকলেও জনমতের বিরোধিতার জন্য দুই পক্ষই সংযত হয়েছিল। পরমাণুবোমার বিরুদ্ধেও যদি প্রবল আন্দোলন হয় তবে সমগ্র সভ্য মানবসমাজের ধিক্কারের ভয়ে আমেরিকা-রাশিয়াকেও সংযত হতে হবে। আশার কথা, যাঁদের কোনও কূট অভিসন্ধি নেই এমন শান্তিকামীরা ঘোষণা করছেন যে পরমাণুবোমা ফেলে জনপদ ধ্বংস আর অগণিত নিরীহ প্রজা হত্যার চাইতে মহা-পাতক কিছু নেই। অনেক বিজ্ঞানীও প্রচার করছেন যে শুধু পরীক্ষার উদ্দেশ্যেও যদি পরমাণুবোমার বার বার বিস্ফোরণ হয় তবে তার কুফল এখন দেখা না গেলেও ভবিষ্যৎ মানবসন্তানের দেহে প্রকট হবে।

ক্রীতদাস প্রথা এক কালে বহুপ্রচলিত ছিল, কিন্তু জনমতের বিরোধিতায় এখন প্রায় লোপ পেয়েছে। শক্তিশালী জাতিদের উপনিবেশপদ্ধতি এবং দুর্বল জাতির উপর প্রভুত্ব ক্রমশ নিন্দিত হচ্ছে। কালক্রমে এই অন্যায়ের প্রতিকার হবে তাতে সন্দেহ নেই। আফিম কোকেন প্রভৃতি মাদকের অবাধ বাণিজ্য, জলদস্যুতা, পাপ-ব্যবসায়ের জন্য নারীহরণ প্রভৃতি রাষ্ট্রসংঘের সমবেত চেষ্টায় বহু পরিমাণে নিবারিত হয়েছে। লোকমতের প্রভাবে পরমাণুশক্তির যথেচ্ছ প্রয়োগও নিবারিত হতে পারবে। এচ. জি. ওয়েলস্, ওয়েন্ডেল উইল্‌কি প্রভৃতি যে একচ্ছত্রা বসুধার স্বপ্ন দেখেছেন তা যদি কোনও দিন সফল হয় তবে হয়তো যুদ্ধও নিবারিত হবে।

এক কালে পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের আদর্শ ছিল—সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা। আজকাল শোনা যায়—মহৎ চিন্তা অবশ্যই চাই, কিন্তু জীবনযাত্রার মান আর সর্ববিধ ভোগ বাড়িয়ে যেতে হবে তবেই মানবজীবন সার্থক হবে। এই পরম পুরুষার্থ লাভের উপায় বিজ্ঞান। অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মনে করেন, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য আর ভোগসুখের বৃদ্ধি। ভারতের শাস্ত্র বিপরীত কথা বলেছে—ঘি ঢাললে যেমন আগুন বেড়ে যায় তেমনি কাম্য বস্তুর উপভোগে কামনা শান্ত হয় না, আরও বেড়ে যায়। পাশ্চাত্ত্য সমৃদ্ধ দেশে বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ফলে দুর্নীতি বাড়ছে, তারই পরিণামস্বরূপ অন্য দেশেও লোভ ঈর্ষা আর অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। কামনা সংযত না করলে মানুষের মঙ্গল নেই এই সত্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা এখনও বোঝেন নি।

দরিদ্র দেশের জীবনযাত্রার মান অবশ্যই বাড়াতে হবে। সকলের জন্য যথোচিত খাদ্য বস্ত্র আবাস চাই, শিক্ষা সংস্কৃতি স্বাস্থ্য এবং উপযুক্ত মাত্রার চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাও চাই। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিজ্ঞানচর্চা একান্ত আবশ্যক। প্রতিবেশী

রাষ্ট্রসকল যদি অহিংস না হয়, নিজ দেশ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা যদি থাকে, তবে বিজ্ঞানের সাহায্যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। কিন্তু অস্ত্রের বাহুল্য আর বিলাসসামগ্রীর বাহুল্য দুটোই মানুষের পক্ষে অনিষ্টকর এই কথা মনে রাখা দরকার।

পৃথিবীতে বহু বার প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে। নূতন পরিবেশের সঙ্গে যে সব মানুষ নিজেকে খাপ খাওয়াতে পেরেছে তারা রক্ষা পেয়েছে, যারা পারে নি তারা লুপ্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের বৃদ্ধির ফলে প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব পড়ছে, তার জন্যও পরিবেশ বদলাচ্ছে। মানুষ এমন দূরদর্শী নয় যে তার সমস্ত কর্মের ভবিষ্যৎ পরিণাম অনুমান করতে পারে। বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাপক ভাবে যে সব লোকহিতকর চেষ্টা হচ্ছে তার ফলেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যদি দুর্ভিক্ষ শিশু-মৃত্যু এবং ম্যালেরিয়া যক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যাধি নিবারিত হয়, প্রজার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট জন্মনিয়ন্ত্রণ না হয়, তবে জনসংখ্যা ভয়াবহরূপে বাড়বে, প্রজার অভাব মেটানো অসম্ভব হবে।* বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে এখনও কিছুকাল ক্রমবর্ধমান মানবজাতির খাদ্য ও অন্যান্য জীবনোপায়ের অভাব হবে না এমন আশা করা যেতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না, মানুষ সকল ক্ষেত্রে অনাগতবিধাতা হতে পারে না।

প্রাচীন ভারতের চতুর্বর্গ বা পুরুষার্থ ছিল—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। সংসারী মানুষের পক্ষে এই চারটি বিষয়ের সাধনা শ্রেয়স্কর বিবেচিত হ'ত। বর্তমান কালে বিজ্ঞান পঞ্চম পুরুষার্থ তাতে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানের অবহেলার ফলে ভারত-বাসী দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করেছে, এখন তাকে সযত্নে সাধনা করতে হবে। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক—কোনও নবাবিষ্কৃত বস্তুর প্রয়োগের পরিণাম দূর ভবিষ্যতে কি রকম দাঁড়াবে তা সকল ক্ষেত্রে অনুমান করা অসম্ভব। ডাক্তার বেণ্টলি বলে গেছেন, বাংলা দেশে ম্যালেরিয়ার বিস্তারের কারণ রেলপথের অসতর্ক বিন্যাস। পেনি-সিলিনে বহু রোগের বীজ নষ্ট হয়, কিন্তু দেখা গেছে অসতর্ক প্রয়োগে এমন জীবাণু-বংশের উদ্ভব হয় যা পেনিসিলিনে মরে না। ডি-ডি-টি প্রভৃতি কীটঘ্নের ক্রিয়া প্রতিরোধ করতে পারে এমন মশক-বংশও দেখা দিয়েছে। বিকিনিতে যে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা হয়েছিল তার ফলে বহুদূরস্থ জাপানী জেলেরা ব্যাধিগ্রস্ত হবে এ কথা মার্কিন বিজ্ঞানীরা ভাবতে পারেন নি। মোট কথায় বিজ্ঞানের সুপ্রয়োগে যেমন মঙ্গল হয় তেমনি নিরঙ্কুশ প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রে সুফলের পরিবর্তে অবাঞ্ছিত ফলও দেখা দিতে পারে।

১৩৬২

* 'জন্মশাসন ও প্রজাপালন' সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা আছে।

# সংস্কৃতি ও সাহিত্য

কালচার শব্দের প্রতিশব্দ কেউ লেখেন কৃষ্টি কেউ লেখেন সংস্কৃতি। কালচার আর কৃষ্টি দুই শব্দেরই ব্যুৎপত্তিতে কৃষি বা কর্ষণের ভাব আছে। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্টি শব্দ পছন্দ করতেন না, তিনিই সংস্কৃতি চালিয়েছেন।

কোনও ইংরেজী শব্দের যখন বাংলা প্রতিশব্দ করা হয় তখন ইংরেজী শব্দের পারিভাষিক অর্থ পুরোপুরি মেনে নেওয়া হয়। Oxford Pocket Dictionaryতে culture-এর বিশিষ্ট অর্থ—

Trained and refined state of the understanding and manners and tastes ; phase of this prevalent at a time or place.

এই পারিভাষিক অর্থে বুদ্ধি আচরণ ও রুচির যে শিক্ষিত ও মার্জিত অবস্থা বোঝায় তা সংস্কৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে নিহিত আছে।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির একটি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে— 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল।' এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

আমি সভ্যতা সংস্কৃতি ও কৃষ্টি এই শব্দত্রয় ত্রিবিধ অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকি। (১) দেহের সুখ বিধান যে কৃতির লক্ষ্য তাহা সভ্যতা। (২) যদ্দ্বারা মনের সুখ সাধন হয় তাহা সংস্কৃতি। (৩) যদ্দ্বারা বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা কৃষ্টি। মহেন-জো-দেড়োর আবিষ্কৃত পুরাকৃতি প্রাচীন সিন্ধুবাসীর সভ্যতার, ভরতনাট্যম্ প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির, এবং নয়টি অঙ্ক দ্বারা যাবতীয় সংখ্যা প্রকাশ বৈদিক আর্যগণের কৃষ্টির পরিচয়।

ইংরেজী অভিধানে কালচার শব্দের যে বিশিষ্ট অর্থ দেওয়া আছে যোগেশচন্দ্র তাই বিশ্লিষ্ট করে সভ্যতা সংস্কৃতি আর কৃষ্টি এই তিন শব্দে ভাগ করে দিয়েছেন। আমার মনে হয় এই বিশ্লেষণের ফলে কালচার বিষয়ক আলোচনা সহজ হবে। পার্থক্য সকল ক্ষেত্রে স্পষ্ট না হলেও মোটামুটি বলা যেতে পারে—

(১) ভারত-রাষ্ট্রের সংবিধান, দেওয়ানী ফৌজদারী আইন, জলসেচ ব্যবস্থা, বাঁধ, সেতু, লোহা প্রভৃতির কারখানা, বিবিধ প্রাসাদ, রেলগাড়ি মোটর-কার টেলিফোন রেডিও, বিদ্যুৎশক্তির বিস্তার, স্কুল কলেজ হাসপাতাল, দেশীয় ও পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা পদ্ধতি প্রভৃতি বর্তমান ভারতীয় সভ্যতার পরিচায়ক, যদিও বহু ক্ষেত্রে কৃতি বা উদ্ভাবনের গৌরব বিদেশীর। চা সিগারেট কেক বিস্কুট, ইওরোপীয় প্যাণ্ট শার্ট কোট, 'পঞ্জাবী' জামা, গান্ধী টুপি, বিলাতী গড়নের জুতা, মাদ্রাজী চপ্পল—এ সবও আমাদের বর্তমান সভ্যতার অঙ্গ।

(২) প্রাচীন ও আধুনিক দেবমন্দির স্তূপাদি, ভারতীয় সংগীত চিত্র ও মূর্তিনির্মাণ কলা, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্যাদি ভারতের সংস্কৃতির পরিচায়ক। বাঙালীর বিশিষ্ট সংস্কৃতির উদাহরণ—কীর্তন ও বাউলের গান, রবীন্দ্রসংগীত, প্রাচীন পট ও আধুনিক চিত্র-পদ্ধতি, এবং বাংলা সাহিত্য।

(৩) ভারতীয় কৃষ্টির পরিচায়ক—সংস্কৃত বর্ণমালা (alphabet), ব্যাকরণ ছন্দঃ ও অলংকার শাস্ত্র, বিবিধ দর্শন শাস্ত্র, এবং নবায়ত্ত বিজ্ঞান। বাঙালীর বিশিষ্ট কৃষ্টির উদাহরণ—নব্যন্যায়, দায়ভাগ, শুভংকরের গণনা-পদ্ধতি এবং বিধবা ও অসবর্ণের বিবাহের প্রবর্তন চেষ্টা। অনাবশ্যক বোধে টিকি-বর্জন—এও বাঙালী হিন্দুর কৃষ্টির লক্ষণ।

সভ্যতা সংস্কৃতি ও কৃষ্টি কালে কালে পরিবর্তিত হয়। দেড়শ বৎসর আগে পর্যন্ত বাংলা দেশে এই পরিবর্তন ধীরে ধীরে হয়েছিল, তার পর ব্রিটিশ রাজত্ব-কালে অতি দ্রুত লয়ে ঘটেছে। স্বাধীনতা লাভের পর পরিবর্তনের গতি আরও ত্বরিত হয়েছে।

কালচারের সর্বার্থক প্রতিশব্দরূপে সংস্কৃতি শব্দই আজকাল বেশী চলছে, কিন্তু সাহিত্যিক আলোচনায় সংস্কৃতি যে অর্থে চলে তা যোগেশচন্দ্রের সংজ্ঞার্থেরই অনুরূপ। বাঙালীর সংস্কৃতি বললে যা বোঝায় তার প্রধান অঙ্গ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। এখন তার কথাই বলছি।

প্রায় পাঁচ শ বৎসর এ দেশে মুসলমান রাজত্ব ছিল, তার ফলে হিন্দু সংস্কৃতিতে মুসলমান (বা পারসীক) প্রভাব কিছু কিছু এসে পড়েছে। বিস্তর ফারসী আরবী আর তুর্কী শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্গত হয়ে গেছে। ব্রিটিশ আধিপত্যের কাল দু শ বৎসরেরও কম, কিন্তু সংস্কৃতিতে তার প্রভাব আরও ব্যাপক। এর কারণ, ব্রিটিশ শাসনের উপর যতই বিদ্বেষ থাকুক, ব্রিটিশ সংস্কৃতি আর সাহিত্যের প্রতি বাঙালীর অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তার ফলে আধুনিক বাংলা ভাষা ইংরেজীর অন্তর্বর্তী হয়ে পড়েছে, শিক্ষিত বাঙালীর সমাজও ক্রমে ক্রমে ইওরোপীয় আদর্শ অনুসরণ করছে।

হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হলে তার প্রভাব বাংলা ভাষার উপর অবশ্যই কিছু পড়বে, কিন্তু ইংরেজীর তুল্য নয়, কারণ হিন্দীর সে প্রতিপত্তি নেই। ইংরেজীর স্থান হিন্দী কখনও নিতে পারবে না। অন্ধ হিন্দীপ্রেমী ছাড়া সকলেই বুঝেছেন যে ইংরেজীর চর্চা লোপ পেলে আমাদের জ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ হবে। ভারত সংবিধানে অষ্টম তফসিলে যে চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষার উল্লেখ আছে তার মধ্যে সংস্কৃত আছে অথচ ইংরেজীর নাম নেই। ইংরেজী অ্যাংলোইণ্ডিয়ানদের ভাষা অতএব অন্যতম ভারতীয় ভাষা—এই কারণে তাঁদের মুখপাত্র শ্রীযুক্ত ফ্র্যাঙ্ক অ্যাণ্টনি ইংরেজীকে তফসিলভুক্ত করবার চেষ্টা করছেন। আমাদের উচিত সর্বতোভাবে এই চেষ্টার সমর্থন করা। আর একটি প্রস্তাব বহুবার আলোচিত হয়ে চাপা পড়ে গেছে—ভারতের সমস্ত ভাষার জন্য রোমানলিপি বা script এর প্রবর্তন, অবশ্য বর্ণমালা বা alphabet যে ভাষার যেমন আছে তাই থাকবে। ভারতীয় লিপি চিরকাল সমান ছিল না। অনেকের ভুল ধারণা আছে যে নাগরী হচ্চে সংস্কৃত ভাষার লিপি সেজন্য দেবনাগরী নাম। সংস্কৃতের কোন সনাতনী লিপি নেই, দিল্লীর লৌহস্তম্ভের লিপি আর সম্রাট হর্ষবর্ধনের স্বহস্তাক্ষরের কোনও মিল নেই অথচ ভাষা উভয়েরই সংস্কৃত। প্রচলিত বিভিন্ন লিপির মায়া ত্যাগ করে সর্ব ভারতের মিলনের যোগসূত্ররূপে রোমান লিপি প্রবর্তনের জন্য প্রবল চেষ্টা আবশ্যক। তুরস্ক তা করে লাভবান হয়েছে, চীন দেশেও আয়োজন হচ্ছে।

ব্রিটিশ শাসনকালে বাংলা ভাষা বাধা পায় নি, প্রশ্রয়ও পায় নি। ষাট বৎসর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার স্থান ছিল না তথাপি বাংলা সাহিত্যের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। তার কারণ, ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাঙালী সুধীজন নবদৃষ্টি লাভ করে-

ছিলেন, বাংলাসাহিত্যও ইংরেজীর তুল্য সমৃদ্ধ হতে পারে এই বিশ্বাসে তাঁরা সাহিত্য সাধনায় নিবিষ্ট হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি যতই বিরাগ থাক, ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত জনের প্রবল অনুরাগ ছিল, বিদেশী ভাষা থেকে রাশি রাশি ভাব আহরণ করে তাঁরা বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত করেছিলেন। জনকতক মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করলেও বহু শিক্ষিত জন অপ্রমত্ত হয়ে বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর বাঙালীর মাতৃভাষাপ্রীতি বেড়ে গেছে।

ইংরেজী ভাষা আর সাহিত্যের যে গৌরব হিন্দীর তা নেই, সুতরাং ভবিষ্যতে হিন্দী কর্তৃক বাংলা অভিভূত হবে এই ভয় অমূলক। হিন্দী যদি ভবিষ্যতে রাষ্ট্রভাষা হয়, বঙ্গ-বিহার যদি কোনও কালে যুক্ত হয়ে যায়, তবে অন্য লাভ ক্ষতি যাই হক বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের হানি হবার সম্ভাবনা নেই। বঙ্গ-বিহার বা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তারা যদি উৎকট হিন্দীপ্রেমের বশে বাংলা ভাষার উপর উপদ্রব শুরু করেন তবে বাঙালী কি এতই দুর্বল যে তা রোধ করতে পারবে না?

বাঙালী লেখকরা বহু কাল ধরে ইংরেজী ভাবরাশি আত্মসাৎ করেছেন, তার ফলে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ ও পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু তার জাতিনাশ হয় নি। সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে একটি অদ্ভুত সন্ধিক্ষণ দেখা দিয়েছে। নবীন বাঙালীর ইংরেজী-জ্ঞান পূর্বের তুলনায় কমে যাচ্ছে। শুনতে পাই অনেক গ্র্যাজুয়েটও ইংরেজী গল্পের বই বুঝতে পারেন না, সেজন্য আজকাল অনুবাদ গ্রন্থের এত প্রচলন হয়েছে। শুধু ইংরেজী গ্রন্থ নয়, চিরায়ত বা ক্লাসিক বাংলা রচনাও ক্রমশ অবোধ্য হয়ে পড়েছে। যুবক ও মধ্যবয়স্ক অনেক শিক্ষিত লোককে বলতে শুনেছি—কপালকুণ্ডলা বুঝতে পারি না; আর কালীসিংহের মহাভারত? ওরে বাপ রে! হয়তো কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রও অবোধ্য হয়ে পড়বেন।

কিন্তু ইংরেজী ভাষার দখল যতই কমুক, ইংরেজী এখনও বাংলা ভাষার গুরুস্থানীয়, বরং গুরুভক্তি আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে এবং তার সঙ্গে মোহ এসেছে। বহুপ্রচলিত বাংলা বাক্যরীতি স্থানে ইংরেজী রীতি ক্রমশঃ প্রকট হচ্ছে। উপযুক্ত বাংলা শব্দ থাকলেও ইংরেজী মাছিমারা নকলে নূতন শব্দ চালানো হচ্ছে। বাংলা ভাষার উপর সংস্কৃত ব্যাকরণের যেটুকু শাসন ছিল তা লোপ পাচ্ছে, তার ফলে ভাষা উচ্ছৃঙ্খল হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা যেমন নবীন শিক্ষিত জনের অবোধ্য, অনেক আধুনিক লেখকের ভাষাও তেমনি প্রবীণ পাঠকদের অবোধ্য হয়ে পড়েছে। আধুনিক বাঙালী লেখকদের এই প্রবৃত্তি অনেকের মতে অবাঞ্ছনীয় হলেও রোধ করা অসম্ভব; ভাল মন্দ নানা পথ দিয়ে ভাষা অগ্রসর হবে এবং যে রীতি অধিকাংশ সুধী-জনের সম্মত তাই কালক্রমে প্রতিষ্ঠা পাবে।

গত ৫ নভেম্বরে Nature পত্রিকায় Dr. John R. Baker একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—

Many scientific papers published in Great Britain are written in a style quite different from that adopted by good English authors....Three kinds of error are—those of grammar, grandiloquence, and German construction.

ইংরেজী লেখকদের বিরুদ্ধে ইনি যে অভিযোগ এনেছেন আধুনিক অনেক বাংলা লেখকদের সম্বন্ধেও তা খাটে...ব্যাকরণের ভুল, আড়ম্বর এবং (জর্মানের বদলে) ইংরেজী বাক্যরীতি।

হিন্দীর কিছু প্রভাব বাংলা ভাষার উপর অবশ্যই আসবে। হিন্দীর মহত্ত্বের জন্য নয়, ভারতের সর্বাধিক প্রচলিত এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা বলেই আসবে। তার লক্ষণ এখনই দেখা যায়। অনেক বাঙালী লেখক 'নূতন' স্থানে 'নয়া', 'সমুদ্র' স্থানে 'দরিয়া', 'স্বাধীনতা' স্থানে 'আজাদী' লিখতে ভালবাসেন। অনেকে 'প্রদেশ, বিপ্লব, শিল্প' স্থানে 'প্রান্ত, ক্রান্তি, উদ্যোগ' লিখছেন। কালক্রমে হয়তো 'অনুগ্রহ পূর্বক' স্থানে হিন্দী 'কৃপয়া', ডাকবাক্স স্থানে 'চিঠ্ঠি ঘুসেড়', 'জরুরী' স্থানে 'ধড়াধড়' চলবে। অনেক বাংলা বই-এর নাম মলাটের উপর নাগরী ছাঁদে লেখা হয়। বাঙালী যদি রাশি রাশি ইংরেজী ভেজাল হজম করতে পারে তবে একটু ভারতীয় ভেজাল সইবে না কেন?

১৩৬৩

# কবিতা

# প্রার্থনা

ওহে অনন্ত বিশাল বিপুল নিখিলের অধিপতি,
বিশ্বে তোমার না পাই নাগাল, মোরা অতি মূঢ়মতি।
মহাজগতের বিরাট ধান্দা ছেড়ে ক্ষণেকের তরে
অতি ছোট হয়ে ধরা দাও আজ মোদের ক্ষুদ্র ঘরে।
ভেবেছ এ ঘর বেশ ত সাজানো, কিসের অসদ্ভাব,
হায় হায় প্রভু বুঝিলে না এ যে ভাড়া-করা আসবাব।
অন্তর্যামী আঁতের খবর কিছুই জানিলে না কি ?
কোনো মতে ঠাট রেখেছি বজায়, ভিতরে সকলি ফাঁকি।
এই যে দেখিছ রোগা রোগা যত অমৃতের সন্তান,
দারুণ দৈন্য লজ্জার চাপে কণ্ঠে আগত প্রাণ।
কবে কোন্ যুগে খেয়েছিনু মোরা দুই চার ফোঁটা সুধা,
হজম হইয়া গেছে কোন্ কালে, পেয়েছে বিষম ক্ষুধা।
হাজার বছর সবুর করিয়া লভিয়াছি এই জ্ঞান—
নিজে হতে তুমি নাহি দিবে কভু ছাপ্পর-ফোঁড়া দান।
ওহে হৃদিস্থ হৃষীকেশ, তাই সকলে তোমার কাছে
জবরদস্তি করিব আদায় যা কিছু অভাব আছে।
দশ-বিশ কোটি নাছোড়বান্দা মোরা ছাড়িব না কভু,
তুমি যে একলা পড়িয়াছ ধরা, কোথায় পালাবে প্রভু ?
ওঠ, নারায়ণ, জাগ জাগ ওহে অচেতন শালগ্রাম,
এ নয় তোমার ক্ষীরোদ সিন্ধু, এ যে গরীবের ধাম।
ওহে দামোদর দশ-বিশ কোটি টানিছে তোমার রশি,
ওঠ নারায়ণ, আজি যে তোমার উত্থান-একাদশী।

অল্পে তুষ্ট দস্যু আমরা বেশী কিছু নাহি চাই,
অর্ধ রাজ্য রাজার কন্যা এ সবেতে রুচি নাই।
ইন্দ্রের পদ কুবেরের ধন স্বর্গের ভোগ যত,
মুক্তি মোক্ষ নির্বাণ আদি তোলা থাক্ আপাতত।
দেশে দেশে যাহা দিয়েছ দেদার তাই দাও আমাদের,
একটি কেবল ছোটখাট বর, তাতেই হইবে ঢের।

খোল হে শীঘ্র খোল হে তোমার শক্তির ভাণ্ডার,
দাও হে মাথায় হৃদয়ে শক্তি বাহুতে শক্তি আর।
কর সুকোমল কুসুমের মত, তাতে আপত্তি নাই,
দরকার হলে বজ্রের মত কঠোরতা যেন পাই।

তৃণের চেয়েও কর হে সুনীচ, তরুর চেয়েও ধীর,
শত্রুর কাছে উঁচু যেন হয় হিমালয় সম শির।
যত খুশি দাও ক্ষমা অহিংসা অন্তরে মোর ভরি,
একটি কেবল মনের বাসনা ব'লে রাখি হে শ্রীহরি—
দুর্জন অরি এক চড় যদি লাগায় আমারে কভু,
তিন চড় তারে কষাইয়া দিব, মাফ কর মোরে প্রভু।
একটি কানের বদলে তাহার দিব দুই কান কাটি,
একটি দাঁতের বদলে তাহার উপাড়িব দুই পাটি।
ইষ্টানিষ্ট না ভাবিব কভু, শত্রু করিব ঢীট—
ক্ষম অপরাধ, ওহে গদাধর, আমি নরকের কীট।

এইটুকু বর লইয়া তোমায় আপাতত দিব ছুটি,
নিজ নিজ ঘর লব গোছাইয়া যত পারি মোটামুটি।
তারপরে যদি আসে হে সুদিন—আর যদি বেঁচে থাকি,
ভাল ভাল বর করিব আদায়, যা কিছু রহিল বাকী—
মান সম্ভ্রম, মোটা রোজগার, চারতলা পাকা বাড়ি,
লোক-লস্কর, রূপসী বনিতা, আট-সিলিণ্ডার গাড়ি।

## দেবনির্মাণ

চাই বাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তজনত্রাতা,
নাহি চাই নির্বিকার, অবোধ্য দেবতা—
গুণহীন পরমাত্মা, যারে তর্কপটু দার্শনিক জ্ঞানী
ধরিতে ছুঁইতে নাহি পারে, তবু লয়ে করে টানাটানি।
চাই দেব হেন শক্তিমান যাঁর সনে চলে কারবার,
বিপদে সম্পদে বারবার যাঁর কাছে চলে আবদার—
অশুভ যা কিছু ফিরে নাও,
শুভ যত আছে সব দাও,
তাহার উপরে কিছু ফাও
আরো দাও মোরে আরো দাও।

ভূলোকে দ্যুলোকে তাই করিনু সন্ধান
কোথায় দেবতা যিনি সর্বশক্তিমান।
জলে স্থলে মেঘলোকে নভে বিশ্বদেব তোমারে সম্ভাষি—
হে অনল-সলিল-বিহারী, হে ওষধি-বনস্পতি-বাসী,
বাধিয়াছি অগণিত পশু মন্ত্রপূত যজ্ঞবেদী 'পরে,
ঢালিয়াছি হবির আহুতি, অগ্নিশিখা উঠিল অম্বরে ;

দাও পুত্র ধন ধান্য ধেনু, দাও ব্রীহি শস্যের সম্ভার,
দূর কর অমঙ্গল-ভয়, শত্রু মোর কর হে সংহার।
কৃষ্ণ ধূমে দৃষ্টি হয় নাশ,
সোমপানে আসিল জড়তা,
মেদগন্ধে না পড়ে নিঃশ্বাস
দেখা দাও যজ্ঞের দেবতা।
কোথা ওহে বিশ্বদেবগণ?
হা বধির হা রে অচেতন!

হে অদৃশ্য দেব, এই মুক্তাকাশ তলে
ধরা নাহি দিবে তুমি মোর মন্ত্রবলে।
গড়িয়াছি বিপুল আয়াসে অভ্রভেদী তব নিকেতন,
পত্র পুষ্প ফল জল দিয়া করিয়াছি অর্ঘ-নিবেদন,
রচিয়াছি বিশ্বরচয়িতা দৃশ্যমান তব কলেবর,
ধাতু শিলা কর্দম-প্রলেপে সুগঠিত মূরতি সুন্দর।

মণিময় নানা আভরণে সাজায়েছি বিগ্রহ তোমার
ওহে স্রষ্টা হের সৃষ্টি মম, লও পূজা দাও পুরস্কার।
আর যদি ওহে নিরাকার, নাহি চাও মূরতি সুঠাম,
আছে ঐ অবয়বহীন সুবর্তুল শিলা শালগ্রাম।
যেথা ইচ্ছা কর অধিষ্ঠান,
ধর ধর অর্ঘ উপহার,
কথা কও ওহে মূর্তিমান,
মনোবাঞ্ছা পুরাও আমার!
হা রে মূক জড় ভগবান,
হা বিমুখ অচল পাষাণ!

বুঝিয়াছি হে দ্যুলোকবাসী ভগবান,
মূরতি-পূজায় শুধু তব অপমান।
নররূপী তব দূত মুখে পাইয়াছি বার্তা অভিনব,
মানবেরে করেছি দেবতা, দেবতারে করেছি মানব।
সব কথা নারিনু বুঝিতে, এইটুকু বুঝিয়াছি প্রভু—
নিজস্ব মোদের তুমি শুধু, অপরের নহ তুমি কভু।
ত্রাণ কর সন্তানে তোমার স্বর্গলোকবাসী হে জনক,
প্রতিবেশী পাপীজন তরে দাও প্রভু অনন্ত নরক।

বীর যত তোমার সন্ততি
শত্রু নাশি' করিছে উল্লাস,
জয় জয় প্রভু গোষ্ঠপতি!
একি দেব, একি পরিহাস?

ভ্রাতা বধ করিছে ভ্রাতায়,
তব রাজ্য রসাতলে যায়।
শুনিব না কোনো কথা অপরে যা কয়,
বিশ্বাসে তোমারে আমি লভিব নিশ্চয়।

তুমি সর্ব গুণের আধার, হে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান,
তুমি সর্বভয়পরিত্রাতা, হে অপার করুণানিধান ;
পাইয়াছি তোমারি দয়ায় ধরাতলে ভাল কিছু যাহা,
অমঙ্গল যা কিছু দিয়েছ, আমারি মঙ্গল তরে তাহা।
সে কেবল তব লীলাখেলা, অথবা সে মোর কর্মফল।
হে ঈশ্বর নাই কি হে তব আর কোন উপায় সরল ?

সোজাসুজি কর না উদ্ধার যদি তুমি এত শক্তিমান।
ওহে শুষ্ক বাঞ্ছাকল্পতরু, গৃহস্থের পোষা-ভগবান,
ভক্তি চায় ধরিতে তোমারে, যুক্তি কাটে তোমার বন্ধন,
হায় প্রভু টিকিলে না তুমি, আবাহনে হ'ল নিরঞ্জন।
হে অক্ষম ভয়পরিত্রাতা, হে অথর্ব নিয়মের দাস,
হে দুর্বল মহাকারুণিক, হে নিষ্ঠুর শক্তির বিকাশ,

হে কৃত্রিম মানস বিগ্রহ
হে নরের বাঞ্ছিত বিধান,
এক চক্ষু মুদি অহরহ
কেমনে করিব তব ধ্যান?
হে বিধাতা, পার নাই গড়িতে ঈশ্বর,
ফেলিয়াছ এই ভার আমার উপর।

অতি দীন আয়োজন মোর, তবু নাহি জানি পরাভব,
যুগে যুগে তিল তিল করি, অসম্ভবে করিব সম্ভব।
হে অব্যয়, কর কিছু ব্যয়, দাও মোরে শ্রেষ্ঠ উপাদান—
মন প্রাণ ধৈর্য নিরবধি, যথাসাধ্য করিব নির্মাণ।
আপনার সমস্ত অভাব দেবতায় চাই মিটাইতে,
সুন্দর যা কিছু আছে যেথা দেবতায় চাই ফুটাইতে।
অঙ্গে তার দিতেছি লেপিয়া শ্রেয় প্রেয় কামনা আমার,
দেবোত্তম রচিবার ছলে নরোত্তমে দিতেছি আকার।
এখনো অনেক ত্রুটি আছে, কেমনে সে দিবে ইষ্টফল ?
তবু আশা আছে ক্রমে সব অনবদ্য সুন্দর সবল।
অখণ্ড সে মানসবিগ্রহ ; খণ্ড তার হেরেছি নয়নে
নানা পাত্রে নানা দেশে কালে ; নমি সেই খণ্ড নারায়ণে।

সর্বশক্তি নাহি থাকে তার,
তথাপি সে বহুশক্তিমান।
না পারুক করিতে উদ্ধার,
তথাপি সে করুণানিধান।
এখনো সে বহুধা খণ্ডিত,
তবু মহা-মহিমা-মণ্ডিত।
নাহি হোক সর্ব ফলদাতা,
তবু তারে কহিব দেবতা।

## পুতুলের বিবাহ পদ্ধতি ঃ

শ্বেত দ্বীপ নিবাসিভিঃ সাহেবৈর্নির্মিতস্য
গৃহীতস্য পুত্রস্য পোর্সিলেন গোত্রস্য
শ্রীমতঃ অমুকস্য শ্রীমত্যা অমুকয়া সহ
বিবাহ কর্মাহং করোমি। ভাস্করে মাসি
তস্করে পক্ষে ছুট্যাং তিথৌ খেলালগ্নে
গণ্ডগোল যোগে ইদং শুভবিবাহকর্ম-
সম্পাদয়তু। পরিণাম ফলং কন্যায়াঃ
নাসিকাভগ্নং পুত্রস্যতু মুণ্ডপাতং অন্তে
পুণ্যন্যাং বিসর্জনং। শুভাশুভং
মদ্রেচিতংতদস্তু।

## দুলালের গল্প

দুলাল নামে একটি ছেলে পটোলডাঙায় বাস,
গরম গরম পটোলভজা খায় সে বার মাস।
পটোলডাঙার চারদিকেতে পটোলগাছের বন
ডাল ধরে তার নাড়লে পড়ে পটোল দু-দশ মণ।
পাড়তে পটোল ছিঁড়তে পটোল মোটেই বারণ নেই,
বারণ কেবল পটোল তোলা—আইন হচ্ছে এই।
অটল ঘোষের পিসির ননদ পটোল তুলেছিল,
ইস্কুলে তাই অটল ঘোষের নামটি কেটে দিল।
যাক সে কথা। বলচি এখন গল্প দুলালের ;
মন দিয়ে খুব শোনো যদি, বুদ্ধি হবে ঢের।

**দুলাল ব'লে একটি ছেলে পটোলডাঙায় ধাম,**
**বাপ হচ্ছেন যতীশচন্দ্র, গৌরী মায়ের নাম।**

তিনকড়ি আর সাধনচন্দ্র দুলালের দুই চাচা,
আড়াই-হাতী খদ্দরেতে দেয় না তারা কাছা।
দুলালচাঁদের আছে আবার ফুটফুটে পাঁচ বোন—
বীণা, রাণু, বুলু, দুলু—এই নিয়ে চারজন।
আর একটি বেরাল-ছানা—নামটা গেছি ভুলে—
দেখতে যেন মোমের পুতুল গাল দুটো তুলতুলে।
এ-সব ছাড়া দুলালচাঁদের আছে অনেক জন
জেঠতুতো আর মাসতুতো আর পিসতুতো ভাই-বোন।
থাক সে কথা। মন দিয়ে খুব শোনো এখন ভাই—
বলচেন যা দুলালচাঁদের ন-পিসে-মশাই।

দুলালচন্দ্র ছিল যখন সাত বছরের ছেলে,
একদিন সে লুচি দিয়ে পটোলভাজা খেলে।
পাকা পাকা পটোল তাতে ক্যাঁচর-ক্যাঁচর বিচি
বিচি খেয়ে মুখ বেঁকিয়ে দুলাল বলে—'ছি ছি,
রইব না আর কলকাতাতে পটোলভাজার দেশে,
যাচ্ছি আমি পণ্ডিচেরী মাদ্রাজীদের মেসে।'
এই-না বলে টিকিট কিনে দুলাল তাড়াতাড়ি
কটকেতে চলে গেল সেজ-পিসির বাড়ি।

ভাবেন তখন দুলালচাঁদের তিন নম্বর পিসে—
উড়ের দেশে এ ছেলেটির বিদ্যে হবে কিসে।
অনেক খুঁজে মাস্টার পেলেন, নামটি বাঞ্ছা ঘোষ,
নাকটা কিছু থ্যাবড়াপানা, এই যা একটু দোষ।

বললে দুলাল—'আপনার সার, নাকটা কেন খাঁদা?
আপনি যদি পড়ান আমার বুদ্ধি হবে হাঁদা।'
বাঞ্ছানিধি হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন ঘরে,
নাক-লম্বা গোবর্ধন এলেন দু-দিন পরে।
দুলাল বলে—'আপনার সার, খাঁড়ার মতন নাক,
নাকের খোঁচায় শেষে আমার বুদ্ধি ছিঁড়ে যাক্।'
গোবর্ধন বরখাস্ত হলেন চাকরি থেকে,
পিসে তখন বলে দিলেন চাপরাসীকে ডেকে—
'জল্‌দি লে আও এসা মাস্টার নাক নেই যার মোটে—
কটক পুরী দিল্লি লাহোর যেখান থেকে জোটে।'

চাপরাসীটা পাগড়ি বেঁধে বন্দুক কাঁধে ক'রে
দেশ-বিদেশে দেখলে খুঁজে একটি বছর ধ'রে।

তার পরে সে ফিরে এসে বললে—'হুজুর, সেলাম!
নাক নেই যার এমন মানুষ কোথ্থাও না পেলাম।
কিন্তু অনেক চেষ্টা করে দুলালবাবুর তরে
ধরেচি এই ওস্তাদকে মহানদীর চরে।
নাকের বালাই নেই, কিন্তু আওয়াজটি এ'র খাসা,
শিখিয়ে দিতে পারবেন খুব উর্দু-ফার্সী ভাষা।'
চাপরাসী তার লাল বটুয়ার মুখ করলে ফাঁক,
অবাক হয়ে শুনলে সবাই গুরুগম্ভীর ডাক।
আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল লম্বা দুটো ঠ্যাং,
বটুয়া থেকে লাফ দিলে এক মস্ত কোলা ব্যাং।

ব্যাং বললে—'আয় রে দুলাল, পড়বি আমার কাছে।'
কোথায় দুলাল? লেপের ভিতর ঐ যে লুকিয়ে আছে!
দুলালচাঁদের রকম দেখে কষ্ট পেয়ে মনে
ব্যাং বেচারা পালিয়ে গেল খণ্ডগিরির বনে।
দুলাল তখন ইস্টিশানে গিয়ে একেবারে।
কোলকাতাতে রওনা হল পুরী প্যাসেঞ্জারে।
পটেলডাঙ্গায় দু-তিন বছর হয়ে গেল শেষ,
বিস্তর বই পড়লে দুলাল, বুদ্ধি হল বেশ।
কিন্তু হঠাৎ একদিন তার খেয়াল হল মনে,
'এখানে নয়, পড়ব আমি শান্তিনিকেতনে।'
ভালমানুষ হলেও দুলাল বড়ই জেদী লোক,
যা চাইবে করবেই তা, যেমন করেই হোক।

ছোটকাকার সঙ্গে দুলাল জিনিসপত্র নিয়ে
শান্তিনিকেতনের ক্লাসে ভর্তি হল গিয়ে।
ইংরিজী আর বাংলা কেতাব পড়লে একটি রাশ,
পাটীগণিত ব্যাকরণ আর ভূগোল ইতিহাস।
দিনু ঠাকুর শিখিয়ে দিলেন গানের অনেক সুর,
তাকাগাকি শিখিয়ে দিলেন কায়দা যুযুৎসুর।
নন্দলালের কাছে দুলাল আঁকতে শিখলে ছবি,
আর সমস্ত যা যা আছে শিখিয়ে দিলেন কবি।

অনেক রকম শিখলে দুলাল শান্তিনিকেতনে,
গায়ে হল ভীষণ জোর আর অসীম সাহস মনে।
গোমড়া-মুখো মাস্টার যাঁর সদাই হাতে বেত,
নাকে কথা বলেন যাঁরা ভূত পেত্নী প্রেত,
পা-ফাটা সেই কানকাটা যে থাকে খেজুর গাছে,
ছোট ছেলের কান ধরে যে যখন তখন নাচে,
বাঘ ভাল্লুক সাপ ব্যাং আর ভিমরুল আর বিচ্ছু
এসব দেখে দুলালের আর ভয় করে না কিচ্ছু।

কারণ, দুলাল জানে ওরা সবাই জুয়োচ্চোর ;
আর, দুলালের বুদ্ধি আছে, গায়ে ভীষণ জোর।

তারপরেতে বোশেখ মাসের তেসরা রবিবারে
ঠিক দুপ্‌পুর বেলা যখন ভূতে ঢেলা মারে,
সমস্ত দিক নিঝুম যখন রোদ্দুরে কাঠ ফাটে,
জুজুর খোঁজে গেল দুলাল তেপান্তরের মাঠে।
জুজু তখন ঘুমুচ্ছিল ভিজে গামছা পরে ;
সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এল ষাঁড়ের মূর্তি ধরে।
কাঁধের ওপর মস্ত ঝুঁটি, শিং দুটো খুব লম্বা ;
দৌড়ে এসে ঘাড় বেঁকিয়ে ডাক ছাড়লে—হম্বা।
তেড়ে গিয়ে বললে দুলাল—'শোন রে জুজু হাঁদা
চেহারা তোর ষাঁড়ের মতন বুদ্ধিতে তুই গাধা।
যুযুৎসুতে শিক্ষা আমায় দিলেন তাকাগাকি,
জুজুর বুদ্ধি নিয়ে আমার সঙ্গে পারবি নাকি?
শিং ধরে তোর দুমড়ে দিয়ে লাগাই যদি চাড়,
হুমড়ি খেয়ে পড়বি তখন ওরে গর্দভ ষাঁড়!
আমার সঙ্গে লড়তে এলি মুখ্‌খু কে তুই রে?
জানিস্‌ আমি পটোলডাঙার দুলালচন্দ্র দে!'
ফটাস করে ষাঁড়ের তখন পেটটা গেল ফেটে,
ভেতর থেকে মানুষ একটি বেরিয়ে এলেন বেঁটে।
পরনে তাঁর পেণ্টুলুন হ্যাট কোট নেকটাই,
হাতে একটা মস্ত খাতা চামড়ার বাঁধাই।
বুকের ওপর দশটা মেডেল, ফাউনটেন পেন ছ-টা,
হাত-ঘড়িতে কেবল দেখেন বাজল এখন ক-টা।
দুলাল জানে ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যবহার :
দু'হাত তুলে বললে তাঁকে—'মশাই নমস্কার।
মাপ করবেন—আপনাকে সার গাল দিয়েচি যা—
ষাঁড়ের পেটে আপনি ছিলেন তা তো জানতুম না।'
ঘাড়টি নেড়ে জবাব দিলেন জুজু মহাশয়—
'ছেলেদের সব কাণ্ড দেখে বড়ই দুখ্‌খু হয়।
এই দুপুরে জিয়োমেট্রির অঙ্ক কষা ফেলে
রোদ্দুরেতে টো টো কর কেমন তুমি ছেলে?
পরখ করে দেখব তোমার বিদ্যে কতদূর।
এই চারটে কোশ্চেনের দাও দেখি উত্তুর—

তিরিশ টাকায় ছ-মণ হলে আড়াই সেরের কি দাম?
বল দেখি শাজাহানের চারটি ছেলের কি নাম?
বল দেখি কোন্‌ দেশেতে আছে শহর মক্কা?
বল দেখি সন্ধি কি হয়—'এতদ্‌' ছিল 'ঢক্কা'?'

বললে দুলাল—'আড়াই সেরের পাঁচ আনা হয় দাম।
দারা শুজা আরংজেব আর মুরাদ—এ চার নাম।
সবাই জানে আরব দেশে আছে শহর মক্কা।
'এতদ্' ছিল 'ঢক্কা'—হবে সন্ধি—'এতড্ঢক্কা'।'

জুজু বলেন—'ভুল বেশী নেই তোমার জবাবেতে।
শিখতে যদি আমার কাছে, ফুল নম্বর পেতে।
মন দিয়ে খুব পড় খোকা, যাচ্ছি আমি আজ,
সেনেটহলে আমার এখন আছে একটু কাজ।'

দুলাল বলে—'থামুন মশাই, অনেক সময় পাবেন।
এই গরমে দুপুর বেলায় রোদে কোথায় যাবেন?
এই বারেতে আমার পালা, বলুন এখন স্যার
এই চারটে কোশ্চেনের ঠিক্-ঠিক্ আন্সার—

রাবণ রাজার দশ মুণ্ডু, নড়বড়ে বিশ হাত,
কেমন করে বিছানাতে হতেন তিনি কাত?
গঙ্গানদী মহাদেবের জটায় করেন ঘর,
ভিজে চুলে শিবের কেন হয় না সর্দিজ্বর?
সে কোন ঘোড়া, ডিম পাড়ে যে বাচ্চার বদলে?
ভূতের যিনি বাবা, তাঁকে সক্কলে কি বলে?'

ঘাড় চুলকে জুজু বলেন—'তাইতো খোকা তাইতো,
জান্তে তুমি চাচ্চ যে সব, আমার মনে নাইতো।
আচ্ছা, তুমি দিন-আষ্টেক থাক চক্ষু বুঁজে,
বিস্তর বই আছে আমার, দেখব আমি খুঁজে!'

বললে দুলাল—'দুও মশাই, হেরে গেলেন, দুও!
দরকারী যা সে-সব কথা জানেন না একটুও।
বল্চি শুনুন্—টুকে নিন স্যার, আপনার খাতাটিতে;
কাজে লাগবে ভবিষ্যতে সভায় স্পীচ দিতে—

রাবণ রাজার পাগড়ি ঘিরে ন-টা সোনার মাথা,
আঠারোটা কাঠের হাত জামার সঙ্গে গাঁথা।
খুলে শুতেন পাগড়ি জামা নকল মুণ্ডু হাত,
অনায়াসে বিছানাতে রাবণ হতেন কাত।
মাথায় মেখে বেলের আঠা আর ঘুঁটের ছাই,
শিবের জটা ওয়াটার-প্রুফ, সর্দির ভয় নাই।

পক্ষিরাজ ঘোটকের পক্ষিরানী যিনি,
অন্য অন্য পাখীর মতন ডিম পাড়েন তিনি।
সকল ভূতের বাবা যিনি "আবাগে" তাঁর নাম,
তাঁর শ্রাদ্ধে হয়ে থাকে খুবই ধুমধাম।'

জুজুমশাই বলেন তখন—'হার মানলুম খোকা,
তুমিই হলে বিদ্বান, আর আমি হচ্চি বোকা।'
এই না বলে মাটির ওপর ছ-বার লাথি ঠুকে
জুজু-মশাই পালিয়ে গেলেন ষাঁড়ের পেটে ঢুকে।

এই সমাচার জানতে পেরে সঙ্গীরা সব মিলে
দুলালচাঁদের পিঠ চাপড়ে খুব বাহবা দিলে।
জুজুর খবর রাষ্ট্র হল পটোলডাঙাময়,
গোলদিঘিতে বললে সবাই দুলালচাঁদের জয়।
দুলালচাঁদের কথা এখন সাঙ্গ হল ভাই।
সকল গল্প সত্যি যেমন এ গল্পটাও তাই।
বলে গেলুম তাড়াতাড়ি যা মনেতে এল,
বিশ্বাস যদি না করে কেউ, বড় বোয়েই গেল।
মিথ্যে যদি বলে থাকি দোষটা তাতে কিসে?
আমি হলুম দুলালচাঁদের চার-নম্বর পিসে।

# সতী

নিশিশেষে কৃতান্ত কহিল দ্বার ঠেলি,—
'ছাড় পথ হে কল্যাণী, আনিয়াছি রথ,
জীর্ণ দেহ হতে আজি পতিরে তোমার
মুক্তি দিব। ধৈর্য্য ধর, শান্ত কর মন।'
কৌতুকে কহিল সতী—'দেখি দেখি রথ।'
সসম্ভ্রমে বলে যম—'দেখ দেখি দেবী
রথশয্যা মাতৃঅংকসম সুকোমল
ব্যথাহীন শান্তিময় বিশ্রাম-নিলয়,
কোনো চিন্তা করিও না হে মমতাময়ী।'
চকিতে উঠিয়া রথে বসে সীমন্তিনী
বিদ্যুৎ-প্রতিমা সম। শিরে হানি' কর
বলে যম—'কি করিলে কি করিলে দেবী!
নামো নামো, এ রথ তোমার তরে নয়।'
দৃপ্তস্বরে বলে সতী—'চালাও সারথি,
বিলম্ব না সহে মোর, বেলা বহে যায়।'
বিমূঢ় শমন কহে—'যথা আজ্ঞা সতী।'
উল্কাসম চলে রথ জ্যোতির্ময় পথে
স্তব্ধ বসুন্ধরা দেখে কোটি চক্ষু মেলি'।
প্রবেশি' অমরলোকে জিজ্ঞাসে শমন—
'হে সাবিত্রীসমা, বল আর কি করিব?'
কহে সতী—'ফিরে যাও আলয়ে আমার,
যার তরে গিয়াছিলে আনো শীঘ্র তারে।'
কৃতান্ত কহিল—'অয়ি মৃত্যু-বিজয়িনী,
নিমেষে যাইব আর আসিব ফিরিয়া।'

---